

মো. ইসরাফিল আলমের প্রথম পরিচয় একজন রাজনীতিক হিসাবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসন রীতিতে একাধিক মেয়াদে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নওগাঁ জেলার অন্তর্গত রানীনগর উপজেলার এই গণমুখী চরিত্রের আলোকিত মানুষটি ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগ, কর্মজীবনে শ্রমিকলীগ এবং জাতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্ব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রগতিশীল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ জন্ম নেয়া ইসরাফিল আলমের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতির পাশাপাশি গণমাধ্যমের একজন 'বিবেক কণ্ঠ' হিসাবেও যেমন তাঁর বিশেষ পরিচিত রয়েছে, রয়েছে সাহিত্যাঙ্গনেও কলম ধরার নিত্য অভ্যাস। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি রবীন্দ্র জার্নাল, আজকের সমবায় ও শ্রমিক কণ্ঠ প্রকাশনার সম্পাদক হিসাবে নিয়োজিত আছেন। 'বেগম জিয়ার ৫ বছর' শীর্ষক গ্রন্থটির সম্পাদনা করেও তিনি আলোচিত হয়েছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি 'শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও 'বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়', 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়', ও 'তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র সদস্য, সর্বদলীয় সংসদীয় দলের এক্সটিম প্রভার্টি ক্লাস্টারের সভাপতি, দেশের সমবায়ী কৃষকদের একমাত্র জাতীয় সংগঠন 'বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন'-এর নির্বাচিত সভাপতি, 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)' ও 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)'-এর পরিচালনা পর্ষদ-এর সদস্য এবং 'অতীশ দিপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও বাংলাদেশ ওয়াকার্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, আজিজুর রহমান মেমোরিয়াল একাডেমীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। সদালাপী, পরিশ্রমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও মানবতাবাদী এই ব্যক্তি 'হিউম্যান রাইটস ল' এবং বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও আইন শাস্ত্রের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি দুই কন্যা ও এক সন্তানের জনক এবং তার স্ত্রী সুলতানা পারভিন একজন ব্যাংকার। ডেনমার্ক, সাউথ আফ্রিকা ছাড়াও সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান, সুইডেন, মরক্কো, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভুটান, নেপাল, সিঙ্গাপুর ও ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি একজন সুবক্তা, গায়ক ও আবৃত্তিকার হিসাবেও আদৃত।



পিতা

সম্পাদনা

মো. ইসরাফিল আলম

পিতা

সম্পাদনা

মো. ইসরাফিল আলম



সাহিত্যিকা

পিতা

সম্পাদনা

মো. ইসরাফিল আলম

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার একযুগ

পিতা
প্রবন্ধসংকলন
মো. ইসরাফিল আলম সম্পাদিত

স্বত্ব
লেখার স্বত্ব স্ব-স্ব লেখকের
সম্পাদনার স্বত্ব সম্পাদকের

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৫

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন
রূপসী বাংলা লিমিটেড, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

প্রচ্ছদ
আদিত্য অন্তর

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
৮০০ টাকা

Pita by Israfil Alam, Published by Ittadi Grantho Prokash : October 2015.
Price Tk. 800, ISBN: 978 984 904 488 8

উৎসর্গ

বঙ্গবন্ধুর দুই তনয়া
শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির আদি ইতিহাসের প্রাণান্ত উৎসব যেন হেমন্তের নবান্ন ঘিরেই। এমন উপলব্ধিতে গেল বছরের অগ্রাহয়ণে ঠিক করেছিলাম—শত ব্যস্ততার মাঝেও আসন্ন নবান্ন ঘিরে গতানুগতিক চিন্তার বাইরে থেকে ব্যতিক্রমি কিছু করা যায় কিনা! খুব সাধারণ চিন্তার খোরাকে বাংলাদেশ উচ্চারণে যখন থাকি ঠিক পরের শব্দটাই যেন বঙ্গবন্ধু। যৌক্তিক কারণেই বাংলার মাটি, মানুষ, কৃষ্টি, অধিকার, স্বাধীনতা, শাসন রীতি—সব মিলিয়ে জাতির পিতাকে নিয়েই ভিন্ন আয়োজনের সম্ভারে নিজেকে নিবেদন করার মানসিকতায় ইস্পাত কঠিন প্রতিজ্ঞায় নিয়োজিত রেখেছি বেশ কিছুদিন। একজন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অযুত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দেশের আর কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে এত সাহিত্য কবিতা গান গল্প প্রবন্ধ লেখা হয়নি। তিনি যেন রাজনীতিময় পৃথিবীর পথে এক বিশ্ব নন্দিত স্বপ্নের মহাপুরুষ। সঙ্গত কারণেই তাঁকে নিয়ে গ্রন্থ সম্পাদনা করার ইচ্ছেকে রঙিন করতে নিজের মনকে ধূসর রাখার চেষ্টা করিনি। আমার সাধারণ পরিশ্রমে বরেণ্য মানুষগুলোর অসাধারণ লেখনি শক্তিকে একত্রীকরণের এই উদ্যোগের সবটুকুজুড়ে রয়েছেন তিনি আমাদের মহান নেতা—আমাদের জাতির 'পিতা' সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ছেলেবেলা হতেই একজন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুরণিত থেকে সামাজিক সাংস্কৃতিক বলয়কে আলিঙ্গন করতে উন্মুখ ছিলাম। অনেক ক্ষেত্রেই আজো আদর্শিক লড়াইয়ের অভিভাবকত্ব নিয়ে তিনি যেন বাংলার বুকে একজন অদ্বিতীয় বীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো পৃথিবী যতদিন থাকবে তিনি ততদিন আমাদের জন্য বেঁচে থাকবেন। খুব কাছাকাছি! বাংলার মানুষের স্বাধিকার আদায়, অপশাসন রুখতে তাঁর বিকল্প তিনি নিজেই। তিনি কার্যত আমাদের মাঝেই আছেন। খুব গভীর চিন্তায় আপ্লুত হলে বলতে হবে—পিতার আদর্শগত কারণে তাঁর সন্তানদের শোষণহীন 'সোনার বাংলা' গড়ার দায়িত্ব বোধ হতে সরে আসার সুযোগ নেই। সেই দরাজ কণ্ঠের তেজস্বী পুরুষ যেন খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে বলছে—জয় বাংলাকে ধারণ কর, আর কতটা সময় ঘুমিয়ে থাকবি। তিনি শোষিত বঞ্চিত

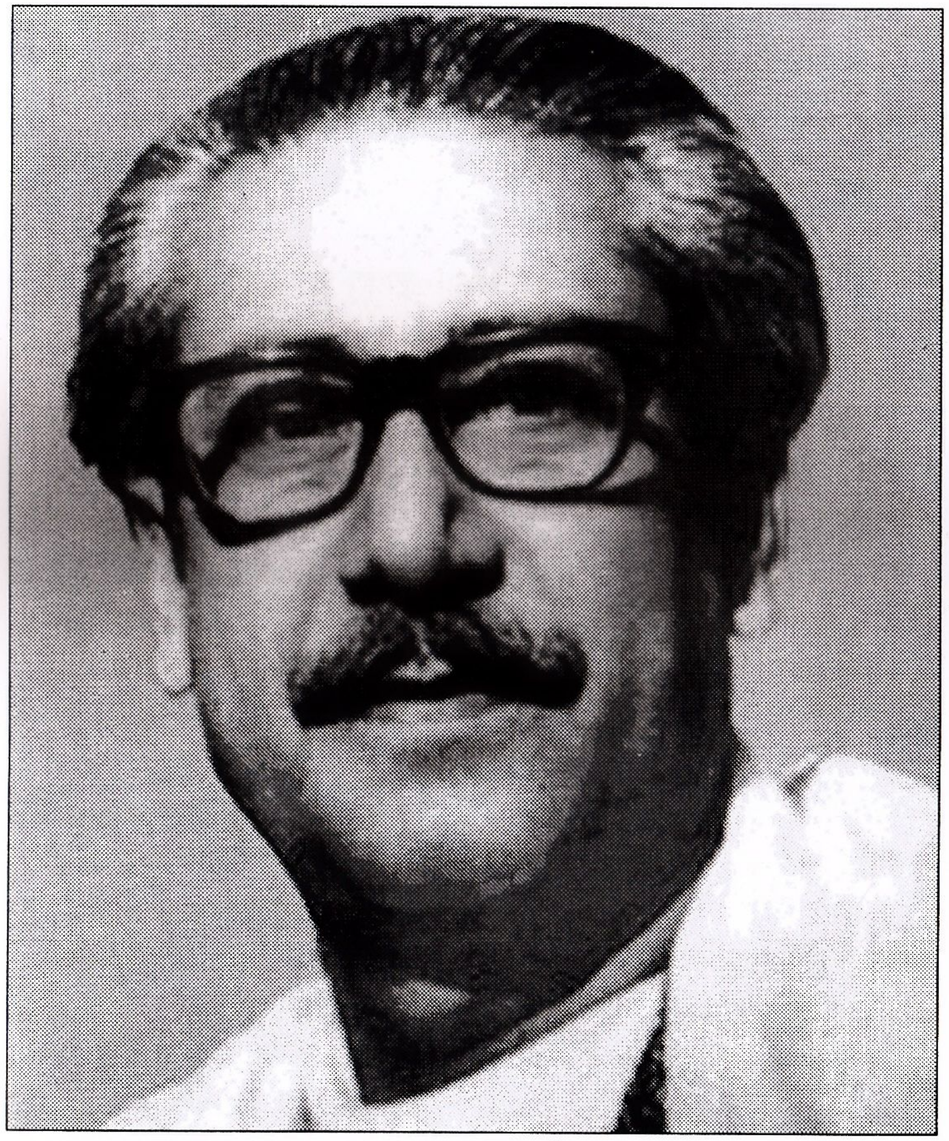
মানুষের মুজিব সংগ্রামে যেন সব সময়ই প্রাসঙ্গিক তিনি যেন আমাদের বীরত্বগাথা অতীত বিশ্বস্ত বর্তমান আর সাফল্যময় সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতছানি।

'পিতা' নামক সংকলিত এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে নেতৃত্বের সকল গুণাবলীর ছায়াচিত্র একজন বঙ্গবন্ধুর মাঝে খুঁজে পাওয়া গেছে। লেখকেরা রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাভাষ্য তুলে ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর মধ্যকার সততা, মেধা, দূরদৃষ্টি, দেশপ্রেম, চরিত্র ও সর্বোপরি ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব বর্ণনায় যাওয়ার প্রয়াসে অবিচল থেকেছেন। জাতির পিতার মানবিক গুণাবলীসমূহ অর্থাৎ মানুষের প্রতি তাঁর সহনশীলতা, নিখাদ ভালোবাসা ও আবেগ বেশ কয়েকটি রচনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। নেতা মুজিব, পিতা মুজিব, বঙ্গবন্ধু মজিব, মানুষ মুজিব, বন্দী মজিব, নন্দিত মুজিবকে খুঁজে পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ চরিত্রকে তুলে ধরতে কলমের শক্ত কালির স্পর্শে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই সংকলিত গ্রন্থে লেখকদের মুক্তমত প্রকাশ পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করেছি জাতির পিতার রক্তের সরাসরি দুই অবলম্বন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে। বাবার অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণে হালের বিশ্বমানের নেত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুপ্রেরণায় আমার সাধারণ উদ্যোগের হেতুতে রয়েছে যথারীতি তাঁর নেতৃত্ব। অন্যদিকে মানবিক চারিত্রিক গুণাবলির উদাহরণ হিসেবে একজন শেখ রেহানার তাঁর সহোদরার পাশে থাকার সংগ্রামকে বাংলার পারিবারিক বন্ধনের শাশ্বত চিরন্তনকে শুধু অনুকরণীয় উপস্থাপনে নজির করে নাই, করেছে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃষ্টান্ত-ও।

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ দেশের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে আদৃত। খানিকটা ব্যতিক্রমী প্রয়াসের এমন উদ্যোগে 'ইত্যাদি' পরিবারকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। বর্তমান সংকলনটির সকল লেখা দেশের জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সকল লেখককে ধন্যবাদ জানাই। লেখক-সূচি নামের আদ্যক্ষর দিয়ে সাজানো হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের আলেখ্য রচনায় একজন বঙ্গবন্ধুর প্রতি লেখকদের উচ্চমার্গের লেখা প্রতিভাত হওয়ার কারণে বইটি সমাদৃত হবে বলে আশা করছি।

মো. ইসরাফিল আলম



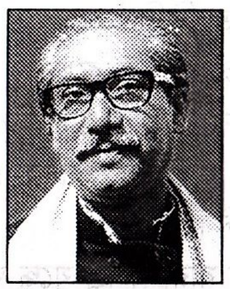
স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

- অজয় রায় ১৭
  পুনর্বাসিত ও পুনর্নির্মিত বঙ্গবন্ধু–বিএনপি স্টাইল
- অন্নদাশঙ্কর রায় ২৯
  ইন্দ্রপাত
- আইভি রহমান ৩৬
  সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা জাতির জন্য কলঙ্ক
- আতাউস সামাদ ৩৯
  বিদেশে বিষণ্ন দিন
- আতিউর রহমান ৪৩
  স্বাধীনতার ঘোষণা অর্থহীন বিতর্ক সময়ই ইতিহাসের সত্য খুঁজে নেবে
- আনিসুজ্জামান ৫৭
  মাটি, মানুষ, বঙ্গবন্ধু
- আবুল ফজল ৬২
  ১৫ আগস্টের ডায়েরি
- আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ৬৬
  বঙ্গবন্ধু
- আবুল মাল আবদুল মুহিত ৭৫
  পনেরো আগস্ট : ষড়যন্ত্রের পটভূমি বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং আমাদের করণীয়
- আবুল হাসান চৌধুরী ৮৫
  বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি
- আবেদ খান ৮৯
  যে মানুষের মৃত্যু নেই
- আসাদুজ্জামান নূর ৯১
  বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শুনে
- আহমদ ছফা ৯৩
  তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান

- আহমাদ মাযহার ৯৮
  শেখ মুজিব : জীবনের দুই পর্ব
- ইসহাক কাজল ১০৩
  আমাদের বঙ্গবন্ধু
- এ বি এম মূসা ১০৮
  আমার যত ভাবনা
- এ কে আজাদ চৌধুরী ১১২
  গণমুখী শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধু
- এম আর আখতার মুকুল ১১৬
  লন্ডনে মুজিব হত্যার সংবাদ কীভাবে পৌঁছালো
- এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১২৫
  পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট : শেখ হাসিনার বিপন্ন দিনগুলো
- ওয়াহিদুল হক ১৩৫
  স্মৃতিময় বাংলা
- কবীর চৌধুরী ১৪০
  কেন তিনি জাতির পিতা
- কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ১৪৭
  ছয় দফা ও শেখ মুজিব
- কামরুদ্দীন আহমদ ১৫৬
  স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিব
- কামাল লোহানী ১৬৫
  লীডার
- কে এম সোবহান ১৭৭
  বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়
- কে. জি. মুস্তাফা ১৯১
  বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আবার বিতর্ক
- খান সারওয়ার মুরশিদ ১৯৭
  মালরো, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব ও কতিপয় নায়ক
- খালেদা এদিব চৌধুরী ২০৮
  পঁচাত্তরের সেই কালো দিন
- চন্দন চৌধুরী ২১৩
  কবিতায় সূর্য-সংগ্রামের ধ্রুব পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান
- জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২২৩
  ইতিহাস বিনির্মাণ এক চলমান প্রক্রিয়া
- জিয়াউর রহমান ২২৭
  একটি জাতির জন্ম
- জ্যোতি বসু ২৪১
  অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মুজিবুর রহমান
- তোফায়েল আহমেদ ২৪৩
  বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্নের বাংলাদেশ
- দাউদ হায়দার ২৪৮
  সেইদিন, একজন পাঁড়েজি
- নাসির আহমেদ ২৫৪
  ইতিহাস বিকৃতির আর এক অধ্যায়
- নির্মলেন্দু গুণ ২৬০
  শেখ মুজিব : এক আত্মঘাতী জাতির নেতা
- নীলিমা ইব্রাহীম ২৬৫
  আমার স্নেহময়ী ভগ্নি রেনু বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
- পান্না কায়সার ২৭১
  ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু
- ফারুক চৌধুরী ২৭৬
  আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু
- বেবী মওদুদ ২৮৪
  ১৫ আগস্ট ১৯৭৫
- মমতাজউদদীন আহমদ ২৯৪
  বাংলা, বাঙালি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
- মযহারুল ইসলাম ৩০০
  মধ্য আগস্টের ক্রন্দন
- মসিউর রহমান, ড. ৩০৫
  বঙ্গবন্ধু ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন
- মহীউদ্দীন খান আলমগীর ৩১০
  বঙ্গবন্ধুর কথা
- মাহবুব উদ্দিন আহমদ ৩২৪
  বঙ্গবন্ধু প্রশাসন এবং তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

- মুনতাসীর মামুন ৩৩৪
  বাঙালির মন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
- মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ৩৪১
  স্বাধীনতা আমার সেই স্বাধীনতা
- মো. ইসরাফিল আলম ৩৪৫
  বিজয়ের প্রাণপুরুষ
- মো. মাহবুবর রহমান, ড. ৩৫২
  মুক্তিদাতা শেখ মুজিব
- মোনায়েম সরকার ৩৫৬
  বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন
- মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ৩৬৩
  প্রশাসক মুজিব
- মোহাম্মদ শাহজাহান ৩৭৯
  সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
- রফিকউল্লাহ খান ৩৮৭
  অস্তিত্ব সত্তার অমলিন দিকপাল বঙ্গবন্ধু
- রামেন্দু মজুমদার ৩৯২
  বঙ্গবন্ধু
- রাহাত খান ৩৯৬
  বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য
- রোকনউদ্দিন মাহমুদ ৪০১
  স্বাধীনতার স্থপতি হত্যার বিচার
- শওকত ওসমান ৪০৭
  সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমি—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
- শফিক সিদ্দিক ৪১৩
  বঙ্গবন্ধু স্যার টমাস উইলিয়াম
- শামসুর রাহমান ৪২৭
  পনেরোই আগস্টের ঘোর অমাবস্যা ছিঁড়ে
- শাহরিয়ার কবির ৪২৯
  মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণকারীদের ক্ষমা নেই
- শেখ রেহানা ৪৩৪
  শোক হোক আমাদের শক্তি
- শেখ হাসিনা ৪৩৭
  ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড
- সন্তোষ গুপ্ত ৪৪২
  পনেরো আগস্টের কালরাতের অনুভূতি এবং কিছু আত্মজিজ্ঞাসা
- সরদার ফজলুল করিম ৪৫১
  মার্চ মাসের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- সরদার সিরাজুল ইসলাম ৪৫৭
  বাঙালির মহাকাব্য কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখবার পারবে না
- সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ ৪৬৩
  বঙ্গবন্ধু একটি নাম, একটি জাতির ইতিহাস
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৪৬৭
  শেখ মুজিবের গোপন শত্রু
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭১
  বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি দু'বার মাত্র
- সুব্রত বড়ুয়া ৪৭৫
  বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু
- সুফিয়া কামাল ৪৭৯
  আমার দেখা মুজিব
- সেলিনা হোসেন ৪৮২
  মৃত্যুঞ্জয় মুজিব
- সৈয়দ শামসুল হক ৪৮৮
  আজ এক কণ্ঠে 'জয় বাংলা' বলবার দিন
- হারুন হাবীব ৪৯০
  শেখ মুজিব : বাঙালির অস্তিত্বের আশ্রয়
- হাশেম খান ৪৯৫
  বঙ্গবন্ধু, শিল্পচার্য ও কিছু অনুভব
- হাসানুল হক ইনু ৫০৩
  মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু
- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৫০৬
  শেখ হাসিনা যেভাবে জানতে পেরেছিলেন



অজয় রায়

পুনর্বাসিত ও পুনর্নির্মিত বঙ্গবন্ধু—বিএনপি স্টাইল

একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে—ইচ্ছা ছিল না বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো বালখিল্য বিতর্কের ওপর কিছু লিখতে। অনেক তো লেখা হয়েছে—অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এমনকি সাধারণ মানুষও লিখেছেন। কিন্তু কাজ কিছু হয়নি। আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিছু ব্যক্তি অটল রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড় করাতে। উঠে পড়ে লেগেছেন তারা প্রমাণ করতে—শেখ মুজিবের ভাষা আন্দোলনে কোনো অবদান নেই, অবদান নেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে, নেই অবদান এ দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোনো আন্দোলনে। তাই বারবার এই মানুষটিকে নিয়ে চলেছে টানাপোড়েন—তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পাচ্ছেন না।

কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় 'শেখ সাহেব', সাধারণ শিক্ষিত জনের কাছে তিনি 'শেখ মুজিব'। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের বিজয়ে—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে জনগণ তাকে মুক্ত করে এনে ভালোবাসার উষ্ণতায় নাম দিয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু'। এই ব্যক্তিটি ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে এই অভিধায় চিহ্নিত করা যায়—আমি তা রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডের সমালোচকদের কাছে এই বিনীত প্রশ্নটি রাখতে চাই। যে কোনো মানদণ্ডে আর কোন নেতা বাঙালির সার্বিক মুক্তির জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করেছিলেন? তিনি প্রাণ দিয়ে সাধারণ বাঙালির ভালোবাসার ঋণ শোধ করেছেন। তবু ক্ষুদ্রচিত্ত-লঘুপাণ্ডিত্যের অধিকারী মহালেখকদের কলম স্তব্ধ করা যায়নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় জাতির জন্য, জনগণের জন্য কোন

ত্যাগটি আপনি স্বীকার করেছেন, যার জন্য আপনাকে দেশবাসী চিনবে, স্বীকৃতি দেবে? এসব তথাকথিত মনীষী-সমালোচকদের কলম থেকেই বেরিয়ে আসে—শেখ মুজিব তো বাংলাদেশ চাননি, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণ তো তিনি 'জয় পাকিস্তান' দিয়ে শেষ করেছেন। যে তাত্ত্বিকেরা এসব কথা উচ্চারণ করেছেন তাদের অধিকংশই '৭১-এ রণাঙ্গন বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসেছিলেন। অবলোকন করেছিলেন যুদ্ধের ফলাফল প্রাচীরগাত্রে বসে। আর অন্যদের অনেকে তখন জন্মগ্রহণ করেননি।

আমার বক্তব্য থাক—কিন্তু যারা সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই সব উঁচুস্তরের সেনাপতিরা কি বলেছেন, একটু দেখে নেয়া যাক :

প্রথমেই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেড-ফোর্সের অধিনায়ক এবং চট্টগ্রামস্থ অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২৫ মার্চের বিদ্রোহী সেনানায়ক কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে একজন বাঙালি সৈনিক হিসেবে। '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম।' *(প্রসঙ্গ : একটি জাতির জন্ম। দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২। পরে ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় পুনঃপ্রকাশিত)*

২৫ মার্চ-পরবর্তী চট্টগ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধের মূল নায়ক এবং ১নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন : "সে দিনের সভায় শেখ মুজিবের দেয়া ভাষণ, বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। গভীর আবেগে, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনাপূর্ণ এ ভাষণে অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম...ইত্যাদি। বীরোত্তম মেজর রফিকুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কয়েকটি দিক সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তার ভাষাতেই বলা যাক :

আমি যদি হুকুম দিবার জন্য না থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।—খাজনা-ট্যাক্স সবকিছু বন্ধ করে দেবেন।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তিনি কী তাঁর ভাষণে দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি?" *(লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, রফিকুল ইসলাম, ১৯৮১)*

আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গনের এক বীরসেনানী কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর কাছে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ-প্রস্তুতির সবুজ সঙ্কেত : ঐদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, এমন আশা অনেকেই করেছিলেন।... কিন্তু সেদিন নেতা আমাদের তথা সব বাঙালিদের হতাশ করেছেন।...

এতদসত্ত্বেও তাঁর ৭ মার্চের ঘোষণা—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-কে বাঙালি জাতির ভবিষ্যতের করণীয় ব্যাপার সবুজ সঙ্কেত বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। '২৬ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ ঘোষণার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার প্রতিই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পরিপূর্ণ আস্থা ছিল।' *(এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, আবু ওসমান চৌধুরী, ১৯৯১)* পুস্তকটির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, "...বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শুধু আমাকেই উদ্বেলিত করেনি, বরং প্রতিটি বাঙালির বুকেই তুলেছে বিদ্রোহের ঝড়, স্বাধীনতার অনাস্বাদিত স্পৃহা।"

চট্টগ্রাম প্রতিরোধ যুদ্ধের আরেক সেনানী, ৫ নং সেক্টরের অধিনায়ক তৎকালীন মেজর মীর শওকত আলী তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, '...১৫ মার্চের দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন এবং ইতিপূর্বে ৭ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিলেন তখন থেকেই আমরা, বাঙালি সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে, একটা গণ্ডগোল বাধবে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' জেনারেল শওকত আরেক স্থানে বলেছেন, '৭ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন?' *(লে. জেনারেল মীর শওকত আলীর সাথে সাক্ষাৎকার, একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, ১৯৮৬)*

কে ফোর্সের ও ২ নং সেক্টরের অধিনায়ক জেনারেল খালেদ মোশাররফ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে দিক-নির্দেশনা হিসেবে দেখেছেন এবং সেভাবে মানবিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন : "অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে (২৬ মার্চ)। যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের ঘোষণার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, 'এবার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম, এই মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম।" *(আমিই খালেদ মোশাররফ, সম্পাদনা : এম আর আখতার মুকুল, ১৯৯০)*

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে আমি এখানে কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাবো না—আর তার প্রয়োজনও নেই। শুধু এটুকু মন্তব্য করবো—এমন সুন্দর কবিতার ভাষায় কে কবে লাখো মানুষের কাতারে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাষণ শুনেছেন, আমার পরম সৌভাগ্য ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃতি করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্তি টানতে চাই—

'একটি কবিতা লেখা হবে
তার জন্যে অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা
বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে কখন আসবে কবি।
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
...
গণসূর্যের মঞ্চে কাঁপিয়ে কবি
শোনালেন তাঁর কবিতা খানি—
'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

আমাদের সর্বজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি নতুন তথ্য সরবরাহ করেছেন—সেদিনের সমাপনী ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষক অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ টেনে তিনি উচ্চারণ করেছেন একটি বক্তব্য, যাকে বলা যেতে পারে সত্যকে চাপা দেয়ার প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'জিয়াউর রহমানই ২৫ মার্চ ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন'। ইতিহাস তথ্যজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা সত্য হলে তো আমাদের স্বাধীনতা দিবস হওয়া উচিত ২৫ মার্চ, ২৬ মার্চ নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতি তীর্যক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, '২৫ মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হলে ২৬ মার্চ ঘোষণা এলো কোত্থেকে? প্রধানমন্ত্রীর এবং তার দলের অবশ্য আরেকটি কাজ আবদ্ধ রয়েছে—তা হলো ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু নয়, ৬ মার্চ মেজর জিয়া তার ড্রইংরুমে বসে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। বঙ্গবন্ধু কেবল পরদিন জিয়ার ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার নির্দেশে জিয়ার ভাষণের পুনরুক্তি করেছিলেন। কাগজে প্রকাশিত (১০

জুলাই) প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, বেশ বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে ৩য় খণ্ডে। সেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণার ইপিআর মেসেজটির জায়গায় মেজর জিয়াউর রহমানের কালুঘাট 'বাংলাদেশ বেতার' থেকে প্রচারিত (২৭ মার্চ) বক্তৃতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণীটি ছিল ইংরেজিতে :

'This is may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on unit the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achived.'

দলিলের সূত্রে বলা হয়েছে শিরোনাম : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত ঘোষণা। তারিখ ২৬ মার্চ, ১৯৭১। বাণীটির নিচে ছোট অক্ষরে নিচের মন্তব্যটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।

Message Embodying Declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March i.e. early hours of 26th March, 1971 for Transmissin throughout Bangladesh over the ex- EPR Transmitter.

বঙ্গবন্ধুর বাণী স্থলাভিষিক্ত জিয়ার বাণীটি নিম্নভাবে ছাপানো হয়েছে। এটি ২৭ মার্চ কালুঘাট বেতার থেকে প্রচারিত।

'Dear fellow Freedom fighters

I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander-in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle, Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate the country from the occupation of Pakistan Army.

Inshallah victory is ours.'

এ বক্তব্যটির পর জিয়াউর রহমানের প্রাগ্রসরতা প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সংস্কারণের পাদটীকা লেখা হয় : '২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত ২টা ১৫ মিনিটে (২৫

মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করেন। এরপর তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জোয়নাদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সাথে সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়।'

বোঝাই যায়, সরকার আটঘাঁট বেঁধেই মাঠে নেমেছেন। জোয়ানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতাটিকেই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা বলে বিএনপি এখন চালাতে চায়।

প্রথমে আমরা দেখতে চাই নতুন মুদ্রণের সাথে সংযুক্ত প্রত্যয়ন কমিটিতে কারা রয়েছেন। বিএনপি শতফুল কমিটির দু'জন রয়েছেন—একজন হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও উপাচার্য পণ্ডিত জনাব এমাজউদ্দিন আহমেদ, আরেকজন সর্ববিষয়ে সর্বজান্তা—ইনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরশাদী উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া। ইনি বিএনপির সর্বভূতেষু বিরাজমান, পাঁচফোড়নের মতো সব তরকারিতেই লাগে। দুজন ইতিহাসবিদও ছিলেন—একজন ড. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, অন্যজনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. কে এম মহসীন। শেষোক্ত জন প্রথম প্রকল্পটির সাথেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন—প্রত্যয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে এবং হাসান হাফিজুর রহমানের মৃত্যুর পর কিছু দিন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুনেছি এই দুজন সদস্য এই বাতিল ও অন্তর্ভুক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছেন।

বর্তমান প্রত্যয়ন কমিটির দুজন সদস্য—দুই সাবেক উপাচার্য বর্তমান সরকারের সুনজরে রয়েছেন, বলেছেন যে, ২৫ মার্চের মধ্যরাতে ঘোষণার কোনো দালিলিক সাক্ষ্য তারা পাননি। তবে দুজনেই বলেছেন, প্রত্যয়ন কমিটি নিশ্চিত হয়েই জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের বক্তব্যের সূত্র হিসেবে ৩য় খণ্ডে বলা হয়েছে, 'শিরোনামে বিপ্লবী বেতার চট্টগ্রাম, তারিখ ২৭ মার্চ। জিয়ার ২৫ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে এরা দুজন তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছেন। পাদটীকার কথাগুলো প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রী জুড়ে দিয়েছেন।

পুরনো দলিল প্রত্যয়ন কমিটির ৫ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এই বিকৃতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রত্যয়ন কমিটির উচিত ছিল কোনো দলিল বাতিল বা সংযোজনের জন্য সাবেক কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করা। যারা সে

সময় তথ্য সংগ্রহের দুরূহ কাজটি করেছিলেন সে রকম ২/৪ জন কর্মকর্তার সাথে আলাপ করা—তাঁরা কোন দালিলিক ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর বাণী অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যেমন—সুকুমার বিশ্বাস বা আফসান চৌধুরীর মতামত তারা নিতে পারতেন। পুনর্মুদ্রিত অথচ সম্পাদক হিসেবে হাসান হাফিজুরের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এ প্রসঙ্গে আফসান চৌধুরীর বক্তব্য হলো—এ কাজটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এটি একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়নি। বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জনাব চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান একটি টেলিগ্রাফ বার্তায় স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন—এর দালিলিক সাক্ষ্য তারা বিভিন্ন সূত্র ও সরকারি দলিলপত্র থেকে আহরণ করেছিলেন। এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও, যেমন—চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, উত্তরবঙ্গ থেকেও এই বাণীর কপি সংগ্রহ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার আরেকটি সাক্ষ্য হলো বিবিসি কর্তৃক প্রচারিত একটি অনুষ্ঠান, যা ১২ পর্বে ১৯৯৪ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত চলে। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে (৭ম ও ৮ম পর্ব) বলা হয়েছিল : '...২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাটিও তৈরি করা হয়েছিল। পাকিস্তানিরা পিলখানার ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের আক্রমণ করার পরপরই শেখ মুজিবের নামে ইপিআর ওয়ারলেসে এটি প্রচার করা হয় এবং টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেয়ার আগে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বাংলাদেশের সব জেলা, মহকুমা এবং অন্যত্র এ ঘোষণাটি পাঠানো হয়। ঘোষণাটিতে বলা হয়—'দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ।... ইত্যাদি।' এই বার্তা যেখানেই পৌঁছে স্থানীয় জনসাধারণ, রাজনৈতিক কর্মী ও সংস্কৃতিসেবীরা স্বেচ্ছায় সাইক্লোস্টাইল করে বাংলায় এ ঘোষণা বিতরণ করে।

এখানে একটা ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়োজন। নবমুদ্রিত ৩য় খণ্ডে জিয়াউর রহমানের যে ঘোষণাটি স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার এবং ২৭ মার্চে প্রদত্ত বলে দাবি করা হয়েছে তা কিন্তু তাঁর প্রথম ঘোষণা নয়, বস্তুত এটি তাঁর ২য় ভাষণের পুনর্মার্জিত রূপ, যা তিনি ২৮ মার্চ পাঠ করেছিলেন। এখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট বেলাল মোহাম্মদের জবানীতে শোনা যাক এ প্রসঙ্গ (২৭ মার্চের ঘটনা) : '২৭ মার্চ সকালবেলা কাজী হাবিব উদ্দিন আহম্মেদ এসেছিলেন মশতারী লজে।... ট্রান্সমিটারে পৌঁছাতে বিকাল ৫টা বেজে গিয়েছিল। ... অফিস কক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম : আচ্ছা, মেজর সাহেব, আমরা

তো সব 'মাইনর', আপনি মেজর হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়। কথা ছিল নিছক রসিকথা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সাথে সাথে বলেছিলেন : হ্যাঁ। কিন্তু কি বলা যায়, বলুন তো!' আমি একপাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি লিখেছিলেন : I Major Zia do hereby declare independence of Bangladesh. আমি তখন বলেছিলাম : দেখুন 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে' বলবেন কি? তিনি বলেছিলেন : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন : On behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman... (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, ১৯৯৩)। জিয়ার স্বকণ্ঠে ঘোষণার পর অনুবাদটিও প্রচারিত হয়েছিল ২৭ মার্চের সন্ধ্যাবেলা। জিয়াউর রহমানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিবৃতিটি স্থান পেয়েছে পুরনো ৩য় খণ্ডের দলিলের ২য় পৃষ্ঠায়। জানি না নতুন মুদ্রণে এটির স্থান রয়েছে কি-না!

মেজর জিয়ার এই বিবৃতিটি কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, নিরাপত্তার জন্য জিয়ার মূল ঘোষণাটি ধ্বংস করে ফেলা হয় (জিয়ার হাতের লেখা কপিটি, যা বেলাল মোহাম্মদের কাছে ছিল—তিনি পরে তা নষ্ট করে ফেলেন)।

জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণাটি আসে ২৮ মার্চ, যেখানে জিয়া নিজেকে অস্থায়ী প্রধান হিসেবে ব্যক্ত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ২৮ মার্চের ঘটনাবলীর বিবরণে বেলাল মোহাম্মদের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ : 'আজ (২৮ মার্চ) মেজর জিয়াউর রহমান নতুন একটি ঘোষণালিপি নিয়ে এসেছিলেন। ওতে নিজেকে তিনি Provisional Head of Bangladesh এবং স্বাধীন বাংলা লিবারেশন আর্মির প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন। মেজর জিয়াউর ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত...। মেজর জিয়াউর রহমান আমার সম্মতি চেয়েছিলেন।... বিদেশের কাছে গুরুত্ব উৎপাদানের জন্য আপনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সামরিক বাহিনীর প্রধান অবশ্যই বলতে পারেন। ঘোষণাটি প্রচারের সময় জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল আপত্তিকর।' তবে এ বক্তব্যটি জিয়া স্বকণ্ঠে প্রচার করেননি—তার পক্ষে লে. শমসের মবিন বেশ কয়েকবার পাঠ করেছিলেন। এ ঘোষণাটি আমি নিজে অনেক কষ্টে ২৯ মার্চ সকালে শুনেছিলাম এবং বলা বাহুল্য আমিও হতাশ হয়েছিলাম এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ওদিকে সে সময় চট্টগ্রামের শিল্পপতি এ কে খান জিয়ার জন্য আওয়ামী লীগের নেতাদের

মাধ্যমে জিয়াকে দিয়ে সংশোধিত ঘোষণা পরে প্রচারিত হতে থাকে—স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে এ কে খানের স্মৃতিচারণ : 'শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম—এখন জিয়ার এই ঘোষণাটি বিশ্ববাসীর মনে এই ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে যে, বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম আর কিছু নয়, আসলে এটা একটা মিলিটারি ক্যু মাত্র। তাই আমি ভাবলাম ঘোষণাটির একটা সংশোধনী দিতে হবে।... তারা জিয়ার কাছে ঐ ঘোষণা (সংশোধিত) নিয়ে যায় এবং জিয়া তা পাঠ করেন। *(স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রাম, একটি বিতর্কিত প্রশ্নের সত্য উদঘাটন, পূর্বকোণ, ২৬ মার্চ, ১৯৮৬)*। এই পরিপ্রেক্ষিতে জিয়ার নামে ৩০ মার্চ আরেকটি বিবৃতি প্রচারিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। স্বহস্তে লিখিত এ ঘোষণাটি সংরক্ষিত হয়েছে এবং পুরনো ৩য় খণ্ডে ছাপানো হয়। তবে ভুল করে জিয়া ৩০ মার্চের পরিবর্তে ৩১ মার্চ সই করেছিলেন। *(দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৩য় খণ্ড, ১৯৮২)*

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে—জিয়া প্রথম ঘোষণাটি দেন বঙ্গবন্ধুর নামে (২৭ মার্চ) দ্বিতীয় ঘোষণাটি দেন নিজেকে অস্থায়ী প্রধান হিসেবে (২৮ মার্চ) আর সর্বশেষ ঘোষণাটি দেন পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে (৩০ মার্চ)। এ প্রসঙ্গে আমরা জিয়ার বক্তব্য তুলে ধরতে পারি তার ডাইরি থেকে, যেখানে তিনি লিখেছেন : '২৭ মার্চ শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রেডিও স্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়।... ৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধে।' বোঝাই যাচ্ছে জিয়া ডাইরির কথাগুলো লিখেছেন ৩০ মার্চের পর। প্রথম ঘোষণাটি যে বঙ্গবন্ধুর নামে গিয়েছিল তা তিনি ভুলে রেকর্ড করেননি, দ্বিতীয় ঘোষণাটিকেই প্রথম ঘোষণা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এবার আমরা নবমুদ্রিত ৩য় খণ্ডে জিয়ার তথাকথিত প্রথম (বস্তুত ২৮ মার্চে প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাষণ) ঘোষণার পর পাদটীকা প্রসঙ্গে আসতে চাই। পাদটীকায় দাবি করা হয়েছে, জিয়া ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ান ও অফিসারদের সামনে 'স্বাধীনতার ঘোষণা দেন'। কিন্তু এটি একটি শুধু মিথ্যা দাবি নয়, দুরভিসন্ধিমূলক। জিয়ার নিজের কথাতেই

শোনা যাক এই তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে : 'ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারদের বন্দি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।... অপারেটর সানন্দে রাজি হলো।

...সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।... আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল। রক্ত অক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন।' *(একটি জাতির জন্ম, জিয়াউর রহমান, প্রথম প্রকাশ দৈনিক বাংলা ও দৈনিক গণবাংলা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২; পুনর্মুদ্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্র, ১৯৭৪)*। জোয়ানদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনামূলক জিয়ার আহ্বানের অবমূল্যায়ন না করেও পাঠকদের কাছে প্রশ্ন রাখা যায়—এটি কোন অর্থে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' আপনারাই বিচার করুন।

আরেকটি প্রশ্ন, জিয়ার নামে ২৭ মার্চের যে নতুন ঘোষণাটি প্রামাণ্য কমিটি অন্তর্ভুক্ত করেছে তা আপনারা কোথায় পেলেন এর বঙ্গানুবাদটিই বা কোত্থেকে পেলেন এবং তৈরি করলেন। কারণ তার এই ভাষণটি যেখানে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন—এর কোনো টেপ 'স্বাধীন বাংলা বেতার' কেন্দ্রের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রক্ষা হয়নি। জিয়ার প্রথম ভাষণটি (২৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানমালা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার অনুচরদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক ক্রান্তিলগ্নে মেজর জিয়া একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন—ইতিহাসে তার স্থান চিহ্নিত হয়ে গেছে সেখান থেকে তাকে নামানো যাবে না, আবার উপরেও তোলা যাবে না।

জোয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকে যদি জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বলে চিহ্নিত করা হয় তাহলে এ ধরনের কমপক্ষে

ডজনখানেক বিভিন্ন সেনাপতির স্থানীয়ভাবে উদ্দীপনা ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে গণ্য করতে হবে। জিয়া এদের মধ্য অন্যতম মাত্র।

লে. জেনারেল খালেদ মোশাররফ এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের স্ব-স্ব এলাকায় প্রত্যেকেই ছিলাম 'স্বাধীনতার স্বঘোষক'। কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। প্রতিটি বাঙালি, বাঙালি সৈনিক ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য : 'যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না,... আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম, আমি এই মুহূর্তে স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সৈনিকদের বলে দাও, আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের অনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। সৈনিকদের তৈরি হতে বলো।'

'...আমি বঙ্গশার্দূলদের স্লোগান শুনলাম 'জয় বাংলা'। আমি তাদের প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হলো সেটা কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল।... আমি দেখতে পেলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা সবাই দৃঢ় সংকল্প থেকে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। ...ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭ মার্চ।' *(আমি খালেদ মোশাররফ, ১৯৯০)*।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, নিজ হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সমবেত সৈনিক ও জনতার উদ্দেশ্যে উদ্দীপনাময় ভাষায় বললেন, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে মেনে নিয়ে পাক সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।' সমবেত জনসমুদ্রের জয় বাংলা ধ্বনিতে শহর প্রকম্পিত হলো। দিনটি ছিল ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল। *(এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, আবু ওসমান চৌধুরী, ১৯৯১)*

ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধের এক অসীম সাহসী সেনানী। তার অধীন জোয়ানদের এভাবে উত্তেজিত করেন : 'শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার আগে সাধারণ সৈনিকদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা ব্যাখা দেয়া আবশ্যক মনে করলাম। একটা খোলা ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ছয়শতাধিক সৈনিকের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে বললাম :

বাঙালি ভাইয়েরা আমার

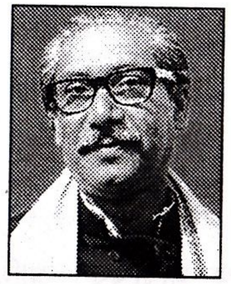
বাঙালি জাতি আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। ইয়াহিয়া সরকারের লেলিয়ে দেয়া পশ্চিমা সৈনিকেরা গতকাল রাতের অন্ধকারে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। তারা বাঙালির রক্তে সেখানে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিয়েছে।... পশ্চিমাদের এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।... এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব আমাদের দিতে হবে।

আমরা আজ স্বাধীন।... বাংলার স্বাধীনতা রাখতে হলে পশ্চিমা হায়েনাদের বিতাড়িত করতে হবে।' *(মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, মেজর এম এ ভুঁইয়া, ১৯৭২)*। একইভাবে চট্টগ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধের বিশিষ্ট নায়ক মেজর রফিকুল ইসলাম এবং মেজর শফিউল্লাহ স্ব-স্ব এলাকায় তাদের সেনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণপাত করার জন্য আহ্বান জানান। শুধু সামরিক নেতৃত্ব নয়, বেসামরিক নেতৃত্বও সেদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে জনসাধারণকে অংশগ্রহণ করান—স্ব-স্ব এলাকার স্বাধীন বাংলার প্রশাসনও গড়ে তোলেন—আমরা নমুনাস্বরূপ পাবনার তৎকালীন ডিসি নুরুল কাদির ও মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরীর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারি।

শেখ মুজিবকে ছোট করার আরেকটি প্রয়াস হলো, বেগম খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক জিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুকেও গত বছর রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান। এটি জিয়া ও বঙ্গবন্ধুকে এক পঙক্তিতে নিয়ে আসার দুষ্ট অভিসন্ধি। একদিকে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের মধ্যে বিএনপি স্টাইলে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকৃতিদান, অন্যদিকে যেখানে যতো বঙ্গবন্ধুর ছবি রয়েছে, নামফলক রয়েছে, তা ধ্বংস সাধন—এই হলো বিএনপি'র রাজনৈতিক দর্শন। প্রধানমন্ত্রী ও তার অনুচরদের জানা উচিত যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ছোট করা যায় না, তাঁর বিশালত্ব বিএনপিদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

অনেক মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সেদিনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে কি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া সম্ভব ছিল—এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো। আজ শুধু বলবো—বঙ্গবন্ধুর অবদান ইতিহাস স্বীকৃত, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় বলতে পারি :

'যতদিন রবে পদ্মা-যমুনা-গৌরী-মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'



অন্নদাশঙ্কর রায়

ইন্দ্রপাত

বারো বছর আগে জার্মানি থেকে ফেরার পথে আমার বিমানসঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রামের ইস্পাহানি সাহেব। সেকালের নামকরা বণিক ইস্পাহানির পুত্র। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমরা লুফট-হানসার বিমানে উঠি ও পাশাপাশি আসনে বসি।

'ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে পার্টিশন একটা সর্বনাশা ব্যাপার। আমাদের কারবার ছিল প্রশস্ত পরিধিজুড়ে। তাকে টুকরো টুকরো করতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভার পড়েছে আমার ওপরে। ঐটুকু গণ্ডির ভেতরে প্রসারণের পরিসর কোথায়?' তিনি আপসোস করেন।

অর্থনীতির প্রসঙ্গ থেকে আমরা রাজনীতির প্রসঙ্গে আসি। তিনি বলেন, 'আইয়ুব খান যে বেসিক ডেমোক্রেসি প্রর্বতন করতে যাচ্ছেন তার ফল ভালো হবে না। মাত্র আশি হাজার ভোটার। টাকা ছড়িয়ে একচল্লিশ হাজার ভোটারকে হাত করা অতি সহজ। আইয়ুব চান চিরস্থায়ী হতে।'

আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁর নিজের মতে কী করা উচিত। তিনি এর উত্তরে বলেন, 'রাজনীতিকদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেই হয়। আগেকার মতো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে যাঁরা জিতবেন তাঁরাই সরকার চালাবেন।'

'কিন্তু সরকার চালানোর মতো যোগ্য লোক কি পূর্ব পাকিস্তানে কেউ আছেন?' আমার নিজের মনেই সংশয় ছিল।

'কেন? শেখ মুজিবুর রহমান।' তিনি নিঃসংশয়ে রায় দেন।

'শেখ মুজিবুর রহমান কি পারবেন একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে?' আমি তাঁর সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলুম।

'কেন পারবেন না? তাঁকে একটা সুযোগ দিলে ক্ষতি কী?' তিনি শেখ মুজিবকে চিনতেন ও তাঁর ওপর আস্থাবান ছিলেন।

ইস্পাহানি বাঙালি নন। মুজিব বাঙালি। কিন্তু লক্ষ করলুম তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতা নেই। তার কারণ বোধহয় তিনি ইরান দেশের আগন্তুক। পাকিস্তানি নাগরিক হলেও তার মানসিকতা পূর্ব পাকিস্তানি সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে। কোলকাতাতেই তিনি ভালো ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া তিনি পছন্দ করেননি।

'আপনার সঙ্গে কোলকাতা অবধি গিয়ে সেখান থেকে অন্য ফ্লাইটে চট্টগ্রাম যাওয়ায়ই আমার পক্ষে সুবিধের। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার সময়ের দাম আছে। কিন্তু ওরা কি সেটা বুঝবে? নিয়ম করে দিয়েছে করাচিতেই রাতের মাঝখানে নামতে হবে। করাচি থেকেই ফ্লাই করতে হবে ঢাকায়। সেখান থেকে চট্টগ্রামে। একটা দিন নষ্ট। আর রাতের ঘুমটাও।' তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তখন থেকেই আমার জানা যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের অদ্বিতীয় নেতা। পরে একদিন তাঁর আরো এক প্রকার পরিচয় পাই। আমার এক বন্ধুপুত্র ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে কাজ করতেন। কিছুকাল তাঁকে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনে নিযুক্ত থাকতে হয়। সেখান থেকে বদলি হয়ে এসে আমাকে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব ভারতের কাছে অস্ত্র চেয়েছিলেন। আর মুক্তিসৈনিকদের ভারতের মাটিতে তালিম। পণ্ডিত নেহরু সম্মত হন না।'

আমি তা শুনে তাজ্জব বনে যাই। মানুষ কী পরিমাণ মরিয়া হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করে! আইয়ুব খান মুজিবকে মুখ্যমন্ত্রী হতে না দিয়ে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছেন? তখতে বসিয়েছেন কিনা মোনায়েম খানকে। ময়মনসিংহ থাকতে একদিন ওঁকে আমার আদালতে বসে থাকতে দেখেছিলুম। মিনিস্টার চেহারা। দারুণ কমিউনাল বলে ওঁর দুর্নাম। হয়তো সেইটেই ওঁর যোগ্যতার মাপকাঠি।

আইয়ুব খানের পতনের পর শেখ মুজিবের সুদিন আসে। বেসিক ডেমোক্রেসি পরিত্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পুনঃপ্রবর্তিত হয়। সাবালকদের সবাইকে ভোটের অধিকার দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে মুজিবের দলের জয়জয়কার। শতকরা নিরানব্বইটা আসন কোন দল কবে কোন দেশের ইতিহাসে পেয়েছে? মুজিবের তো সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা।

সেই সময়ে কতকগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হয় ঢাকায়। একটি ছাত্রের বাড়ি ঢাকায়। সে পড়ে শান্তিনিকেতনে। তাকে পাঠাই বই কিনে আনতে। সে বই নিয়ে আসে। উপরন্তু আনে কয়েকটি রেকর্ড। আমাকে বাজিয়ে শোনায়; কিন্তু হাতছাড়া করে না। রেকর্ড শুনে আমি চমকে উঠি। পাকিস্তান সরকার বার করতে দিচ্ছে অমন সব রেকর্ড! তাতে শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ। কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা। সে কী উন্মাদনতা ভরা গান! গেয়েছে তরুণ-তরুণীরা। আবার যেন সেই ১৯০৫ সালের স্বদেশী আমল ফিরে এসেছে। লোকে পাকিস্তানের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্য পাগল। যে বাংলাদেশ তাদের একান্ত আপনার।

আজ বাদে কাল রাম রাজা হবেন; কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। তেমনি শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। তার বদলে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের এক দুর্গম স্থানে হলেন রাজবন্দী। যখন ফিরে এলেন তখন তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। আমার সেই রেকর্ড শোনার বারো মাসের পরই রেডিওতে তাঁর সংবর্ধনার বিবরণ শোনা। তাঁর ভাষণ শোনা। রামের মতো তিনি ফিরে এলেন পুষ্পক বিমানে।

তিনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন এতেই আমরা কৃতার্থ। কারণ তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। ঢাকায় পাকিস্তানি ফৌজ আত্মসমর্পণ না করলে, রাতারাতি ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ না করলে, পাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে না দিলে, লন্ডন থেকে তিনি দিল্লি ও দিল্লি থেকে ঢাকায় পৌঁছতেন না। তাঁর দিল্লি সংবর্ধনার বিবরণও শুনেছি। সেখানেও তিনি বাংলায় ভাষণ দেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণে ঢাকা যেতে পারিনি। পরে ডিসেম্বর মাসে আসে অন্য এক আমন্ত্রণ। ততোদিনে শেখ সাহেব স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেছেন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবকে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পদ। ইতোমধ্যে কোলকাতায় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার 'পথে প্রবাসে'র থেকে আবৃত্তি করে আমাকে অবাক করে দেন। পরে ঢাকায় বঙ্গভবনে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন করেন। তখন জানতে পাই তিনি ছাত্র বয়সে তাঁর পত্রিকার জন্য আমাকে চিঠি লিখে লেখা চেয়েছিলেন।

তার পরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যাওয়া হয় না। কিন্তু পরবর্তী একুশে ফেব্রুয়ারিতে সদলবলে নিমন্ত্রণ। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা হয়ে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণ পাশে শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর পাশেই আমি। খুব কাছাকাছি পাই শেখ সাহেবকে। আমার অন্যতম হিরো। কিন্তু কথা বলার অবকাশ পাইনি। পেতুও না, যদি না সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাদের প্রত্যাবর্তনের দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতেন।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা আমি ফিরে এসে লিখি ও তার নাম রাখি 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে।' কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ তাতে ছিল না। তিনি নিজেই আমাদের বারণ করেছিলেন। আজ তিনি নেই। আমারও তো বয়স হলো একাত্তর। আর কতোদিন আছি কে জানে! কেউ না কেউ লিখে না রাখলে ভাবীকাল জানতেই পাবে না শেখ মুজিব কী করেছিলেন ও কেন করেছিলেন। তাঁর নিষেধ তাঁর জীবৎকালে মান্য করেছি। এখন তিনি সব আপদ-বিপদের উর্ধ্বে। মরণোত্তর মানহানিরও শঙ্কা নেই। তিনি অমর।

এ বিবরণ আনুপূর্বিক নয়। পরেরটা আগে, আগেরটা পরে, যখন যেটা মনে আসছে তখন সেটা কলমের মুখে আসছে। ভাষা ও ভঙ্গি শেখ সাহেবের নয়, তবে বক্তব্যটা তাঁরই। ভুলচুক যদি ঘটে থাকে তবে সেটা আমার স্মৃতির ভ্রম।

'দেখুন, আমি দুইবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার আইয়ুব খানের বন্দিশালায়। ষড়যন্ত্রের মামলায়। আমার এক সাথী আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, সন্ধ্যাবেলা সেলের বাইরে গিয়ে নিয়মিত বেড়ানোর অভ্যাসটি বিপজ্জনক। পেছন থেকে গুলি করবে আর বলবে পালিয়ে যাচ্ছিলো বলে গুলি করেছি। অন্যের বেলা ঘটেও ছিল ওরকম গুলি চালনা। দ্বিতীয়বার ইয়াহিয়া খানের কারাগারে। আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে, আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। মনটাকে তৈরি করে নেই যে, মরতে যখন হবেই তখন মিছে ভয় কেন? শান্ত মনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি।' শেখ সাহেব বলে যান।

সেদিন তিনি বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। সাতজন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে নিয়ে যেতে। তিনি তাঁদের সাফ বলে দিয়েছেন যে, আগে স্বীকৃতি, তারপর সম্মেলনে যোগদান। এখন কী হয় দেখা যাক। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘণ্টাকয়েক যেতে না যেতেই পাকিস্তান দেয় স্বীকৃতি আর রাত পোহাতে না পোহাতেই শেখ উড়ে যান লাহোরে। সেখানে পড়ে যায় সংবর্ধনার ধূম।

শেখ সাহেবকে আমরা প্রশ্ন করি—'বাংলাদেশের আইডিয়াটা প্রথম কবে আপনার মাথায় এলো?'

'শুনবেন?' তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারতো। তারা জগৎ জয় করতে পারতো। They could conquer the world.'

বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বলেন, 'দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি নয় তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। আমিও দেখি যে, আর কোনো উপায় নেই। ঢাকায় চলে এসে নতুন করে শুরু করি। তখনকার মতো পাকিস্তান মেনে নেই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা। হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। লোকগুলো যা কমিউনাল! বাংলাদেশ চাই বললে সন্দেহ করতো। হঠাৎ একদিন রব উঠলো, আমরা চাই বাংলাভাষা। আমিও ভিড়ে যাই ভাষা আন্দোলনে। ভাষাভিত্তিক আন্দোলনকেই একটু একটু করে রূপ দেই দেশভিত্তিক আন্দোলনে। পরে এমন একদিন আসে যেদিন আমি আমার দলের লোকদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের নাম কী হবে? কেউ বলে পাকবাংলা। কেউ বলে, পূর্ববাংলা। আমি বলি—না, বাংলাদেশ। তারপর আমি স্লোগান দেই, জয়বাংলা। তখন ওরা বিদ্রূপ করে বলে, জয়বাংলা না জয় মা কালী। কী অপমান! সে অপমান আমি সেদিন হজম করেছি। আসলে ওরা আমাকে বুঝতে পারেনি। জয়বাংলা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম বাংলাভাষা, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জয়, যা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে।

'জয়বাংলা' আসলে একটি মন্ত্র। যেমন—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বা দাদাভাই নওরোজীর 'স্বরাজ' বা গান্ধীজীর 'কুইট ইন্ডিয়া' বা নেতাজী সুভাষের 'চলো দিল্লি'। এ হলো শব্দব্রহ্ম। একটি শব্দের বা শব্দের সমষ্টির মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত। সে শক্তি অসাধ্য সাধন পটিয়সী।

একটি কমিউনাল পার্টিকে ন্যাশনাল পার্টিতে রূপান্তরিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। বারবার জেলে গিয়ে, বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি একদিন সত্যি সত্যিই পেয়ে যান তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ অবিভক্ত না হয়েও সার্বভৌম ও স্বাধীন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিনই পেলেন পাকিস্তানের স্বীকৃতি। পরে ইউনাইটেড নেশনসে আসন। একজন ব্যক্তি তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়সে এর চেয়ে বেশি সার্থকতা প্রত্যাশা করতে পারে কি? আর কেউ কি পারতেন?

সেদিন আমাদের বিশ্বাস করে আরো একটি কথা বলেন শেখ সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে বলিয়ে নেন যে আমরা প্রকাশ করবো না। আমি এখন কথার খেলাপ করছি ইতিহাসের অনুরোধে। আমি প্রকাশ না করলে কেউ কোনোদিন করবে না।

'আমার কী প্লান ছিল জানেন? অকস্মাৎ আমরা একদিন পাওয়ার সিজ করবো। ঢাকা শহরের সবক'টা ঘাঁটি দখল করে নেবো। আর্মিতে, নেভিতে, এয়ারফোর্সে, পুলিশে, সিভিল সার্ভিসে আমাদের লোক ছিল। কিন্তু একটা লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সব পণ্ড হয়। নেভির একজন অফিসার বিশ্বাস করে তাঁর অধীন একজনকে জানিয়েছিলেন। সে ফাঁস করে দেয়। তখন আমরা সবাই ধরা পড়ে যাই।'

আমি প্রশ্ন করি—'ঘটনাটা ঘটতো কোন তারিখে?'

তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন, 'বলবো না।'

আমি চুপ। বুঝতে পারি অশিষ্টতার মাত্রা অতিক্রম করেছি।

বহু তপস্যার ফলে মর্তের মানুষ স্বর্গের ইন্দ্র হয়। পুণ্যবল ক্ষয় করে হলে বা অসুররা প্রবল হলে পরে একদিন সেই ইন্দ্রের পতনও হয়। দুই দুইবার মরণের মুখ থেকে বেঁচে এসে তিনবারের বার তাঁকে মৃত্যুর কবলে পড়তে হলো। পাওয়ার সিজ করলো তাঁরই স্বদেশবাসী ও স্বজাতি। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

এর কি কোনো দরকার ছিল? সাক্ষাৎকারের দিনই তো শেখ সাহেব আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি আর ক্ষমতার আসনে থাকতে চান না, কী করবেন, তাঁর দলের লোক যে তাঁকে যেতে দিচ্ছে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, তাঁর কাজ সারা হয়েছে। তিনি যা যা চেয়েছিলেন সবকিছুই পেয়েছেন।

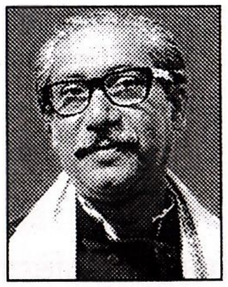
ঠিক সময়ে সরে গেলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরতো। সে ভাঙন শুধু স্বার্থঘটিত কারণে নয়, মতবাদঘটিত ও পলিসিঘটিত কারণেও। সব বাঙালি কখনো এক হতে পারে না, সব বাংলাদেশী কখনো এক হতে পারে না, সব মুসলমানও কি কখনো এক হতে পারে? সব মুসলমানের জন্য পাকিস্তান একটি অনাসৃষ্টি। তার এক অংশের থেকে অপর অংশ হাজার মাইল দূরে। মাঝখানে সমুদ্র নয়, অপর এক দেশ। তার কোনো স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থল ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনোকালেই মেজরিটি ভোট মেনে নিতো না। ভোটবল ছিল পূর্বপ্রান্তের বাঙালি মেজরিটির। অস্ত্রবল ছিল পশ্চিমপ্রান্তের পাঞ্জাবি ও পাঠান মাইনরিটির। একদিন না একদিন একটা বল পরীক্ষা হতোই।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিবর্তনটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন ক্রান্তদর্শী পুরুষ। আপন ব্রতে

নিবেদিত কর্মবীর। একটি স্বপ্ন নিয়েই তাঁর যাত্রারম্ভ। যাত্রা শেষও সেই স্বপ্নের রূপায়ণে।

সময়ে পদত্যাগ করলে বাঁচতেন তিনি আরো কিছুকাল নিশ্চয়। কিন্তু বাঁচতেন কী নিয়ে? যুক্তবঙ্গের লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তিনিও সে আশা ত্যাগ করেছিলেন। এমনভাবে ত্যাগ করেছিলেন যে, তাঁর কারবার ছিল দিল্লির সঙ্গে, কোলকাতার সঙ্গে নয়। ভারত সরকারের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে নয়। আমরাও বাংলাদেশে গেলে বাঙালি বলে চিহ্নিত হতুম না, হতুম ভারতীয় বলে, ইন্ডিয়ান বলে। বাংলা সাহিত্যের সম্মেলনেও আমরা বিদেশী অতিথি বলে অভ্যর্থনা পাই, যেমন পান সোভিয়েত রাশিয়ার বা পূর্ব জার্মানির প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, যাতে কেউ কখনো মনে না করে বাঙালিতে বাঙালিতে তলে তলে একটা একতার চেষ্টা হচ্ছে। তাই আমাদের প্রতি তাঁদের একটা ছাড়া ছাড়া ভাব।

ওদিকে আবার একদল সক্রিয় ছিলেন মুসলমানে মুসলমানে একতার চেষ্টায়। শেখ সাহেবকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের অবিশ্বাস থেকেই এ ঘাতকতা।



আইভি রহমান

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা জাতির জন্য কলঙ্ক

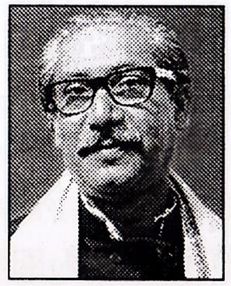
সেনাবাহিনীর কয়েকজন বহিষ্কৃত অফিসার, সেনাবাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন ব্যক্তি এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তির ঘৃণ্য চক্রান্তের ফল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। কিন্তু কেন এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড? কেন শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি যৌবনের প্রথম দিন থেকে তার স্বপ্নের একটি রাষ্ট্রের জন্মের জন্য তিলে তিলে নিজের সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দিয়েছিলেন, একটা জাতিকে জন্ম দেয়ার জন্য বার বার কারাবরণ করেছেন, দু'বার ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণের অবস্থায় গিয়েছিলেন, যার ভালোবাসা, যার নেতৃত্বে একটি আত্মবিস্মৃত-প্রায় জনগোষ্ঠীকে জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করে সে জাতির জন্য স্বাধীনতার সোনার পদক পালক এনে দিয়েছিল সে মানব কেন হত্যা হলো? এ প্রশ্নের জবাব আত্মস্বীকৃত খুনিদের জবানবন্দি বিবৃতিতে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে সামরিক শাসন ক্ষমতা দখলকারী এবং তাদের উত্তরসূরিদের কর্মকাণ্ডে। ঘৃণিত হত্যাকারীরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চায়নি, তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছে, তারা বাঙালি জাতিকে হত্যা করতে চেয়েছে, হত্যা করতে চেয়েছে একটি জাতির স্বকীয়তা আর আদর্শকে, এই হত্যাকাণ্ড যে কোনো হঠকারীর হঠকারিতা নয় তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৫ আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ৩ নভেম্বর জেলখানায় বন্দি আওয়ামী লীগের চারজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, যারা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়েছিলেন—তাঁদের কারাভ্যন্ত

রে হত্যা করা থেকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতা ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, যে স্বপ্নকে তিনি নিজের মেধা এবং যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বাস্তবায়িত করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি, যদিও তাকে হত্যা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধু তার জীবিতকালে কোনো প্রটোকল মানেননি। জনতার মাঝে তিনি তার অস্তিত্ব খুঁজে পেতেন, জনসমুদ্রে তিনি মিশে যেতেন। পুলিশ, সিপাহী, সেনাবাহিনীর কঠিন লৌহ বেষ্টনীর আড়ালে তাকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। যেখানেই গেছেন জনতার মাঝে চলে গেছেন, তাদের সাথে মিশে গেছেন। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা বলে কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনি। সুতরাং যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হত্যাকারীরা তাকে হত্যা করেনি। তাকে হত্যা করা হয়েছে তখন, যখন তিনি তার সৃষ্ট বাংলাদেশকে যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্ত করে ফেলে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে এক দিগন্তপ্রসারী উন্নয়নের পথে পরিচালনা করলেন। যখন তিনি আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন, বাকশাল গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আমলাদের প্রভু থেকে সেবকের স্তরে উন্নীত করার বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখনই তাকে হত্যা করা হলো। এই হত্যাকাণ্ডের চক্রান্ত করেছিল গুটিকয়েক বিবেকবর্জিত গণমানুষের শত্রু আর সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত এবং কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তা, যারা বিদেশী শক্তির অনুচর হয়ে নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছিল বিদেশী স্বার্থের কাছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে এ দেশের মানুষ মেনে নেয়নি, তারা মেনে নেয়নি তুলনাহীন পৈশাচিক বর্বরতায় বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, তার ভাই, পুত্রবধূ এবং শিশুপুত্রসহ পুত্রদের হত্যাকে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রচণ্ড আকস্মিকতায়, বেদনায় মানুষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বোকা চোখে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল ঘৃণিত খুনি উন্মত্ত অস্ত্রধারী এবং তাদের পোষ্য সেটুয়াদের উল্লাস। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে জাতি মেনে নেয়নি, মেনে নেয়নি কখনো নজিরবিহীন বর্বরতায় তার পরিবারর্গের হত্যা, শিশু, হাতে মেহেদি পরা সদ্য বিবাহিত বধূদের হত্যা, যে দুটি কোমল হাতে হাত রেখে বঙ্গবন্ধু তার নিত্যদিনের কর্মে অনুপ্রাণিত হতেন সেই বেগম মুজিবের হত্যা। জনতার হতবাক অবস্থা কেটে যাওয়ার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে তারা এই হত্যাকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে, জনতার মঞ্চে তাদের কখনো আসতে দেয়নি, ঘৃণিত খুনিরা দেশ

ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু-তনয়া শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পর জনতার অন্তরে লালিত ঘৃণা প্রকাশ্য রুদ্ররূপ নিয়েছিল, মিছিলের পর মিছিল চলেছে ২১ নং সড়কের সেই বাড়িটির দিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে ফুল দিয়ে তাকে হৃদয়ের কান্না ভেজা শ্রদ্ধা জানাতে, তারপর গগণবিদারী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবি, ঘৃণিত খুনিদের বিচারের দাবি। বাঙালি জাতি বহু রক্ত ঝরিয়ে সামরিক শাসনকে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছে, হটিয়েছে ঘৃণিত চক্রান্তকারী মোশতাকের আমলে, স্বৈরশাসনের দোসর বিচারপতি সায়েমের আমলে, স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলে। যে ঐশ্বর্যকে কয়েকজন ঘৃণিত হত্যাকারী এবং তাদের দোসররা লুণ্ঠন করেছিল, দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পরে অনেক রক্ত দিয়ে বাঙালি জাতি সে ঐশ্বর্যকে পুনরুদ্ধার করেছে, সগৌরবে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য জাতি দায়ী ছিল না, সুতরাং এ কলঙ্ক তাদের নয়। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ঘৃণিত হত্যাকারী, তাদের দোসরদের কলঙ্ক। এ কলঙ্ক তাদের, যারা ঘৃণিত হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছিল, যারা তাদের বৈদেশিক দূতাবাসে চাকরি দিয়ে তাদের প্রতিপালন করেছিল। এ কলঙ্ক মোশতাক, সায়েম, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়াদের—যারা দীর্ঘ একুশ বছর ধরে এই নজিরবিহীন বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে দেয়নি। আইন করে বা আইনের আড়ালে হত্যাকারীদের রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছিল।



আতাউস সামাদ

বিদেশে বিষণ্ন দিন

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। নয়াদিল্লিতে সেই দিনটি আমাদের জন্য ছিল চরম উৎকণ্ঠা, ভয়, আশা-নিরাশা এবং লজ্জার দিন। এখনও সেই দিনটির কথা ভাবলে গলা শুকিয়ে আসে। আর মনে হয় নয়াদিল্লিতে ঐ দিনটি যেন ছিল রুক্ষ, যদিও আগস্ট-সেপ্টেম্বরে সেখানে কিছু বৃষ্টি হয়। আসলে দিনটি হয়তো-বা সামান্য আর্দ্র ছিল কিন্তু আমাদের কাছে সবই শুষ্ক ও রুক্ষ মনে হচ্ছিল।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ছুটেছিলাম লালকেল্লায়। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী লালকেল্লায় ভাষণ দেবেন। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেয়া ভারতে রাষ্ট্রীয় রীতির অঙ্গ। তবে ঐ বিশেষ ১৫ আগস্টে সাংবাদিকরা যে লালকেল্লায় মিসেস ইন্দিরার ভাষণ শুনতে জমায়েত হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ইতোমধ্যে শুধু ভারতবাসী নয় বিশ্বকে চমকে দিয়ে নতুন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ করা শুরু করেছেন গণহারে। সেন্সরশিপ এবং অন্যান্য দলন-পীড়নও চলছে। আমাদের আগ্রহ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তার ভাষণে এসব বিষয়ে কী বলেন তার দিকে এবং তার সিকিউরিটির জন্য কত কড়া এন্তেজাম হয় তা দেখতে। আর মনে ক্ষীণ আশা, জরুরি অবস্থার কঠোরতা যদি তিনি কিছু কমান। অবশ্যই নতুন কিছু তিনি সেদিন শোনাননি ভারতবাসীকে।

আমি সেই সময় নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিটে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ান (পিটিআই) অফিস থেকে খবর পাঠাতাম বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

(বিএসএস)-কে। পিটিআই অফিসে আমার জন্য একটা লেখার টেবিল বরাদ্দ ছিল। সেই সময় পিটিআই'র বাংলাদেশের সংবাদদাতা একইভাবে ঢাকায় বিএসএস অফিসে বসে কাজ করতেন এবং সেখান থেকেই টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠাতেন।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর লালকেল্লার ভাষণ থেকে কী এমন পাঠানো যায় খবর হিসেবে তা ভাবতে ভাবতে পিটিআই'র বার্তা কক্ষে ঢুকতেই বড় হলটার এক কোনা থেকে সি. রাঘবন চিৎকার করে উঠলেন, 'হেই সামাদ, দেয়ার ইজ এ ক্যু ইন বাংলাদেশ।' সি. রাঘবন তখন পিটিআই'র এডিটর-ইন-চিফ। তার কথায় আমি স্থাণু হয়ে গেলাম। আবার তার কণ্ঠ শুনলাম, 'রিড দিস'। ততক্ষণে তিনি আমার সামনে এসে দুই প্যারাগ্রাফের একটি খবর এগিয়ে দিলেন। টেলিপ্রিন্টারের ঐ কাগজটিতে ছিল পিটিআই'র গৌহাটি ব্যুরো চিফের পাঠানো খবর, 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। সে দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ভোরে বাংলাদেশ বেতারের একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবকে অপসারণ করা হয়েছে। বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি'। পিটিআই'র টেলিপ্রিন্টারের কাগজটির ছাপা হরফগুলো বিশ্বাস করবো, না নিজের হাতপা-কে তাই যেন ঠিক করতে পারছিলাম না তখন। রাঘবনই সম্বিৎ ফেরালেন আমার। তিনি বললেন, 'তুমি বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। দেখ, তারা কিছু জানান কি-না।'

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে আমাদের বেবী ভাইকে (প্রয়াত সৈয়দ মাহবুব আলম চৌধুরী) লাইনে পেলাম। তিনি তখন দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রেস মিনিস্টার। না, তার কাছে ঢাকা থেকে বা হাইকমিশন অফিস থেকে কোনো খবর আসেনি। তবে পিটিআই থেকে কেউ ফোন করেছিল এ ব্যাপারে। পিটিআই'র খবরটি তাকে আবার পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন যে, আমাদের হাইকমিশনার খান শামসুর রহমানকে তিনি যোগাযোগ করবেন আবারও, এক্ষুনি। আমাদের মধ্যে ঠিক হলো যে, সে ক্ষেত্রে হাইকমিশনার সাহেবকে আমি একটু পরে ফোন করব। তাই করলাম। সৌভাগ্যবশত শামসুর রহমান ভাইকে প্রথম চেষ্টাতেই পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন যে, তিনিও চেষ্টা করবেন খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। আরো দুটি কথা জানালেন, ঢাকায় ফোন লাইন পাওয়া যাচ্ছে না এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তখন পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ করেননি, কারণ তার আগে তিনি নিজে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিতে চান। সি. রাঘবন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন,

আমি কোনো বাড়তি খবর পেলাম কি না তা জানার জন্য। একজন সহ-সম্পাদক তাকে জানিয়ে গেলেন, পিটিআই'র কোলকাতা অফিস খবর দিয়েছে যে, ঢাকার সঙ্গে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোনো প্লেনও যাচ্ছে না ঢাকায়। রাঘবন নির্দেশ দিলেন যে, পিটিআই'র গৌহাটি এবং কোলকাতা অফিস যেন বাংলাদেশ বেতার মনিটর করতে থাকে।

এর পরের বিস্ময় এলো ভারত সরকারের কাছ থেকে। আমি প্রায় মরিয়া হয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যাকেই চিনি তাকেই ফোন করছি। সবারই ফোন ব্যস্ত। তবু কেমন করে জানি তৎকালীন ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব কেওয়াল সিংয়ের (Kewal Singh) বাড়ির লাইনটি পেয়ে গেলাম। গলা শুনে বুঝলাম, তিনি নিজেই ফোন ধরেছেন। আমার পরিচয় বলতেই তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, হোয়্যার ইজ ইয়োর হাইকমিশনার? আই কান্ট রিচ হিম'। বললাম, 'তিনি বাড়িতেই আছেন। আপনি এখনই ফোন করলে তাকে পাবেন। তবে পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত তিনি ঢাকা থেকে কোনো খবর পাননি'। কেওয়াল সিং খুব হতাশ হলেন।

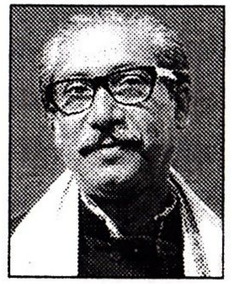
আমরা জানতাম যে, দিনকয়েক আগে বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন ঢাকা থেকে দিল্লি এসেছিলেন। সি. রাঘবনকে অনুরোধ করলাম, খোঁজ করে দেখতে যে, তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ এসেছি কি-না। রাঘবন কি মনে করে আমার অনুরোধ রাখলেন। তার কামরায় ঢুকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন, কিন্তু পনের মিনিট পর মুখ হাঁ করে বেরিয়ে এলেন। আর তিনি যা বললেন, তা আমারও বিশ্বাস হতে চাইছিল না। রাঘবন বললেন, মি. সমর সেন এখনও দিল্লিতে। তিনি ঢাকায় ফেরত যাননি তখন পর্যন্ত। এখানে-ওখানে ফোন করতে করতে দুপুর হয়ে এলো। এরই মাঝে একটা রেডিও মনিটর করা রিপোর্টে পাওয়া গেল যে, খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা যাচ্ছে না।

আর তখনো, টেলিফোনের ডায়াল ঘোরানো আর পিটিআই'র বন্ধুদের যাকেই সামনে পাচ্ছি তাকেই প্রশ্ন করা ছাড়া আমি আর কোনো কিছু করছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে বাসায় ফোন করে আমার স্ত্রী রেনুকে দুঃসংবাদটি জানিয়ে বলেছিলাম, রেডিওর দিকে কান রাখতে। সি. রাঘবন এর মাঝে এসে বললেন, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি খেতে। তোমার ফ্ল্যাট তো পথে পড়বে। তোমাকে একটা লিফট দিই'।

গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি বাংলাদেশ নিয়ে তার অভিজ্ঞতার নানান কথা বললেন। জানতে চাইলেন কেন ক্যু হতে পারে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং একদলীয় শাসন কায়েম হওয়া— এসব কি জনগণকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছে? তবু এতো জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন নেতার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটানোর সাহস করল কিভাবে? কি ঘটছে শেখ সাহেবের ভাগ্যে?

তার শেষ প্রশ্নে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বললাম, 'খন্দকার মোশতাক আহমেদ তো শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু! আমার মনে হয় তিনি শেখ সাহেবকে হত্যা করতে দেবেন না। হয়তো বা তিনি শেখ সাহেবকে সপরিবারে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন'। সি. রাঘবন কেমন যে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'সাম্প্রতিক সময়ের সামরিক অভ্যুত্থানগুলোর কথা চিন্তা করলে তো তেমন সম্ভাবনা দেখি না। তবে তুমি বলছো মোশতাক আহমেদ শেখ সাহেবের বন্ধু। দেখ কিছু যদি হয়। লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট'। বেস্ট তো দূরের কথা, বেটার অথবা গুডও কিছু হলো না। যা হলো তা ওয়ার্স্ট, ভয়ঙ্কর রকম ওয়ার্স্ট। ১৬ আগস্ট সকাল বেলায় রয়টার কোলকাতা থেকে একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে খবর দিল যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি তার কিশোর পুত্র শেখ রাসেলকেও খুন করা হয়েছে।

এরপর বেশ কয়েকটি দিন যে কেমনভাবে কেটেছে নয়াদিল্লিতে, এখন মনে পড়ে না। একটি যন্ত্রণা, একটি ঘোর, একটি প্রচণ্ড শূন্যতা আর মানসিক অবসাদের মধ্যে ছিলাম বোধহয়।



আতিউর রহমান

স্বাধীনতার ঘোষণা অর্থহীন বিতর্ক সময়ই ইতিহাসের সত্য খুঁজে নেবে

জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই সব জাতি ভাগ্যবান, যারা সব সময় স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মাঝেই খুঁজে পায় *(রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৪)*। সাধারণত ইতিহাসই নবীন প্রজন্মের সদস্যদের স্বদেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অতীতের অর্জনের সঙ্গে বর্তমানকে যুক্ত করে দেয়। ভবিষ্যতে কোন পথে হাঁটতে হবে তার দিক-নির্দেশনা দেয়। গর্বিত এক জাতির উত্তরাধিকারী তৈরির কাজে ইতিহাসের ভূমিকা তাই খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের—ইতিহাস আর কাঙ্ক্ষিত সেই ভূমিকা পালন করতে পারছে না বরং আমাদের স্বদেশের মুখচ্ছবিকে আরো আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অস্পষ্ট এই স্বদেশের ছবি আমাদের সন্তানদের মোটেই মহৎ কিছু অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে না। উল্টো তাদের বিভ্রান্ত করে। তারা তাই স্বদেশের মলিনমুখ দেখতে দেখতে নিজেরাও হতাশার সাগরে ডুবে থাকে। এজন্য তাদের দোষও দেখা যায় না। এদ্দিন তারা জেনে এসেছে একাত্তরের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পরদিন সেদিনের মেজর জিয়া মহান নেতা শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে পাঠ করেন। এত বছর পর তাদের সেই জানাকে উল্টে দিয়ে বলা হচ্ছে, ২৫ মার্চ রাতে (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) শেখ মুজিব নয়, জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। বলা হচ্ছে যে, সকলকে যার যা আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনিই নাকি বলেছেন। ইতিহাসকে এমন করে

বদলে নেয়ার এ প্রচেষ্টার কারণে সবচেয়ে বিপদে পড়েছে আমাদের নিষ্পাপ সন্তানরা। ক'দিন আগে একটি চ্যানেলের সংবাদে দেখলাম ইতিহাস নিয়ে এই ধ্বাক্কাধাক্কির বিষয়ে কয়েকটি শিশুর প্রতিক্রিয়া। মনে হলো তারা সত্যি অসহায়। বিভ্রান্ত শিশুরা বলছিল যে, এমন করে সময়ে সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণার মতো মৌল বিষয়ে পরিবর্তন হলে তারা কোনটা বিশ্বাস করবে? তাদের পাঠ্যসূচি কেন রাজনৈতিক বিবেচনায় বদলে ফেলা হয়? জাতির আত্মা নিয়ে কেন এভাবে টানাটানি হয়? পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কি এমনভাবে মীমাংসিত জাতীয় গৌরবের বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়?

এ প্রশ্ন শুধু শিশুদের নয়। দেশের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন, এমন সকল নাগরিকই ইতিহাস নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে খুবই উদ্বিগ্ন। কেউ কেউ বিরক্তও। কেননা ইতিহাসের সত্যকে ইচ্ছে করলেই নিজের প্রয়োজনে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যারা চোখের সামনে মুক্তিযুদ্ধ হতে দেখেছি, নিজেরা তাতে অংশগ্রহণ করেছি তাদের পক্ষে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা মেনে নেয়া মুশকিল। নিজের চোখকে, কানকে অবিশ্বাস করি কী করে?

অথচ যাঁরা এ কাজটি করছেন, তাঁরাও নিশ্চয় জানেন ইতিহাসের সত্যকে জোর করে মনগড়া খাতে প্রবাহিত করা যাবে না। ইতিহাস ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকবে। ইতিহাস কারো ক্রীতদাস নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন ইতিহাসের অন্তরাত্মা। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, সেই পাকিস্তানিরা এখন পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাস নিয়ে এমন করে ছক্কা-পাঞ্জা খেলার সাহস দেখায়নি। অথচ আমরা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস নিয়ে কেবলই ধস্তাধস্তি করে চলেছি। কাটাকাটি করছি। একাত্তরে সারা বিশ্বের অগ্রসারির গণমাধ্যমের সেরা সব প্রতিনিধি এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁদের প্রতিবেদনগুলো এখনো কালের সাক্ষী। সেগুলোই বা অস্বীকার করি কিভাবে? এমনকি অনেক যাচাই-বাছাই করার পর সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র তৈরি করা হয়েছিল। তাকেই বা উপেক্ষা করি কিভাবে? মনে রাখা দরকার হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় রচিত ঐ দলিলপত্রের তথ্যাবলী প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য হিসেবে দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসবিদরাও যাচাই-বাছাই করেছিলেন। তখন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটিও ক্ষমতায় ছিল না। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেই দলিলপত্রে তাদের দলীয় কোনো প্রভাব ছিল না বলে ধরে নেয়া যায়। ঐ কমিটির সদস্যরা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, স্বাধীনভাবে তাঁরা ঐ কাজটি

করতে পেরেছিলেন। ক্ষমতাসীন সরকারের নজরের ভেতরে থেকেই তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁদের কাজে কেউ বাধা দেননি। বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়াত মফিজুল্লাহ কবির ঐ দলিলপত্রের মুখবন্ধে লিখেছেন—'বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচনে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাণ্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সুবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সেক্টর কমান্ডার বা উপ-কমান্ডারদের কাছ থেকেও বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবারে নতুন করে ছাপা দলিলের পেছনের দিকের খণ্ডগুলোতে তাঁদের দেয়া তথ্যের সঙ্গে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দেয়া তথ্যের বড় ধরনের গরমিল দেখা দিয়েছে। যেমন– জেনারেল শওকত আলী বা কর্নেল অলি আহমদের দেয়া তথ্যের সঙ্গেও নতুন সংরস্করণের মুখবন্ধের তথ্য মিলছে না। এমনকি নতুন করে ছাপা দলিলপত্র প্রত্যয়নকারীদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁরা মূল তথ্য বদলানোর পক্ষে মত দেননি। তা সত্ত্বেও তথ্য বদলে গেছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি বাড়ছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এর পটভূমি তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। হাজার বছর ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠী সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে টিকে থাকলেও একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই। এ কথা ঠিক, বাঙালিরাও বিপুলভাবে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। মূলত আর্থ-সামাজিক মুক্তির আশা নিয়েই তাঁরা তা চেয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি হবে গণতান্ত্রিক, মানসিক ও সামাজিক ন্যায়পরাণধর্মী। জমিদারি প্রথা দ্রুত উচ্ছেদ করে পূর্ববাংলার কৃষকদের ওপর শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এ রাষ্ট্র তৎপর হবে। প্রশাসনিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য বিকাশের পূর্ণ সুযোগ অনগ্রসর বাঙালিদের দেয়া হবে। কিন্তু নয়া রাষ্ট্রের জন্মের পুরোটাই খরচ হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য। সেদিনের

সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন তারাই। তাই সরকারি জমা-খরচের ন্যায্য হিস্যা বাঙালিরা যে পাননি, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। উল্টো তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বাংলাভাষার ওপর নেমে আসে নগ্ন আঘাত। ফলে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বিকাশের পথ হয় রুদ্ধ। আমলাতান্ত্রিক অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানি রাষ্ট্রের চাপে বাঙালির বেড়ে ওঠার সকল স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বেশকটি ভাষাপ্রেমী তাজাপ্রাণ। সেদিনই পূর্ব বাংলার মূলত কৃষক-সন্তান মধ্যবিত্ত তরুণরা পাকিস্তান ধারাটির কবর রচনা করে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বহুমাত্রিক এক নয়া রাষ্ট্র চিন্তার বীজ বপন করে। চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়, একষট্টির রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অসখ্য ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। এসব আন্দোলনে অনেক নেতারই অবদান ছিল; কিন্তু তাঁদের সকলের অবদানকে আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে একজনই কেবল বেড়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই যেন সমগ্র বাঙালি জাতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হতো। তাঁর চোখ দিয়েই যেন সমগ্র বাংলাদেশকে দেখা যেতো। সুখে-দুঃখে তাঁর উপস্থিতি প্রায় সকলেই অনুভব করতেন। আর সে কারণেই ঊনসত্তরের সফল গণঅভ্যুত্থান শেষে ছাত্র-জনতা তাঁকে বাংলার বন্ধু বা বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে নিজে বেড়ে উঠেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তারও পূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছেন। তিনি নিজে সাহসী ছিলেন। আর সেই সাহস সঞ্চারিত করেছেন বিকাশমান পুরো জাতির মনে।

ভাষা আন্দোলনে তাঁর পাশে ছিলেন একঝাঁক দক্ষ, মেধাবী, সহযোগী নেতা ও সংগঠক। তাঁরা তাঁকে সর্বক্ষণ সহযোগিতা করেছেন বলে বেড়ে ওঠার এ প্রক্রিয়া আরও বেগবান হতে পেরেছে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল নামটি অবশ্যই তাজউদ্দীন আহমদ। তাছাড়া সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ছাড়াও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহায়তা ও আশীর্বাদ তিনি সক্রিয়ভাবে পেয়েছেন। মওলানা ভাসানীও তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় অভিভূত হয়েছিলেন। মণি সিংহ-মোজাফফর আহমদের মতো অনেক নেতাই

তাঁর চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর তরুণ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গুরু শিষ্যের। সামরিক আইনের বেঁধে দেয়া গণ্ডির মধ্যেও সত্তরের নির্বাচনটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য টার্নিং পয়েন্ট। নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে গণভোটে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্তর সালে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে তিনি যেসব প্রাক-নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেছিলেন, তাতেই দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত একটি স্বতন্ত্র দেশের কথা আকারে ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্বাচনে নিরঙ্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও বাঙালিকে দেশ শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কোনো মতামত না নিয়েই তা হঠাৎ করে স্থগিত করে দেয়া হলো। এর প্রতিবাদে একাত্তরের পয়লা মার্চ থেকেই বাঙালির মুক্তির আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করলেন যে, একটি স্বাধীন দেশ পরিচালনার সকল নৈতিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বাঙালির রয়েছে। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিনটি ছিল সাতই মার্চ। ঐ দিনই 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে রণহুঙ্কার দিলেন রাজনীতির এক অমর কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলেই জানা। তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য বিচক্ষণ নেতার সহায়তায় এ ভূখণ্ডের পুরো বেসামরিক শাসনভার বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর নির্দেশেই একাত্তরের মার্চ মাসে বেশিরভাগ সময় বাংলার জীবন ও প্রশাসন স্বাধীনভাবে চলতে থাকে। *(দ্রষ্টব্য : আতিউর রহমান, অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব, সাহিত্যে প্রকাশ ১৯৯৮)*। পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীন করে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের স্বপ্নও সুদৃঢ় হতে থাকে। ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা আলাপ-আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চের কালরাত্রে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। এর পরপরই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই (১২.২০ মি) টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিগ্রাম ও ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ইংরেজি সেই ঘোষণায় তিনি বলেন :

'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh- wherever you might be and with whatever you have, to resist the army

of occupation to last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved'. *(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২ পৃ :১।)*

ঐ সময় যাঁরা জেলা প্রশাসক (বাঙালি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁরা এ ঘোষণাপত্র পেয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ এখনও ঐ ঘোষণাপত্রের কপি সংরক্ষণ করে চলেছেন। তাঁদের এখন মুখ খোলা উচিত।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার এ ঘোষণা নানাভাবে জনগণের কাছে প্রচার হতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রথমেই প্রচার করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম এ হান্নান। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে যখন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণাটি একটু ভিন্নভাবে পুনরায় পাঠ করলেন, তখন মুক্তিপাগল জনগণের মনে স্বস্তি ও সাহস দুই-ই যোগ হয়েছিল। সেদিনের ঐ ঘোষণার যে ক্যাসেটটি এখন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তিনি আমাদের মহান জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন।

('I Major Ziaur Rahman, do hereby declare independence of Bansladesh on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman')

Anthony Mascarenhas Bangladesh : A legacy of Blood (1986)- বইয়ে Zia, The man and the myth শিরোনামে এগারো পরিচ্ছেদে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদকে উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন যে, একাত্তরের ২৬ মার্চ ২.৩০ মিনিটে এম এ হান্নানই প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। কিন্তু দশ কিলোহার্টজের ট্রান্সমিটারে প্রচারিত সেই ঘোষণাটি মাত্র ৬০ মাইলের মধ্যকার সামান্য সংখ্যক মানুষই শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে কালুরঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মেজর জিয়ার ঘোষণাটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতীয় ভূখণ্ডের বেতার তরঙ্গে ধরা পড়ে এবং এভাবেই তিনি ইতিহাসে তাঁর নাম লিখতে সক্ষম হন। মেজর রফিকের *A Tale of Millions* বইতেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐ ক্রান্তিকালে তৎকালীন মেজর জিয়ার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তিনি জীবদ্দশায় তার বিরোধিতা করেননি *(দ্রষ্টব্য : Mascarenhas. ঐ পৃ: ১২০)*। তবে

মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে একই ঘটনা একটু অন্যভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

Major Zia, Provisional Commander in Chief Bangladesh liberation army, hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh. I also declare, we have already framed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh. The government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world. *(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড পৃ : ২)*।

উল্লেখ্য, মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। তবে স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার টেপরেকর্ড, ২৭ মার্চ, ১৯৭১ এবং দ্য স্টেটসম্যান, দিল্লি, ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সূত্র ধরে উপরের ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর ঐ বেতার ঘোষণাটির ঐতিহাসিক মূল্য কোনোভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। তাছাড়া ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চের দৈনিক বাংলায় একটি জাতির জন্ম শিরোনামে যে লেখাটি তিনি লিখেছেন তাতে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা অন্তত দুবার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।" এরপর তিনি ৭ মার্চের কথা লিখেছেন তাঁর ভাষায়, "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগনাল বলে মনে হলো।" ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে যে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন তার স্বীকৃতি সেদিনের দখলদার পাকিস্তানিদের লেখাতেও ধরা পড়েছে। জেনারেল

নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তাঁর *Witness to Surrender* গ্রন্থেও বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণার কথা লিখেছেন। মাসুদুল হক অনূদিত সিদ্দিক সালিকের নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল *(নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৮)* গ্রন্থে লেখা হয়েছে, "যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গে (ওয়েভলেন্থ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ঐ কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন" *(পৃ. ৮৫)*। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সফরকারী এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে জেনারেল টিক্কা খানও বলেছেন যে, শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর তিনি চিনতেন এবং ২৬ মার্চের ঐ ঘোষণা যে বঙ্গবন্ধুরই ছিল তিনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন *(মুসা সাদিক, 'ইতিহাসের আলোকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা' জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ২০০২)*। বিবিসিও স্বাধীনতার এ ঘোষণার কথা প্রচার করেছিল। ২৭ মার্চ বিবিসির সকালের অধিবেশনে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন *(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি, বিসিডিজেসি, ২০০১)*। ঐ একই গ্রন্থে মার্ক টালির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, খবর পাওয়া গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্টের (ইয়াহিয়া খান) বক্তৃতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, সঙ্কটের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই শেখ মুজিব এবং তাঁর অনুসারীদের দোষী করেছেন।

উল্লেখ্য, ইয়াহিয়া খান ঐ ভাষণেই দম্ভ করে বলেছিলেন এবার শেখ মুজিব তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। আর সেই কারণেই ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র দেয়া হয় তাতেও বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষাণাটি পুনরায় নিশ্চিত করা হয় *(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ১৯৮২ তৃতীয় খণ্ড, পৃ : ৪-৬)*

'Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimmate right of self determination of the people fof Bangladesh, duly made a declaration of Independence at Dacca on march 26,1971 and urged the

people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh.' (বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪)।

সেই ঘোষণাটিই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভ । সেই অর্থে আমাদের পবিত্র সংবিধানের অংশ। আমাদের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। বিটিশ পত্রপত্রিকাও বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তা নিশ্চিত করেছে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দ্য টাইমস প্রথম পাতায় শিরোনাম করেছিল 'Heavy fighting as Sheikh Mujibur declares E. Pakistan independent.' অনুরূপভাবে একই দিনে *দ্য গার্ডিয়ান* লিখেছিল, 'Shortly before his arrest, Mujib had issued a proclamation to his people, which informed them You are citizens of a free country.'

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ইতিহাসবিদদের একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের সম্পাদনায় এ প্রতিষ্ঠান ১১ খণ্ডে বাংলা পিডিয়া প্রকাশ করেছে। বাংলাপিডিয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন *(বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাপিডিয়া, ২০০১)*। এ বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম দলিলপত্রের নয়া সংস্করণে প্রামাণ্যকরণ কমিটিতেও ছিলেন। তিনি নয়া সংস্কারণে মূল দলিলের তথ্য পরিবর্তনে সম্মত হতে পারেননি বলে কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং ইতিহাসের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এরপর নয় মাস ধরে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুরই নামে তাঁরই আত্মাভাজন নেতৃবৃন্দ (সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীনসহ আরও অনেকে।) যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দুবার তাঁর বজ্রকণ্ঠ প্রচারিত হতো এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাতে উজ্জীবিত হতেন। সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হতেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁঝোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞ শুরু করেন তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন *(ঐ পৃ: ৮)*। ভাষণে তৎকালীন মেজর জিয়ার কথাও এসেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁর প্রশংসাও তিনি করেছেন। কিন্তু এ কথা সত্যি নয় যে,

তাজউদ্দীন আহমদ মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে কোথাও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তাছাড়া হালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের বিবরণ সংবলিত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বের হয়েছে রোয়েদাদ খানের সম্পাদনায় (১৯৯৯) *'The American Papers'*। এ বইয়ে সন্নিবেশিত ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সুলার অফিস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে পাঠানো গোপনীয় চিঠি ও দলিলপত্র পড়লেও বোঝা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার মতো নৈতিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতা কার ছিল। খুব সম্ভব সে কারণেই ২০০২ সালের ডিসেম্বরেও বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ওয়েবসাইটে *(দেখুন http:/www. Bangladoot. org/ aboutbangladesh.asp)* একই কথা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, Bangabandhu declared the independence of Bangladesh on March 26.1971 and urged upon the people to liberate the county through armed struggle. The entire nation stood like a rock and followed the command of their supreme leader and finally succeeded in Vanquishing the marauding Pakistani occpation forces.

সেদিনের সকল বার্তা, আলোচনা, সমালোচনা ছিল শুধু একজনকেই ঘিরে। তিনি বাঙালির প্রশ্নাতীত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ বইয়ের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বইয়ে ৪৬৫ পৃষ্ঠায় তাঁর Charismatic personality-র বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে অন্য গুরুত্বপূর্ণ এক গোপন দলিলে State department বিশ্লেষণ করেছে এভাবে—'All indications are that Mujib intends to cast the die in his speech on March 7 and will probably call for action tanamount to independence' *(ঐ পৃ: ৪৯৮)*। পরবর্তীকালে ঠিকই লক্ষ করা গেল, তিনি ৭ মার্চের ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও তাকে প্রায় স্বাধীনতার ঘোষণাই বলা চলে *(ঐ পৃ: ৪৯৮)*। এরপর অন্যান্য দলিলপত্রে শেখ মুজিব কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষিত হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *(দেখুন, ঐ Alternate Us postures toward possible East Pakistan secession, পৃ: ৫০৮-৫১২ এবং Contingencies and actions to be*

taken in the event of separation. পৃ: ৫১২-৫১৭।) এসব দলিলপত্রের কোথাও শেখ মুজিবকে আপোষকামী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বরং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবেই তাঁকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মার্কিন গোপন দলিলে আশঙ্কা করা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণার দিকেই এগুচ্ছিল।

"With the steady drift toward independence in East Pakistan over the past several days this posture has now been overtaken as a practical recourse ... If agreement is not reached Mujib is expected to announce on March 7 complete or virtual independence" *(ঐ,পৃ: ৫০৩)*।

হালে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বই হচ্ছে সাবেক মার্কিন কূটনীতিবিদ আর্চার ব্লাডের *'দ্য ক্রুয়েল ব্যার্থ অব বাংলাদেশ (২০০২)'*। একাত্তরের দুর্বিষহ দিনগুলোতে তিনি ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশের জনগণের এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দের মনোভাব যেভাবে তিনি তাঁর এ বইয়ে বর্ণনা করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বইয়ের মধ্যমণি শেখ মুজিবুর রহমান। ব্লাড নিয়মিত ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠাতেন। সেসব বার্তাতেও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত ছিল। ছয়দফার প্রশ্নে শেখ মুজিব বরাবরই অনমনীয় ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান' এর বদলে 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। শব্দের এই রূপান্তরও যে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সে দিকটিও ব্লাডের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন :

"Upon reading this report after a gap of many" years, I was struck by Mujib's frequent reference to Bangladesh instead of East Pakistan. I do not recall any earlier public use of the Bangladesh, which means Bengali homeland. Mujib may have done so in order to convey a subtle hint to a West Pakistani audience that there was an alternative to the continual union of East Pakistan and West Pakistan. In those early days of 1971 Bangladesh was expressed in towards, later when joined together Bangladesh carried the clear connotation of an independent country, i.e. for Bangalis of East Pakistan" *(Blood, 2002:146)*।

পয়লা মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর বাংলাদেশের স্বাধীন অভ্যুদয় যে অবধারিত হয়ে যায় সে কথাটি ব্লাডের কথায় ফুটে ওঠে। অসহযোগের অবয়বে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা যে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেবে সে কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন ("It would be difficult, perhaps impossible, for the movement toward independence to be checked now") *(ঐ পৃ: ১৬৩)*। তাই ইতিহাসের এ বাস্তবতা সেই আন্দোলনের অদ্বিতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মওদুদ আহমদও জাতির প্রতিষ্ঠাতা জনক (The founding father) বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন *(দেখুন Ahmed .2002, P.51)*। পাশাপাশি তিনি জিয়াউর রহমানকে সমরনায়ক (war hero) বলে পরিচিতি দান করেছেন। *(ঐ পৃ: ৫২)*।

The new encyclopedia Britanica (1982:) 427 vol 9) ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেই তথ্য মতেও শেখ মুজিবই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

"The Success of Awami League in East Pakistan surprised even its friends. Sheikh Mujib emerged with a majorrity at his command among the membership of the new assembly (167 of the 300 total) ... Yahya's plan provided that when the new assembly met it must produce a constitution within 100 days. Mujib, however, stood out for complete independence for East Pakistan, execpt for foreign policy, through the East wanted to make its own aid, trade and defence agreements. Bhutto rejected these terms and refused to bring his party to Dacca to participate in the assmbly On March 1, 1971, President Yahya announced that the National Assembly would be suspended indefinitely. Sheikh Mujib replied by ordering a boycott and general strike throughout East Pakistan. Bowing to the invitable, Yahya proceeded to Dacca in mid March to negotiate a compromise that would concede the substence of Mujib's demands while retaning tenuous ties that might still preserve

the name of Pakistan. But compromise proved impossible President Yahya nounced Mujib and his men as traitors and launced a drive to 'reoccupy' The East with West Pakistan troops.

Warfare between government troops and supporters of the Awami League broke out in East in March, Sheikh Mujib and many of his collegues were arrested, while others escaped to India, proclaiming East Pakistan an independent State under the name Bangladesh (Bangal Land)".

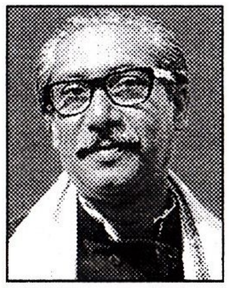
উপরের এই উদ্ধৃতিতে 'reoccupy' বা পুনরুদ্ধারের কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল অর্থেই অসহযোগের দিনগুলোতে বাঙালিরা স্বাধীন দেশে বাস করেছিলেন। তাই পাকিস্তানের শাসকরা তা পুনরায় উদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধে নামে। আর এ যুদ্ধের প্রধানতম টার্গেট ছিলেন শেখ মুজিব।

এতটা বিস্তৃতভাবে দলিলপত্র উদ্ধৃত করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গটি টানলাম এজন্য যে, এ বিষয়টি নিয়ে অযথা একটি বিভ্রান্তিকর বিতর্ক জিইয়ে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের নয়া সংস্কারণ প্রকাশের নামে সেই বিতর্ককে আরেক দফা উসকে দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ বিতর্ক ইতিহাসের স্রোতে একদিন ভেসে যাবে। এ বিতর্কের মাধ্যমে শুধু শুধু মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন সমরনায়ককে (যিনি নিজেও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মানতেন) খাটো করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তাঁর জীবদ্দাশায় এ ধরনের বিতর্ককে তিনি প্রশ্রয় দেননি। আশা করছি, ইতিহাসে যাঁর যে স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে তাঁর হেরফের করার কুযুক্তি ও কুবুদ্ধি দেয়ার মতো সুবিধাবাদী মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম না হওয়া সত্ত্বেও জাতি তাতে বিভ্রান্ত হবে না। বরং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পর্যায়ের সংগঠন ও নেতাদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অযথা এ ধস্তাধস্তির অবসান হওয়া একান্ত জরুরি।

জাতীয় ঐকমত্যের জন্যই এ প্রশ্নের চূড়ান্ত বোঝাপড়া কাম্য। আমাদের জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থেই তা হওয়া উচিত। কোমলমতি শিশুদের নিজেদেরও গৌরবগাঁথা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

যিনি না জন্মালে বাংলাদেশই সৃষ্টি হতো না, যাঁর মুখচ্ছবিই আসলে বাংলাদেশের মানচিত্রে ভাসে, তাঁকে বাদ দিয়ে মনগড়া ইতিহাস লেখার এই

অপচেষ্টা থেকে স্বার্থান্বেষী মহলের সরে আসতে বাধ্য করতে সামাজিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তবে এভাবে ইতিহাস বদলে ফেললেই বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি চিন্তার জগত থেকে উপড়ে ফেলা যাবে না। দিন দিন তিনি আরও বড় হবেন। আকাশের সমান হতে থাকবে তাঁর উচ্চতা। শত অপচেষ্টা সত্ত্বেও ইতিহাসে তাঁর যে অটল অবস্থান, তা দিন দিনই আরও মজবুত হবে। তাঁর ঐ অবস্থান নিয়ে তাঁর অনুরাগীদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাঁকে আরও বড় করারও প্রয়োজন নেই। যে বামনেরা তাঁকে মাথায় আঘাত করতে চাইছেন, তাঁরা তাঁর নখও স্পর্শ করতে পারবেন না। তাঁর যা প্রাপ্য তা তাঁকে দিতে ইতিহাস সামান্যতম কার্পণ্য করবে না।



আনিসুজ্জামান

মাটি, মানুষ, বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত আজো লেখা হয়নি। তাই তাঁর সম্পর্কে সব কথা আমাদের জানা নেই। আমরা যা জানি, তার সবই প্রায় ইতিহাসের অন্তর্গত। আবার এ কথাও বলা অসঙ্গত নয় যে, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও ইতিহাসের একটা ছায়াপাত ঘটেছে।

পূর্ববঙ্গের এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, লেখাপাড়া করতে গোপালগঞ্জ থেকে গেলেন কোলকাতায়—সেদিনের স্বপ্নের নগর ও সভ্যতার কেন্দ্রে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। দেশে চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, তারই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পাকিস্তান-আন্দোলন। সেকালে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান আত্মবিকাশের যে সম্ভাবনা দেখেছিল, সে স্বপ্ন লাগলো তাঁরও চোখে। মুসলিম লীগ-সমর্থিত ছাত্র-সংগঠনের কর্মী হলেন মুজিব, হলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যও। বঙ্গীয় মুসলিম লীগে উপদল ছিল : সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম এবং নাজিমুদ্দীন-আকরম খাঁর নেতৃত্বে। মুজিব প্রথমটিতেই গেলেন, ওটিকেই মনে করা হতো একটু অগ্রসর, অপেক্ষাকৃত সমাজসচেতন, কিছুটা সম্মুখ দৃষ্টিসম্পন্ন। ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে মুজিব জোর খাটলেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দলীয় নেতাদের, নিজেও হয়ে উঠলেন ছাত্রলীগের একজন নেতা। পাকিস্তান অর্জিত হলো। মুজিবের কর্মক্ষেত্র বদল হলো—এবারের পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকায় শিকড় গাড়লেন।

যে পাকিস্তানের জন্য এত কিছু করা, সে পাকিস্তান সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে সময় লাগল না মুজিবের। প্রথমে চেষ্টা করলেন মুসলিম লীগের অভ্যন্ত

রে থেকে কাজ করার। পারলেন না—বিরোধ লেগে যায় পদে পদে। রাষ্ট্রভাষা নিয়েই প্রথম সংঘাত লাগল। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। সেই '৪৮ থেকে '৭১ সালের মধ্যে কতবার যে বন্দি হলেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই।

মওলানা আবদুল হামিদ খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের উদ্যোগে যুক্ত হলেন মুজিব। বিকল্প রাজনৈতিক দল, মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের বিকল্প পথের অনুসন্ধান শুরু হলো। পেছনে ফিরে তাকাননি একবারও। যে তটভূমি ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, একবারও ফিরে তাকালেন না। জেলে যাচ্ছেন, মুক্তি পাচ্ছেন, মন্ত্রী হচ্ছেন, আবার সংসার দেখতে পারছেন না, সংগঠন করছেন, জড়িয়ে পড়ছেন নানা বিরোধ-সংঘাতে, চেতনায় পরিবর্তন আসছে, তার প্রতিফলন ঘটছে জীবনে ও রাজনীতিতে।

সে পরিবর্তনের মূলে নিশ্চয় ছিল একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাব। ঐ দিনটাই তো পাল্টে দিল ইতিহাসের গতিপথ। সেই নতুন পথ ধরে যুক্তফ্রন্টের গঠন ও তার অবিশ্বাস্য বিজয়লাভ। ক'দিনের মন্ত্রিত্বের পরে আবার কারাগারে। ৯২ক ধারার শাসন প্রদেশে। আওয়ামী মুসলিম লীগ রূপান্তরিত হলো আওয়ামী লীগে। যুক্তফ্রন্ট ভাঙলো, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় আবার স্থানলাভ। আবার পদচ্যুতি মন্ত্রিসভার, এবারে সামরিক শাসন সারা দেশে। তার আগেই আওয়ামী লীগ ভেঙেছিল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। সারা পাকিস্তানে ন্যাপের বিস্তৃতি সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী সংগঠনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণতর। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েই মুজিব খুশি—বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রচিত হলো ছয় দফা, তাঁর ভাষায় জাতীয় মুক্তির সনদ। এবারে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুবের আসন টললো, মুজিব হলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭০ সালের ১ ডিসেম্বর নির্বাচনী আবেদন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মরণ করেছিলেন পূর্ববর্তী ক'টি বছরের কথা :

'আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্য ১৯৬৬ সালে আমি ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি, অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি

তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতামাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা বাংলার বিপ্লবী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে, মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনে কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানি করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবে।'—তাঁর এ কথাই একদিন সত্য হয়েছিল, তবে সে পরের কথা।

১৯৬৯-৭০-এ বঙ্গবন্ধুই হয়ে উঠেছিল বাঙালির একচ্ছত্র নেতা, জনগণের সাথে তাঁর একাত্মতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এ-সময়টায়। তাঁর লক্ষ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং এ অঞ্চলের মানুষকেও তিনি সেই পথের পথিক করে নিতে পেরেছিলেন। আপাতত ছ'দফা-ই চাই, তারপর দেখা যাবে—এমন একটা মনোভাব মানুষের। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর যে অভূতপূর্ব বিজয় সারা বিশ্বকে বিস্মিত করেছিল, তার শক্ত ভিত রচিত হয়ে গিয়েছিল ১৯৬৯-৭০-এই। তিনি যদিও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন নির্বাচনের ফলাফলে, তবু এ কথা বলতে ভোলেননি যে, এ ফল এক ব্যাপক গণজাগরণের প্রকাশ এবং এ কথাও বুঝতে ভুল করেননি যে, এ ফল তাঁর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব আরোপ করেছে।

প্রতিকূলতা কী হতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। ১৯৫৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের সাথে দ্বন্দ্ব করে আসছিলেন তিনি। তবু আশাও ছিল। জনমতের এ বিপুল বিস্ফোরণকে অগ্রাহ্য করবে কি শাসকরা? তাই করল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তার আগে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের তিনটি সপ্তাহ

ধরে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চালানো, প্রশাসনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অধীন করা, সামরিক শক্তিকে কিছুকালের জন্য হলেও নখদন্ত লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করা—এর নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে।

তারপর যা হলো, তারও নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। সুসংগঠিত, আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীকে শৃঙ্খলামুক্ত করে লেলিয়ে দেওয়া হলো নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু আবার বন্দি—রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে—তাঁকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না শাসকরা। কিন্তু তারই ফাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলো তাঁর নামে। তিনি থাকলেন না মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়ে—তবু কেউ ভুলল না তাঁর কথা। সারা পৃথিবী ভুলল না। মুক্তিযুদ্ধের শেষে দেশনায়ক ফিরে এলেন স্বদেশে। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণ হবে না।"

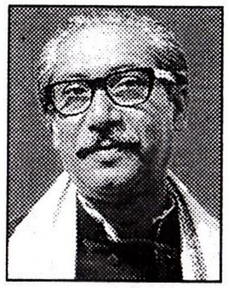
এরপর সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি সময় পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রশাসন নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে একটি চমৎকার গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা, দেড় বছরের মাথায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের কাজে অগ্রগতি, ব্যাপকভাবে বাংলা প্রচলন—এ সবই তাঁর শাসনকালের ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক—দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হত্যা ও একদলীয় শাসনের প্রবর্তন। দুর্ভিক্ষ ঘটার পশ্চাতে মার্কিন পরাশক্তির ভূমিকা আজ কারো অবিদিত নয়। ক্ষমতাসীন দলের বহু কর্মী ও বহু মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছিল—কোথাও স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে, কোথাও আত্মগোপনকারী বিপ্লবী রাজনীতিকদের হাতে। সিরাজ শিকদার-হত্যাও বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের এক শোচনীয় ঘটনা, যদিও সিরাজ শিকদারের হাতেও বহু রক্তের দাগ ছিল। একদলীয় শাসনের যেসব লক্ষ্য তিনি স্থির করেছিলেন, তার মধ্যেও ভালো জিনিস ছিল না, তা নয়; কিন্তু একদলীয় শাসন অনিবার্যভাবে গণতন্ত্রের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেদিন যাঁরা বৈপ্লবিক রাজনীতি বা যাঁরা বৈজ্ঞানিক রাজনীতি করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁদের ভূমিকা লক্ষ করলে স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে তাঁদের রাজনীতি বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে।

তবু ক্ষমতাসীন বঙ্গবন্ধু অনেকখানি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং সে সময়েই তাঁর ওপর হানা হলো চরম আঘাত। যারা আঘাত হানলো, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে ক্ষুব্ধ সামরিক কর্মকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক

কর্মকর্তা ছিল। উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক সহকর্মী ও সামরিক কর্মকর্তা ছিল, দেশের বাইরে থেকেও উস্কানি ছিল। কিন্তু শোচনীয়তা সত্ত্বেও এই মৃত্যু তাঁকে গৌরবদানই করেছিল। নিজের নিরাপত্তার জন্য সামান্যতম উদ্বেগ তাঁর ছিল না, সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্ণপাত করেননি, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি। ঘাতক দলের মুখোমুখি হতেও বিলম্ব করেননি তিনি—'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা'।

তাঁর রক্তে কি উর্বর হয়েছে দেশের মাটি? তাকে এত ভয়—ঢাকায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগেরও অন্ত নেই। এমনকি, তিনি যে স্বাধীনতা চাননি বাংলাদেশের, এ কথাই প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত তাঁর প্রতিপক্ষরা। এ বড় বিচিত্র ব্যাপার। কেন এত ভয় তাঁকে? তার কারণ, বাঙালির চিত্তে তাঁর আসন স্থায়ী। বাংলাদেশ থাকলে মুজিবকে ভোলা কঠিন, ভুলিয়ে দেওয়া কঠিন।

বঙ্গবন্ধু-হত্যা এ দেশের ইতিহাসের নির্মমতম অন্যায় রচনা করেছে। আইন করে আইনের হাত থেকে বাঁচতে হয়েছে ঘাতকদের। নিহত হয়েও বেঁচে আছেন বঙ্গবন্ধু, চিরদিন বেঁচে থাকবেন। বাঙালির শক্তি ও দুর্বলতা, বাস্তববুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতা, সাহস ও পরিণামচিন্তাহীনতা, মৃত্তিকাসংলগ্নতা ও কল্পনাপ্রিয়তা—এ সবেরই একটা সমন্বয় দেখেছি তাঁর মধ্যে। এ অর্থেও দেশের মানুষের থেকে তিনি অবিচ্ছেদ্য।



আবুল ফজল

১৫ আগস্টের ডায়েরি

আজ ১৫ আগস্ট। শুক্রবার। মুসলমানদের জন্য সপ্তাহের পবিত্রতম দিন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। এজন্য সাজসজ্জা, তোড়-জোড় চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। রাষ্ট্রপতিকে যথোপযুক্ত সংবর্ধনা জানানোর জন্য শিক্ষক-ছাত্রদের মহড়াও নাকি হয়ে গেছে কয়েক দফা। এ পরির্দশনের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বয়ং শেখ সাহেবও ছিলেন সচেতন। ইতিপূর্বে কোনো চ্যান্সেলর এভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেননি।

এ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি কি বলবেন, কি বলা উচিত হবে ইত্যাদি ব্যাপারে আগের দিন তিনি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য এক বৈঠক করেছেন। আলাপ-আলোচনার পর নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনার্স পরীক্ষায় যারা সবচেয়ে ভালো ফল করবে তাদের জন্য ২০টি আর আলাদাভাবে মেয়েদের জন্য ৫টি উচ্চমানের বৃত্তি ঘোষণা করবেন। আর এসব ছেলেমেয়ের অবশিষ্ট শিক্ষাজীবনের সব খরচ রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বহন করা হবে। এসব বৃত্তি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সীমিত থাকবে না; বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই হবে এসব বৃত্তির হকদার। অর্থাৎ এসব বৃত্তির জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীই অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজকাল কোনোরকম গবেষণা করে না বলে যত্রতত্র একটি বদনাম শোনা যায়। তাই গবেষণাকর্মে উৎসাহ দেয়ার জন্যও কিছু একটা করা দরকার—শেখ সাহেব কথাটা নিজেই

বললেন। সিদ্ধান্তও নিলেন নিজে; শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা মূল্যবান গবেষণা করবেন তাঁদের নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে এবং উন্নততর গবেষণাকার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে ব্যবস্থাও সরকার থেকেই করা হবে। এ গবেষণা বৃত্তি ও পুরস্কার স্রেফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত থাকবে না; বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই হতে পারবেন এর দাবিদার। দেশে গবেষণা হোক এ আমি চাই। উপস্থিত মন্ত্রী আর সচিবরা তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রতিও তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁর ভাষণের জন্য নানা পরিসংখ্যান হাজির করেছিল। যেমন—প্রাইমারিতে কত ছাত্রছাত্রী পড়ে, মাধ্যমিকে কত, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়েই বা কত ইত্যাদি। ঐসব দেখে শেখ সাহেব নাকি বলেছিলন : পরিসংখ্যানভিত্তিক বক্তৃতা দেয়া আমার পোষাবে না, আর ঐ ধরনের বক্তৃতায় আমি অভ্যস্তও নই। পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, পাকিস্তান আমলে বাজেটের শতকরা কত টাকা সামরিক খাতে আর কত টাকা শিক্ষা খাতে খরচ হতো; আর এখন ঐ দুই খাতে তুলনামূলকভাবে আমরা কত খরচ করছি—এটুকুই আমার জানা দরকার। পরিশেষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জিজ্ঞাসা করবো, সরকার তথা দেশের মানুষ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা খরচ করছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশকে কি দিচ্ছে? ইত্যাদি।

সেদিনের ভাষণের মনে মনে এ খসড়া পরিকল্পনাটি শেখ সাহেব করেছিলেন। ঐ বৈঠকের উপস্থিত একজনের মুখ থেকে শুনেছি, তিনি এখনো সরকারি চাকুরে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আল্লাহ করেন আরেক—অক্ষরে অক্ষরে তা ঘটে গেল সেদিন। ভোর ছ'টায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ। অবিশ্বাস্য এক দারুণ নির্মম সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, মর্মাহত হয়ে পড়লাম। দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি নিজেও। গত পঁচিশ বছর ধরে মিশে গিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের সত্তার সঙ্গে। বাংলাদেশের এমন কোনো প্রত্যন্ত স্থান নেই, যেখানকার মাটি আর মানুষের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত নেই। শেষেরদিকে আমার নিজেরও অনেক স্মৃতি জড়িত হয়ে পড়েছিল তাঁর সঙ্গে। মাত্র এক মাস আগে ১৫ জুলাই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা উৎসবে গণভবনের দরজায় তাঁর সঙ্গে দেখা। এ যে শেষ দেখা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেদিন। পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গণভবনের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

গাড়ি থেকে নেমে আমি আর ডক্টর এনামুল হক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তিনি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন : আপনি চাটগাঁ থেকে এসেছেন, খুব খুশি হলাম।

পাশে দাঁড়ানো ছেলের দিকে ইশারা করে বললেন—ছেলেকে দোয়া করুন। ছেলে শেখ কামাল জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলো আমার ও ডক্টর এনামুল হকের সঙ্গে।

মেহমানরা সবাই যখন আসন নিয়ে নাস্তা করে গল্প-গুজবে ব্যস্ত তখন শেখ সাহেব বর-কনে, আত্মীয়-স্বজন এবং নতুন বেয়াইকেও সঙ্গে নিয়ে মেহমানদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে করতে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন দুই সারিতে বসা মেহমানদের মাঝখান দিয়ে। নতুন বেয়াইকে দেখিয়ে বললেন : ইনিই আমার বেয়াই।

এনামুল হক সাহেব ত্বরিত উত্তর দিলেন : দবিরউদ্দিন সাহেবকে তো বহুদিন থেকেই চিনি। শেখ সাহেব বললেন, তখন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই চিনতেন, আমার বেয়াই হিসেবে তো জানতেন না। এখন থেকে আমার বেয়াই হিসেবে জানুন, বলে হেসে উঠলেন—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় হাসি।

আমাদের চাটগাঁর কয়েকজনকে এক জায়গায় দেখে ঠাট্টা করে বলে উঠলেন, চাটগাঁর মানুষদের এ এক দোষ, একজন আরেকজনকে দেখলে এক জায়গায় এসে জড়ো হবেনই—বলে হাসতে হাসতে হেঁটে চললেন সামনের দিকে।

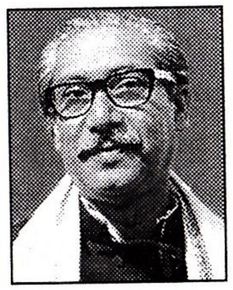
ডক্টর এনামুল হক আর আমি ছাড়া জাস্টিস ইদ্রিস আর চাটগাঁর এমপিদেরও কয়েকজন তখন একত্রে আলাপরত ছিলাম ওখানে। যাঁর নামে আর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, যাঁকে দেশের মানুষ এতকাল বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক বলে অভিহিত করে এসেছে, যাঁর নাম বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত, দূর দেশেও যাঁর নাম সবচেয়ে সুপরিচিত, দেশের জন্য যাঁর অন্ত হীন নির্যাতন ভোগ এ দেশের নরনারীর কারো অজানা নয়, সে মানুষটির এই ভাগ্য! আকস্মিকভাবে আজ ভোরে ঢাকা বেতার কি-না ঘোষণা করলো—সে মানুষটিকে, সে পুরুষসিংহকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে।

অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম : 'এ কি নিয়তির খেলা! না আল্লাহর অনন্ত রহস্যের এও আরেক রহস্য' Manproposes, God dispoes—এ আপ্তবাক্যটাই শেষকালে সত্য হলো? সামরিক বাহিনী খন্দকার মোশতাক

আহ্‌মদকে রাষ্ট্রপতি করেছে। তিনি শেখ মুজিবের দীর্ঘকালের সহকর্মী আর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। গণভবনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় অন্য অনেক মন্ত্রিতদের সঙ্গে সেদিন তাঁকেও দেখেছিলাম। তাঁদের দীর্ঘদিনের নেতা আর দীর্ঘদিনের সহকর্মী শেখ মুজিবকে যেদিন সকালে হত্যা করা হয়েছে, আর সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর ১৩ জন সহকর্মী মন্ত্রী আর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। এঁরা সবাই শেখ মুজিবের তৈরি, নিজের হাতের গড়া । তিনি না থাকলে তাঁদের অনেকের কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্বই থাকতো না। ক্ষমতা আর পদের প্রলোভন কি সবরকম মানবীয় আবেগ, অনুভূতি, বিবেক-বিবেচনা সমূলে বিনষ্ট করে দেয়? এ জন্যই কি বলা হয়েছে Power is corrupting. Power is degrading? না কি এও মধ্যবিত্ত মানসিকতা?

শোনা যাচ্ছে, নির্বিচারে শেখ পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, শিশু-নারী কাউকেও রেহাই দেয়া হয়নি। অন্তরের অন্তস্তলে স্বতঃই উচ্চারিত হলো : আল্লাহ! এ যেন সত্য না হয়! (পরে জানা গেছে বহুবারের প্রার্থনার মতো আমার এ প্রার্থনাটাও আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। শেখ পরিবারের কেউ বেঁচে নেই।)

যাই হোক, এ এক মহাসত্য যে, দোষেগুণেই মানুষ; কোনো নেতৃত্বই নির্দোষ নয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বও এর ব্যতিক্রম ছিল না; তবে বহুতর কারণে তাঁর নেতৃত্ব আর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসে। এ যুগে বাংলাদেশে এমন ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি জন্মাবে কি-না সন্দেহ। বাঙালি নেতৃত্বের এক অসাধারণ নিদর্শন শেখ মুজিব। এ নেতৃত্বের সবরকম সরলতা-দুর্বলতার তিনি ছিলেন এক অসন্দিগ্ধ প্রতিভূ।



আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু

'প্রায় বারো শ' বছর পর বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং হাজার বছর পরে বাংলাদেশ এমন নেতা পেয়েছে, যিনি রঙে-বর্ণে, ভাষায় এবং জাতি-বিচারে প্রকৃতই একজন খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা।'

এ মন্তব্য একজন খ্যাতনামা বিদেশী ঐতিহাসিকের এবং তা করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে।

খ্যাতনামা ব্রিটিশ সাংবাদিক সিরিল ডানের মতে, 'তিনি সুদর্শন, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অনলবর্ষী বক্তা এবং শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার মতো ক্ষমতা রাখেন।'

তাঁর জীবনী লেখকদের কেউ কেউ বলেছেন, তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এখন সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বহুল আলোচিত নেতা। সামরিক অভ্যুত্থানের যুগেও তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, গণতন্ত্রের পতনের যুগে গণতন্ত্রকে এশিয়ার একটি দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং 'লৌহমানব' হওয়ার যুগে একচ্ছত্র নায়ক হওয়ার সুযোগ অবহেলা করে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদ বেছে নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিরস্ত্র গণমানুষের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে ধাপে ধাপে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করে মাত্র নয় মাসে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব করেছেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখটি ছিল তাঁর জীবনের চরম পরীক্ষার দিন। পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকচক্রের নায়কেরা এদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা

করছিল তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অদূরে একদল সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্য বাঙালির নিধনযজ্ঞ শুরু করার নির্দেশ লাভের অপেক্ষায় ছিল। তাদের অজুহাত হতো, শেখ মুজিব ঐদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তারা শুধু বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে গেছেন।

আসলে সেদিন সারা বাংলাদেশ ছিল বিদ্রোহী। নব-নির্বাচিত জাতীয় সংসদের বৈঠক ডেকে অকস্মাৎ তা স্থগিত করা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক নায়কদের অনিচ্ছা দেখে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে তখন স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য পাগল। সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত হয়েছিল বিশ লাখ মুক্তিপাগল বাঙালি। তাদের কণ্ঠে ছিল একটি মাত্র দাবি, 'বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ঘোষণা কর। সংগ্রামের নির্দেশ দাও।'

একাত্তরের সাতই মার্চ। বেলা তখন তিনটে। সভামঞ্চে ধীরে ধীরে দেখা দিলেন এশিয়ার সবচাইতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতা। উদ্বেল জনসমুদ্র। দেশ ও বিদেশের অসংখ্য সাংবাদিক চেয়ে আছে তার আজকের সিদ্ধান্তের ওপর। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ ঘটনা-প্রবাহ নির্ভর করছে। নির্ভর করছে উপমহাদেশের ভাগ্য।

তিনি ধীর ও সংযত ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা নয়, যেন মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রমুগ্ধ বিশ লাখ মানুষ। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেদিনের সভায় এ ঐতিহাসিক ঘোষণা তাঁর। কিন্তু পাকিস্তানি জঙ্গি শাসকদের অস্ত্র উত্তোলনের সুযোগ তিনি দিলেন না। তাদের পাতা ফাঁদ তিনি ব্যর্থ করে দিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই একই বক্তৃতায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের চারটি প্রস্তাব উল্লেখ করেন। আলাপ-আলোচনার দরজা খোলা রাখলেন।

সেদিন তাঁর সমালোচকরা স্বীকার করলেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক দলের নেতা নন, একজন দেশনায়কও। সঙ্কটের চরম মুহূর্তে তিনি স্থির ও অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। বিদেশী সংবাদপত্রে বলা হলো, শেখ মুজিব এখন বাংলাদেশে শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি জাতীয় নেতা। সাড়ে সাত কোটি মানুষ এখন তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।

সাধারণ বাঙালির চাইতে একটু লম্বা, তাদের মতোই শ্যামলা রং, ভরাট গলা এ মানুষটির এমন কি আকর্ষণ—যে আকর্ষণের যাদুতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঁধা? এ প্রশ্নটি দেশে-বিদেশে অনেকের মনকেই

আলোড়িত করে। তিনি বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, তিনি অভিজাত ঘরে রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি। অথচ তিনি শিক্ষিত বাঙালির কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি প্রিয় অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালির কাছে। বুদ্ধিজীবী ও কর্মজীবী অর্থাৎ পণ্ডিত ও মজুরের কাছে তিনি সমান প্রেরণা। তিনি রাতারাতি নেতা হননি। কর্মী থেকে নেতা হয়েছেন। নেতা থেকে জাতীয় নেতা। জাতীয় নেতা থেকে জাতির জনক। এখানেই তার যাদুকরী শক্তির রহস্য, লক্ষ্য ও আদর্শের বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কথা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের সাথে তাঁর নাড়ির যোগ। এই সাধারণ মানুষকে সাথে তিনি রাজনীতিতে এগিয়েছেন। তাদের ভাষায় কথা বলেছেন। তাদের হয়ে সংগ্রাম করেছেন। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন। বছরের পর বছর—যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো জেলে কাটিয়েছেন। তাই কোটি মানুষের শক্তি তার শক্তি। তিনি তাদের নয়নের মণি। তিনি তাঁর দেশের মানুষের জন্য একাধিকবার হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর দেশের মানুষও তাঁর জন্য অকাতরে আত্মদান করেছে। তাই অতি অল্প সময়ে সফল হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম।

যাঁরা বঙ্গবন্ধুর কাছে একবারও গেছেন তাঁরাই স্বীকার করেছেন, কোমলতা-কঠোরতায় মিশিয়ে অদ্ভুত যাদুকরী আকর্ষণ তাঁর ব্যক্তিত্বে। তিনি শিশুর মতো সরল, সাহসে অনমনীয়, প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠোর, সেই সাথে মিশেছে দুর্জয় মনোবল, নিজের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি চরিত্রে জাতীয়তাবাদী, স্বভাবে গণতন্ত্রী, বিশ্বাসে সমাজতন্ত্রী এবং আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের তিনি উদগতা, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, অর্থনীতির প্রবক্তা এবং সেই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের অনুসারী।

পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভর সমাজ এবং তার সাথে যুক্ত মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ছিল বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায়। রাজনৈতিক দিক থেকে শাসিত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বহু শতাব্দী ধরে শোষিত একটি এশীয় দেশ—যেখানে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন তখনও দানা বাঁধেনি, বরং বেকার জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বাড়ছে, সেই দেশে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করা এবং তাকে নিজের জীবদ্দশায় সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেয়া কম বিস্ময়ের কথা নয়। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ ২৫ বছর ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়েছে। আন্দোলন করতে হয়েছে। আন্দোলনের কৌশল ও শ্লোগান বার বার পাল্টাতে হয়েছে।

তাই বলা চলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কাল মাত্র ন'মাস। কিন্তু পরোক্ষ আন্দোলনের সময়ের পরিধি ২৫ বছর। এ ২৫ বছর কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। (ক) গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্যায়, (খ) বিপিসি বা মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, (গ) ভাষা আন্দোলন, (ঘ) নির্বাচনী মোর্চা গঠন ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের বিজয়, (ঙ) সামরিক শাসন, (চ) সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন (ছ) স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, (জ) ঐতিহাসিক ছ'দফার আন্দোলন, (ঝ) নির্বাচনী বিজয় ও অসহযোগ আন্দোলন, (ঞ) সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম।

পঁচিশ বছরের এ মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত রয়েছে শেখ মুজিব। তাই বাংলাদেশ বলতে আজ শেখ মুজিব। শেখ মুজিব বলতে বাংলাদেশ।

১৯২০ সাল। ভারত উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসিত কলোনি। বাংলাদেশ তার একটি প্রদেশ। প্রথম মহাযুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের শাসন-সংস্কার আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের দাবি আদায়ের পন্থা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার কথা ভাবছেন। ভবিষ্যতে যিনি এক বিস্ময়কর অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন এবং তাকে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তর করবেন, সেই বঙ্গবন্ধু মুজিবের জন্ম সাবেক ভারতের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রারম্ভিক মুহূর্তে। এটাও সম্ভবত ইতিহাসের এক বিচিত্র লীলা। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তারিখে ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে তার জন্ম। সাধারণ বাঙালির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তাঁর মন ও মানসিকতার বিকাশ।

কৈশোরেই তিনি রাজনীতিতে দীক্ষা নেন। এই দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তখনকার বাংলাদেশের এক নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফরিদপুরেই যুবক সোহরাওয়ার্দীর সাথে কিশোর শেখ মুজিবের পরিচয়। সেই পরিচয় থেকে দু'জনেই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। উপমহাদেশের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাজনীতি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল মুখব্যাদন। ৫০ লাখ বাঙালির আত্মাহুতির ঔপনিবেশিক শাসনের জ্বালা তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলল।

১৯৪২ সালে তিনি মেট্রিক পাস করেন। মাঝখানে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চার বছরের জন্য পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয়। কোলকাতায়

হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলনে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের পরিচয় পান। সোহরাওয়ার্দীর যুক্তিনিষ্ঠা এবং সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মনিষ্ঠা তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের আরেকজন নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের 'ডাল-ভাতের' রাজনীতির দর্শন দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। সেই যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি উপলব্ধি করেন—দরিদ্র ও পরপীড়িত বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে অবশ্যই অর্থনৈতিক কর্মসূচির পরিপূরক হতে হবে।

তাঁর কলেজি-শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতায়, তখন যা ছিল সাবেক অখণ্ড বাংলার রাজধানী। কিশোর জীবনেই তাঁর কারাবাস শুরু। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়ার অপরাধে তিনি প্রথমবার ছ'দিনের জন্য কারারুদ্ধ থাকেন। কোলকাতায় ছাত্র থাকাকালে তিনি উপমহাদেশের রাজনীতির স্বাভাবিক আবর্তে পড়ে মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর পরই তিনি বুঝতে পারেন, বাঙালিরা আসলে স্বাধীনতা লাভ করেনি। এটা ঔপনিবেশিক শাসনের হাত বদল মাত্র। বাংলাদেশকে দ্বিতীয়বারের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। ১৯৪৭ সালেই তিনি গ্রাজুয়েট হন এবং এ সময় বার্নার্ড শ, কার্ল মার্ক্স এবং রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সাথে গভীরভাবে পরিচত হন। তাঁর চিন্তার দিগন্ত এ সময় থেকেই প্রসারিত হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন, বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিক ইউনিট এবং তার ভৌগোলিক জাতীয়তা স্বতন্ত্র এবং তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রও পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে রয়েছে ভাষাগত ব্যবধান এবং দেড় হাজার মাইলের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা। ফলে এই দু'অঞ্চলকে ধর্মীয় জাতীয়তার নামে এক রাষ্ট্র কাঠামোতে বেঁধে পূর্বাঞ্চলের ওপর চলবে নির্মম রাজনৈতিক শাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণ। কারণ, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী, অর্থনৈতিক ও সামরিক হেড কোয়ার্টার সবই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে।

এক নতুন উপলব্ধি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর জন্ম নেয় ১৯৪৮ সালেই। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। ১৯৪৮ সালেই বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। বস্তুত এ আন্দোলনকেই বলা চলে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রথম সূচনা। বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দাবি থেকে জাতীয়

স্বাধীনতার দাবি ধীরে ধীরে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গ্রেপ্তারবরণ করেন। ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের সময়েও তিনি ছিলেন জেলে। জেলে বসেও এ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্বদানের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকার লালবাগে বাঙালি পুলিশ হত্যার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তাতেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন পুরোভাগে। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের ধর্মঘট আন্দোলনে সমর্থন করায় তিনি কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এলো ১৯৫০ সাল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সংবিধান রচনার জন্য মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ রিপোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করে কৌশলে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার এবং উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনেরও পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নবগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার আগে ছিলেন তিনি প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগের নেতা। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে শাসক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী মোর্চা-যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবিতে বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। নির্বাচনে একুশ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের হক মন্ত্রিসভায় তিনি তরুণতম মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। পাকিস্তানের গণবিরোধী শাসকচক্র অল্পদিনেই এ মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয় এবং বঙ্গবন্ধু জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি আবার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু দলের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে স্বেচ্ছায় মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব পাকিস্তানের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান এবং বিভিন্ন অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য

মামলা সাজানো হয়। চৌদ্দ মাস নিঃসঙ্গ কারাবাসের পর তিনি মুক্তি পান। কিন্তু ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার গ্রেপ্তার হন।

১৯৬৩ সালে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন। এ সময় সামরিক জান্তা রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোর শহরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছ'দফা কর্মসূচি পেশ করেন। এ কর্মসূচিতে পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো গঠন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়। অল্পদিনেই এ ছ'দফা কর্মসূচি বাংলাদেশে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, এ কর্মসূচি বাঙালির মুক্তিসনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা ফর বেঙ্গলিজ' এ আখ্যা লাভ করে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এ ছ'দফা কর্মসূচির আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেয় এবং ১৯৬৬ সালের ৮ মে প্রতিরক্ষা আইনে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বাংলাদেশব্যাপী যে প্রবল গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়, তা 'জুন আন্দোলন' নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের ১৭ জুন তাকে ঢাকা জেল থেকে কুর্মিটোলার সামরিক শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয় এ অভিযোগ 'আগরতলা মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলায় তিনি ছিলেন এক নম্বর আসামি। সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার চলাকালে ১৯৬৯ সালের গোড়ায় বাংলাদেশে প্রবল গণঅভ্যুত্থানে সামরিক জান্তার শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ফলে তাঁকে অন্য অভিযুক্তদের সাথে মুক্তি দেয়া হয়; মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। বঙ্গবন্ধু এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ছ'দফা কর্মসূচি গ্রহণের দাবিতে অটল থাকেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে নতুন আন্দোলনের সম্ভাবনায় তিনি পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। নির্বাচনের ফল দেখে সামরিক জান্তা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শুরু হয় ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। ১ মার্চ এক ফরমানবলে জেনারেল ইয়াহিয়া এ বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করলেন।

বারুদাগারে যেন অগ্নিসংযোগ হলো, জ্বলে উঠল সারা বাংলাদেশ। শুরু হলো ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন। কার্যত বাংলাদেশের প্রশাসনভার গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। সামরিক জান্তা গোপনে বাংলাদেশে সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে লাগল। শুরু হলো বিভিন্ন স্থানে অসহায় বাঙালির নর-নারী হত্যা।

মার্চ মাসের মধ্যভাগে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় এলেন। এলেন জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ অন্যান্য নেতা। আলোচনা সফল হতে চলেছে বলে সবাই যখন আশা করছে, ঠিক তখন পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন। মধ্য রাত থেকে শুরু হলো সারা বাংলাদেশে বর্বর গণহত্যা অভিযান।

পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাঙালির সৈন্য, পুলিশসহ সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বিতাড়নে অস্ত্রধারণের নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস—এ দীর্ঘ দশ মাস বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানি কারাগারে ফাঁসির আসামি হয়ে। তিনি জীবিত না মৃত তাও তাঁর দেশবাসী জানতো না। তবু তাঁর প্রেরণায় সঞ্জীবিত জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগেই সারা বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয়।

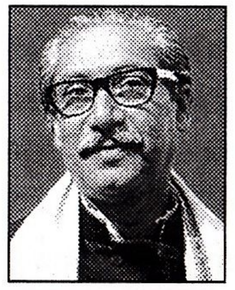
১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে আসেন এবং রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে তিনি দেশের সংবিধান রচনা ও তা গণপরিষদে পেশের ব্যবস্থা করেন। সংবিধান পাস হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে তাঁর দল আবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে দেশের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব আরো পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু আজ জাতির জনক। তাঁর রাষ্ট্রাদর্শ চারটি : জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি দেশের ভারী কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা, রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা তুলে

দিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছরের মধ্যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সারা এশিয়ায় তাঁর পররাষ্ট্র নীতি শান্তি, সহযোগিতা, জোটনিরপেক্ষতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তিনি গত পঁচিশ বছরে চীন, রাশিয়াসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ সফর করেছেন। বহু দেশের বহু রাষ্ট্রনায়কের সাথে তার ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ছিল। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মূর্ত প্রতীক বলেই তাঁকে দেয়া হয়েছে 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার। সমাজতন্ত্রী দেশের মানুষের চোখে তিনি এশিয়ায় শান্তির দূত।

শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে আজ তিনি একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত। এ নামটি হলো 'বঙ্গবন্ধু'।



আবুল মাল আবদুল মুহিত

পনেরো আগস্ট : ষড়যন্ত্রের পটভূমি বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং আমাদের করণীয়

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্ট হলো সবচেয়ে কলঙ্কিত দিবস। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জন্য এটি সত্যিকার অর্থে শোক দিবস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার নিকটাত্মীয় ও সহযোগী নিয়ে আঠারো জন এ কলঙ্কিত দিনে শাহাদাতবরণ করেন। কতিপয় কাপুরুষ দেশদ্রোহী সেনাসদস্য রাতের অন্ধকারে ছলনার আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে এ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। শুধু খুনই কিন্তু এ কাপুরুষতার উদ্দেশ্য ছিল না, তার আসল উদ্দেশ্য এখন আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমাদের বহু সাধনা ও সংগ্রামে অর্জিত জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি চুরমার করে দেয়া ছিল এ হঠকারী অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য। আজকের দিনে আমি শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও তার সাথে যারা শাহাদাতবরণ করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এ আলোচনা শুরু করছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর। ২৬ মার্চ আমরা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করি। কারণ সেদিন শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব—আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ। যে যেখানে যেভাবে পেরেছে, যার যা কিছু শক্তি ছিল তাই নিয়ে শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের নগরে, শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে সর্বত্র। এ রকম জনযুদ্ধের নজির আর আছে বলে আমার জানা নেই, সমাজের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি মতের, প্রতিটি পেশার জনগণের এমন সম্পৃক্ততা আর কোনো মুক্তিযুদ্ধে হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া

যায় না। ১৬ ডিসেম্বর নয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে পরাজিত পাকিস্তানি দখলদার দস্যুদলের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে এই দস্যুদল ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পায় এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ হয় মুক্ত। এ দিনটি আমরা বিজয় দিবস হিসেবে পালন করি। ষড়যন্ত্রকারী আন্তঃশত্রু ও কোনো বহিঃশক্তির প্ররোচনা এ দুটি বাস্তবতাকে এখনো বিকৃত করতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধ রাতারাতি হয়ে যায়নি এবং বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠা পায়নি, এর পেছনে আছে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় একটি জাতির উদ্ভবের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এ প্রক্রিয়ার শুরু হয় যখন বাংলা ভাষার হয় আত্মপ্রকাশ। এ প্রক্রিয়ার শুরু হয় মাৎস্যন্যায়ের পঞ্চাশ বছরের নৈরাজ্যের শেষে যখন ছোট ছোট রাজন্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে একজন নৃপতি নির্বাচন করেন। বৌদ্ধ পাল রাজবংশ (৭৫০-১১৫৫), হিন্দু সেন রাজবংশ (১১১৮-১২০৬), মুসলিম দাস ও খিলজী রাজত্ব (১২০৩-১৩৪২) এ জাতিকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। তবে ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ পর্যন্ত বাংলায় সুলতানি রাজত্ব আমলে এবং পরবর্তী সময়ে মোগল সুবেদারদের আমলে (১৬১২-১৬৫৭) বাংলায় একটি স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তার বিকাশ ঘটে।

১৭৫৭ সালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয়। ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাটের ফরমানে এ শাসন বল সঞ্চয় করে। পরবর্তী ৯৩ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তা সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। ১৮৫৭ সালে এ বিদেশী শাসন উৎখাতের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশ আমলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় একটি ভাষাভিত্তিক জাতি গঠন প্রক্রিয়া সংহত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে বৃহত্তর ভারতে তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসান আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগে। সারা ভারতে সর্বভারতীয় স্বরাজ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের এ উত্তাল সময়ে বাংলায় জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বেশ বিঘ্নিত হয়। একটি সুযোগ আবার আসে ভারত বিভাগের সময় । যুক্ত বাংলায় একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উদ্যোগ কিন্তু ব্যর্থ হয়। সর্বভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ উদ্যোগকে সমর্থন করলেও কংগ্রেসের মূলধারা ও ব্রিটিশ

ভাইসরয়ের আপত্তিতে হাজার বছরের বাংলা জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীতে উসকে ওঠা সাম্প্রদায়িকতাও এ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

অতঃপর পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রক্রিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। পাকিস্তানের স্বার্থপর শোষণ নীতি, পাক সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল ও চণ্ডনীতি, বাংলাভাষার ওপর আক্রমণ, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বঞ্চনা, পাকিস্তানে ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, সবকিছু মিলে আবার তাতিয়ে দেয় বাংলার জাতিরাষ্ট্র গঠনের সুপ্ত স্বপ্ন। এ জাতির শুধু একটি ভাষাই ছিল না, সমাজ জীবনে এ জাতি ছিল একটি যৌগিক গোষ্ঠী, সংশ্লেষী নয়। ধর্মকর্মে সহনশীলতা, আত্মার আচরণে সমমাত্রিক কৃষ্টি, অর্থনৈতিক জীবনে সমতার আকাঙ্ক্ষা ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এ জাতিকে করে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত। পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ও সামরিক ঐতিহ্যে পূর্ব বাংলার এ চেতনার জন্য কোনো সুযোগ ছিল না। তাই তেইশ বছরের সম্পর্ক ও সংগ্রাম অবশেষে ব্যর্থ হলো। মুক্তিযুদ্ধ হলো গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সামরিক কর্তৃত্বকে বিদায় দিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্মান্ধতাকে বিতাড়িত করে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বঞ্চনা ও শোষণকে খতম করে সকলের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ ও ন্যূনতম সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশ্বরাজনৈতিক কৌশল পরিহার করে মানবাধিকারকে সমুন্নত করার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে উপরিউক্ত আদর্শবাদ ও স্বপ্ন যতো শক্তিশালী ছিল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তা হয় আরো সুদৃঢ়। মুক্তিযুদ্ধে এসব আদর্শ বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য জনযুদ্ধে ধর্ম দিয়ে কোনো মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় ছিল না। এই জনযুদ্ধে সকল পেশার, সকল স্তরের, সকল মানসিকতার জনগণ ছিল এক সূত্রে গ্রোথিত, এক পরিচিত ও এক উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ। এই দৃঢ়চিত্ত উদ্যোগ, এই নিখাদ ঐক্য এবং পবিত্র আদর্শবাদ একদিকে যেমন বিশ্ব জনমতের সমর্থন লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতাশালী স্বার্থগোষ্ঠীকে ঘোর শত্রুতে পরিণত করে।

পাকিস্তান তো ছিল সরাসরি শত্রুপক্ষ। তারা ধর্মের নামে চালায় তাণ্ডব এবং ধর্মের নামে সমর্থন আদায় করে মুসলিম বিশ্বের। তারা সার্বভৌমত্বের নামে গণহত্যা সাধন করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বাংলাদেশে। তারা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার অজুহাতে চালায় মানবাধিকারের নৃশংস দলন। বাংলাদেশের জাগ্রত জনতাকে তারা অপমানিত করে ভারতের দালাল বলে। তাদের বিবেচনায়

বাংলার সমুদয় সমর্থ যুবক হয়ে যায় দুষ্কৃতিকারী। বাংলাদেশকে পদানত করার এ কৌশল তারা পরিহার করেছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের ইতিহাসে এখনো বলা হয় যে, ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। আজও সরকারিভাবে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তারা পাকিস্তান যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সেখানে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের একটি প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তানের একজন ফেডারেল মন্ত্রী আজও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ বলে মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। মুক্তিযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের কারণে পাকিস্তানের নৃশংসতার কোনো নিন্দাবাদ করেনি এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে সাহায্য অব্যাহত রাখে। যদিও মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সংবাদ মাধ্যম বা মার্কিন শিক্ষা মহল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে; কিন্তু মার্কিন নির্বাহী বিভাগ বিশেষ করে নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি ছিলেন বাংলাদেশের বিজয়ের ঘোরবিরোধী। অনেক মার্কিন গবেষকের মতে, বাংলাদেশের বিজয় কিসিঞ্জারকে এতোই ক্ষুব্ধ করে যে, বাংলাদেশের স্থপতি তার ভয়ানক শত্রুতে পরিণত হন। বাংলাদেশের বিজয়কে এ জুটি তাদের পরাজয় ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশে যখন সামরিক হঠকারিতা সফল হয়, তখন নিক্সন অবশ্যই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত; কিন্তু কিসিঞ্জার তখনও সদর্পে বিদ্যমান।

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ আস্তে আস্তে গৃহীত হলেও কতিপয় গোঁড়া গোষ্ঠী বাংলাদেশকে মানতে রাজি ছিল না। সৌদি আরব তো শর্ত দিয়ে বসলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে। লিবিয়া সেই সময়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত এবং নানা দেশে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানি দিতে অভ্যস্ত। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও ১৯৭২ সালের পর (নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগের পর) বাংলাদেশকে শত্রু বিবেচনা করতো না, তবে পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব খর্ব করতে প্রস্তুত ছিল না।

বহির্বিশ্বে যখন এ অবস্থা তখন দেশের অভ্যন্তরে পরাজিত শক্তি সংহত হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এসব দেশশত্রু, বিশেষ করে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দল দুটি গুহায় আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে যখন বিরোধী দলের বিকাশ

হতে থাকলো, এসব অন্ধকারের জীবগুলো এই নতুন দলের আশ্রয় নিতে শুরু করে। আমার মতে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবির্ভাব অশুভ ছিল না এবং এর পুরোধায় ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এক গোষ্ঠী। কিন্তু তাদের বেজন্মা রাজাকাররা একটি মঞ্চ হিসেবে পায় এবং এর ছত্রছায়ায় তাদের নিজস্ব ধারায় দুষ্কর্ম করে চলে।

বাংলাদেশের সেনাবহিনী গড়ে ওঠে অনন্য ধারায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তা ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক। সেনাবাহিনী, আধা সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়ে তাদের সম্মিলিত শক্তি বারো হাজার সৈনিক ও দুশো কর্মকর্তার কম ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই তারা রাজনৈতিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এ সেনাবাহিনীতে আত্মস্থ হলেন আরো বাঙালি সৈনিক ও কর্মকর্তা, যারা কারণে-অকারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। সেখানেই শুরু হয় প্রাথমিক জটিলতা ও শৃঙ্খলার সমস্যা। পাকিস্তান থেকে যখন বাঙালি সেনা সদস্যরা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেল। এরাই হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বৃহত্তম অংশ এবং এদের চিন্তা-চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের উচ্চাদর্শ তেমন অর্থবহ ছিল না।

এ পটভূমিতে সংঘটিত হয় পনেরো আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান ও কলংকিত হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় কর্মকর্তা এর পরিকল্পনা করেন এবং একে বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র করেন। তারা আসলেই বাংলাদেশের আদর্শের বিরোধী এবং এক সময়ে তারা তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে। যদিও কাপুরুষের মতো বিচারের কাঠগড়ায় এসব বক্তব্য বেমালুম অস্বীকার করে বসেন। এ ষড়যন্ত্রটি হয় পাকিস্তানের সাথে ও পাকিস্তানের মদদে। ষড়যন্ত্রকারীরা অন্যত্র সহযোগী খুঁজে তাই তাদের পরিকল্পনা অনেকেরই জানা ছিল। এরা সহযোগী না হলেও সাফল্যের পর তাদের সমর্থন করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আশীর্বাদ তারা চায় এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সেই সমর্থন তারা কোনো কোনো পক্ষ থেকে সরাসরি না পেলেও নিশ্চিত হয়। তাদের পরিকল্পনা উপ-সেনাপ্রধানের জানা ছিল। তারা মার্কিন দূতাবাসেও ধরনা দেয়। তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কতিপয় মীর জাফরের পৃষ্ঠপোষকতা তারা লাভ করে। তারা তাদেরই আশ্রয়ে হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এক গোষ্ঠীকে এতে সম্পৃক্ত করে সারা জাতিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। আমার মনে হয় পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোনো বহিঃশক্তি এদের নীলনকশার সাথে

সংশ্লিষ্ট ছিল না। পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের মাধ্যমে লিবিয়া হয়তো অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। তবে ষড়যন্ত্রকারীরা সাফল্য লাভ করলে তাদের দিকে সহায়তার হাত অনেকেই বাড়িয়ে দেয়। যেমন—মার্কিন উদ্যোগে কতিপয় হত্যাকরী থাইল্যান্ডে পালাতে পারে। আবার লিবিয়ায় কতিপয় হত্যাকারী আশ্রয় ও অর্থ সাহায্য পায়। লক্ষ করার বিষয় হলো যে, খুনি ডালিমের বেতার ঘোষণার প্রথম বিদেশী অনুরণন হয় পাকিস্তান থেকে এবং পাকিস্তানের ঘোষণায় বাংলাদেশের ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরেরও ঘোষণা দেয়া হয়।

কতিপয় হঠকারী সেনা কর্মকর্তার এ অভ্যুত্থানের বিষয়টি অনেকের জানা ছিল; কিন্তু তা প্রতিরোধের জন্য কেউ কোনো ভূমিকা নেয়নি। ষড়যন্ত্রটি মূলত শুধু জাতির পিতাকে হত্যা করার জন্য ছিল না, ছিল মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে বিনাশের জন্য। যে আদর্শ মুক্তিযুদ্ধে সমুন্নত হয় তার শত্রুতার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এ আদর্শগুলোকে চুরমার করে দেয়ার ব্রত নিয়ে হয় এ সামরিক অভ্যুত্থান এবং এ অভ্যুত্থানের প্রধান ভোগকারী তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনকালে সারাটি জাতির চরিত্রহনন ও মূল্যবোধ ধ্বংসের কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন।

- জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথমেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা হরণ করলেন। নির্বাচনে জালিয়াতি আগেও হতো তবে প্রশাসনকে দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া ধ্বংস শুরু করেন তিনি। ১৯৭৭ এর মে মাসে তিনি গণভোটের ব্যবস্থা করলেন তাতে প্রদত্ত ভোট ছিল অবিশ্বাস্য ৮৫ শতাংশ এবং হ্যাঁ ভোট ছিল ৯৮.৯ শতাংশ। প্রশাসনকে নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে পারদর্শী করেন দুই সামরিক শাসক।
- জেনারেল জিয়া সংবিধানের চরিত্র বদল করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ধর্মকে রাজনীতিতে সমাসীন করেন। তার হুকুমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠা পেল।
- তার রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া ছিল সরকারি গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্যে ঘুষ ও সন্ত্রাস দিয়ে দল গঠন, দল ভাঙন ও রাজনীতিবিদদের বেচাকেনার ব্যবসা পরিচালনা।
- তিনি নিজস্ব উদ্যোগে ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় প্রভাব নিশ্চিত করেন এবং ছাত্রমহলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এক যুবককে জেল থেকে বের করে এই সন্ত্রাসী উদ্যোগের সূচনা হয়। ছাত্রমহলে সন্ত্রাস আগেই শুরু হয় তবে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন জেনারেল জিয়া।

- আইনের শাসন প্রতিহত করতে তিনি কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইনকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেন। সর্বোচ্চ অপরাধের জন্য দুষ্কৃতকারীরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এই খুনিদের আবার তিনি সরকারি পদে বহাল করেন ও কূটনৈতিক দায়িত্ব দেন।
- তার অন্যতম অবদান ছিল রাজাকার ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন। যোগসাজশ আইন বাতিল করে তিনি রাজাকারদের রাজনীতি করার সুযোগ দেন এবং খুনি, ধর্ষক, লুণ্ঠনকারী ও বোমাবাজদের অপরাধ মাফ করে দেন। দেশত্যাগী রাজাকার দেশে ফিরলো, ক্ষমাপ্রাপ্ত রাজাকার দেশের প্রধানমন্ত্রী হলো।
- আইয়ুবী কায়দায় তিনি দেশে সাংবিধানিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ প্রত্যাহার করেন।
- তিনি বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে এক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদীর প্রবক্তা হন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।
- সর্বোপরি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন শুরু করে তিনি রাজনীতিতে শিক্ষিত যুবসমাজের অনীহা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশে নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষের জন্ম দেন।

এভাবে পনেরো আগস্টের নৃশংস অভ্যুত্থান শুধু বাংলাদেশে সামরিক শাসনই বহাল করলো না; বরং এ জাতিরাষ্ট্রের মজ্জাগত আদর্শকে ধ্বংস করে পাকিস্তানের প্রেতাত্মাকে স্বাগত জানায়। দীর্ঘ ষোল বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসন আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিকাশ এবং দ্রুত আর্থ-সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। এ অভিশাপ জাতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পচন প্রক্রিয়া এতো বলিষ্ঠ যে—সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্বাচনে জালিয়াতি এখন আমাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রায়িত ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতায়নকে বিতাড়ন করেছে। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় দায়িত্ব বলে কিছু রাষ্ট্রে দেখা যায় না। সমঝোতার পরিবর্তের বিভক্তি আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবে সোনার বাংলার অস্তিত্বই এখন প্রশ্নাধীন। রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় না। সরকার ব্যর্থ হয়। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জাতিকে বহন করতে হয়। দেশে মৌলবাদী সন্ত্রাস ব্যাপক। লুটপাট এবং চুরি রাজনীতিবিদদের পেশা। প্রশাসন রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিবাজ ও রাজনৈতিক দলবাজিতে পরিপক্ব। প্রতিটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠান অবক্ষয়ের মুখোমুখি। পুলিশ যেন এক দুর্বৃত্ত

বাহিনী। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস ও দুর্নীতির আখড়া। বিচার বিভাগ দুর্নীতিপরায়ণ এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষতার তোয়াক্কা করে না। প্রায় সব পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এ বিষময় বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের জন্য যদি সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ না নেয়া যায় তা হলে গৃহযুদ্ধ এবং মহাপ্রলয় তার সমাধান খুঁজে পাবে।

সক্রিয় উদ্যোগের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বিবেচনা করা যায় :

১. প্রথমেই সন্ত্রাস উৎপাটনের জন্য সব সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে। সন্ত্রাসে সন্ত্রাস দমন হয় না। সন্ত্রাস মূলত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত হয়। এ পৃষ্ঠপোষকতা পরিহারের জন্য রাজনৈতিক দলকে যেমন বিশুদ্ধ আন্দোলন করতে হবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেও তেমনি ঢেলে সাজাতে হবে। স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ পুলিশবাহিনীর প্রয়োজন। গণনিপীড়নের পরিবর্তে জনসেবার আদর্শে তাদের পুনর্গঠন করতে হবে।

২. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গড়তে হবে। ভোট জালিয়াতি রোধের সহজ প্রতিষেধক বের করতে হবে, যেমন—বুথপ্রতি সর্বোচ্চ ভোটের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৫/৭ দিনব্যাপী ভোট অনুষ্ঠান করতে হবে।

৩. রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সচিবালয়কে ভেঙে সাজাতে হবে। সংসদীয় কায়দায় মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদে রাষ্ট্রীয় সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে হবে। সংসদের কার্যপরিচালনায় নতুন নিয়মে বিরোধী দলের আওয়াজ ও ভূমিকাকে জোরদার করতে হবে। যেমন—প্রতি অধিবেশনে বিরোধী দলের প্রশ্ন, মুলতবি প্রস্তাব ইত্যাদি উত্থাপনের নির্দিষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

৪. ক্ষমতার প্রতিসংক্রম করে জনগণের ক্ষমতায়নকে বাস্তবরূপ দিতে হবে। উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড স্থানীয় পর্যায়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে লম্বা দাগে সংকোচন করতে হবে। আমলাগোষ্ঠীর দলীয়করণের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

৫. রাজনৈতিক দলের শক্তি হলো তৃণমূল পর্যায়ে। তাই তৃণমূলে সংগঠন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে

জনগণের বৃহত্তম দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যা সুযোগ রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। সহনশীলতা ও সমঝোতার কৃষ্টিকে সমুন্নত করতে হবে।

৬. সাম্প্রদায়িকতার উৎপাটনে ধর্মকে রাষ্ট্রকর্ম থেকে আলাদা করতে হবে। অত্যন্ত সচেতনভাবে মৌলবাদের অভ্যুত্থান কঠোর হাতে প্রতিরোধ করতে হবে।

৭. রাষ্ট্রীয় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দলবাজি থেকে রেহাই দিতে হবে। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, পুলিশবাহিনীর বিকেন্দ্রায়ন ও পুনর্গঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধারার সব শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠা, এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুসংগঠনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

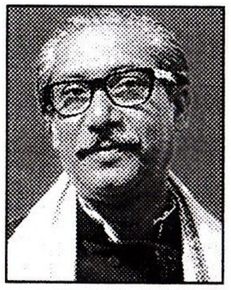
৮. দুর্নীতি বিতাড়নের জন্য একদিকে সামাজিক আন্দোলন হবে। অন্যদিকে একটি সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মকাণ্ড সংকোচন করে, সরকারি দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে, সরকারি সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে এবং দায়বদ্ধতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করতে হবে। দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি এবং তা নিরপেক্ষভাবে প্রদানের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে নিতে হবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উচ্চ পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সাথে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে নজর দিতে হবে। একটি সমন্বিত সঠিক বিনিয়োগ নীতিমালা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করতে হবে।

১০. সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সমাজ জীবনে যৌগিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক জীবনে সুযোগের সৃষ্টি ও ন্যূনতম সমতার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তির প্রসার এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য যে গোষ্ঠী, দল ও সংগঠনের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের প্রয়োজন।

১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্ট বস্তুতই বাংলাদেশের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করে বসে। এই দিনের অভ্যুত্থান ছিল একটি সুপরিকল্পিত প্রতিবিপ্লব, পরাজিত শক্তির উত্থানের প্রথম পদক্ষেপ। বাংলাদেশ যে আদর্শের প্রতীক,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নে আন্দোলিত তারই প্রত্যাখ্যান ছিল এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য। আজ তিরিশ বছরের মাথায় সেই হুমকিটি ভয়ঙ্কর আকারে প্রতিভাত হচ্ছে। তবে শত বাধা-বিপত্তি ও অত্যাচার-নির্যাতনও এ জাতিরাষ্ট্রের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা এবং তার মজ্জাগত মূল্যবোধকে এখনো উৎখাত করতে পারেনি। তবে এবার আঘাতটিকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত কার্যক্রম এবং বৃহত্তম ঐক্য। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমরা ব্যর্থ হতে দিবো না—জাতির পিতার শাহাদাত দিবসে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং সাহসী উচ্চারণ।



আবুল হাসান চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে দেশটির অভ্যন্তরীণ নীতির একাধারে সম্প্রসারিত ও সংযোজিত অংশ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এক রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটির নির্মাতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আদি স্থপতি। এজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ২৫তম অনুচ্ছেদে প্রত্যাশিতভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'The state shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter.'

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম নিয়মিত অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণেও আমাদের পররাষ্ট্রনীতির এ মূল কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত হয়েছে : 'The noble ideals enshrined in the United Nations Charter are the very ideals for which millions of our people have made the supreme sacrifice. The Bengalee nation fully commits itself to the building of a world order, in which the aspiration of all men

for peace and justice will be realised.' একইভাবে ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, 'Bangladesh will continue to strive for good neighbourly relations with all its neighbours based in the principles of peaceful co-existence, respect for sovereignty and territorial integrity and non-interference in each other's internal affairs. We will continue to support every move which seeks to promote peace in our region and in the world.' প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির এটিই হচ্ছে ভিত্তিপ্রস্তর, যাকে তিনি পৌনঃপুনিকভাবে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত উচ্চারণের মাধ্যমে জাতির পিতা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যসব স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির স্থায়ী উপাদান। বঙ্গবন্ধুর এ উচ্চারণে আমরা লর্ড পামারস্টোনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—'We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies, Our interests are eternal and perpetual.' তার বিঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বঙ্গবন্ধু নিজের প্রতিষ্ঠিত নতুন দেশটির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান এবং অসামান্য কূটনৈতিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তিনি মাত্র সোয়া দু'বছরের ব্যাপ্তিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের ১২১টি দেশের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়ক এতোগুলো দেশের সর্বাত্মক স্বীকৃতি লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হননি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক কুশলতার অন্য একটি অনন্য দিক হচ্ছে, অতীতের সমুদয় দৃষ্টান্ত ম্লান করে দিয়ে তিনি জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের পূর্বেই বাংলাদেশের জন্য এই বিশ্বসংস্থার সব বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভে সক্ষম হন। একটি বৃহৎ দেশ ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রদান করলে বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্র দপ্তরকে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বিচক্ষণ নির্দেশ প্রদান করেন, যা বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বিপুলভাবে সহায়তা করে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, জাতিসংঘের

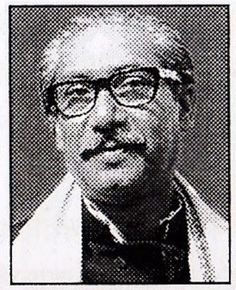
আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের পূর্বেই জেনেভা, ভিয়েনা, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভ করে। এ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে অভূতপূর্ব, যা জাতির জনকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কুশলতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে। তাই ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হওয়ার ঘটনাটিকে বিদগ্ধ বিশ্বসমাজ তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বলে গণ্য করেছেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ্য, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার পর বঙ্গবন্ধু যদিও মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, এতদসত্ত্বেও তার অনন্যসাধারণ নেতৃত্বের কারণে ১৯৭৪ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানসহ বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ, ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে, যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের অবিচল আস্থার পরিচায়ক।

ভারত ও পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কূটনৈতিক কুশলতার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্ধারিত সময়ের ১২ দিন পূর্বেই স্বদেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন। এছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে অমীসাংসিত সীমান্ত সমস্যা সমাধান, সমুদ্র সীমার নীতি-নির্ধারণ, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানসহ অন্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন, যা পরবর্তীকালে তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায় করতে সহায়তা করে। এছাড়া দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা লাভে সক্ষম হন। একই সাথে তিনি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশ সফর করেন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য

প্রণীত তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা বাংলাদেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুই প্রথম তদানীন্তন জাপান সরকারের কাছে যমুনা সেতু নির্মাণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন, যার ফলশ্রুতিতে একটি জাপানি বিশেষজ্ঞ দল ঐ সময়ে বাংলাদেশ সফর করে যমুনা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখেন। এ থেকেই জাতীয় উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া এ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে হার ছিল, তা তাঁর শাসন পরবর্তী ২১ বছরের সরকারগুলো কখনই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক কূটনীতি অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, তার শুভ সূচনা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের একজন মহানায়ক হিসেবে তিনি বাঙালি জাতিকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে আসীন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। আসলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শুধু একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই উপহার দেননি, বরং তিনি বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য আমৃত্যু ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়েছেন। এজন্য এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হাজার বছরের সংগ্রামী বাঙালির মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত জনকই নন, রবং তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দূরদর্শী স্থপতিও বটে।



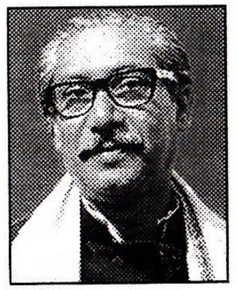
আবেদ খান

যে মানুষের মৃত্যু নেই

একজন মানুষের মৃত্যু হয় কখন? যখন সে স্মৃতি থেকে মুছে যায়। ঔপন্যাসিক থরটন-এর 'আওয়ার টাউন'-এ এর একটা চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে। প্রথমে যখন কারও মৃত্যু হয় তখন তার সবই থাকে। তার ঘড়ি, লাঠি, মাথার টুপি, ওভারকোট, কলম সবই নির্দিষ্ট জায়গায় সাজানো থাকে। যেন সবাই আছে, কেবল মানুষটি এখন এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত নেই। হয়তো যে কোনো মুহূর্তে এসে উঠবে—যেন আসলে কিছুই হয়নি। কিন্তু একদিন তার কোনো সুহৃদ আসে। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিয়ে যায় ঘড়িটা। আরেকজন নিয়ে যায় চশমা কিংবা ছবিটা। এভাবে সেই হারানো মানুষটি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারপর একসময় সে আর থাকে না, চিহ্নগুলো থাকে না। ধীরে ধীরে স্মৃতিও অবলুপ্ত হয়। তখন প্রকৃত অর্থেই সেই মানুষটির মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ যখন স্মৃতি ফুরিয়ে যায় মানুষের প্রকৃত মৃত্যুতো তখনই ঘটে।

কিন্তু কোনো কোনো মানুষ থাকে যাদের মৃত্যু থাকে না। শুধু একটি মহাপ্রয়াণ দিবস থাকে এবং সেই দিনটিই সব মানুষকে জাগিয়ে দেয়। প্রয়াত মানুষটি তখন আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠে আর সেই প্রতীকটিই তখন প্রবল হয়ে বিশাল শক্তি হয়ে বেঁচে থাকে। পনেরই আগস্ট ঠিক তেমনিই একটি দিন। এই দিনটির ভেতর দিয়ে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি নিজেদেরকে। আমরা অন্বেষণ করি চেতনার প্রতীককে। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিল তা হচ্ছে বাংলাদেশের নৈতিক অবস্থানকে বিধ্বস্ত করা। কিন্তু সেটা যে সম্ভব হয় না, বাংলাদেশের পরবর্তী

ইতিহাসই তার প্রমাণ। জার্মানিতে হিটলার যখন ক্ষমতায় এলেন এবং ফ্যাসিস্ট বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রগতিশীল মানুষের ওপর তখন এর ফরমান জারি করলেন যে, দেয়াল গাত্রে প্রগতিশীলদের কোনো স্লোগানই রাখা হবে না। তার বাহিনী দেয়ালের লেখা মুছার জন্য বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কোনো কোনো জায়গায় প্রাচীর লিখন এমন ছিল যে, সেগুলো কোনোভাবেই মোছা সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই হিটলারবাহিনী সেসব লেখা খুঁড়ে খুঁড়ে উৎপাটন করার চেষ্টা করতে থাকল। এর ফল দাঁড়ালো উল্টোটি। যেগুলো ছিল কালির লিখন সেগুলো উৎকীর্ণ হলো দেয়ালে স্থায়ীভাবে। এ থেকে একটা শিক্ষা অবশ্যই নেয়া যায়, তা হলো কোনো আদর্শকে শক্তি দিয়ে কিংবা অন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিশ্চিহ্ন করা যায়। এতে সাময়িক লাভ হয়তো হতে পারে কিন্তু স্থায়ীভাবে সাফল্য অর্জিত হয় না। যারা পেশীশক্তির ওপর নির্ভর করে তারা অন্ধ, তারা ইতিহাসের লেখা পড়তে জানে না। আর পড়তে জানে না বলেই তারা এক সময় নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। একটি বিষয়তো খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জীবিত বঙ্গবন্ধুর চাইতে প্রয়াত বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিমান হয়ে উঠছেন ক্রমাগত। এর কারণ সম্পর্কে আমরা স্মরণ করতে পারি দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের একটি অমূল্য বক্তব্য। তিনি বলেছেন, 'মানুষের সংজ্ঞা হচ্ছে মানুষের কর্মের যোগফল।' কর্মের ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ, কর্মের ভেতর দিয়েই ক্রমাগত শক্তিশালী হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস, ধারাবাহিক মুক্তিসংগ্রাম এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগঠিত উদ্ভব ও অগ্রযাত্রার ভেতর দিয়েই বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন প্রকাশিত। একে তো কোনো শক্তি দিয়ে, কোনো নৃশংসতা দিয়ে রোধ করা যাবে না, যায়নি কখনও। পনেরই আগস্টের রক্তস্রোত আসলে রক্তবীজের বংশধরদের উত্থানকেই নিশ্চিত করেছে। আজ যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আমরা যথাযথভাবে ধারণ করতে পারি আমাদের হৃদয়ে, যদি দেশপ্রেমের দীক্ষা দিতে পারি আমরা সবাই, তাহলে পনেরই আগস্ট আমাদের মুক্তির মন্ত্র হবে। দুঃশাসন কিছুকালের জন্য কিছু মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য পারে না, ঘরে ঘরে এই বিশ্বাসেরই প্রস্তুতি নেয়ার ভেতর দিয়েই বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হবেন, চিরস্মরণীয় থাকবেন।



আসাদুজ্জামান নূর

বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শুনে

তখন আমি চাকরি করতাম সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগে। আমার বস ছিলেন প্রথিতযশা কবি শহীদ কাদরী। থাকতাম জিগাতলায়। জিগাতলা থেকে খুব কাছে ধানমন্ডির অফিসে কখনো কখনো হেঁটেই চলে যেতাম। তো, প্রতিদিনের নিয়মে সেদিনও রাতে পড়াশোনা সেরে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর রাতের দিকে চেঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঝটপট ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই প্রতিবেশী কে একজন আতঙ্কের স্বরে জানালো শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

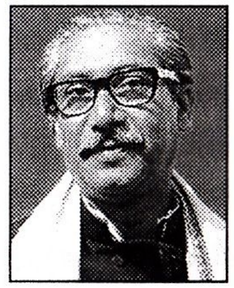
কথাটা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস হচ্ছিলও না, এ দেশের কারো পক্ষে সম্ভব না বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা। যে ব্যক্তিটির অঙ্গুলির নির্দেশে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য জোট বেঁধেছিল, যার বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে পৃথিবীর অনেক বাঘা বাঘা নেতাও ম্লান—সেই মানুষটিকে হত্যা করার একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে—বাংলাদেশকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করা। কারা হত্যা করতে পারলো এই মহান নেতাকে? স্বাভাবিক কর্মশক্তি হারিয়ে ফেললাম, মনটা কেমন নিস্পৃহ, শীতল হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন সংবাদটি কেবল শুনেছি কিন্তু কার হাতে, কীভাবে এবং কেন নিহত হয়েছে তা জানি না। জানতে চাই। তাই সকাল সকালই সেদিন বাসা থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে (জিগাতলা দিয়ে যে রোডটা মোহাম্মদপুরের দিকে চলে গেছে) এসে দাঁড়ালাম। এই কি আমার পরিচিত শহর? থমথমে একটা ভাব, নীরব বিস্তব্ধতা—কোথাও কোনো জনমানব নেই—রাস্তা একদম ফাঁকা। সম্ভবত কারফিউ চলছিল। ভাবলাম, রাস্তা পার

হয়ে গলিপথ ধরে ৩২ নম্বরের দিকে এগিয়ে যাবো, তখনই আচমকা একটি মিলিটারি গাড়ি কোথা থেকে এসে সাঁই করে বেরিয়ে গেল। আমি লুকাতে গিয়েও পারলাম না। গাড়িটা থামল এবং একজন আমাকে ধমকে উঠলেন, রাস্তায় বেরিয়েছি কেন সেজন্য। গাড়িটা চলে যেতেই, আমি রাস্তা পার হলাম। তারপর এ গলি সে গলি দিয়ে হাজির হলাম ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটার কাছাকাছি। না কোনো উপায়-ই নেই ওদিকে যাবার। মিলিটারি ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, এ দেশের প্রিয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আর, তাঁকে যদি হত্যা করা হয়েই থাকে, বিক্ষোভে কেন ফেটে পড়ছে না মানুষ? কেন তারা দলে দলে বেরিয়ে আসছে না রাজপথে? সবই কি সেই রূপকথার রাজ্যের দৈত্য-দানবের অভিশাপে পাথর হয়ে গেল! কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল সবকিছু। মাথায় কোনো চিন্তাও কাজ করছিল না।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে এটি একটি চরম ঘটনা; কিন্তু তাঁর হত্যার প্রতিবাদে কেন সেদিন এ শহরে, এ দেশে বিক্ষোভ হয়নি—সে ঘটনাকেও আমার আরো বেশি দুঃখজনক ব্যাপার মনে হয়। আশা করেছিলাম, এই অমানবিক বর্বরতার প্রতিবাদে মিছিল হবে, মিটিং হবে।

দারুণভাবে আশাহত হয়েছিলাম, কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা আটঘাট বেঁধেই নেমেছিল। এরপর থেকে আরো আশাহত হওয়ার পালা... চোখের সামনে কত কিছু অভিনীত হতে দেখলাম। মোশতাক সরকার গঠন করলো, আওয়ামী লীগের কিছু নেতাও সেই সরকারের সদস্য। ক্যু পাল্টা ক্যু শুরু হলো। ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য রাজনীতি—তথাকথিত পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে মুজিব হত্যাকারীদের যেন শাস্তি না হয়, সেজন্য পাস করা হলো ইনডেমনিটি বিল। এর চেয়ে অবমাননাকর ঘটনা আর কী হতে পারে!



আহমদ ছফা

তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। এ সত্য যারা অস্বীকার করবে, তাদের সাথে কোনো রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হবো না। একটি জাতি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে যে সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবকে দিতে হবে। আবার একই সাথে এ জাতির বিকাশ এবং আত্মপ্রকাশের পথে যে মেঘ-কুয়াশা সঞ্চিত হয়েছে—যার ফলে জাতির টিকে থাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তার জন্যও আমরা কিছু হলেও শেখ মুজিবকে দায়ী করবো।

বস্তুত, শেখ মুজিব সমালোচনার ঊর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি নন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাবাদী কৌশল এত বেশি ক্রিয়াশালী ছিল যে, যা আখেরে তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতি নানাভাবে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। এমনকি সপরিবারে নিহত হওয়ার পরেও এসব প্রশ্ন তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে এবং হবে। একজন বড় মানুষ যখন ইতিহাসে দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেন, তাঁকে নিয়ে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর এধরনের বিতর্ক চলতে থাকে।

যদি কিংবা কিন্তু দিয়ে ইতিহাস হয় না। সত্যিকার ইতিহাস হলো যা ঘটে গেছে তার সঠিক বিবরণ। ঘটনা পবিত্র কিন্তু তার ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম এমন অচ্ছেদ্যভাবে

যুক্ত হয়ে পড়েছে, যে যত পণ্ডিত হোন না কেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিপুণতা এবং যুক্তির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে কোনো ব্যক্তি একটা থেকে আরেকটাকে পৃথক করতে পারবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ভূমিকাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে অন্য দশটা রাজনৈতিক দলের ভূমিকার সাথে অবশ্যই তুলনামূলক মানদণ্ড প্রয়োগ করে বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে শেখ মুজিবের চেয়ে প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা হয়তো ছিলেন, তাঁর চেয়ে মেধাবী রাজনৈতিক নেতারও হয়তো অভাব ছিল না, জাতির সবচেয়ে নির্যাতিত অংশের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নেতাও এ দেশে ছিলেন না, এ কথা বললে সত্য বলা হবে না।

কিন্তু একটি জাতির অন্তস্থ সত্তা প্রাণ পাতালের উত্তাপে আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করার তাগিদে বাংলার ইতিহাসের স্মরণকালের সবচেয়ে মহত্তম ও ব্যাপক জনযুদ্ধটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তার বেগ-আবেগ সবটুকু ধারণ করেছিলেন, পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছু উর্বরা উপাদান ছিল, যা শেখ মুজিবকে এ জাতির স্রষ্টা হতে সহায়তা করেছিল। ঘটনা এবং সময়ের উত্তাপের মধ্যে আশ্চর্য সারবান কিছু উপাদান ছিল, এই মানুষটির মধ্যে সেসব ধারণ করার একটা ক্ষমতা ছিল। একটা পচা ডিমকে ইনকিউবেটর যন্ত্রের মধ্যে রাখলে কোনো বাচ্চা হবে না, আবার তেমনি একটি তাজা ডিমকে ঐ যন্ত্রের মধ্যে রাখলে একটা বাচ্চা তৈরি হতে পারে। তা না করে ডিমটিকে এমনি রেখে দিলে সময়ের ব্যবধানে আপন আপনি পচে যাবে। সুতরাং ১৯৬৫ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটা মৌলিক উপাদান বিরাজমান ছিল। আন্দোলনের নানা স্তর এবং সংগ্রামের নানা ধাপ পেরিয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তা একটি সলিড আকার ধারণ করেছিল। ঐ মৌলিক উপাদানটি হলো বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দাবি। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন এবং কর্মের যত কঠোর সমালোচনাই করা হোক না কেন তিনি যে এ সংগ্রামটি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবাহিত করে নিয়েছিলেন সেটা একটা তর্কাতীত সত্য।

একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটা রাজনৈতিক মিশনকে হত্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে কিন্তু আদর্শের মরণ নেই। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী বাংলাদেশে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল? তখন আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে বড় দল, তাছাড়া সহায়ক শক্তি ছিল ন্যাপ এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি। এছাড়াও

ছিল অনেক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী। সেদিন একটি কণ্ঠও এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেনি। পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত রাষ্ট্রাদর্শটি সম্পূর্ণভাবে অকেজো ঘোষণা করে নতুন একটি রাষ্ট্রদর্শন এখানে চাপিয়ে দেয়া হয়, যা আমাদের জনগণের অধিকাংশের কখনো কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, শেখ মুজিবুব রহমানের অনুগত ভক্ত এবং রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ এ প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত হয়েছিল। এ কথাও সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর যে ব্যক্তিটি ক্ষমতার আসনে আসীন হয়েছিলেন তিনি তাঁর বিরোধী বা বিপক্ষ দলের কেউ নন। তাঁরই মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী। এভাবে ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শটি নস্যাৎ করার কাজে তাঁর দল বুঝে না বুঝে যে ভূমিকা পালন করেছিল এবং করে যাচ্ছে তার তুলনায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ভূমিকা বোধ করি বেশি নয়। কারণ স্বাধীনতার-বিরোধী শক্তি তো ঐ আদর্শের বিরোধিতা আগাগোড়াই করে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একবার আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয় এবং জাসদের সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের পর আবার আওয়ামী লীগ ভাঙে এবং মিজান আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। তারপরে আবার আওয়ামী লীগ দু'টুকরো হয় এবং আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশালের সৃষ্টি হয়। এখন শোনা যাচ্ছে আবার আওয়ামী লীগ ভাঙবে এবং ব্যারিস্টার কামাল হোসেনসহ কতিপয় নেতা বেরিয়ে নতুন দল করবেন। ১৯৭২ সাল থেকে নেতা এবং কর্মী বেরিয়ে এসে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলোর হাত সুদৃঢ় করেছে। রব, মিজান, মোয়াজ্জেম, ইউসুফ আলী, কোরবান আলী সকলের সম্পর্কে এ কথা কম-বেশি প্রযোজ্য। এখনো আওয়ামী লীগ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন, কিন্তু কিছু করতে পারছে না। তার বিবেক একধরনের অপরাধ বোধের ভারে জর্জরিত।

আমরা বলেছি ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে রাজনৈতিক আদর্শের মৃত্যু ঘটেনি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে ভবিষ্যতই বলতে পারে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর বারো/তেরো বছর সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিজয়ী হতে পারেনি এবং সেই কারণে তার মরদেহের অবশিষ্টাংশ টুঙ্গিপাড়ায় আটকা পড়ে আছে, রাজনীতির কেন্দ্রে আসতে পারেনি। এখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। তিনি দেশ এবং জাতিকে জাগিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনো পরিণতির দিকে দিকনির্দেশ করতে

পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দলও সে আদর্শটিকে সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তুলে স্বাধীনতার অঙ্গীকারসমূহ বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের পরাজয়। কেন এ পরাজয়, কি কারণে এ পরাজয় বিস্তৃত করে বলার অবকাশ এ নিবন্ধে নেই। তথাপি শেখ মুজিবুব রহমান এ জাতির মহান স্থপতি এবং একজন মহান পুরুষ। সব দোষত্রুটি, রাজনৈতিক প্রমাদ ও সীমাবদ্ধতাসহ বিচার করলেও তিনি অনন্য। শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান।

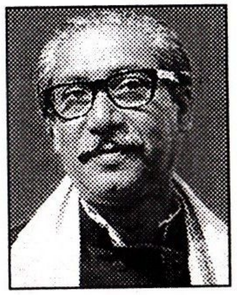
কোনো কোনো মহল শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা দিবস ১৫ আগস্টকে জাতির নাজাত অর্থাৎ মুক্তি দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। শেখ মুজিবের হত্যাকারীরা যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকে তারা শেখ মুজিবকে হত্যা করে একজন স্বৈরাচারীর হাত থেকে এ জাতিকে উদ্ধার করেছে। দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীও তাতে সমর্থন দিয়ে থাকেন।

এখানে কাল মার্কসের একটা কথা আমরা উদ্ধৃত না করে পারছি না। 'কোনো ডাকাত সর্দার কোনো সুযোগে রাজাকে হত্যা করে রানীর শয়ন কক্ষে ঢুকে রাত্রি যাপন করতে পারে। তাতে করে ঐ ডাকাত সর্দারের ওপর রাজ্য শাসনের অধিকার বর্তায় না।' ১৫ আগস্টের শেখ মুজিব হত্যাকারীদের যুক্তিও অনেকটা ঐ কথিত ডাকাত সর্দারের অনুরূপ। শেখ মুজিব যদি জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করতেন জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতিবাদ করতো। জাতিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার নিশ্চয়ই সে আততায়ীদের নেই এবং ছিল না। আরো একটা মানদণ্ড প্রয়োগ করি আমরা, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাটি ভুলে গেলেও চলবে না, শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করতে হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বাংলাদেশের রাষ্ট্রদর্শনের রূপকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে, জনগণের মধ্যে কোনো উত্থান শক্তি নেই, স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধগুলো একে একে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। জনজীবন ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে দিয়ে এমন একটা বিপরীত মেরুতে ঠেলে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে উদ্ধারের আশা একেবারে অসম্ভব না হলেও সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত এসব সীমাবদ্ধতা, সব দুর্বলতা, সব ভ্রান্তি সত্ত্বেও হৃদয়ের উত্থান এবং ভালোবাসার গুণে এ মানুষটি বাঙালির জাতির আত্মবিকাশের সংগ্রামের পথে

যেসব শক্ত বাধা দিয়ে এসেছিল সেসব শক্তি আজ কাপালিক উল্লাসে এখানে একটি নতুন পাকিস্তান সৃষ্টি করার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা তাদের কাছে মুক্তি দিবস হতে পারে, কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে নয়। বাংলার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষ শেখ মুজিবকে এ জাতির মহান স্রষ্টা হিসেবে জ্ঞান করবে। দিনের পর দিন যাবে জনগণের অন্তর্লালিত এ শ্রদ্ধা ঘনীভূত হয়ে বিকশিত সেনোর রূপ ধারণ করবে। হৃদয়ে চেপে বসবেন, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আজ থেকে অনেক অনেক দিন পরে হয়তো কোনো পিতা তার শিশুপুত্রকে বলবেন জানো, খোকা! আমাদের দেশে একজন মানুষ জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁর দৃঢ়তা ছিল, তেজ ছিল আর ছিল অসংখ্য দুর্বলতা। কিন্তু মানুষটির হৃদয় ছিল, ভালোবাসতে জানতো। দিবসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে যে বস্তু চিকচিক করে জ্বলে তা হলো মানুষটির সাহস। আর জোৎস্না রাতে রূপালি কিরণ ধারায় মায়ের স্নেহের মতো যে বস্তু আমাদের অন্তরে শান্তি এবং নিশ্চয়তার বোধ জাগিয়ে তোলে তা হলো তার ভালোবাসা। জানো খোকা, তার নাম? শেখ মুজিবুর রহমান।



আহমাদ মাযহার

শেখ মুজিব : জীবনের দুই পর্বে

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে শেখ মুজিবের আবির্ভাব এমন একটা সময়ে যখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সমাজের সামন্ত বা ধনী অংশের প্রতিনিধিত্বের পর্ব অতিক্রম করে মধ্যবিত্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব শুরু হয়ে গেছে। ততদিনে বাংলার রাজনীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ রাজনীতিবিদ। তরুণ রাজনীতিক হিসেবে শেখ মুজিব ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। সুতরাং বলা চলে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বলয়ে তাঁর বিকাশ। কালক্রমে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক যোগ্যতা, বাগ্মিতা, দুঃসাহস, অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও অনমনীয় থাকা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এই রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক-মানুষ। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন শত্রুর কারাগারে বন্দি। তা সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন মুক্তিকামী বাঙালি জাতির নেতা। একটা সময় এমন হয়েছিল যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ভাবমূর্তি এত উঁচুতে উঠেছিল যে, অধিকাংশ বাঙালি মনে করত তিনিই সকল মুশকিল আসানের ক্ষমতাধারী। সে সময় তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো কেবল স্তুতিবাক্য। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল ঘূর্ণ্যাবর্তে মানুষ শেখ মুজিব সর্বার্থে সফল হতে পারেননি। মানুষের প্রত্যাশা যতটা দ্রুত চূড়ায় উঠেছিল হতাশাও মাটিতে

নেমে আসছিল ততটাই দ্রুত। কিন্তু অতি প্রত্যাশা বা অতি হতাশা কোনোটাই প্রকৃত বাস্তবের অনুকূল নয়। সব ক্ষেত্রেই মহৎ মানুষেরা উত্তর কালে বিবেচিত হয়েছেন বাস্তবতার নিরিখে। শেখ মুজিবের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম হবে না।

১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি এবং এর কাছাকাছি সময়ে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল সবচেয়ে উচ্চে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন তাঁকে হত্যা করা হয় তার কাছাকাছি সময়ে তাঁর ভাবমূর্তি নিচের দিকে নেমে এসেছিল। এর কারণ অনেকটাই ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি। বেশকিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা তাঁর ছিল। পাকিস্তানপন্থী ও বামপন্থী উভয় ধারার বিরুদ্ধবাদী প্রচারণা ছিল প্রবল। মৃত্যুর অব্যবহিত-উত্তর কালে স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী অধিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রক্ষমতায়। তাদের দ্বারা সৃষ্ট গুজবের মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমে তাদের একচেটিয়া বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণায় ভাবমূর্তির এই পতন ঘটতে পেরেছিল।

পরাধীন দেশে দূরদৃষ্টি ও সাফল্যজনক সাংগঠনিকতার ফলে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ক্রমশ স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। পরিণতিতে বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীন দেশ। সে হিসেবে তাঁর জীবনের সাফল্যের এই অধ্যায়কে বিজয়ের পর্ব হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বাধীনতাউত্তর কালে নির্মম ভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর নেয়া কৌশলগত ও সাংগঠনিক অধিকাংশ পদক্ষেপকে হয় পরিত্যাগ করা হয়েছে না হয় করা হয়েছে বিকৃত। এই যে তাঁর গৃহিত কর্ম পরিকল্পনা নিজের দ্বারা নির্দেশিত পথে চলতে পারেনি এটা তাঁরই ব্যর্থতা। সুতরাং তাঁর জীবনের এ পর্বকে ব্যর্থ পর্ব বা পরাজয়ের অধ্যায় বলে অভিহিত করা যায়। এ ব্যর্থতার ফলে তাঁর মৃত্যুত্তর বাংলাদেশ যে নতুন এক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, নতুন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো উত্তরকালে তাঁর হাতে কতটা সাফল্য পেত বা কতটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো তা বিচার করে দেখবার পর্যাপ্ত সুযোগ বাংলাদেশের মানুষ পায়নি।

মানতেই হবে যে শেখ মুজিবের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের দুটি পর্বই ছিল চরম ভাবে সংগ্রামসঙ্কুল। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য তাঁর জীবনের বিজয়ী ও পরাজিত—এই দুই সংগ্রামশীল পর্বকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এ বিচারকে হতে হবে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ। বাংলাদেশের

ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর জীবন যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থের সঙ্গেও। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থে তাঁর জীবনকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না—এই সত্য না মেনে উপায় নেই। সে কারণে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক বই, ভবিষ্যতে আরও হবে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বাঙালির সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের অবদান যতটুকু তুলনায় বিশ্বব্যাপী বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের অবদান তারও চেয়ে বেশি। দীর্ঘকালব্যাপী নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান বিবিসির বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের মধ্যে পরিচালিত জরিপেও তাঁর নাম শীর্ষদেশে থাকার মধ্য দিয়ে এই সত্যটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

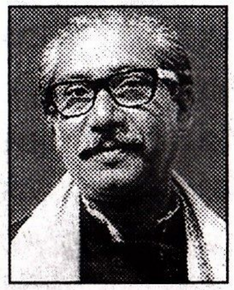
মুক্তিযুদ্ধের আগের পাকিস্তানি আমলের ২৪ বছর ধরে তাঁর রাজনীতিক সত্তার বিকাশ। তবে সমকালীন প্রবীণতর নেতাদের ছাড়িয়ে শেখ মুজিবের নাম শীর্ষে আসে ষাটের দশকে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর থেকে। তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সত্যিকার ভাবে নাড়া দিতে পেরেছিলেন ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৩ সালের দিকে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে। কিন্তু প্রবীণ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, নুরুল আমিন প্রমুখ প্রবীণ নেতা রাজনৈতিক দলসমূহের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ছিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল ফ্রন্ট ভেঙে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষতি হবে। শেখ মুজিবের নেতা সোহরাওয়ার্দীও এ মত পোষণ করতেন। শেখ মুজিব তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এমনকী লন্ডনে চিকিৎসারত নেতাকে বোঝানোর জন্য তিনি লন্ডন পর্যন্ত যান। সোহরাওয়ার্দী রাজি না হলে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করলে এনডিএফ-এর নেতৃত্বে সংকট দেখা দেয়। তখন ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিব মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের বাড়িতে অনুষ্ঠেয় সভায় আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ তাঁদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপও পুনরুজ্জীবিত করেন। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে দলীয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের শীর্ষ অবস্থান সংহত হয়। দলের পুনরুজ্জীবন সমর্থন করেননি বলে আতাউর রহমান খান

পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। এর পর থেকে শেখ মুজিব সমগ্র বাংলাদেশ সফর করেন। দলকে সংহত করেন। আনাচে-কানাচে দেশের মানুষের মনোভাবের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। নিজের ভাবনা দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সকল মানুষকে তিনি স্মৃতিতে নিয়ে নেন। সেই সময়ই প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয় নেতা হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার পটভূমিও তখনই গড়ে ওঠে। ছয়দফা ঘোষণা হয়ে গেলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তা হজম করা ছিল অসম্ভব। ছয় দফা নিয়ে নানা অপপ্রচারের আশ্রয় নেয় পাকিস্তান সরকার। কিন্তু শেখ মুজিব তো পিছপা হলেনই না উল্টো মানুষের কাছে ছয়দফার দাবিকে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। বলা যায় এই ছয় দফাই তাঁকে অন্যান্য জাতীয় নেতা থেকে, যথা: মওলানা ভাসানী বা আতাউর রহমান খান প্রমুখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যায়। তার পরে তাঁর ওপর নেমে এল আইয়ুব শাহী নির্যাতন। তাঁকে অভিযুক্ত করা হলো ষড়যন্ত্রমূলক মামলায়। কিন্তু এতেও তাঁর ভাবমূর্তি কমল না বরং বাড়ল। ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি একের পর এক এমনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে থাকলেন যে, তিনি হয়ে উঠলেন অবিসংবাদিত নেতা। '৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মনে করেন ঐসময় তাঁর উচিত ছিল পালিয়ে যাওয়া ও সরাসরি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া। যাঁরা এমনটি মনে করেন তাঁরা লক্ষ করেন না যে, যদি শেখ মুজিব ভারতে আশ্রয় নিতেন তাহলে বাধ্য হতেন ভারতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে। তাঁকেও মওলানা ভাসানী বা মণি সিংহ বা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের মতো প্রায় বন্দি জীবন কাটাতে হতো। শত্রুর কারাগারে থাকায় তিনি পরিণত হয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রতীকে। আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ভারত সরকারকে তাঁর মুক্তি দাবি করতে হয়েছে। দেশের মানুষের মধ্যেও জেগে উঠেছে অনমনীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত পরিপক্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধশেষে মুক্তির ঠিক আগে তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গোছের একটা সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য। তখনও স্পষ্টভাবে তাঁর জানা ছিল না দেশ স্বাধীন হয়েছে কী না। তিনি বলেছিলেন জনগণের সঙ্গে কথা না বলে তিনি কোনো আলোচনায় যেতে রাজি

নন। এক্ষেত্রেও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে। মুক্ত মুজিবকে নিয়ে বিমান উড্ডীন হলে তিনি কোথায় যেতে চান তা জানতে চাওয়া হয়। তিনি দিল্লি না গিয়ে তৃতীয় নিরপেক্ষ স্থান লন্ডনে যেতে চান। দেশে ফেরার পথে তিনি দিল্লিতে যাত্রাবিরতি কালে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে উপহার হিসেবে কী পেলে তিনি খুশি হবেন জানতে চাইলে শেখ মুজিব বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার চান। এই ঘটনাটিকে শুধু দূরদর্শিতা বললে কম বলা হবে। কারণ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এটিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর সংবিধান রচনায় বিলম্ব ঘটবার কারণে নানা সাংবিধানিক সংকটে পড়েছিল পাকিস্তান। শেখ মুজিব সে-কথা ভোলেননি বলেই দ্রুত সংবিধান প্রণয়নে যত্নবান হয়েছিলেন। ড. কামাল হোসেনকে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সংবিধান-বিশেষজ্ঞতার কারণে। তাঁর এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও দূরদর্শী রাজনীতিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু তাঁর নেয়া আরও অনেক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময় তাঁকে দেয়া হয়নি। কিন্তু ব্যর্থতার দায় চাপানো হয়েছে। তাঁর যেসব পদক্ষেপ ভুল বলে অনেকের মনে হয় সে-সবের তিনি কী কী অদল-বদল করতেন তাও আজ আর কারও জানার উপায় নেই।

এ-সব কিছু বিবেচনায় তাঁর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন জরুরি। এখনও তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন হয়নি, এখনও তাঁর মৃত্যুর অভিঘাত মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি, এখনও তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায় বা ক্ষমতার আশেপাশেই থাকছে। ফলে তাঁর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এখনও অনেক দুরূহ কাজ। তবু আমরা নিশ্চয়ই এ কথাও বলতে পারি যে, তাঁর কর্মময় জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার নির্মোহ মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্ব এখনই শুরু হয়ে গেছে বা আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমাদের শুধু লক্ষ রাখা উচিত তাঁর জীবনী রচনার কোনো প্রামাণ্য উপাদান অসাবধানতাবশত হাতছাড়া হয়ে না যায়।



ইসহাক কাজল

আমাদের বঙ্গবন্ধু

রাষ্ট্রনেতার ক্ষেত্রে 'আমাদের নেতা' অভিধায় একক নেতার অস্তিত্ব বড় বিরল। কোনো কোনো জাতি অতি সৌভাগ্যক্রমে সেই ধরনের একজন নেতাকে পেয়ে যান। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নেতার সংখ্যা হাতেগোনা। বাঙালির সৌভাগ্য সেই হাতেগোনা নেতাদেরই একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাঁকে অক্লেশে আমাদের বঙ্গবন্ধু বলা যায়।

বঙ্গবন্ধু কিভাবে আমাদের হয়ে উঠলেন? তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল। আরো অনেক রাজনৈতিক দলের একটি। এবং আওয়ামী লীগে আরো অনেক নেতাও ছিলেন। মেধায়-প্রজ্ঞায় তাদের কাউকেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। তবুও সবাইকে ছাপিয়ে কেন বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন গোটা একটি জাতির একক নেতা; কী সেই গোপন রহস্য, কী সেই যাদু? হ্যাঁ, যাদুই বটে। একাত্তর কিংবা তার আগের সময়কাল যারা দেখেছেন তারা এক বাক্যে মানবেন, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল যাদুকরের মতো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুকরও তাঁর যাদুর কাছে নস্যি হয়েছিলেন। রূপকথার সেই হ্যামেলিনের বংশীবাদক যেন বঙ্গবন্ধুতে এসে প্রাণ খুঁজে পায়। বঙ্গবন্ধু বাঁশি বাজালেন, সেই বাঁশির সুর শুনে, মাঠ থেকে কৃষক, নদী থেকে জেলে, কলেজ থেকে ছাত্র, ঘর থেকে পুত্র, অফিস থেকে চাকরিজীবী পথে নামলেন। সাত কোটি মানুষ শামিল হলো এক কাতারে। তারা ভুলে গেল প্রতিপক্ষ ভীষণ শক্তিধর। তারা ভুলে গেল, কেবল সাহস ছাড়া অন্য কোনো রসদ তাদের নেই। সাহস দিয়েই কি দাঁড়ানো যায় মেশিনগানের বিপরীতে? শুধু সাহসকে সঙ্গী করে এখন যদি কেউ মেশিনগানের সামনে বুক চিতিয়ে

দাঁড়ান, আমরা তাকে অবশ্যই বোকা বলে ব্যঙ্গ করব। অথচ কী অনায়াসেই না একাত্তরের সেই পেক্ষাপট পাল্টে গিয়েছিল। ট্যাংক, মেশিনগানের বিপরীতে মানুষ কী অসীম সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেটাকে মোটেও বোকামি বলে বোধ হলো না, মনে হলো সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটাই। মানুষের এমন সাহসে ভড়কে গেল মারণাস্ত্র। অস্ত্রের প্রতিপক্ষ সাহস এবং সাহসের কাছে অস্ত্রের পরাজয়। এমন আশ্চর্য ব্যাপার একাত্তরেই কেবল সম্ভবপর হয়েছিল, আর সেটিকে বাস্তব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি না থাকলে আমাদের এমন ক্ষেপাটে সাহসী হওয়ার সুযোগ ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর এমন আশ্চর্য ক্ষমতার নেপথ্যে কী ছিল? একটু আগে তাঁকে যাদুকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে তিনি তারও অধিক কিছু ছিলেন। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা বললেই বঙ্গবন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় না, তিনি তার চাইতেও বড় মাপের। বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বঙ্গবন্ধু' হয়ে উঠার পেছনে ছিল তার অসাধারণ সম্মোহনী ক্ষমতা। তিনি গোটা জাতির নাড়ির স্পন্দন টের পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত চিকিৎসক। জাতির নাড়ির যন্ত্রণা তাঁর মতো করে এত ভালোভাবে পৃথিবীর সেরা স্নায়ুবিদের পক্ষেও ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। এই যে নাড়ির স্পন্দন বুঝতে পারা, এটাই বঙ্গবন্ধুকে আমাদের বঙ্গবন্ধুতে পরিণত করেছিল। একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সাত কোটি মানুষের একক কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলেছিলেন, সেটি সাত কোটি মানুষের ভাষা হয়েছে। তাতে দ্বিমত করার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি (এই বাক্য শুনে অনেকেই স্বাধীনতাবিরোধীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবেন, তবে খেয়াল করলে দেখবেন এখানে কেবলই 'মানুষের' কথা বলা হচ্ছে)।

বঙ্গবন্ধু যখন এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, তখন স্বয়ং মওলানা ভাসানীও বেঁচে ছিলেন। তবে কথা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু সেই সময়ে একক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। কেউ যদি একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন তবে তিনি সর্বগ্রাসীও হয়ে ওঠেন। বিস্ময়কর রকমভাবে বঙ্গবন্ধু এই দোষে দুষ্ট হননি। তাঁর সময়েই কিন্তু তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় নেতার ঠিকই আলো ছড়িয়েছেন। এমনকি তরুণ নেতৃত্বও যথারীতি বিকশিত হয়েছিল। চার খলিফা হিসেবে খ্যাত আবুল কুদ্দুস মাখন, আ স ম রব, নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন সফলতম। তাদের এই সফলতার পেছনে

একটিই কারণ বিদ্যমান। তারা বলতেন, 'আমরা কথা বলছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে।' এই একটি কথাই স্বাধীনতার আন্দোলনে তাদেরও অমরতা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই তরুণ নেতাদের বিকাশে বাধা দেননি। বঙ্গবন্ধু কারো বিকাশেই বাধা দেননি। সবাই সবার অবস্থান থেকে একাত্তরে কাজ করেছেন। তাদের মাথায় ছাতা হয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। সেই সময়ে গোটা জাতির উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা এমনও ভাবতে লাগলেন, যদি বঙ্গবন্ধুর কিছু হয়ে যায়, তাহলে স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে? এক্ষেত্রে ঐসব মুক্তিযোদ্ধার ভাবনায় স্বাধীনতার সমার্থক শব্দে পরিণত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা যুদ্ধদিনের গল্প বঙ্গবন্ধুর জন্য তুলে রাখলেন। যদি এই কথাটি কোনোদিন তারা বঙ্গবন্ধুকে বলার সুযোগ না পেতেন, সম্ভবত তাদের মুক্তিযুদ্ধ অপূর্ণ থেকে যেত। সেই সময়ে যখন পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশায় বঙ্গবন্ধু, তখন একজন সাধারণ পিতা যদ্ধে যাওয়া তার সন্তানের চাইতে বেশি চিন্তিত থেকেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর খবর শোনার জন্য সাত কোটি মানুষের হাপিত্যেশ সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল একটি ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু মুজিব ছিলেন এককভাবে অগ্রসরমান। একটি মুজিবের জন্যই একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা। এ সব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানেই অতুলনীয় এবং তুলনাহীন। যেন আপন দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। এককথায় শতাব্দীর মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। হঠাৎ করে অবৈধভাবে ক্ষমতা জবরদখল করে টাকা-আনা-পাই এর মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের আসনে বসেননি। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জনগণের সুখ-দুঃখের সাথে একাকার হয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রামে অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করে জনগণের নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু তথা জাতির জনকের মর্যাদা লাভ করেছেন। মানুষের কথা বলতে গিয়ে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে লৌহ-কপাটের অন্তরালে। লোভ, লালসা, ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন,

'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধুর সে সাহসী উচ্চারণ বৃথা যায়নি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন আর ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ। এই সময়কালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন লড়াই সংগ্রাম তথা স্বাধিকারের প্রধান প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু আর জয় বাংলা এই দুটি শব্দ হয়ে ওঠে সাহসের হাতিয়ার। এই সময় নেতা ছিলেন অনেক, কিন্তু তারা ছিলেন নেতৃত্বহীন। বাংলার মানুষ তখন আর কারো কথা শুনতে রাজি নয়। জনতার জোয়ার তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বের দিকে। অন্য কোনো দিকে চোখ ফেরাবার সময় তখন জনতার নেই। আর এই গণজাগরণের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরি হও। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। জয় বাংলা।' বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা বাঙালি জাতির মধ্যে বাঁধভাঙা জোয়ারের সৃষ্টি করে। কোটি কোটি কণ্ঠ থেকে ঐকতানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' এই সময় যারা পাক সরকারের অধীনে চাকরি করছিলেন, তারা নীরবে দৃশ্যপট যাচাই করে দেখছিলেন। তাদের মনে তখন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল 'যদি হারিয়ে যাই' তখন কি হবে। দেশে জনতার লড়াই চলছে, পাক বর্বর বাহিনীর হাতে মানুষ প্রাণ দিচ্ছেন তখন সুযোগ আলীর দল নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, 'দেখি কি হয়' অপেক্ষায় ছিল। ২৬ মার্চ পর্যন্ত যে জিয়া জনতার এই আপসহীন আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণা পাঠ করার সুযোগ পাওয়ায় তাকে হিরো বানানোর কাল্পনিক প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। যারা এই অবান্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা একটি অমোঘ সত্য স্বীকার করতে রাজি নয় যে, জোর করে ক্ষমতা জবরদখল করা যায়, কিন্তু জনগণের মন জয় করা যায় না। মনগড়া ইতিহাস একদিন নির্বাসনে যায়। কেননা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

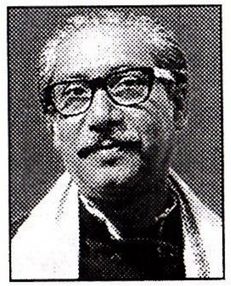
দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ লড়াই করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই চরম সময়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে তাঁর নামে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে কারো নাম সেখানে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কেননা রণাঙ্গন থেকে সর্বক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা আর লড়াইয়ের হাতিয়ার। সেখানে অন্য কারো অংশীদারিত্ব ছিল না। বিশ্বজনতার চাপ আর বাঙালি জাতির সাহসী প্রত্যাশার কাছে ভুট্টো, ইয়াহিয়া,

গোলাম আজম, নিজামী চক্রকে হার মানতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ীর অহঙ্কার নিয়ে স্বদেশে আপন জনতার মাঝে ফিরে আসেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে বাংলা আর বাঙালির ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। স্বজন হারানোর ব্যথাকে ভুলে গিয়ে মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। শেখ মুজিবের নামে বাংলা ও বাংলার মানুষ, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। আজো সে দিনের স্মৃতি মনে হলে সাহস বেড়ে যায়। ঘাতক নির্মূলের এরূপ একটি দিনের জন্য এখানে প্রহর গুনছি।

বঙ্গবন্ধু অবশ্যই রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি রাজনীতির মানুষ চিরকাল রাজনীতি করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের সীমাবদ্ধতা থাকে। তাকে নিজের দলের স্বার্থ দেখতে হয়। আওয়ামী লীগের স্বার্থ এবং সাত কোটি মানুষের স্বার্থ এক ছিল না। ফলে এক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে তাই দুই পক্ষ থেকেই অপবাদ উঠার সুযোগ ছিল, দলের কর্মীরা বলতে পারতেন, তিনি দলের চাইতে দলের বাইরের মানুষের মতামতকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন, সাধারণ মানুষ বলতে পারতেন, বঙ্গবন্ধু তার দলের স্বার্থ দেখছেন। কিন্তু কোনো পক্ষই এ কথাটি বলার সাহস পাননি, অথবা বঙ্গবন্ধু কাউকেই এই সুযোগও দেননি। এটি করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ কৌশলী হতে হয়নি। তাঁকে যা করতে হয়েছে, সেটি হলো নিজের স্পষ্ট অবস্থান স্থির করা। বলতে গেলে তার কারণেই আওয়ামী লীগ পরিণত হলো গণমানুষের সংগঠনে। আর যখন সেটি গণমানুষের সংগঠনে রূপ পায় তখন দলের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থ এক হতে বিলম্ব ঘটেনি।

এ সবকিছুই সম্ভব হয়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানুষকে এতটাই মুগ্ধ করে রেখেছিল, যে এমন কি বঙ্গবন্ধু তিনি নিজের গায়ে হাতাকাটা যে কোট চাপাতেন, সেটিও স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রতীকী পোশাকে পরিণত হলো। আজ এতদিন পরও মুজিব কোটের জনপ্রিয়তায় ঘাটতি আসেনি।

সবমিলিয়ে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মকরণেই 'আমাদের বঙ্গবন্ধু'। একটা জাতি একবারই পায় তাকে, তারপর আর পায় না কিছুতেই।



এ বি এম মূসা

আমার যত ভাবনা

মাসখানেক আগে বিবিসি থেকে আমার একটি সাক্ষাৎকার চেয়েছিল। বিষয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হবে। তখনও জানতাম না ইতোপূর্বে বিবিসি একটি শ্রোতা জরিপ করেছে। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালি কে তা নির্ধারণ করা। জানতে পারলাম, সারা বিশ্বে ছড়ানো-ছিটানো সব দেশের নাগরিক বাঙালিদের তথা বাংলাভাষীদের বলা হয়েছিল পাঁচটি নাম পাঠাতে হবে। কমও নয় বেশিও নয়। ক্রমানুসারে সাজিয়ে নাম পাঠাতে হবে। এক থেকে বিশ পর্যায়ক্রমে সাজানো নামের গ্রেডিং পদ্ধতিতে নম্বর দিয়ে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শেষ থেকে শুরু হবে ২০তম ব্যক্তির নাম দিয়ে। পহেলা বৈশাখে প্রথম ব্যক্তিটির নাম সবাই জানবেন। বলা বাহুল্য, এটি বিবিসির বিশেষ কোনো নাম নির্ণয় পদ্ধতি অথবা নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ছিল না, স্রেফ শ্রোতা জরিপ। সোহরাওয়ার্দী দিয়ে শুরু করা হলো, সঙ্গে আমার একটি পর্যবেক্ষণ প্রচার করা হয়েছিল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এমনিভাবে কারো না কারো বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য জুড়ে দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমাকে শেরেবাংলা সম্পর্কেও বলতে বলা হয়েছে। উভয়ের সম্পর্কে যা বলেছি শ্রোতারা শুনেছেন, তাই পুনরুক্তি করলাম না। তবে যিনি আমার সাক্ষাৎকার নিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এক নম্বরে কে আসবে জানেন? তিনি জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। কারণ তিনি নিজেই জানেন না। তবুও আমি বললাম, খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শেখ মুজিবুর রহমান।

আমার প্রশ্নের জবাব ইতোমধ্যে দেয়া হয়ে গেছে, সবাই জানেন। তবে এর মাঝেও একটি অবাক করা ব্যাপার রয়েছে। বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মুস্তাফা চ্যানেল আইতে সাক্ষাৎকারে একটি চমৎকার তথ্য দিলেন। জরিপে প্রথম স্থান অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাপ্ত পয়েন্টের সংখ্যা ছিল দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিগুণ। এছাড়া এ জরিপ নিয়ে আরও মজার কাহিনী শুনেছি, বলা যায় জানতে পেরেছি। কেননা কথাটি সঠিক কি-না জানি না, সোহরাওয়ার্দী এক পয়েন্ট কম পেলেই কাদের সিদ্দিকীকে নাকি ২০তম স্থান ছেড়ে দিতে হতো। আরও জানলাম অনেক শ্রোতা গোলাম আযমের নাম তাদের পাঁচজনের লিস্টিতে ঢুকিয়েছেন এবং এ কাজটি হালাল করার জন্য তারাও এক নম্বরে বঙ্গবন্ধুর নামটি রেখেছিলেন। গোলাম আযমের অনুসারীরা যে কতখানি সংগঠিত ও প্রসারী চিন্তার অধিকারী তা জানা ছিল। কিন্তু এত চালাক আর ধুরন্ধর তা জানতাম না। তবে তাদের এতদিন পরে পাকিস্তানি থেকে বাঙালি হওয়ার সাধটি কৌতূহলোদ্দীপক বটে। আবার সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে আলোচনার সময়েই জেনেছি ১৯তম স্থানে জিয়াউর রহমান। তাৎক্ষণিক একটি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছিলাম। কেন সেই ভাবনা তা পরে ব্যাখ্যা করব। বঙ্গবন্ধুর নাম শীর্ষ বাঙালির তালিকায় স্থান পাওয়ায় জিয়া প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদলের উষ্মা প্রকাশের খবরটির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট।

বিবিসি জরিপের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগপন্থীদের আনন্দ প্রকাশ নিয়ে মন্তব্যটি প্রথমে স্থান দিতে চাই, তবে সরাসরি নয়। পহেলা বৈশাখের সকালে মেজাজ খারাপ করা একটি টেলিফোনের কথাটি দিয়েই শুরু করি। অগ্রজপ্রতিম একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক টেলিফোন করলেন সকালবেলা। বললেন, বৎস! বিবিসি শুনেছ? বঙ্গবন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মন খিচড়ে গেল, ব্যঙ্গ করে বললাম, আপনি এদ্দিন পর জানতে ও বুঝতে পারলেন, আমি তো সব সময়ই জানতাম। সুপ্রতিষ্ঠিত এ সত্যটি জানতে বিবিসি জরিপের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? কিংবা তা বলার পর নিশ্চিত হতে হবে কেন? তাছাড়া গলা ফাটিয়ে চিরন্তন সত্য জানান দিতে হয় না। যা সত্য তা গলা ফাটিয়ে উদ্দাম হয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলার দরকার হয় না। কোনো জানা বিষয় সত্য কিনা-না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য বারবার বলতে হয়। বিতর্কে যেতে হয়, যুক্তি দিতে হয়, যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এমনটি হচ্ছে। এ নিয়ে জরিপের প্রয়োজন আছে। বাঙালি কী ভাবছে তা নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে। বাঙালি বা বিশ্বের সকল

বাংলাভাষী বঙ্গবন্ধুর স্থানটি কোথায় দিয়ে থাকে নতুন করে জানার বিষয় নয়, খবর হিসেবে আমি চাঞ্চল্যকর মনে করি না। আমার সাংবাদিকতার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে—যাহা অস্বাভাবিক তাহা ঘটিলেই শুধু বিষয়টি খবর হতে পারে। যেমন খবর হচ্ছে বাংলাদেশ উদারপন্থী মুসলিম দেশ। এজন্য টমাস সাহেব, বিশ্বব্যাংক বা দাতাগোষ্ঠীর সার্টিফিকেট দরকার। গুরুত্ব দিয়ে বলতে হয়, পত্রিকায় ছাপতে হয়। আরেকটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। টাইম ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধ। বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ম্যাগাজিন লিখেছে, বাংলাদেশ একটি মর্যাদাহীন অকার্যকর রাষ্ট্র। এই ছাপার খবরটিও একজন পাঠক ইন্টারনেট থেকে আগেই জেনে নিয়ে আমাকে জানালেন, একটি প্রিন্ট আউট পাঠাবেন বললেন। আমি জবাবে বলেছি, প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ যে মর্যাদা হারিয়েছে, দেশ যে চলছে না তা টাইম ম্যাগাজিন পড়ে জানতে হবে কেন? পরে প্রতিবেদনটি পড়ে দেখলাম দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বর্তমান সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে অরবিন্দ আদিকা নতুন কিছুই লেখেননি। এসবই বিগত আড়াই বছরে দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তবে আমার একটি প্রতিবাদ টাইমে পাঠাব কি-না ভাবছি। কারণ স্টেট অব ডিসগ্রেস নয়, শিরোমানটি হওয়া উচিত ছিল—গভর্নমেন্ট অব ডিসগ্রেস। যা কিছু বিবরণ রয়েছে প্রতিবেদনে তা জনগণের জন্য নয় দেশ ও সরকার যারা চালাচ্ছে তাদের ডিসগ্রেস, মর্যাদাহানি হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবার একটি প্রতিবাদও জানিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হিন্দু নিধনের বর্ণিত ঘটনাবলী যে মিথ্যা তা প্রমাণ হয়েছে। আমার কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ রুটিন প্রতিবাদ অর্থহীন মনে হয়েছে?

এদিক দিয়ে বিএনপি অঙ্গসংগঠনের বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে ভোট পাওয়ার প্রতিবাদ জানানোর ও ক্যাম্পাসে মিছিল করার একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আবার যুক্তিহীন কি-না তা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। জিয়াউর রহমানের কোনো প্রকার অসম্মান জানিয়ে নয়, পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই আমার আপত্তি। ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিলটিকেও একই ধরনের আপত্তির বহিঃপ্রকাশ হলে স্বাভাবিক মনে হতো। টেলিভিশনে যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয়েছিল তারা বঙ্গবন্ধুকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলায় ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু কেন এই ক্ষোভ, কে শ্রেষ্ঠ বাঙালি তা নিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তার অনুসারীদের আদৌ মাথা ঘামানো নয়, তা বুঝতে পারলাম না। তারা বরং 'শহীদ জিয়া বাঙালির তালিকায় কেন বিবিসি জবাব দাও, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশী

শহীদ জিয়া' স্লে-াগান দিতে পারতেন। সেটাই যুক্তিযুক্ত হতো। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদান রয়েছে, বিশেষ সময়ে রেডিও ঘোষণাটি যে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এ সত্যটি কেউ এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। সেই পটভূমিতে জিয়াকে ইতিহাসে স্থান দিতে হবে কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় যারা তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন তারা বোধহয় নিজেদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অনুসারী মনে করেন না। জিয়াকে বাঙালির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তারা কি বাংলাদেশীদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন? ভাবছি বিএনপি সরকারের যে নাজুক অবস্থা বিবিসি জরিপের কারণে সৃষ্টি হলো সেখান থেকে উদ্ধারের রাস্তাটি কি? তাদের সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশী পরিচয় দিতে হলে তারা শহীদ জিয়াকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় অবস্থান মেনে নেবেন অর্থাৎ এবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়েও জিয়ার বাঙালিত্ব মেনে নেবেন কি-না।

আলোচনা শেষ করার আগে বলে নিচ্ছি আরও খবর জানতে পেরেছি। এরপর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গানের জরিপ করবে বিবিসি। আমি কিন্তু এখনই তালিকায় এক নম্বরটি জানিয়ে রাখলাম 'বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।' সর্বশেষ জানিয়ে রাখি আমার ঘরের খেয়ে পরের বনের মোষ তাড়ানো দুই ভাগনে শাহীন-মুনির অনলাইনে কুলাঙ্গার বা নিকৃষ্টতম বাঙালির এবং বাংলাদেশীদের একটি জরিপ শুরু করেছে। পাঠক-পাঠিকাদের জরিপে অংশগ্রহণের জন্য যথাসময়ে অনলাইন ওয়েবসাইটটি জানিয়ে দেয়া হবে।



এ কে আজাদ চৌধুরী

গণমুখী শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধু

সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতে শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এবং জীবনের মান উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। শিক্ষাই শক্তি (Knowledge is Power), শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার অপর নাম আত্মসচেতনতা ও উন্নয়ন। শিক্ষিত জাতি মাত্রই উন্নত জাতি। অপরদিকে, অশিক্ষিত জাতি যে অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন—বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে হয়।

শিক্ষা যখন আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এতোই গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষা কাঠামো বা স্তর বিন্যাস কিরূপ হবে, শিক্ষার বিষয় বা উপাদান কী হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা উৎসাহ, সমাজ চাহিদা এবং জাতীয় প্রয়োজন বা উন্নতি-সমৃদ্ধির সাথে শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে সম্পর্কিত হবে, তার প্রতিফলন ঘটে শিক্ষানীতিতে। তাই একটি স্বাধীন ও উন্নয়নকামী জাতির একটি জাতীয় শিক্ষানীতি আবশ্যক। চিরাচরিত শিক্ষানীতির পাশাপাশি আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যা হলো গণমুখী শিক্ষা।

গণমুখী শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে জনগণের জন্য, জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বোঝায়। এর প্রধান লক্ষ্য, দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ন্যূনতমপক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা বা সাক্ষর করে তোলা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। উপরন্তু, লব্ধ শিক্ষা যেন

ব্যক্তি ও সমাজ-চাহিদা, জনকল্যাণ, দেশ ও জাতির উন্নতি-সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সাধনে নির্দেশিত হয়, সে বিষয়ে সমান গুরুত্ব আরোপ করা। তাই, ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত বা 'এলিট' সৃষ্টি এ শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী—যেমনটি ছিল ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারতে Macaulay কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালের 'বাংলাদেশ বিপ্লবের' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু জাতীয় মুক্তি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই ছিল না, তা ছিল বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নির্দেশিত। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে জনগণের রাষ্ট্র এবং এর সমুদয় নীতি বা কর্মকাণ্ড জনস্বার্থে বা জনকল্যাণে পরিচালিত হবে। পাকিস্তান পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশের জনগণের মনে এ আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় এবং ক্রমশ তা তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সে আকাঙ্ক্ষাকে গণচেতনায় পরিণত করে। তাই আমাদের নতুন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নামে 'গণ' শব্দের প্রয়োগ। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) একই চেতনার স্বাক্ষরবাহী। এ রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি অবশ্যই গণমুখী হওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে এর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই। এ সম্বন্ধে সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গণমুখী শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যতীত আমাদের উন্নতি-অগ্রগতির যে উপায় নেই তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষা তাঁর কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি একে 'উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ' হিসেবে দেখেছেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য :

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বারা সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল কলেজ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

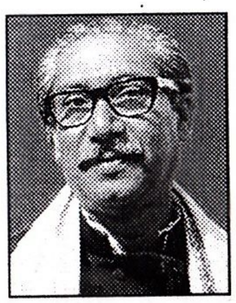
[মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন, ১৯৮৯) পৃ. ২৮]

স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার গণমুখী শিক্ষার বিষয়কে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই থেমে থাকেনি, বরং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠা নিয়ে 'খুদা কমিশন' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রায় দুই যুগ পরেও এটি একটি চমৎকার রিপোর্ট হিসেবে সর্বমহলে বিবেচিত (যদিও পরিবর্তিত অবস্থায় কোথাও কোথাও এর পরিবর্তন/পরিমার্জন আবশ্যক)। কমিশনের উল্লিখিত রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্বন্ধে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন হতো না। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। *['ভূমিকা', কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪]*

জাতির দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল এক চক্রের নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন জাতির জনক। এরপর এ চক্রের পৃষ্ঠপোষক শক্তি দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে। তাই কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখেনি। দীর্ঘ এ সময়ে জাতি শিক্ষানীতিহীন অবস্থায় চলেছে। শুধু তাই নয়, এ সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণমুখী চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একে জনগণের বিপরীতে বা মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা হয়েছে।

জাতির জন্য একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যে কত আবশ্যক তা বর্ণনাতীত। আমাদের জন্য শিক্ষাই উন্নতি-অগ্রগতির একমাত্র সোপান। নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। একবিংশ শতাব্দী সমাগত। 'গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্ট'-এ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ছাড়া বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমাদের টিকে থাকার অন্য কোনো উপায় থাকবে না। আশার কথা, বর্তমান সরকার ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য স্থির করেছে। পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার আলোকে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টভিত্তিক একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতির বহু মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এখন আমাদের দ্রুত অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। জাতির জনকের নির্দেশিত পথেই তা সম্ভব।



এম আর আখতার মুকুল

লন্ডনে মুজিব হত্যার সংবাদ কীভাবে পৌঁছালো

সিংহ রাশিতে জন্ম আমার। তাই সমগ্র জীবনটাই হচ্ছে শুধু উত্থান-পতন। কখনোই এক নাগাড়ে বেশিদিন সুখ আমার সহ্য হয় না। এই লন্ডন মহানগরীতে এর ব্যতিক্রম হলো না। মাত্র বছরখানেক আগেও আমি ছিলাম বাংলাদেশ হাইকমিশনের একজন কূটনীতিবিদ। তখন আমার বাসা ছিল লন্ডনের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা 'হ্যামস্টেড'-এ। কার্যোপলক্ষে প্রতিনিয়ত আমার যাতায়াত ছিল ব্রিটিশ ফরেন অফিস, কমনওয়েলথ সচিবালয়, বুশ হাউস-এর বিবিসি, আর ফ্লিট স্ট্রিট-এর সংবাদপত্র অফিসগুলোতে। সন্ধ্যার পর পার্টি ও নৈশভোজের আমন্ত্রণ না থাকলে প্লে-বয় কিংবা ভিক্টোরিয়া ক্লাবে আমার যাতায়াত ছিল নিয়মিত। মাঝে মধ্যে নাটক দেখার বাতিক ছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'উইক-এন্ড' কাটাবার জন্য সপরিবারে গাড়িতে চলে যেতাম লন্ডনের বাইরে।

হঠাৎ করেই আমার জীবনের ছন্দপতন হলো। স্বল্পকালের ব্যবধানে এখন আমি পূর্ব লন্ডনের সর্ড-উইচ হাই স্ট্রিট-এর এক বিরাট চামড়ার কারখানার একজন সাধারণ শ্রমিক। ফ্যাক্টরির নাম একজি ফ্যাশনস। মালিক হচ্ছেন সিলেটের জনৈক বঙ্গ সন্তান। এখানে আমার কাজ প্রতিদিন সকালে পাঁচতলা থেকে কাঁধে করে কখনও 'বোমা জ্যাকেট' কখনও বা মেয়েদের ওভারকোট বহন করা। কাজে কোনো ফাঁকি দিলে নিজেরই আর্থিক ক্ষতি। কারণ এখানে কাজ হচ্ছে পিস ওয়ার্ক পদ্ধতি। অর্থাৎ যে শ্রমিক যত বেশি কাজ করবে, তার তত বেশি কামাই হবে। এক কথায় বলতে গেলে 'নো ওয়ার্ক, নো পে'। তাহলে গোড়া থেকেই কথাগুলো গুছিয়ে বলতে হয়।

সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট। আমি তখন লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস কাউন্সিলের দায়িত্বে। সকালে গার্ডিয়ান কাগজে একটি ডাবল কলাম বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠলাম। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের ডিকটেটরকে সরিয়ে ('রিমুভ') ফেলতে সাহায্য করুন'। বিজ্ঞাপনদাতা হিসেবে যে সংস্থার নাম ছাপা হয়েছে, সেই নামের কোনো সংস্থার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। সকাল থেকেই মনটা খুব অস্থির হয়ে রইল।

কিন্তু হাইকমিশনের কারো সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতে সাহস হলো না। প্রথমেই হাইকমিশনার শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আবদুস সুলতানের কথা। এ সময় স্থানীয় বিখ্যাত 'রিজেন্ট পার্কে' মূলত সৌদি সরকারের টাকায় একটি মসজিদ তৈরি হচ্ছিল। লন্ডনে মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনাররা এই মসজিদ কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই সুবাদে আমাদের হাইকমিশনার এই মসজিদ কমিটির ছিলেন একজন সিনিয়র মেম্বর। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অন্যদের মতো তারও উৎসাহে ভাটা পড়ল। ফলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকেই মসজিদ কমিটির পরবর্তী বৈঠকগুলোতে যোগ দিতে হতো। কিন্তু প্রথম দিনের বৈঠকে যাওয়ার আগে স্থানীয় মাননীয় হাইকমিশনার আমাকে এ মর্মে ব্রিফিং দিলেন যে "বেশি কিছু মাতবেন না। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মিয়া মমতাজ দৌলতানা যে লাইনে কথা বলবেন, আপনিও সেই মোতাবেক কথা বলবেন এবং ভোট দিবেন।"

আমি কিন্তু এ ধরনের ব্রিফিং-এ হতবাক হয়নি। মুহূর্তে মনে পড়ল অখণ্ড পাকিস্তানি জামানার কথা। দুর্দান্ত প্রতাপশালী স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল (অব.) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় মরহুম আবুল হাশিমের পরামর্শে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ধকল এড়িয়ে পুরনো মুসলিম লীগ দলটাকেই দখল করে বসেন। পদ্ধতিটা ছিল খুবই অভিনব। পশ্চিম পাকিস্তানের হোমড়া-চোমড়া মুসলিম লীগাররা ছাড়াও চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, ময়মনসিংহের মোমেন খাঁ, রংপুরের আবুল কাশেম, খুলনার খান এ. সবুর প্রমুখের মতো পাকিস্তানের যেসব মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সামরিক জান্তাকে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেছিল, আইয়ুব খান তাদের দিয়ে করাচির ক্লিফটন বিচ-এ মুসলিম লীগের এক বিরাট কনভেনশন আহ্বান করিয়ে নিজেই পার্টি দখল করে বসলেন। এ থেকেই আইয়ুব খানের মুসলিম লীগের নামকরণ হলো 'কনভেনশন মুসলিম লীগ'। পাকিস্তান মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করে দলকে পুনর্গঠিত করলেন। সংবাদপত্রের ভাষায় এই পুনর্গঠিত উপ-দলের

নামকরণ হলো 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ।' এই কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল পাঞ্জাবি নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা আর অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ময়মনসিংহের সৈয়দ আবদুস সুলতান। সৈয়দ সাহেব আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলেন। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের টিকেটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রস্তাবিত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সীমান্ত অতিক্রম করলেন।

কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভদ্রলোক আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। ময়মনসিংহ জেলার আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতিতে সৈয়দ সাহেবের স্থান হলো না। সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনোরঞ্জন ধর, জিল্লুর রহমান, রফিকউজ্জামান ভূঁইয়া, ডা. আজিজুল রহমান মল্লিক এবং আবদুল মোমেন প্রমুখের পর 'নব্য আওয়ামী লীগের' সৈয়দ আবদুস সুলতানকে ময়মনসিংহ জেলার (সদর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ) কোটায় মন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করার প্রশ্নই উঠল না।

নিয়তির পরিহাসই বলতে হয়। আলোচ্য ঘটনা প্রবাহের জের হিসেবে লন্ডনে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার হলেন সৈয়দ আবদুস সুলতান। আবার কিছুদিনের ব্যবধানে খণ্ডিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন সেই-ই মিয়া মমতাজ দৌলাতানা। এখন দুজন হচ্ছেন দুই দেশের নাগরিক। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক?

তাই গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে মাননীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে কোনো আলাপই করলাম না। এরপর ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব ফারুক চৌধুরীর কথা। সিলেটের এক খান্দানি বংশের সন্তান ফারুক সাহেব উচ্চ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। যদিও ১৯৭২ সালে লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পেটে অপারেশনের সময় এই চৌধুরী সাহেব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কষ্টের কথা চিন্তা করে হাসপাতালের করিডোরে নিজেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তবুও এ কথা উল্লেখ করতে হয় যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভদ্রলোক ঢাকায় পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বহাল তবিয়তেই কাজ করে গেছেন। তাই বলতে বাধা নেই যে, আমি জনাব ফারুক চৌধুরীকে একজন সহকর্মীরূপে পছন্দ করলেও কোনো সময় একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করতে পারিনি।

সর্বশেষ হাইকমিশনার গোয়েন্দাপ্রধান জনাব নূরুল মোমেন খান মিহির। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, তখন জবাব খান জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসআই) প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নেতৃবৃন্দের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। আবার দুজনে একই সঙ্গে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনে। তখন আমাদের মধ্যে চমৎকার সমঝোতা। সপ্তাহের প্রতি সন্ধ্যায় অবসর মুহূর্তে আমরা দুজন একই সঙ্গে। একেবারে মানিকজোড়। সমস্ত রাত্রির প্রাইভেট পার্টি থেকে শুরু করে ম্যাকলিয়ড রোডের ভিক্টোরিয়া ক্লাব পর্যন্ত দুজনার একই সঙ্গে যাতায়াত। খান সাহেবের নতুন গাড়ি 'অডি-৮০' আর আমার জাপানি 'ডাটসন-১৬০০' নিয়ে আমরা দু'জনে সমগ্র লন্ডন একেবারে চষে ফেললাম। কখনো উত্তর লন্ডনে শেফিক তালেয়ার বাসায় আড্ডায়। কখনো কর্পোরেশনের সীমানা ছাড়িয়ে মেথুয়েন রোডে গাফ্ফার চৌধুরীর বাড়িতে, আবার কখনো বা পশ্চিম লন্ডনের শেফাডু বুশ-এ গাউশ খানের 'এলাহাবাদ রেস্টুরেন্টে'।

এসবের পরেও একটি 'কিন্তু' থেকে গেল। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে 'বাকশাল' গঠনের প্রাক্কালে দু'জনের চিন্তারাজ্যে বেশ কিছুটা ফারাক দেখা গেল। 'বাকশাল' গঠনের ব্যাপারে আমার মনে তখনো নানা প্রশ্ন। মানসিক দ্বন্দ্বে আমি জর্জরিত। বাকশালের বিপক্ষে কিছু না বললেও, প্রকাশ্যে 'বাকশাল'কে সমর্থনের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হলাম। তাই সত্যি কথা বলতে হলে ১৪ আগস্ট সকালে অফিসে গিয়েও 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এই বিশেষ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে নূরুল মোমেন খানের সঙ্গে কোনো আলাপই করলাম না।

একমাত্র হাইকমিশনের প্রতিষ্ঠাতাসদস্য ও হিসাবরক্ষণ বিভাগের প্রধান এবং আমার একান্ত সুহৃদ লুৎফুল মতিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনায় আগ্রহী হলাম। ভদ্রলোক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানি মিশন থেকে 'ডিফেক্ট' করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন। এ সময় তাঁর সহকর্মী ছিলেন পিআই-এর ইস্তাম্বুল অফিস থেকে 'ডিফেক্ট' করা জনসংযোগ অফিসার মহিউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী।

সে যাই হোক, আলোচ্য দিন সকালে লুৎফুল মতিনকে তাঁর অফিসে পেলাম না। কার্যোপলক্ষে তিনি লন্ডনের বাইরে গিয়েছিলেন। তাই আর আলাপ-আলোচনা হলো না।

দুপুরে আমরা হাইকমিশন থেকে দল বেঁধে কাছেই লাঞ্চ করতে গেলাম। দলের সদস্যরা হচ্ছেন ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক চৌধুরী, সাংবাদিক

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জুলফিকার আলী ভুট্টোর এককালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি ও প্রাক্তন কূটনীতিবিদ কায়সার রশীদ চৌধুরী, কায়সার তনয়া জিনাত, নূরুল মোমেন খান এবং আমি।

খেতে বসে অনেক আলাপ হলো। কিন্তু আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কথায় কথায় একজন সরাসরি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বললেন, "আচ্ছা, আপনারা কেউ বলতে পারেন বঙ্গবন্ধু আর কতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন?"

হঠাৎ করে জবাবটা দিলেন জিয়াউল হক টুলু।

"বঙ্গবন্ধুর নীতির জন্য আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মোটামুটি সন্তুষ্ট। আমার তো মনে হয় বঙ্গবন্ধু সরকার আরও বছর দশেকের জন্য ক্ষমতায় থাকবে।"

এবার গাফ্ফার চৌধুরী ঠোঁট-কাটা কথা বললেন, "এভাবে বাংলাদেশ চলতে পারে না। শেখ মণি আরও শক্তিশালী হলে আগামী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সরকার টিকতে পারে কি-না সন্দেহ।"

গাফ্ফার চৌধুরীর এ ধরনের জবাবে বুকটা ধক করে উঠল। তাহলে কি সামথিং রং সাম হোয়ের? এবার সবাই আমাকে ধরে বসল। আমার মুখ থেকে কিছু একটা জবাব বের করবেই। এরকম এক সমাবেশে কোনো কথা না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এঁদের চাপাচাপিতে আকস্মিকভাবেই হেঁয়ালি ধরনের জবাব দিলাম।

"তাহলে শোনেন। প্রায় ৭ হাজার মাইল দূরে বসে আমার জবাব সঠিক হবে কিনা জানি না। সঠিক না হলেই খুশি হব। আমার তো মনে হয়, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে গাফ্ফার সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতেই হচ্ছে। লন্ডনে পরিচিত মহলে তখন এ কথা প্রায় সবারই জানা ছিল যে, বেকার অবস্থায় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে চৌধুরী সাহেবের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ঢাকায় সরকারি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলোর লন্ডনস্থ সংবাদদাতার চাকরির জন্য গাফ্ফার চৌধুরী প্রার্থী হলেন। এ ব্যাপারে সুরাহার লক্ষ্যে সপ্তাহ কয়েক আগে বাংলাদেশ বিমানে একটা রিটার্ন টিকেটের ব্যবস্থা করে আমিই চৌধুরী সাহেবকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল ছিল। গাফ্ফার চৌধুরীর মতে শেখ মণির মাধ্যমে চাকরির সুপারিশ না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে বিপত্তির সৃষ্টি হলো। চাকরিটা হয়েও হলো না।

গাফ্ফার চৌধুরীও তাঁর 'বরিশ্যাইলা জেদ' ছাড়লেন না। ঢাকায় স্বল্পকালীন অবস্থানকালে একটা চাকরির জন্য শেখ মণির সঙ্গে দেখা তো দূরের কথা, যোগাযোগ পর্যন্ত করলেন না। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার তিনি লন্ডনের পথে রওয়ানা হলেন। আসার দিনে আওয়ামী লীগের মুখপত্র দৈনিক জনপদ-এর প্রথম পাতায় বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে 'বাকশাল'-কে নিয়ে লেখা গাফ্ফার চৌধুরীর সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলো—"ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু"।

লন্ডনে ফিরে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই গাফ্ফার চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনায় নতুন বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও ব্যুরোক্রেটদের কারসাজিতে গোপনে আরও একটা 'বিপ্লব' হয়ে গেছে। এজন্যই 'কোলাবরেটার' আর রাজাকাররা এখন শুধু ক্ষমাপ্রাপ্তই নয়, সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য গাফ্ফারের বক্তৃতায় বিরোধিতা ছাড়াও আফসোসের সুর দারুণভাবে বিদ্যমান।

লন্ডনে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোররাত সাড়ে ৩টা। চারদিক নীরব-নিঝুম। বাংলাদেশের ঘড়িতে এখন সকাল সাড়ে ৯টা। লন্ডনে এর মধ্যেই শীতের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে আবার বিছানায় শোবার সুযোগ পেলাম না। বিশ্রী শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওপাশ থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল—

"হ্যালো, হ্যালো। কে মুকুল সাহেব? আমি কায়সার বলছি। কায়সার রশীদ চৌধুরী।"

"তা কায়সার ভাই এত রাতে? সকালে ফোন করলেও তো পারতেন? কোনো জরুরি খবর আছে নাকি?"

"হ্যাঁ খুবই জরুরি কথা। আর ঘুমাতে যাবেন না। আমি এক্ষুণি আসছি।" "হ্যালো, হ্যালো..."

ফোনের লাইনটা খুঁট করে কেটে গেল। আমি একাকী বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরেই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই কায়সার ভাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন।

"মুকুল সাহেব, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করার সময়। ঢাকার খবর ভালো না।"

"কায়সার ভাই, যা জানেন সবকিছু খুলেই বলুন। কসম খোদার বলছি,

আমি খুব একটা উত্তেজিত হব না। বাংলাদেশে কি মিলিটারি ক্যু হয়েছে? বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন তো?"

"মুকুল সাহেব, গতকাল দুপুরে 'পাব'-এ লাঞ্চ খাওয়ার সময় আপনি আর গাফ্ফার যা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটাই হয়েছে। ব্রিটিশ ফরেন অফিসের খবর হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে ওরা হত্যা করেছে। তবে মিলিটারি ক্যু হয়েছে কি-না জানি না।"

আমি পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। শুধু চোখের সামনে বারবার করে ভেসে উঠল ধবধবে পাঞ্জাবি পরিহিত সৌম্য চেহারার মুজিব ভাইয়ের সেই অমায়িক হাসিমাখা মুখখানা। মনে পড়ল লন্ডনে পোস্টিং হওয়ার পর ১৯৭৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার ধানমণ্ডিতে বত্রিশ নম্বরের দোতালায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার একান্ত শেষ সাক্ষাৎকারের কথা। সেদিন দরজা বন্ধ করে শেখ হাসিনার ঘরে দু'জনের মাঝে অনেক কথা হলো।

"তাহলে শেষ পর্যন্ত তুই-ও আমারে ছাইড়া চইল্যা যাইতাছস?"

"মুজিব ভাই, আমি দেশে থাকতে পারলাম না বইল্যা মাফ কইর‍্যা দিয়েন। বেয়াদবি নিবেন না। আসলে আপনি কিন্তু আবার 'বাস মিস্' করছেন। আমার তো আর ধানমণ্ডি-গুলশানে বাড়ি নাই। ব্যাংক ব্যালেন্সও নাই। আমি হইতাছি ছাপোষা মানুষ। আমি বাঁচতে চাই।"

একটা পশমি আলোয়ান গায়ে বঙ্গবন্ধু বিছানায় কাত হয়ে শুয়েছিলেন। আমাকে ডেকে মাথার কাছে বসালেন। এরপর তার হাতের আঙুলগুলো ফুটিয়ে দিতে বললেন। সবে মাত্র গোটা দুয়েক আঙুল ফুটিয়েছি, এমন সময় বলে উঠলেন, "আমার হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা, কর্মী আর অফিসারদের মধ্যে একমাত্র তুই-ই এ ধরনের কথাবার্তা সাহস কইর‍্যা বলতাছস। আমি কিন্তু সব কিছুই আন্দাজ করতে পারি। শুধু মুখ ফুইট্যা বলি না।"

মিনিট খানিক দুজনেই চুপচাপ। এর পরে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে আমার হাতটা টেনে গেঞ্জির নিচে তাঁর বুকের উপর নিয়ে গেলেন। বললেন, "বলতে পারস" কয়টা গুলি আমার বুকটা ছেঁদা কইর‍্যা ফেলাইব? ভালো কাইর‍্যা বুকটা একটু হাতাইয়্যা দে।" এরপর দুজনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আবার ঘরে কবরের নিস্তব্ধতা।

একটু পরেই মুজিব ভাই উঠে নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, "বউ পোলাপান সব সঙ্গে লইয়া লন্ডন যাইবি। তোর পরিবারের কেউ যেন বাংলাদেশে না থাকে, বুঝছোস। ফরেন অফিসেও তোর শত্রু রইছে।"

বিদায়ের সময় মুজিব ভাইকে কদমবুচি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাংলাদেশে যখন ফেরত আইবি, তখন আমারে আর পাইবি না। আমার কবর যেখানেই থাক জিয়ারত কইরা একটা সাদা ফুল দিয়া আসিস।"

"তবে তোরে আইজ আরও একটা কথা কইয়্যা দেই। তুই তো ১৯৪৬ সাল থাইক্যা আমারে দেখতাছোস। সে-ই ক্যালকাটা পলিটিকস। আমি আছিলাম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য। ছাত্র রাজনীতিতে দিনাজপুর জেলা থাইক্যা দবিরুল ইসলাম আর তুই ছিলি আমাগো অন্ধ সাপোর্টার। হেই জন্য নূরুল আমিনের টাইম-এ দিনাজপুরে জেলও খাটছোস এক বছর। পঞ্চাশ সালের রায়ট-এর বছর ঢাকায় আইলি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য। তারপর মানিক ভাই-এর ইত্তেফাকের জন্মের টাইম থাইক্যা তুই হইলি ফুল টাইম সাংবাদিক। পাকিস্তানের চব্বিশটা বছরই তুই আমার রাজনীতির সবকিছুই দেখছোস। এরপর একাত্তর থাইক্যা তুই হইলি আমার বাংলাদেশ সরকারের অফিসার। যা আইজ তোরে একটা ভবিষ্যৎদ্বাণী কইয়া দিলাম। আমি যখন এই দুনিয়ায় থাকুম না, তুই তখন আমার সম্বন্ধে বই লিখবি। বুঝছোস এইসব বই বেইচ্যা তোর হইবো রুজি-রোজগার। বউ পোলাপন খাওয়াইতে পারবি।"

দরজার ছিটকানি খুলে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে আবার পিছনে ডাক এল। মুখে তাঁর স্নেহমাখা হাসি। বললেন, "আমার মুকুল, তুই আর ফুটলি না। আর একটা কথা শুইন্যা রাখ। আমার ফ্যামিলির সঙ্গে তোর স্পেশাল সম্পর্কের কথা কিন্তু ভুলিস না। এই বাড়ির তিন-তিনটা জেনারেশনের লগে তোর হইতাছে 'ভাই'-এর সম্পর্ক। ১৯৪৬ সাল থাইক্যা তুই আমারে চিনিস। আমি তোর মুজিব ভাই আর রেণু তোর ভাবী। আবার কামাল-জামাল-রাসেল আর হাসিনা-রেহানাও তোরে 'মুকুল ভাই' কইয়া ডাকে।

"সবচাইতে বড় ডাকটা তুই শোনছোস? আমার নাতি মানে হাসিনার পোলা 'জয়'ও কিন্তু তোরে "মোগল ভাই" কইয়া ডাকে। এই জন্যই তুই হইতাছোস এই বাড়ির হগলের ভাই।"

কথা ক'টা বলেই মুজিব ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ শিশুর মতো সরল অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। আমি তখন দরজার কাছে থমকে দাঁড়ানো। তিনি এবার নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে এক গাদা ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলায় বলবেন, "করি কি? মনে হইতাছে, মস্কো আমারে এখনও ঠিক মতো বিশ্বাস করে না। আবার লাহোরের ইসলামী সম্মেলনে গেছিল্যাম

বইল্যা দিল্লির 'সাউথ ব্লক' গোসা। আর নিক্সন-কিসিঞ্জারের আমলে ওয়াশিংটনের পলিসি তো বুঝতেই পারতাছোস। একবারে এক ঠ্যাং-এ খাড়া। আমাগো মতো 'ন্যাশনালিস্ট'গো বিপদ তো এইখানেই। আমি ঠিকই বুঝতে পারতাছি। চিলির পর বাংলাদেশ। আলেন্দের পর এবার আমার পালা। আমিও শ্যাষ দেইখ্যা ছাড়ুম। পারুম কিনা জানি না।"

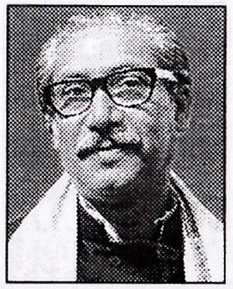
আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা আমার কোন সে সুদূরে চলে গেল। হঠাৎ নেতার কথায় সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি ধরা গলায় বললেন, "আমি যখন থাকুম না, যদি সম্ভব হয় ভাই হিসেবে এগো একটু খোঁজ-খবর নিস।"

সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিবকে হত্যার স্বল্পদিনের ব্যবধানে ঢাকা থেকে আমার জনৈক সাংবাদিক বন্ধু কার্যোপলক্ষে লন্ডনে এসে হাজির হলেন। বিবিসি এক্সটার্নাল সার্ভিসেস-এর বাংলা বিভাগে দেখা। খন্দকার মোশতাক তখন ক্ষমতায় টলটলায়মান। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। বিবিসি'র নূরুল ইসলামের সঙ্গে আমরাও বিকালের নাস্তা খাওয়ার জন্য বেসমেন্ট-এর রেস্টুরেন্টে গেলাম। তিনজনে অনেক আলাপ হলো। একটু পরে রেকর্ডিং-এর জন্য নূরুল ইসলাম উঠে গেলেও আমাদের কথাবার্তা অব্যাহত রইল। কথায় কথায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাংবাদিক বন্ধু গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার গোরস্থানে বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফনের সংগৃহীত কাহিনী বললেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকাল থেকেই কারফিউ। বিকাল নাগাদ টুঙ্গিপাড়ার আকাশে বঙ্গবন্ধুর লাশ নিয়ে হেলিকপ্টার এল। আর আগেও অনেকবার টুঙ্গিপাড়ার লোকজন হেলিকপ্টার নামতে দেখেছে। প্রতিবারই হাজার হাজার লোক টুঙ্গিপাড়ার কৃতী সন্তান শেখ মুজিবকে একনজর দেখার জন্য দৌড়ে গেছে।

কিন্তু এবার? কারফিউর ভয়ে আর ঘর থেকে বেরুতে সাহসী হলো না। বাংলাদেশ বেতারে তখন পাকিস্তানি উর্দু সিনেমার গান আর মাঝে মাঝে সরকারি নির্দেশ ঘোষণা হচ্ছে।

হেলিকপ্টার থেকে ধীরে ধীরে বাংলার অগ্নিপুরুষ ও বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাকে তাঁর জন্মভূমিতে নামানো হলো। কিন্তু তিনি আর জীবিত নেই। এবার টুঙ্গিপাড়ায় নামল একটা বস্তাবন্দি লাশ।



এম এ ওয়াজেদ মিয়া

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট
শেখ হাসিনার বিপন্ন দিনগুলো

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টায় ঘুম ভাঙে ম্যাডাম রাষ্ট্রদূতের ডাকে। তিনি জানান যে, জার্মানির বন থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ফোন করেছেন। প্রথমে হাসিনাকে পাঠিয়ে দিই তাঁর সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হাসিনা আমাকে জানায় যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমার সাথে কথা বলতে চান। হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। আমি দ্রুত নিচের দোতলায় চলে যাই। তখন সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা হেট করে রাষ্ট্রদূত সাহেব ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেও তিনি কোনো কথা বললেন না। ফোনের রিসিভারটি ধরতেই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন, 'আজ ভোরে বাংলাদেশে 'ক্যু-দে-তা' হয়ে গেছে। আপনারা প্যারিস যাবেন না। রেহানা ও হাসিনাকে এ কথা জানাবেন না। এক্ষুণি আপনারা আমার এখানে বনে চলে আসুন।'

প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর বেশি আপাতত আমি আর কিছুই জানি না। এ কথা বলেই তিনি আমাকে ফোনের রিসিভারটি সানাউল হক সাহেবকে দিতে বলেন। অতঃপর আমি আস্তে আস্তে তিনতলায় আমাদের কক্ষে চলে যাই। সেখানে পৌঁছাতেই হাসিনা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে আমার কাছ থেকে জানতে চায় হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কী বলেছেন। তখন আমি শুধু বললাম যে, তিনি আমাদেরকে প্যারিস যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেদিনই বনে ফিরে যেতে বলেছেন।

এ কথা বলেই আমি বাথরুমে ঢুকে পড়ি। সেখানে এটা সেটা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকটা সময় কাটাই। ততক্ষণে রেহানা সজাগ হয়ে আমাদের কামরায় চলে আসে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রেহানা ও হাসিনা দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে বলে যে, নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে, যা আমি তাদেরকে বলতে চাই না। তারা আরও বলে যে, প্যারিসে না যাওয়ার কারণ তাদেরকে পরিষ্কারভাবে না বলা পর্যন্ত তারা ঐ বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। অতএব, বাধ্য হয়ে আমি তাদেরকে বলি যে, বাংলাদেশে কি একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্য আমাদের প্যারিস যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। এ কথা শুনে তারা দু'বোন কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের কান্নায় ছেলেমেয়েদেরও ঘুম ভেঙে যায়।

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমরা বনের উদ্দেশ্যে ব্রাসেলস ত্যাগ করি। পথে রেহানা ও হাসিনা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমরা বনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছাই। সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন যুগোশ্লাভিয়ায় সফর শেষে বাংলাদেশে ফেরার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাত্রাবিরতি করে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় উঠেছেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী, ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তিনজন মিলে কান্নায় ভেঙেপড়া রেহানা-হাসিনাকে ধরাধরি করে বাসার ভেতরে নিয়ে যান! ড্রইংরুমে এভাবে কিছুক্ষণ কাটানোর পর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী হাসিনাদের উপর তলায় নিয়ে যান।

তখন ড্রইংরুমে ড. কামাল হোসেন, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও আমি ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি। এরই এক ফাঁকে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত হাসিনাকে আমি কোনো কিছু জানতে দেব না, এই শর্তে তিনি আমাকে বললেন, বিবিসি-এর এক ভাষ্যানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত বিবরণীতে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কোথায় আশ্রয় নেয়া নিরাপদজনক হবে তাঁর কাছ থেকে এ কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনো দেশ আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।

পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সকাল আটটার দিকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য ড. কামাল হোসেন বনস্থ বিমানবন্দরে যাবেন বলে আমাকে জানানো হয়। ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দুজনে একত্রে কিছু গোপন আলাপ করেন। অতঃপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে আমি ড. কামাল হোসেন সাহেবের হাত ধরে তাঁকে বললাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ খুব সম্ভবত আপনাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাখার চেষ্টা করবেন। অনুগ্রহ করে আমার কাছে ওয়াদা করুন যে, আপনি কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে তাঁর মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করবেন না। আমার এই প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন আমাকে বললেন, ড. ওয়াজেদ, প্রয়োজন হলে বিদেশেই মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে এ ব্যাপারে আপোস করে আমি দেশে ফিরতে পারি না। এ কথাগুলো বলেই তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে যান। বিমানবন্দর থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বাসায় ফিরে হাসিনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইতিপূর্বে লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকা (কাকা) ওদের সাথে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি আমাদেরকে লন্ডনে তার কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক সময়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ছোট ভাই কায়সার রশীদ চৌধুরী তাঁকে ফোন করেন। এ পরিস্থিতিতে খন্দকার মোশতাক আহমদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না করার জন্য কায়সার চৌধুরী তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেন। কায়সার রশীদ চৌধুরী রেহানা ও হাসিনার সাথে কথা বলে তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, রেহানা, হাসিনা ও আমাকে বলেন যে, লন্ডনে চলে যাওয়ার সাব্যস্ত করলে আমরা সেখানে তাঁর বাসায় গিয়ে উঠতে পারি। তবে তিনি আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, সেখানে মাত্র একটি সমস্যা আছে। ঐ বাসার নিচতলায় কায়সার রশীদ চৌধুরী বসবাস করে এবং সে ভুট্টোর অন্ধ ভক্ত। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ১৫ আগস্ট তারিখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর সাথে তৎব্যাপারে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য। যাহোক, ঐদিনই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কার্লসরুয়ে পাঠালেন সেখান থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য ভারি জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য।

আমি সেদিন কার্লসরুয়ে গিয়ে বনে ফিরে আসি রাত সাড়ে দশটার দিকে। কিন্তু সেদিন সাপ্তাহিক ছুটির কারণে অফিস বন্ধ থাকায় আমি কোনো

বইপত্র বা অন্য কোনো জিনিসপত্র সাথে আনতে পারিনি। রাত এগারোটার দিকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁর স্ত্রী ও আমাকে সাথে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাইরে যান। পথে তিনি বলেন যে, একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ভারতীয় দূতাবাসে তাঁর পরিচিত একজন অফিসিয়াল আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাকে তাঁদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাহোক, উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর ভারতীয় সেই অফিসিয়ালের সাথে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে রেখে দ্রুত বাসায় ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে রওনা হওয়ার সময় আমি যেন তাঁকে ফোনে অবহিত করি। অতঃপর ভারতীয় ঐ অফিসিয়ালের সাথে আমি তাঁদের রাষ্ট্রদূতের বাসায় যাই। তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন মুসলমান জার্নালিস্ট। একটু ভয়ে ভয়ে আমাদের বিপর্যয়ের কথা আমি তাঁকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। আমার কথা শোনার পর তিনি আমাকে লিখে দিতে বলেন যে, আমরা ভারতীয় সরকারের কাছে থেকে কি চাই। অতঃপর তিনি সাদা কাগজ ও একটি কলম আমার হাতে তুলে দেন। তখন মানসিক দুশ্চিন্তা ও অজানা শংকায় আমার হাত কাঁপছিল। যাহোক, অতিকষ্টে রেহানাসহ আমার পরিবারবর্গের নাম উল্লেখপূর্বক সকলের পক্ষ থেকে আমি লিখলাম, শ্যালিকা রেহানা, স্ত্রী হাসিনা, শিশু ছেলে জয়, শিশু মেয়ে পুতুল এবং আমার নিজের কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার জন্য ভারত সরকারের নিকট কামনা করি রাজনৈতিক আশ্রয়।

১৭ আগস্ট রোববার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সারাক্ষণ বাসায় ছিলেন। ঐদিন লন্ডন থেকে আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা ও বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় রেহানা ও হাসিনাকে ফোন করেন। এক সময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্নী আমাদেরকে ফোন করে জানান যে, তিনি ঢাকায় তাঁর স্বামীর সাথে ইতিপূর্বে কথা বলেছেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, আমাদের ভীত সন্তস্ত্র হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, তিনি আমাদেরকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কিনা। আমি তাঁকে জানাই যে, হাসিনারা প্রত্যেকে মাত্র পঁচিশ ডলার সাথে নিয়ে এসেছে। কার্লসরুয়ে গেস্ট হাউসে আমি রেহানার জন্য একটি পৃথক কক্ষ ভাড়া নিয়েছি। অতঃপর আমি তাঁকে হাসিনার সাথে ঐ বিষয়ে আলাপ করার জন্য পরামর্শ দিই। তখন হাসিনার

সাথে আলাপ করে আমরা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে জনাই যে, মাত্র হাজারখানেক জার্মান মুদ্রা দিলেই আমরা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব।

১৬ আগস্ট ড. কামাল হোসেন লন্ডন চলে যাওয়ার পর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দেশের কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট আমলা কর্মকর্তা সম্পর্কে অনেক গোপন ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমাকে শোনান। তিনি বলেন যে, তাঁর ছোট ভাই কায়সার চৌধুরী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর একান্ত সচিব ছিলেন, যখন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্ত্রিপরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ঐ সময় জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনেক অপকর্ম ও কুকর্মে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কায়সার রশীদ চৌধুরীর।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে অনেক কাহিনী শোনান। তিনি তখন দিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণার পূর্বে তাঁকে দাপ্তরিক কাজে করাচি হয়ে ইসলামাবাদ যেতে হয়েছিল কয়েকবার। তখন পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতো। ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে দিল্লি থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফর শেষে ফেরার পথে করাচি বিমানবন্দরে তাঁকে গ্রেপ্তার করারও নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইসলামাবাদ থেকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরিত টেলেক্স বার্তাটি করাচিস্থ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তিনি সেবার ভাগ্যক্রমে রেহাই পান। অতঃপর দিল্লি পৌঁছেই তিনি পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে আরও জানান যে, ১৯৭১-এ কোলকাতায় খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জহিরুল কাইউম, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনপ্রধান হোসেন আলীসহ কতিপয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জোর গোপন তৎপরতা চালিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত ও নস্যাৎ করার জন্য।

১৯৭৫-এ আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ইতিপূর্বে ড. কামাল হোসেন ও হুমায়ুন

রশীদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের যথাক্রমে দলপতি ও সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। যে কারণে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নিউইয়র্ক ও লিমায় হোটেলও রিজার্ভেশন করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্টের ঘটনার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করায় তাঁর লিমা সম্মেলনে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁকে কোনো অবস্থাতেই লিমা সম্মেলনে যেতে দেবেন না। কিন্তু তখন স্বল্পসময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক ও লিমাস্থ হোটেলসমূহে তার পূর্ব নির্ধারিত রিজার্ভেশন বাতিল করা সহজ হবে যদি তিনি লন্ডন যান। সেই মোতাবেক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৮ আগস্ট তারিখে সপত্নীক লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮ আগস্ট সোমবার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরেন দুপুর বারোটার দিকে। তিনি আমাদের সাথে দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদেরকে কার্লসরুয়ে শহরে পৌঁছেই যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। এর এক ফাঁকে তার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতীকস্বরূপ তিনি হাসিনাকে এক হাজার জার্মান মুদ্রা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের তার সাধ্যমতো টাকা-পয়সাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অতঃপর কার্লসরুয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার মুহূর্তে ঘরের বাইরে এসে দেখি যে, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁর সরকারি রাষ্ট্রদূতের গাড়িটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাকে এও বলেন যে, কার্লসরুয়ে আমাদের জরুরি কাজগুলো সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন ঐ গাড়িটিকে সেখানে রেখে দেই, তাঁর এ সহমর্মিতায় ও মহানুভবতায় আমি আবেগে এতই অভিভূত হয়ে যাই যে, তখন আমার দু'চোখ অশ্রুআপ্লুত হয়ে পড়ে। এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধরীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

১৮ আগস্ট বন থেকে ৩৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ করে আমরা নিরাপদে কার্লসরুয়ে পৌঁছাই সন্ধ্যা সাতটার দিকে। আমাদের কার্লসরুয়ে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসে কার্লসরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য তখন গবেষণারত শহীদ হোসেন এবং কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী আমিরুল ইসলাম। অতঃপর হাসিনাদের গেস্ট হাউসে রেখে আমি শহীদ হোসেনকে সাথে নিয়ে আমাদের কার্লসরুয়েতে উপস্থিতির কথা রিপোর্ট করার জন্য যাই সেখানকার বিশেষ নিরাপত্তাবিষয়ক দপ্তরে। ১৯ আগস্ট আমি কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র

থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসি এবং অন্যান্য জরুরি কাজকর্ম সম্পন্ন করি উক্ত গাড়িটি ব্যবহার করে। ২০ আগস্ট তারিখে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের ঐ গাড়িটি ফেরত পাঠিয়ে দিই। শোক ও শঙ্কায় তখন আমরা এত মুহ্যমান হয়ে পড়ি যে, আমাদের দেখাশোনার ভার নিতে হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামকে। গেস্ট হাউসে আমাদের কক্ষ দুটির পাশের কক্ষটি ভাড়া নেয়া হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামের জন্য। ২২ আগস্ট বন থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে ফোন করে ওদের (ভারতীয় দূতাবাসের) কেউ আমার সাথে কার্লসরুয়েতে যোগাযোগ করেছেন কি-না সে সম্পর্কে জেনে নেন। ২৩ আগস্ট সকালে বনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে ফোনে জানান যে, সেদিনই তাঁর অফিসের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি কার্লসরুয়েতে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। বিকাল ২টায় ঐ কর্মকর্তা ঐ গেস্ট হাউজে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি আমাকে এও জানান যে, তিনি পরদিন অর্থাৎ ২৪ আগস্ট সকাল ৯টার দিকে আমাদেরকে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নিয়ে যাবেন। পরদিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঐ ভদ্রলোক উক্ত গেস্ট হাউসে পৌঁছান। অতঃপর মালপত্রসহ দুটো ট্যাক্সিতে আমরা কার্লসরুয়ে রেলওয়ে স্টেশনে যাই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে যাওয়ার জন্য। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমি শহীদ হোসেনকেও সাথে নেই। বিমানবন্দরে বহির্গমন হলে প্রবেশ করার মুহূর্তে শহীদ হোসেনের নিকট হতে বিদায় নেয়ার সময় তাকে আকার-ইঙ্গিতে জানাই যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। উল্লেখ্য, ভারতীয় ঐ কর্মকর্তা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উক্ত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য। শহীদ হোসেনও তখন মুখে কিছু বললেন না। তিনি আমাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলেন। তখন আমাদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনায় তাঁর দু'চোখ ছিল অশ্রুতে ভরা। আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি জাম্বো বিমানে (পশ্চিম) জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিস্থ পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করি ২৫ আগস্ট সকাল আটটার দিকে। 'আগমন হলে' কাউকে দেখলাম না আমাদের খোঁজ করতে। দেখতে দেখতে ঐ বিমানে আগত প্রায় সব যাত্রীই চলে যান। মেরামত ও নবরূপায়ণ কাজের জন্য উক্ত হলটির শীতলীকরণ সিস্টেম বন্ধ ছিল। নানান দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা এবং আগস্ট মাসের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার কারণে তখন আমার শরীর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিল। যা হোক, সেখানের এক কর্মকর্তার অফিস থেকে ফোনে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম প্রায় পৌনে একঘণ্টা ধরে। কিন্তু কাউকে

পেলাম না। ফলে, আমার দুশ্চিন্তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উক্ত অফিস থেকে হল ঘরে এসে হাসিনাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। যাহোক, এর একটু পরেই একজন শিখ কর্মকর্তা পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আরও কাছ থেকে জানতে চান যে, আমি উক্ত দুই মহিলার সহযাত্রী কি-না। আমি তাদের সফরসঙ্গী জেনে কর্মকর্তাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ঐ যুবতী মহিলাদ্বয়কে ঐ দুই বাচ্চাসহ ভিআইপি হিসেবে এই বিমানবন্দর হয়ে যেতে দেখেছিলাম। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, আজকে তাঁদের কি নিদারুণ করুণ অবস্থা। একেবারেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

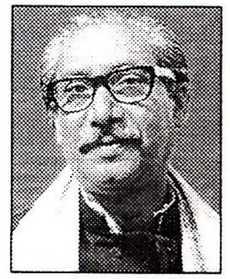
প্রায় আধঘণ্টা পর ঐ শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে জানান যে, কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতি শিগগিরই সেখানে পৌঁছবেন আমাদের ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। এরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দুজন কর্মকর্তা এলেন আমাদের খোঁজে। তাঁদের একজন নিজেকে ভারত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব বলে পরিচয় দিলেন। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর ঐ দুই কর্মকর্তা আমাদেরকে দুটো ট্যাক্সিতে বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায় নিয়ে যান। তখন ভারতীয় সময় দুপুর ১টা। সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা বিমানবন্দরে অপেক্ষা, দিল্লির প্রচণ্ড আবহাওয়া, পারিবারিক শোক, নিজেদের নিরাপত্তা এবং নানান দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি তখন শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক দিয়ে দারুণভাবে বিপর্যস্ত।

ডিফেন্স কলোনির বাড়িটির নিচতলার ডাইনিং-কাম-ড্রইংরুম এবং প্রত্যেকটি সংযুক্ত বাথরুমসহ দুটো শয়নকক্ষ। এর ছাদে সংযুক্ত বাথরুমসহ একটি শয়নকক্ষ, যা তখন গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দুপুরের খাবার ও বিকেলের চা-নাস্তা খাওয়ার পর ঐ দুই কর্মকর্তা চলে যান। ঐ বাড়ির জানালায় কোনো গ্রিল ছিল না। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই, রাতে রেহানাসহ সবাই মিলে একই শয়নকক্ষে থাকার। পরদিন অর্থাৎ ২৬ আগস্ট উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ঐ বাসায় আসেন আমাদের খবরাখবর জানার জন্য। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দেন সবকিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক জার্মানির আমার ঐ স্কলারশিপটি কয়েক মাসের জন্য সংরক্ষিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে। অতঃপর ২৭ আগস্ট তারিখে আমি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ঐ মর্মে পত্র পাঠাই।

ঐ বাড়ির চত্বরের বাইরে না যাওয়া, সেখানকার কারো নিকট আমাদের পরিচয় না দেয়া কিংবা দিল্লির কারোও সাথে যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল আমাদের সকলকে। অতএব নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঐ বাড়ির অতি ক্ষুদ্র চত্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি আমরা সকলেই। আমি রাতে শুয়ে সারাক্ষণ জেগে থাকতাম এক রকম নিরাপত্তা প্রহরীর মতো। মাঝে মাঝে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাতাম। রাতে কয়েক ঘণ্টা পর পর গেটে প্রহরারত দারোয়ানের সাথে বাইরের লোকের ফিসফিস কথা বলা সন্দেহের উদ্রেক করত। এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মাঝে মধ্যে হাসিনাকে সজাগ করতাম। সারা ভারতে তখন জরুরি অবস্থা আইন বলবৎ ছিল। সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতো না। কাজেই তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এভাবেই অতিবাহিত হয় সপ্তাহ দুয়েক। ইতোমধ্যে রেহানাসহ বাচ্চারা চক্ষুপীড়ায় (কনজাংটিভাইটিসে) আক্রান্ত হয়। এমন সময়ে একদিন ভারত সরকারের উক্ত যুগ্মসচিব হাসিনা ও আমাকে জানান যে, ঐ রাতে আটটায় আমাদের দু'জনকে অন্য এক বাসায় নেয়া হবে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য। সে রাতে সে বাসায় যাওয়ার পথে অপর একটি গাড়িতে আমাদের সাথে যান একজন অতিউচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। সেখান থেকে মিনিট পনের জার্নি করার পর আমরা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে পৌঁছাই। অতঃপর অতিউচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ঐ কর্মকর্তা আমাদের দুজনকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের একটি মাঝারি ধরনের বৈঠকখানায় নিয়ে যান। একটি লম্বা সোফায় হাসিনাকে বসানো হয় আর আমাকে আরেকটি লম্বা সোফা। এর প্রায় মিনিট দশেক পর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে হাসিনার পাশে বসেন। সামান্য কুশলাদি বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আমরা ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছি কি-না। এর জবাবে আমাদের জার্মানির বনে থাকাকালীন সময়ে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে 'রয়টার' পরিবেশিত এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত যে দুটি ভাষ্যের কথা বলেছিলেন, আমি তার পুনরুল্লেখ করি। অতঃপর ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ঐ কর্মকর্তাকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য জানাতে বলেন। তখন উক্ত কর্মকর্তা দুঃখভারাক্রান্ত মনে ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। এ সংবাদে হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধী তখন

হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টায় বলেন, তুমি যা হারিয়েছ তা আর কোনোদিনই পূরণ করা যাবে না। তোমার একটি শিশু ছেলে ও মেয়ে— ভাবতে হবে। এছাড়াও তোমার ছোট বোন ও তোমার স্বামী রয়েছে তোমার সাথে। এখন তোমার ছেলেমেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অতএব এখন তোমার কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়লে চলবে না। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এটাই ছিল আমাদের একমাত্র সাক্ষাৎকার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঐ সাক্ষাৎকারের তিন-চার দিন পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে নয়াদিল্লিস্থ ভারতের স্বাধীনতায় যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ 'ইন্ডিয়া-গেট'-এর নিকটবর্তী পারা রোডস্থ প্রতি তলায় দুটি ফ্ল্যাটের একটি সরকারি দোতলা বাড়ির উপর তলায় একটি ফ্ল্যাট আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়। ফ্ল্যাটগুলোতে দুটো করে শয়নকক্ষ। এ ফ্ল্যাটটিতে তখন কোনো আসবাবপত্র ছিল না। যা হোক, আস্তে আস্তে বাজার থেকে ভাড়ায় কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। অতঃপর ১ অক্টোবর সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে আমার জন্য একটি পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ ফেলোশিপের শর্তানুসারে বাসা ও অফিসে যাতায়াতের সুবিধাদির অতিরিক্ত আমাকে দৈনিক প্রদান করা হতো বাষট্টি রূপি (ভারতীয় মুদ্রা) পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। ঐ বাসাতেও আমাদেরকে একই নিয়ম পালন করার পরামর্শ দেয়া হয়। অর্থাৎ বাইরের কারও নিকট আমাদের পরিচয় না দেয়া, কারও সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ না করা এবং নিরাপত্তা প্রহরী ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব বলে আমাদের সকলকে স্মরণ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। সময় কাটানো ও নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের বাসায় সরবরাহ করা হয় একটি ভারতীয় 'সাদাকালো' টেলিভিশন। এছাড়া আমার একটি নিজস্ব ট্রানজিস্টারও ছিল। এ বাসায় কোনো টেলিফোন সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশ সম্পর্কে খবরাখবর রাখার আমাদের একমাত্র উপায় ছিল আমার ঐ ব্যক্তিগত ট্রানজিস্টার।



ওয়াহিদুল হক

মূর্তিময় বাংলা

কাজী নজরুল ইসলাম ইসলাম নিয়ে এমন কিছু ভাবিত ছিলেন না, মুসলমান নিয়েও নয়। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল মানবপ্রেম, ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও নিষ্পেষণ, সামাজিক অসাম্য, অনাচার এবং সঙ্গীত তথা বিমূর্ত সৃজনশীলতার বিশুদ্ধ আনন্দ। পক্ষান্তরে, তিনি তার উত্তরাধিকারের পারসিক-সারাসেনীয় অংশ বিষয়ে কোনো হীনম্মন্যতায় ভুগতেন না বলে—সে নিয়ে তার অযথা অহঙ্কারও ছিল না—তার অজান্তেই তিনি বাঙালি মুসলমানের জন্য বাঙালিত্বের বৃহৎ এবং ভারতবর্ষীয়তার বৃহত্তর পটে একটা ঠিকানা তৈরি করে যান। এমনটা হয়তো সাহস করে বলা যায় যে, বহুতর প্রশ্নে হিন্দুতে-মুসলমানে-খ্রিস্টানে-বৌদ্ধে মিলিত যে সমগ্র বাঙালি তার একটা বড় এবং সত্য ঠিকানা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও নজরুলেই বেশি পাওয়া যাবে—যদিও বাঙালিত্বের মর্ম, এই আর্দ্র শ্যামল করুণ বাংলামাতার কাতর কোমল অন্তরটি রবীন্দ্রনাথই জেনেছেন, ছুঁয়েছেন এবং আমাদের জানতে দিয়েছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ভেতরে বড় হয়েছেন। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ভেতরে ইসলাম কিংবা মুসলমানদের জন্য ভাবনা কমই ছিল। দুটি প্রবল উপাদান তাকে সর্বপ্লাবী করে তুলেছে। এক ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব উন্নতির নীতিবর্জিত দেশ চেতনাবিরহিত মোহতাড়িত প্রলুব্ধ অনন্ত ধাবন—যাতে নির্যাতিত নিষ্পেষিত মুসলমান এ ধুয়াটি অশেষ কার্যকর ছিল। দুই উত্তর ভারতীয় তথা আর্যাবর্তীয় পটে মুসলিম জমিদার-জায়গীরদার ও উচ্চ আমলা শ্রেণীর ইংরেজ শাসনে শিল্পায়ন-আধুনিকায়নের সুবাদে নিজেদের শতাব্দী-আগত সুবিধাসমূহের বিলুপ্তির কারণে একটি বৈষম্যপীড়িত

সংখ্যালঘুর এক জাতীয়তা কল্পনার ভেতরে একটা যথেচ্ছা চরে খাবার জায়গার অন্বেষণ। বাঙালি মুসলমানের সমস্যাটি ঠিক ঐ জায়গায় না হলেও উত্তর ভারতীয় মুসলমান জমিদার ও ধনীসম্প্রদায়, খানদানি পরিবার ও উঠতি প্রতিযোগী ব্যবসায়িক পুঁজির বিচ্ছিন্নতার জাতীয় মুক্তিবিরোধী রাজনীতি বাংলার মুসলমান চাষী-তাঁতীর সন্তানদের ভাষণই টানলো—পতিত ব্যক্তি পরিস্থিতি থেকে স্বল্প রাস্তার স্বল্পায়াসে ধনেমানে পৌঁছার মন্ত্র হিসেবে। বাঙালিত্ব, ভারতবর্ষীয়তাকে সহজেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একটা বুলি ধরলো. পতিত 'মুসলমান জাতির' উদ্ধারের এমনকি ইসলামের হৃতগৌরবের উদ্ধারেরও, পরম হিন্দু শয়তানদের চরমভাবে পরাস্ত করার, শতাব্দীর অপমান নির্যাতনের বদলা নেয়ার।

এসবের একটা রাজনীতি দাঁড়িয়েছিল উত্তর-ভারতীয় ধনী মুসলমানের নেতৃত্বে, যে নেতৃত্ব দেশকে চেনেনি, মানুষকে চেনেনি, চিনতে চায়নি, ব্রিটিশকে জেনেছি শত্রু হিন্দুকে শায়েস্তা করার মিত্র হিসেবে, ঔপনিবেশিক দাস্যে যার কোনোই আপত্তি ছিল না এবং উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্তের ব্যক্তি উন্নতির লোভ, হিন্দু সাম্প্রদায়িক চাপা দেয়া থেকে মাথা বার করে নিশ্বাস নেয়ার প্রাণপণ প্রয়াস অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, কংগ্রেসের ত্যাগী ও কারাভোগী রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জন দাশের উদার মানবতাবাদী উচ্চাদর্শ ইত্যাকার তাবৎ মহৎ এবং সমাজকল্যাণের ও মুক্তির সাধনা নির্মিত পথকে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুললো।

এই তো রাজনীতি ছিল বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশের—নজরুল যেখানে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এবং তারই ধারায় হুমায়ুন কবির এবং কাজী আবদুল ওদুদ, এমনকি কুমিল্লার আশরাফউদ্দীন চৌধুরীও। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এই লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধারের ধর্মধাপ্পাবাজির রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার এক প্রবল প্রমাণ কোনো বড় শিল্পী-সাহিত্যিক কোনো প্রবল মননের অধিকারী প্রকৃত প্রতিভাবান মানুষ জিন্নাহর স্যুট ও শেরওয়ানির, ইংরেজিয়ানার ও মুসলমানের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের দেশান্তর খেলার পিছনে ছিলেন না—যে কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেই—বনে খাটাশ-রাজা বনে বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা হিসেবে গণ্য হতেন সকল বাঙালি লীগারের কাছে।

ঐ রাজনীতির মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ রাজনীতির মধ্যেই বড় হয়েছেন। ঐ রাজনীতির ভেতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। আটচল্লিশ-বায়ান্নর সে মুসলিম লীগ মানসিকতা ধাক্কা খেলেও দ্বিজাতি তত্ত্ব ও তার ফসল পাকিস্তানের কার্যকর উপযোগিতা বিষয়ে সংশয়

প্রবল হয়ে নিজেকে ঘোষণা করেনি যতদিন গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবিত ছিলেন—যদিও এরই মধ্যে তার প্রকৃত দেশভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, সমাজভিত্তিক রাজনীতির অনুষঙ্গ জেলের ভাত-খাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দীয় বড়লোক মন্ত্রিত্বের রাজনীতির ঘেরাটোপ টপকানোর সাধনায় ব্যাটটাইজড হয়ে গিয়েছেন।

নজরুলের সাথে মুজিবের বড় হওয়ার ইতিহাসের গরমিলটি লক্ষণীয়। নজরুল প্রায় শৈশবেই ঘর ছেড়েছেন এবং তারপর জীবনভর করে গেছেন 'যখন যা চাহে মন যা'। দূর থেকে কবিগুরুর প্রাপ্য প্রণাম সেরেছেন, সাগরেদি করেননি কারো। কোনো সঙ্কীর্ণতার আবর্তে পড়েননি কখনও, সর্বসময়ে সকল আরোপিত গণ্ডী পেরিয়ে যেতে থেকেছেন। চিত্তটি তার বরাবর এমন ছিল 'জগত আদি সেথা করেছে কোলাকুলি'। ভারতবর্ষীয় পুরাকথায় আকীর্ণ তাঁর সাহিত্য—তাঁর মনও বটে, ভাবনাও বটে—সেখানে অকুণ্ঠ প্রবেশ পেয়ে যাচ্ছে শিথিল-ইসলামী স্বপ্নউপাদান। তাঁর গানে সকল উত্তরাবর্ত তো বটে, ইরান-তুরাগ তুর্কি-মগুরেব সকলই এসে মিলেছে। সামাজিক ধার্মিক অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিয়ে করেছেন সম্প্রদায়ের বাইরে, সন্তানদেরও কিছু মুসলমান করে বড় করেনি। বরাবর তিনি স্বাধীন ছিলেন, বিপ্লবস্বাপ্নিক ছিলেন, মানুষকেই মানতেন, তাদের তোলা দেয়ালগুলোকে নয়। এই করে তিনি প্রথমত আরও করেছেন বাঙালিত্বের ষোল-আনা আর তারপরে আরও কতো। মুজিব প্রথম থেকেই বদ্ধ ছিলেন, আবদ্ধ ছিলেন একটা সঙ্কীর্ণ, ফাঁপা স্লোগানের ভেদবুদ্ধিসর্বস্ব 'রাজনীতিতে'। কিন্তু সহজাতসূত্রেই যেন কর্মী ছিলেন তিনি, ছিলেন সংগঠনমনস্ক মানুষ, যার কোনোটির মুসলিম লীগ চত্বরে সুলভ ছিল না একেবারে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মুসলিম লীগের রাজনীতির মূল বিষয়টি অর্থাৎ হিন্দুদের দ্বারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চণা-নিষ্পেষণ মূলোচ্ছেদ—একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তখন ক্ষমতায় তিষ্ঠে থাকার জন্য এবং দেশ যাতে সাম্প্রদায়িক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে অগ্রসর আধুনিক রাষ্ট্র না হতে পারে, প্রকৃত জাতি-রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হতে না পারে সেজন্য তারা নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজে বের করে। সে নতুন শত্রু হচ্ছে কমিউনিস্টরা এবং তাদের সহযোগী নানা বরনের নানা ধরনের বামপন্থীরা। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী খোঁজ, ফজলুর রহমান ও ট্যারা খাজা শাহাবুদ্দীনের তেলেসমাতি কারচুপিতে খাজা নাজিমুদ্দীনের হেরে ভারতীয় মুসলমানদের সেবা করার জন্য ভারতেই থেকে

গেলে, বাংলা মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে বিরাট অনুসারী বাহিনী প্রায় এতিম হয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশ কালচক্রে ধীরে ধীরে নাজিমুদ্দীন তথা পশ্চিমাদের পাকিস্তানের পদলেহী অংশে ভিড়ে পড়ে। বাকিরা ভাসানী, আতাউর রহমান ও শামসুল হকের আওয়ামী লীগে যুক্ত হতে থাকে। আওয়ামী লীগ পয়ষট্টি সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় না-যেতে পারা মুসলিম লীগই ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বে সমানভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু কিছু পার্থক্য তো ছিলই—আওয়ামী লীগ আবুল হাশিম সংগঠিত বাঙালি মুসলিম লীগারদের অপেক্ষাকৃত সচেতন ও আদর্শবাদী মুসলিম অংশকে পেয়েছিল, যার উজ্জ্বল প্রতিভূ ছিলেন শামসুল হক এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ একেবারেই পশ্চিমা স্বার্থের ক্রীড়নক ছিল। ঐটুকু পার্থক্যের ফাঁক ধরে আওয়ামী লীগ বাঙালি মুসলিম চেহারা নিয়ে বাঙালিত্বভিত্তিক দাবি-দাওয়া, শোষণ-বঞ্চনার চেতনাকে ক্রমে তার রাজনীতির বিষয় করে তুলতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার শক্তিশালী উৎস ছিলেন শেখ মুজিব, যিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী থেকে পাওয়া বামবিদ্বেষ রোগে ভালোভাবেই ভুগতেন এবং এ কারণে প্রাক-পাকিস্তান মুসলিম রাজনীতির সঙ্কীর্ণতাকে এক নতুনরূপে বদলে নিয়ে তার ভেতরেই থেকে গেলেন। জেল খাটলেও সেখানে কমিউনিস্ট দাদাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন কাটালেও সমাজকে নতুন এবং উদার এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারাটাকে যেন তিনি প্রায় জেদ করেই ঠেকিয়ে যাচ্ছিলেন (এখন ভাবি ভাগ্যিস, তিনি বামপন্থী তথা কোঁদলবাজ বাক্যনবাব নপুংসকে পরিণত হননি) এবং তার সম্পর্কে বামপন্থীদের অবিস্মরণীয় স্মৃতি তার বৈজ্ঞানিক খাবার।

এতো নেতার ইতিহাস এটা বলার জন্য যে, ঠিক এই মানুষটিই নজরুলের পাশে একমাত্র বড় মানুষ যিনি বড় ভাবে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তথা মূল আত্মপরিচয়ঘটিত সঙ্কটের সবচেয়ে বড় সমাধানটি, শুধু নির্দেশ নয়, নির্মাণ করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে পৃথিবীর তাবৎ বাঙালিকে একটা দৈহিক তো বটেই, মানসিক ঠিকানা দিলেন তিনি। প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ একটি যেন হোমল্যান্ড পেয়ে গেল তাঁর কীর্তিসূত্রে এবং বাঙালিত্বের চরম উৎপাদনকারী সাম্প্রদায়িকতাকে উৎপন্ন করে পৃথিবীর বুকে তৈরি করলেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চার স্তম্ভের ওপর একটি জাতিরাষ্ট্র—দ্বিজাতিতত্ত্বের সরাসরি এবং দ্ব্যর্থহীন প্রত্যাখ্যানের ওপরে ভিত্তি করে।

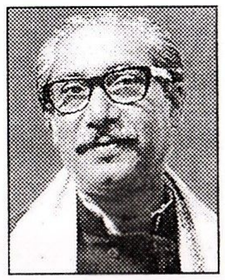
কী করে মুজিব নজরুলের জায়গায় পৌঁছে গেলেন, রবীন্দ্রনাথকে ছুঁলেন এবং ঐ উভয়ের তো রাজনৈতিক চিন্তা প্রয়াস কোনো গৌণ কর্ম ছিল

না—রাজনৈতিক অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের উভয়কে অতিক্রম করে গেলেন, ঐ মতো একটা পশ্চাৎপদ থেকে বেরিয়ে এসে? এখনও অবধি এ এক অব্যাখ্যাত রহস্য, কিন্তু শেষাবধি নিশ্চয়ই তা ব্যাখ্যাতীত থাকবে না।

সে ব্যাখ্যা সময়সাপেক্ষ, সাধনাসাপেক্ষ, প্রতিভাসাধ্য হতে বাধ্য। তবে এ রহস্যের উন্মোচন বাঙালির জন্য নিতান্ত জরুরি। আমি নিজেকে এ কাজের যোগ্য সাধক বলে ভাবি না, এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তির অভাব তার এক প্রধান কারণ। আমার শুধু থেকে থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন ঈশ্বরের বাঁশি কিংবা বীণা বলে নিজেকে ভেবেছেন জীবনের অধিকাংশ সময়, টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমানও এক সুমহান যন্ত্র ছিলেন, যার মধ্য দিয়ে বাঙালি মানুষের ঐতিহাসিক প্রয়োজন বেজে উঠেছে, যেমনটা তাঁর চেয়ে অনেক বড় জীবন ও সমাজ নির্মাতা রবীন্দ্রনাথেও বাজেনি, নজরুলে তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের বীণা হয়েছিলেন বীণা হতে চেয়েই। মুজিবের মধ্য দিয়ে কেন বাঙালির ইতিহাস সঙ্গীত হয়ে বাজল—সাম্প্রদায়িক, কমিউনিস্টবিরোধী তথা সমাজ প্রতিষ্ঠাবিরোধী মুজিবের ভেতর দিয়েই যেন বাঙালির সম্প্রদায় অতিশীয় জাতীয়তায় পৌঁছানোর, শোষণ-বঞ্চনাউত্তীর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের প্রয়োজনগুলো রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক রূপ পেল, যা কিনা কিছুকালের জন্য মেঘের আড়াল হলেও সূর্যেরই মতো চিরন্তর হয়ে থাকল। নানা অবাঞ্ছিত আঁচড়ে হারিয়ে অনপনেয় হয়ে থাকল?

উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য অপার অনন্ত ভালোবাসা—বাঙালি মানুষের জন্য অন্তহীন মমতা এবং যত মান পেয়েছেন ক্ষমতায় আরূঢ় হয়েছেন শুদ্ধ এবং নীতিমান থাকার অটল প্রয়াস।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই কি তাঁর কীর্তির শেষ? বাঙালির বাংলায় বাঁচার এবং বাড়ার পথ-নির্দেশও রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতোই তাঁরও এবং তাঁর খুব বড় কীর্তি বোধ করি তাঁর মৃত্যু। তিনি প্রায় ভাবতেন বীর আইয়েন্দের মৃত্যু হবে তার। তাই হলো। অবাঙালি পাকিস্তান তাকে মারল না, কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারল না। বাঙালি পাকিস্তানিরা তাঁকে মেরে অমর করল। চিনিয়ে দিল আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বীরকে, জানিয়ে দিল আমরা যাকে সময়েই ভুল জেনেছি, তিনিই আসল লোক—মূর্তিময় বাংলা।



কবীর চৌধুরী

কেন তিনি জাতির পিতা

'জাতির পিতা', 'ফাদার অব দ্য নেশন', একটি বহুল প্রচলিত শব্দগুচ্ছ। জাতি বলতে সেখানে অবশ্য স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রকেই বোঝায়, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গিত করে না। আমরা এ কথাও জানি যে, কোনো একক ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দেন না বা প্রতিষ্ঠা করেন না, কেউই শুধু তার একক চেষ্টায় পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে বিশ্ব মানচিত্রে কোনো নতুন একটি জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটান না। এর জন্য বহুকাল ধরে তীব্র কঠিন সংগ্রাম চলে, বহু নারী-পুরুষ সেই সংগ্রামে অংশ নেয়, নানাপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে, আত্মাহুতি দেয়। তবু আমরা এ কথাও জানি যে, ইতিহাসের কোনো কোনো পর্বে, কোথাও কোথাও, একক ব্যক্তি এত বিশাল গগনচুম্বী সর্বপ্লাবী ভূমিকা পালন করেন, তাঁর অবদান এত কেন্দ্রীয় ও চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসেবে তার কর্মকাণ্ড এত ফলপ্রসূ হয় যে, দেশের মানুষ তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার মাথায় জাতির পিতার শিরোপা পরিয়ে দেয় এবং বিশ্ববাসীও তাঁকে সেভাবে দেখে। এভাবেই আমরা পেয়েছি ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে, পাকিস্তানের কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে, নয়া তুরস্কের আতাতুর্ককে এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও সমগোত্রীয় শব্দগুচ্ছের প্রচলন আছে, তবে সেখানে বলা হয় প্রতিষ্ঠাতা-জনকগণ, ফাউন্ডিং-ফাদার্স।

যে পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল তার প্রধানতম প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিব।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে আমরা একটা মেকি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, সে আন্দোলনের সাথেও শেখ মুজিব জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে অন্যান্য দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদবিরোধী মুসলমান তরুণের মতো তিনিও মুসলিম লীগের হয়ে নানা সংগ্রাম কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। নবলব্ধ পাকিস্তানে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পাবে না, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রত্যাশা এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার যে এখানে শুধু উপেক্ষিত নয়, নিষ্পেষিত ও লঙ্ঘিত হবে, সেটা বুঝতে তার দেরি হয়নি। এরই ফলে ১৯৪৮ সাল থেকেই আমরা তাকে স্বৈরাচারী অগণতান্ত্রিক শাসকবর্গের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি। সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রা-হরতাল সংগঠনের অভিযোগে ১৯৪৮-এর মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার 'অপরাধে' ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। সে সময়ে আরো কতিপয় আন্দোলনকারী ভবিষ্যতে সৎ আচরণের মুচলেকা দিয়ে নিজেদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নেয়, কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে তা ছিল অচিন্ত্যনীয়। তখন থেকেই তাঁর তুচ্ছ ও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জীবনের অনেকগুলো বছর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অতিবাহিত করেন। একাধিকবার তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার চেষ্টা করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার সময়ে, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল 'পিণ্ডি ষড়যন্ত্র' মামলা এবং পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কারাগারে নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে বন্দি, তখনও, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও শেখ মুজিব আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। মুহূর্তের জন্যও তিনি আপোসকামিতাকে প্রশ্রয় দেননি, সর্বদা তার ইস্পাত কাঠিন মনোবল অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি ঐ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন, তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর হলো এবং তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার দ্রুত বিকাশ ঘটল। মূলত তাঁরই অক্লান্ত এবং কুশলী কর্মোদ্যোগের ফলে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে নূরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি ঘটে এবং প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব তখন মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হন এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসককুল অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তারপরই বাঙালির স্বার্থরক্ষাকারী প্রায় তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে কারাগারের প্রবেশ পথে সহিংস প্রতিবাদসহ নানা অভিযোগ আনা হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেদিন পাকিস্তানের শাসকবর্গ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য আঁটঘাট বেঁধে নেমেছিল। প্রায় এক বছর ধরে মামলা চলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিব তখন আওয়ামী লীগকে দেশব্যাপী সুসংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার এবং শেষে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বাঙালির সংগ্রামী সকল তৎপরতায় শেখ মুজিবের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে নিজেকে একাত্ম করলেন। তাঁর এই বিকাশ অন্য সব নেতা থেকে পৃথক করে তাঁকে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা ও বেশিষ্ট্যে ভূষিত করে। বিশেষ করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করতে হয়। মধ্য ষাটের দশকে তিনি যুগান্তকারী 'ছয় দফা' প্রণয়ন করে এবং ছয় দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংহত করেন। ছয় দফার মধ্যে নিহিত ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বীজ।

দেশের মানুষ অকারণে বা নিছক আবেগের তাড়নায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয়নি। ষাটের দশকের শেষ দিকে ঊনসত্তরের গণবিক্ষোভসমূহ এবং সত্তরের গণআন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করে শেখ মুজিব যেভাবে দুর্বার জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলেন এবং দেশবাসীর চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তুঙ্গে নিয়ে যান, তা এক কথায় তুলনারহিত। ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চের মধ্য রাতে পাক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দি হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চল, তথা সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সেই বাংলাদেশের জনগণমন অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের সাথে এক অসাধারণ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়, যা ব্যাপ্তিতে, শান্তিপূর্ণ

প্রয়োগে, দৃঢ়তায় এবং সর্বাত্মক সাফল্যে বিশ্ব ইতিহাসের সামনে এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছে।

আমাদের মনে পড়ে ১৯৭১-এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কথা, যা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনেরই বিজয়। আমাদের মনে পড়ে, ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি তারিখে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসমাবেশের কথা, যেখানে বঙ্গবন্ধুর পরিচালনায় ৪১৭ জন নবনির্বাচিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলির সদস্য ছয় দফা এবং এগারো দফা কর্মসূচির প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় ভাষণের কথা। তিনি দেশবাসীকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান। বলেন যে, লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। তিনি যদি নির্দেশ দানের জন্য নাও থাকেন, তবুও। বজ্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন যে, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর ঐ ঘোষণাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। তাই তিনি যদি হুকুম দেয়ার জন্য নাও থাকেন, বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম যেন অব্যাহত থাকে, সে কথা সেদিন তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন। তবে এ কথা তিনি আরো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে, ইংরেজি দিনপঞ্জি অনুযায়ী তখন ২৬ মার্চ শুরু হয়ে গেছে। সর্বত্র বেতারযোগে পাঠানোর জন্য তিনি একটি বাণী সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দেন। বিখ্যাত মার্কিন লেখক রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, বাণীটি ছিল নিম্নরূপ : 'পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।' এ প্রসঙ্গে জেনারেল ওসমানী এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার সালিকের একটি বইয়ের উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ রাতে যখন সালিক টিক্কা খানের সাথে বসেছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসে ভেসে আসছিল। বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বান চট্টগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পৌঁছে যায়। ২৬ মার্চ দুপুরের আগেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীটি হ্যান্ডবিল আকারে চট্টগ্রাম শহরে বিলি করা হয়। সেই সন্ধ্যাতেই

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ ঘোষণা অনুযায়ীই আমরা ২৬ মার্চ তারিখটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাদের স্বাধীনতার মূল স্থপতি, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সারথি ও অগ্নিপুরুষ। মুক্তিযুদ্ধকালীন একাত্তরের নয় মাস তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা এবং অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিকামী বাঙালি জনগণ ঐ নয় মাস তাঁর দৃপ্ত মুখমণ্ডলকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, তাঁর স্লোগান 'জয় বাংলা'কে কণ্ঠে ধারণ করে স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বস্বপণ করে লড়েছে। তাঁর অনুপস্থিতিতেও তিনি বেঁচে আছেন না নিহত হয়েছেন তা জানার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, তাঁকেই বসিয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আসনে। দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধুই যে জাতির পিতার আসনে আসীন হবেন, এ সত্যটি তখনই সবার চিত্তে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছিল।

এ সত্যটি পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের কাছেও অস্পষ্ট থাকেনি। বঙ্গবন্ধু তার দুর্জয় সাহস, গভীর আত্মবিশ্বাস, প্রবল দেশপ্রেম, দৃঢ় সংকল্প ও নেতৃত্বের বিভিন্ন গুণাবলীর কারণে তাদের চোখে হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানের প্রধানতম শত্রু। আইয়ুব খান তাঁকে আগরতলা মামলার মাধ্যমে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানও ঘোষণা করেছিলেন যে, মুজিব হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু, তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতেই হবে। পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকবর্গ কর্তৃক শেখ মুজিবের মূল্যায়ন এবং বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে এ অঞ্চলের আপামর জনগণ কর্তৃক শেখ মুজিবের মূল্যায়ন দুই-ই এক বিন্দুতে মিশে তাঁর মাথায় বাংলাদেশের জাতির পিতার শিরোপা পরিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালি জাতির পিতা বলে উল্লেখ করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ আরো একটি চমৎকার তথ্য দিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক রচনায়। তিনি জানিয়েছেন যে, গণপরিষদের সদস্য নাটোরের আশরাফুল ইসলাম মিঞা ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল পরিষদের প্রথম সভাতেই স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভাকক্ষে

কেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নেই সে প্রশ্ন তোলেন এবং প্রস্তাব করেন যে, জাতির পিতার ফটো না দেয়া পর্যন্ত হাউস মুলতবি রাখা হোক। এর পর উপস্থিত সদস্যদের সমবেত ইচ্ছার ভিত্তিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি হাউসে সংস্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু যে জাতির পিতা, গণপরিষদেই তা সেদিন সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়। পরে বাংলাদেশের সংবিধানেও এর স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি যখন জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়, তখন সংশোধনীর ৩৪নং অনুচ্ছেদে লেখা থাকে : 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন।' ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদে পঞ্চম সংশোধনী পাস করান, যার মাধ্যমে বলা হয় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত যে সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন ইত্যাদি প্রণীত হয়েছে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন ইত্যাদি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এখানে যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, তা এই যে, সামরিক ফরমানে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে জাতীয় দল বিলুপ্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ৪৫ নং অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হইবেন, বাতিল করা হয়নি। তাই সাংবিধানিকভাবেও বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, যদিও সমগ্র দেশবাসী জানে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর্কিত করে তোলা এ বিষয়টি আসলে মোটেই সংবিধান সম্পর্কিত নয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালিত্বের চেতনাবিরোধী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহ নানা কূটতর্ক তুলে চলেছে তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

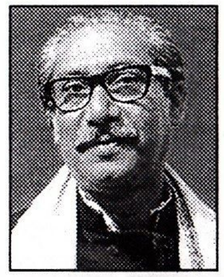
দেশবাসীর মানসপটে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘকাল ধরেই জাতির পিতারূপে বিরাজমান। তার সে আসন টলানোর শক্তি কারো নেই। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে, নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙালি জনগণ যখন আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠেছিল, তখন দেশের অগ্রজ কবি জসীমউদ্‌দীন ঢাকা রেডিও থেকে স্বকণ্ঠে 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির কয়েকটি চরণ ছিল নিম্নরূপ :

মুজিবুর রহমান
ঐ নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারি বান
.....

জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী তব পাচ্ছে
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।
রাজভয় আর কারা শৃঙ্খল হেলায় করেছ জয়
ফাঁসির মঞ্চে মহত্ত্ব তব কখনো হয়নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ
প্রতি বাঙালির হৃদয়ে তোমার তখ্ত তাজ ॥

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের, কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, যদিও বিজয়ী বাঙালি স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছে যে, এবার তারা তাদের বীরনেতাকে শীঘ্রই নিজেদের মধ্যে ফিরে পাবে। ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতার দাবিতে তাদের সে আশা পূর্ণ হতে বেশি দেরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু বাংলার মাটিতে, তাঁর মুক্ত স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। এর আগেই আন্তর্জাতিক তৎপরতা ও পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতির ফলে যখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়ে যায়, তখন সংগ্রামী কবি সিকান্দার আবু জাফর 'ফিরে আসছেন শেখ মুজিব' নামে একটি চমৎকার কবিতা লেখেন। সিকান্দার তখন বাংলাদেশের আরো বহু দেশত্যাগী মানুষের মতো ভারতের পশ্চিম বাংলায় শরণার্থী হয়ে বাস করছিলেন। তার কবিতাটি ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে 'কেন তিনি জাতির পিতা' শীর্ষক আমার এই লেখা শেষ করছি :

মুক্তিকামী মানুষের শুভেচ্ছার পথে
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক
শেখ মুজিবুর রহমান
ফিরে আসছেন বাংলাদেশে
.....
করতালি মুখরিত পথে
ফিরে আসছেন তিনি জাতির জনক
সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে...॥



কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

ছয় দফা ও শেখ মুজিব

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা বাঁধা পড়ে গেল নতুন এক ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশে। অথচ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে। সেখানে স্বাধীনতা তো দূরের কথা পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলা বঞ্চিত হলো ন্যূনতম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে। যদিও পাকিস্তানের ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মিলটুকু ছাড়া নৃতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছিল হাজার মাইলব্যাপী ভৌগোলিক দূরত্বের মতোই বিপুল। এদিকে বিভাগপূর্ব আমলে যেমন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল অবাঙালিদের হাতে তেমনি নতুন রাষ্ট্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটলো না। যেন এক অলঙ্ঘনীয় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় নতুন রাষ্ট্রেও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো মূলত অবাঙালি চক্র। পাকিস্তানি এ শাসকগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলমান এবং আদি পাকিস্তানি এলাকা থেকে বিশেষত পাঞ্জাবের ভূস্বামী, সামরিক-বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি ও পেশাজীবী গোষ্ঠী দ্বারা। বাঙালির দুর্ভাগ্য ছিল এইখানে যে, পূর্ব বাংলা থেকে যারা এ শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন তাদের কেউ কেউ ছিলেন উর্দুভাষী (যেমন—খাজা নাজিমুদ্দীন), বাদ-বাকিরা বাংলাভাষী হলেও তারা সকলেই অবিমিশ্র বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি প্রেমিক ছিলেন এমন বলা যাবে না। তদুপরি তাদের ছিল সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ছোট ছোট ব্যক্তিগত

লাভ-ক্ষতি, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ। গোটা পাকিস্তান আমলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভুরি ভুরি।

আইয়ুবীয় সামরিক শাসনপূর্ব এগারো বছরে (১৯৪৭-১৯৫৮) মোট সাতজন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিনজন ছিলেন বাঙালি—খাজা নাজিমুদ্দীন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এদের কেউই পূর্ব বাংলার প্রত্যাশা এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের পক্ষে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেননি বা করতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী ছাড়া অন্য দুজন তেমন কোনো চেষ্টাও করেননি। উল্লেখ্য, এই দীর্ঘ এগারো বছরে পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয়নি—পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সভয়ে সুপরিকল্পিতভাবে জনতার মুখোমুখি হওয়াকে এড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যে একবার ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় যে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে তারা বাধ্য হয়েছিল তাতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের শোচনীয় ভরাডুবি ঘটেছিল। পূর্ব বাংলায় ঐ নির্বাচনে সরকারবিরোধী যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার ছিল বাংলার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়। ভয় পেয়েছিল অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী। তাই বিজয়ী সেই যুক্তফ্রন্ট সরকার দুই মাসও টেকেনি—ক্ষমতার ভাগাভাগিজনিত তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তাদেরকে। এভাবে পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাঙালির জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের প্রথম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সুযোগ এসেছিল ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনার সময়ে। গত প্রায় এক দশকের পাকিস্তানি শাসনে বাঙালির তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল এই যে, অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বায়ত্তশাসন দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য বরাবর 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' অজুহাতকে ব্যবহার করে এসেছে। তাই এই সংবিধান রচনার সূচনাকাল থেকেই তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সুনির্দিষ্ট অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রের দাবিতে সোচ্চার ছিল প্রবলভাবে। গণপরিষদে এ সংবিধানবিতর্কে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ এবং সংসদীয় দলনেতা সোহরাওয়ার্দী জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি যেদিন স্বায়ত্তশাসনের বিধানবিহীন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের ভিত্তিতে প্রণীত নতুন সংবিধান পাস হয় সেদিন আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ অন্য ছোট দু-একটি গ্রুপের সাথে

প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন। কিন্তু অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী এবং বাঙালি রাজনীতিবিদদের একাংশের আপোসকামিতার কারণে শেষ রক্ষা হয়নি। তবে শাসনতন্ত্র পাস হলেও আওয়ামী লীগ তার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে থাকে।

নতুন এ সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। তখন নির্বাচন তথা জনতার আদালতে হাজির হওয়াকে ঠেকানোর সর্বশেষ উপায় হিসেবে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন অবাঙালি গোষ্ঠী বেছে নেয় সামরিক শাসনকে। কেন্দ্রে ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন সেনাশাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে। অতঃপর প্রত্যক্ষ বা ছদ্মবেশী সামরিক শাসনের এ ধারাই অব্যাহত ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত। অব্যাহত থাকে কেন্দ্র কর্তৃক পূর্ব বাংলার প্রতি এতদিনকার বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতিগত নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটটি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। রাজনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনে এবং সামরিক বাহিনীতেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of Pakistan) এবং সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য আর্থিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সবক্ষেত্রেই প্রধান নির্বাহী ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের অধিকাংশেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা অধিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালির কোনো ভূমিকাই ছিল না শুরুতে– এগুলো পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী ছিল বলা যায়। পরবর্তীতে কিছু বাঙালি এ বাহিনীগুলোতে চাকরি পেলেও তাদের অবস্থান ছিল নিম্ন পর্যায়ের এবং ভূমিকাও ছিল তদ্রূপ।

তাই পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিমাতাসুলভ আচরণ ও চক্রান্তের জাল শুরু থেকেই বহুল বিস্তৃত হতে থাকে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা প্রয়োগের তিনটি অঙ্গকেই (রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সশস্ত্র বাহিনী) পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ করার কাজে নির্মম নৈপুণ্যে ব্যবহার করা হতে থাকে। ফলে অচিরেই করাচি পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর পরিণামে সূচিত হয় (যাকে Gunnar Myrdal 'Cumulative Causation' আখ্যা দিয়েছেন) এমন এক প্রক্রিয়া, যা বড় ব্যবসায়ী

পুঁজিপতি ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের করাচি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে আকৃষ্ট করে। পূর্ব পাকিস্তান থাকে অবহেলিত। ভারত থেকে যেসব ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান চলে আসেন তারা ব্যবসায়ের খাতিরেই করাচিকে করেন তাদের ঠিকানা। পশ্চিম পাকিস্তানে তাই বিনিয়োগ বাড়ে, চাকরির সুযোগ বাড়ে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদ ব্যবহার ক্ষমতা (absorptive capacity) খুবই দুর্বল এই ধুয়া তুলে সেখানে সম্পদ বরাদ্দ সীমিত রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানির জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যেরও অতি বৃহৎ অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ করা হতে থাকে। কৃষিপ্রধান পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি থাকে উপেক্ষিত। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় নগণ্যসংখ্যক শিল্প-কারখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশই ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের মালিকানায়। ষাটের দশকে কিছু পাট ও বস্ত্রকল বাঙালি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প খাতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য বজায় থাকে। অব্যাহত অবহেলা ও শোষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

অব্যাহত পাকিস্তানি রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে তীব্র বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাটিকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়াও পাকিস্তানের নিরাপত্তা কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা হিসেবে সরকারিভাবে বিবেচিত হতে দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিকে কোনো নজরই দেয়া হয় না। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে তাই পূর্ব পাকিস্তান থাকে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। পরে জানা যায় যে, পরাশক্তিদের হস্তক্ষেপের কারণে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পায়।

দুই

বাঙালির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি আগ্রাসন শুরু হয় বাংলা ভাষার ওপর আঘাতের মাধ্যমে। হাজার বছরে গড়ে ওঠা একটা সমৃদ্ধ ভাষা-সংস্কৃতির গর্বিত উত্তরাধিকারী হিসেবে বাঙালিদের ন্যায্য প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। তার বদলে পাকিস্তানিদের উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে

দেয়ার অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধের ফসল ছিল ১৯৪৮-১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন। সেটা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নতুন করে গড়ে ওঠার সময়, ভবিষ্যৎ স্বাধিকার আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপনের কাল।

পূর্ব পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও পঙ্গু করে রাখা হয়। কেবল পশ্চিম পাকিস্তান হয়েই বহির্বিশ্বের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বিমান যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে মাসাধিককাল পূর্ব পাকিস্তান ছিল বহির্বিশ্বের সাথে বিমান যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন, ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও নিরাপত্তাবিহীন। ঐ যুদ্ধের সময়ে বাঙালির কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতা ও ভূ-রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দুয়ের সহযাত্রা সম্ভব নয়।

ঐ যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাস পাঁচেক পর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ লাহোরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কনভেনশনে শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবকে তিনি বাঙালির বাঁচার দাবি বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮ বছর ধরে অব্যাহত রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, এসবের মোকাবিলায় বিভিন্ন কালপর্বে বাঙালির শান্তিপূর্ণ প্রয়াস, জঙ্গি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫-এর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই ছয় দফা রচিত হয়। শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন—ছয় দফায় নতুন কোনো বিষয় নেই; অতীতে বাঙালিদের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি এবং সেগুলো পূরণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই এই দাবিনামা রচিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, এ ধারাগুলো এমনভাবে চয়ন ও গ্রন্থনা করা হয় যে, ছয় দফা প্রস্তাবে প্রকৃতপক্ষেই বাঙালির বাঁচার দাবি ঘোষিত হয়। তদুপরি সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, ছয় দফা বাঙালিকে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়ে কালক্রমে এমন এক ধারাবাহিকতার সূচনা করতো, যার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো কেবল বাঙালির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায়।

তিন

এখন দেখা যাক, ছয় দফায় কি কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথম দফা : লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে গণতান্ত্রিক সরকারভিত্তিক পাকিস্তান ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলোর সংসদ

প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। (পরবর্তীতে 'লাহোর প্রস্তাবের' উল্লেখ বাদ দেয়া হয় এবং ফেডারেল সংসদ অঙ্গরাজ্যগুলোর জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব গঠনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

দ্বিতীয় দফা : শুধু বিদেশ নীতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ফেডারেল সরকারের দায়িত্বে থাকবে। বাকি সব বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিয়ারভুক্ত হবে।

তৃতীয় দফা : যদি এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যায় যাতে দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি পাচার রোধ নিশ্চিত করা যাবে, তবে সারা দেশের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। অন্যথায় (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য) দুটি আলাদা মুদ্রার ব্যবস্থা করা হবে।

চতুর্থ দফা : কর নির্ধারণ ও আদায় অঙ্গরাজ্যসমূহের এখতিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারকে নির্ধারিত অর্থ দেয়া হবে।

পঞ্চম দফা : অঙ্গরাজ্য দুটি আলাদা আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

ষষ্ঠ দফা : অঙ্গরাজ্যগুলো সমস্ত আধাসামরিক বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

১৯৬৬ সালে বিভিন্ন দফা যেভাবে রচনা করা হয়েছিল, ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময়ে কোথাও কোথাও তার কিছু পরিবর্তন করা হয়। ঐ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে চারটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করার কারণে কোনো কোনো প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন এমনিতেই দেখা দেয়। যাই হোক, বিভিন্ন প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব রাখা হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পশ্চম দফায় অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রস্তাব বিধৃত হয় এবং ষষ্ঠ দফা ছিল নিরাপত্তা বিষয়ক।

অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহের আওতায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় অঙ্গরাজ্যগুলোকে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানকে। বিদেশ নীতি ও নিরাপত্তা ফেডারেল সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হলেও ষষ্ঠ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাও বহুলাংশে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে বর্তায়। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য অঙ্গরাজ্যগুলোর দায়িত্বে থাকার প্রস্তাবের দ্বারা বিদেশ

নীতির ক্ষেত্রেও ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ফেডারেল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকাই তাই থাকলো না।

ছয় দফা প্রস্তাবের রচয়িতা কে বা কারা এ নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলে থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর বলে আমার মনে হয়। আমরা জানি, একজন শীর্ষ নেতার বক্তৃতা প্রণয়নে সহযোগী থাকা স্বাভাবিক। বক্তৃতা বা প্রস্তাব কে বা কারা তৈরি করলেন বা সেই কাজে সহায়তা করলেন তা জরুরি কথা নয়। আসল কথা হলো কার দায়িত্বে তা চূড়ান্ত রূপ নিলো এবং উপস্থাপিত হলো। ছয় দফার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রচনায় বিভিন্ন জনের অবদান থাকাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু মুজিব নিজেই বলেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিদের উত্থাপিত নানা বক্তব্য ও প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই ছয় দফা রচনা করা হয়। তবে তাঁর নেতৃত্বে এর চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তিনিই দায়িত্ব নিয়ে তা উত্থাপন করেন। কাজেই এর রূপকার তিনিই, দায়িত্বও তাঁরই। আসল কথা এটাই।

চার

আইয়ুব খান ও তার পশ্চিম পাকিস্তানি সহযোগীরা ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রস্তাব এবং দেশকে ধ্বংস করার চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, বাঙালির এ প্রস্তাবিত পথ দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে এবং ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। তিনি অস্ত্রের ভাষা ব্যবহারের হুমকি দেন এবং চক্রান্তকারীদের 'স্বপ্নবিলাস' চুরমার করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। তার সাথে সুর মেলান অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা। এদিকে ঐ মার্চ মাসে শেখ মুজিবকে অন্তরীণ করা হয়। আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকেও নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগের ডাকে ঢাকায় মানুষের ঢল নামে। পুলিশের গুলিতে ৪১ ব্যক্তি প্রাণ হারান এবং আরো শত শত লোককে জেলে নেয়া হয়। এ কারণে এবং পরবর্তীতে জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলায় জড়ানোর ফলে ছয় দফার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে। ছয় দফা এবং শেখ

মুজিব ও তাঁর সহযোগীদের ধ্বংস করতে গিয়ে আইয়ুব খান ও তার দোসররা ছয় দফাকে শিগগিরই এক দফায় অর্থাৎ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরকে করে তোলেন অনিবার্য। আর শেখ মুজিব অধিষ্ঠিত হন বাঙালির এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একচ্ছত্র নেতৃত্বে। তিনি এবং আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকর্মী কারারুদ্ধ থাকায় ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে ছয় দফা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত থাকলেও আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে এসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া এতো তীব্র হয়ে ওঠে যে, ঢাকা তো বটেই সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। আইয়ুব খান আগরতলা মামলা তুলে নিয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন এবং এর কিছুদিন পর ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন। শেখ মুজিবকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি নিজেই পরিণত হলেন ইতিহাসের খলনায়কে। এর আগেই শেখ মুজিব যথার্থই ভূষিত হয়েছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে নির্বাচন দেন। ক্ষেত্র তৈরিই ছিল। যোগ হলো নির্বাচনী প্রচারণা। এদিকে নির্বাচনের আগের মাসে অর্থাৎ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকার ওপর বয়ে যাওয়া প্রলঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন উদাসীনতা ও অবহেলা চরম ঘা দেয় বাঙালি চেতনায়। ছয় দফার যৌক্তিকতা আবারও প্রমাণিত হলো, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে যোগ হলো নতুন মাত্রা। যেন ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল সাবধানী বাঙালির আবারও রাষ্ট্র ভাঙাগড়ার সকল হিসাব-নিকাশ। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলার মানুষের কাছে গৃহীত হলো তাদের মুক্তিসনদ রূপে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আশি ভাগের বেশি ভোটার রায় দেন ছয় দফার পক্ষে। আওয়ামী লীগের এ বিপুল বিজয় নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো ছয় দফার জনপ্রিয়তা। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাননি বঙ্গবন্ধু। কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে। হাজার বছরের ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় বাঙালি জাতি এসে দাঁড়িয়েছিল এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে। আসন্ন হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের পটপরিবর্তন। এক হয়ে গিয়েছিল নেতা ও জনতার স্বপ্ন, উদ্বেল হয়ে উঠেছিল বাঙালির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার রূপ দিতে অবিসংবাদিত

নেতার হাত ধরে জনতা এগিয়ে গেল অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Syed Humayun, Sheikh Mujib's 6 Point Formula– An Analytical Study of the Breakup of Pakistan, Royal Book Company, Karachi, 1995.

২. A. M. A. Muhith, Bangladesh : Emergence of a Nation, The University Press Limited, Dhaka 1978.

৩. Tariq Ali, Can Pakistan Survive? The Death of a State, Penguin Books, England 1983.

৪. বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র– বিভিন্ন খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২।

৫. Moudud Ahmed, Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy, UPL, Dhaka 1979.



কামরুদ্দীন আহমদ

স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিব

শেখ সাহেব ছিলেন ভালো-মন্দের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কঠোরতা ও নম্রতার এক অদ্ভুত উদাহরণ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন একজন বড় দেশপ্রেমিক। বাংলাদেশকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি চরমপন্থীদের রাজনীতি বুঝে উঠতে পারেনি। তাঁর পক্ষে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভারতের আচার্য কৃপালিনী তার এক গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তবে দেশপ্রেমিক বলতে যা বোঝায় ইন্দিরা তা নন। তার কারণ বোধহয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাড়া দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবা করার সুযোগ তার হয়নি। দেশপ্রেমিকরা স্বপ্নিল হন, তাই বাস্তব ক্ষেত্রে ভুলচুক হওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক। দেশপ্রেমিকের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে যতটা প্রসারিত থাকে ততটা থাকে না বর্তমানের দিকে। আচার্যের দেশপ্রেমিক সম্বন্ধে উপরিউক্ত মন্তব্য অনেকটা শেখ সাহেবের ওপর প্রযোজ্য।

শেখ সাহেব সম্বন্ধে যাই বলা যাক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তাঁর সময় গণভবন একটা পুরোদস্তুর আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। শেখ সাহেবকে সাহায্য করতে তাঁর পাশে যারা অবস্থান করতো তারা প্রত্যেকেই মনে করতো যে, তারা আজীবন গণভবনের অধিবাসীই থাকবে। নানারকম নির্দেশ যেত ঐ গণভবন থেকে। থানার দারোগা থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তারা পর্যন্ত সবাই তটস্থ থাকতেন গণভবনের নির্দেশের ভয়ে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, স্বাধীনতার পরপরই নেতারা

তাদের দলের লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। দলের লোকজনের জন্য সেক্রেটারিয়েটে থাকে অবাধ যাতায়াতের অধিকার। ভারতে এক সময় মাথায় খদ্দরের টুপি দেখলেই লোকে তাকে পারমিট শিকারী বা মাল পাচারকারী ভাবতো। পাকিস্তান হওয়ার পর করাচিতে ঐ অবস্থা কিছুটা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু জিন্নাহ সাহেব বা লিয়াকত আলী খান রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না তাই সেক্রেটারিয়েটে ভিড়টা হতো ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীরা যেহেতু নব্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠলো তাই তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো শেখ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। মন্ত্রীদের ঘরে পারমিট শিকারীদের ভিড় লেগেই থাকতো। ফলে মন্ত্রীদের পক্ষে কাজকর্ম করা ছিল সাধ্যের বাইরে। মন্ত্রীদের ঘরে চলতো একে অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটনা। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দেশের ঐ দুর্দিনে কিছু ভারতীয় সাংবাদিক শেখ সাহেব সম্বন্ধে মুখরোচক কথা লিখে বাহাদুরি পেতে লাগলেন। তাদের লেখা পড়লে মনে হতো যে, রাষ্ট্রের যতো গোপন কথা বা ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে আলাপ আলোচনা, এমনকি দিল্লির সাথে আলোচনাও তাদের উপস্থিতিতেই হয়। বসন্ত চ্যাটার্জি নামক এক সাংবাদিক *'In side Bangladesh Today'* নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বইটি সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর ভিত্তি করে লেখা। শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা ও সমালোচনায় পরিপূর্ণ। তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের দালাল হিসেবে। হাইকমিশন থেকে খবর নিয়ে দেখা গেল যে, বইটি লিখেছেন বাংলাদেশেরই একজন বামপন্থী সাংবাদিক। বসন্ত চ্যাটার্জি নামক ভদ্রলোক কিছু টাকার বিনিময়ে তার নাম বইটিতে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

শেখ সাহেব রাতের অন্ধকারে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তিনি এ ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যেও সাড়ে তিন বছর জীবিত ছিলেন এটাও তাঁর জন্য যথেষ্ট বলেই মনে হয়। কারণ গান্ধীজী আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার কয়েক মাস পরেই। বার্মার আওংসান তার মন্ত্রীদের নিয়ে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন বার্মার স্বাধীনতা আসার পূর্ব মুহূর্তে। লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই নিহত হয়েছেন আততায়ীর গুলিতে। ভারত এবং বার্মার আততায়ীদের বিচার হয়েছে, দোষী ব্যক্তিরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে। বিচার হয়নি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হত্যার, বিচার হয়নি শেখ মুজিব হত্যার। এর কারণ হতে পারে যে, গান্ধীজী ও আওংসান হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে কোনো

বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল না। পক্ষান্তরে, লিয়াকত আলী খান ও শেখ মুজিব হত্যার পেছনে জড়িত ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি। শ্রীলঙ্কায়ও নিহত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকে। কিন্তু অন্য কোনো দেশে রাষ্ট্রনায়ককে স্ববংশে হত্যা করা হয়নি। শেখ মুজিবের বাড়িতে তার আট-নয় বছরের ছেলেকেও রেহাই দেয়নি হত্যাকারীর নির্মম হাত। নিহত হয়েছিলেন তার স্ত্রী, তার সকল পুত্র সন্তান ও পুত্রবধূরা। শেক্সপিয়রের ভাষা : 'Men, wives and children stare, cry out and run, As it were dooms day'

সত্তর দশকে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত রেশারেশি। ১৯৭১ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যখন যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তানের আতাত গড়ে উঠেছিল তখনই হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালিদের ওপর তাই ক্ষিপ্ত হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

মারণাস্ত্র তৈরি প্রতিযোগিতা চলছিল দুই পরাশক্তির মধ্যে। মারাত্মক প্রতিযোগিতা চলছিল বিশ্বজোড়া প্রভাব বিস্তারের। সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত যখন উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তখন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তেমনি একটির পর একটি কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। যেসব রাষ্ট্রে সোভিয়েতের প্রভাব ছিল বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল, সেসব রাষ্ট্রে নেতৃত্বকে সিআইএর মাধ্যমে বিপর্যস্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণকে, অস্ট্রেলিয়ার হুইটলামের বিরুদ্ধে ফ্রেজারকে, শ্রীলঙ্কার মাদাম বন্দরনায়েকের বিরুদ্ধে জয়বর্ধনকে নির্বাচনে জেতার জন্য তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করল। কিন্তু বাংলাদেশে কাউকে পাওয়া গেল না, শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর স্থান দখল করার জন্য। সুতরাং বাংলাদেশে চিলির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ঘটানো হলো সামরিক অভ্যুত্থান।

তিন বছর ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করেও শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ অথবা কোনো বড় ধরনের বিক্ষোভও সৃষ্টি করতে পারেনি সিআইএ। তাই রাতের অন্ধকারে তাকে ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারাতে হলো। জারি হলো 'মার্শাল ল' বা সামরিক শাসন। বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেয়া হলো এক যুগেরও বেশি। বাংলার মানুষ চার বছর আগেও অন্য একটি সেনাবাহিনীর 'মার্শাল ল' দেখেছে। সুতরাং আবার দেশে মার্শাল ল আসায় সাধারণ জনগণ ভীত হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো আবার বুঝি ১৯৭১-এর মার্চের পুনরাবৃত্তি হবে। তারপর চলতে লাগল শেখ সাহেবের

বিরুদ্ধে একতরফা অপপ্রচার। শেক্সপিয়র তার 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে মার্ক এন্টনির মুখ দিয়ে বলেছেন,

'The evit that men do lives after them
The good is oft interred with their dones.'

শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। দুঃখের বিষয় রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার সাথে তার মতের মিল হয়নি কোনো দিন। কিন্তু আমি রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার পর ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শেখ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহস আমার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। ঐ সময় মুজিবের পরিবর্তন আশ্চর্যজনক বলেই মনে হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। অসংখ্য জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মাথা ঠিক রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিকভাবে নেয়া যথেষ্ট প্রতিভাবান নেতার পক্ষেও সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান থেকে শুরু করে নাম না জানা নেতারা পর্যন্ত ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন জনসভায় তখন শেখ সাহেব তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেননি। কারণ স্বাধীনতার আগে তিনি নির্বাচন চেয়েছিলেন এবং নির্বাচন বানচালের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ বাংলাদেশের কয়েক ডজন নেতা নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতা বলে মানতে রাজি ছিলেন না। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে তিনিই জনগণের যথার্থ নেতা। আমার ভয় হয়েছিল যে শেখ সাহেব ঐ ডামাডোলের মধ্যে সাংঘাতিক একটা ভুল করে না বসেন।

তারপর এল ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলন। পাকসেনারা এখানে-ওখানে গুলি চালাচ্ছিল, উত্তরবঙ্গে, ঢাকার জয়দেবপুরে, চট্টগ্রাম বন্দরে। কিন্তু শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের মতো অটল থেকেছেন আপন সিদ্ধান্তে। ঐ একুশ দিনের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সারিতে এনে দাঁড় করেছে। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়-এর কথা ভেবেছিলেন, বিনা রক্তপাতে সমাধানের একমাত্র পথ হিসেবে।

শেখ মুজিব দেশ-জাতির সম্মানকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

নিজের ব্যক্তিত্বকে দেশের কাজে লাগানোর জন্য উৎসুক ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষে মানুষে সমন্বয় ঘটানোই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা।

বাধ্যতামূলক সমবায় পদ্ধতির ওপর শেখ সাহেবের দৃঢ় আস্থা ছিল। ভুমিহীন কৃষকদের জন্য বাধ্যতামূলক সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাদের সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করায় সাধারণ কৃষকের কোনো উপকার হয়নি। ঐ উচ্ছেদ আইনে ভূমির শোষণ বন্ধের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে কৃষি জমি যা আছে তা কৃষক সমাজের সবাই উপভোগ করবে। গ্রামে ভূমিহীন কৃষকরা ক্ষুধার তাড়নায় অত্যন্ত কম মজুরিতে উৎপাদন কাজে অংশ নিতে বাধ্য হয়। অথচ ঐ উৎপাদিত ফসলের ওপর তাদের কোনো অংশ থাকে না। ফলে উৎপাদনেও তাদের তেমন উৎসাহ থাকে না।

এর সমাধানের জন্য গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সমবায় খামারগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রাম প্রশাসন গড়ে উঠবে। এ বিষয়ে যুগোশ্লাভিয়ার নীতি অর্থাৎ ডিসেন্ট্রালাইজেশন ও সেলফ ম্যানেজমেন্ট নীতি ছিল তাঁর পথ-প্রদর্শক—কি শিল্পাঞ্চলের প্রশাসনে, কি যৌথ খামারে। যার ফলে শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের কাজ অনায়াশেই সম্পন্ন হতে পারবে। (Participation of all production in management in fields and factories is the ultimate good of BKSAL)। বাকশাল নীতি প্রবর্তনের পর তার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। বাকশাল নীতি সম্বন্ধে সংসদে তাঁর ২ জানুয়ারির বক্তৃতায় ও ২৬ মার্চের জনসভায় ভাষণ ছাড়া আর কোনো উপকরণ বা মালমশলা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ড. রওনক জাহান তার সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে (Bangladesh Politics Problems and Issues) আমার এ মতের সমর্থন করেছেন। বাকশাল গঠনের সাথে সাথেই দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে গণভবনে ভিড় করেছিল তাতে শান্তভাবে সময় নিয়ে শেখ সাহেবের সময়ে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। বাকশাল নীতি ঘোষণার সাথে সাথেই রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী প্রভৃতি সর্বস্তরের জনগণ বাকশাল সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত করতে থাকে। দরখাস্তের সংখ্যা এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেখ সাহেবের সচিব রহিম সাহেব সেগুলো ফাইলবন্দি করার চেষ্টা না করে চটের বড় বড় থলিতে ভরে রাখতে আরম্ভ করেন। তথাকথিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ কেন যেন স্বার্থরক্ষার তাগিদে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। বোধ হয় শেখ সাহেবের কথাই সত্য যে, বাংলাদেশের পাঁচ শতাংশ লোক যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করে তারা দেশের সকল পাপের উৎস। শেখ সাহেব ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারির

জনসভায় বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ তার মতে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন; আর তার সমাধানের জন্য চিহ্নিত করেছিলেন একটি মতবাদ। এ মতবাদটি হলো বহুমুখী সমবায় (Multipurpose Co-operative). শেখ সাহেব মার্চ মাসের ২৬ তারিখের বক্তৃতায় নতুন সিস্টেমের যে ব্যাখ্যা দেন তা হলো তার ভাষায় :

'কিন্তু একটা কথা এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে যাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্লানে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপরারেটিভ হবে। প্রত্যকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এর জমি মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ—যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফারটিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের যারা টাউট আছেন তাদেরকে বিদায় দেয়া হবে।'

উপরিউক্ত মতবাদ বা কর্মসূচি সফল করার জন্য যে পদ্ধতি তিনি ঐ তারিখের জনসভায় উপস্থিত করলেন, তা ছিল তার ভাষায়—

'ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বছর ত্রিশ লক্ষ লোক বাড়ে। আমাদের জায়গা হলো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। যদি বছরে আমাদের ত্রিশ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশে কোনো জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে, এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাক্শন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো পপুলেশন প্ল্যানিং, চার নম্বর হলো জাতীয় ঐক্য।

জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এ দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে।'

এর আগে অর্থাৎ ২ জানুয়ারি গঠনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী পাসের সময় শেখ সাহেব সংসদের বক্তৃতায় বলেন, 'আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই। আমরা জীবনভর সংগ্রাম করেছি। কেউ যদি মনে করেন যে জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি তাহলে আমি বলব না, আজকে এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বাররা জনগণের দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।

আজকের এমেন্ডেড কনস্টিটিউশনে যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই, এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনোদিন আসতে পারবে না, আমরা তা হতে দেব না। বাংলাদেশকে ভালোবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলা ভাষা ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না, এ আমরা চলতে দিব না। আমি ফ্রি-স্টাইল দিয়ে রেখেছিলাম—তাই যার যা ইচ্ছা তাই লেখে। কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে। বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজদের তেমনি নাই ঐসব সন্ত্রাসবাদীদের।'

শেখ মুজিবের উপরিউক্ত দুটি বক্তৃতা ছাড়া বাকশালের ওপর তার জীবদ্দশায় লিখিত কোনো পুস্তক বা কোনো লিফলেট পাওয়া যায়নি। উপরিউক্ত দুটিই মৌখিক ভাষণ। মৌখিক ভাষণ দেয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা গভীরে যায় না। ঐ বক্তৃতার পরেও শেখ সাহেব প্রায় পাঁচ মাস জীবিত ছিলেন ও প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার চারপাশে লেখাপড়া জানা লোক ছিল। কিন্তু মনে হয় তারা কেউ শেখ সাহেবের সহযোগিতা করেননি। এর সম্ভাব্য কারণ, সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী সদস্যরা বহুমুখী সমবায়ের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। কেউ চাননি তার জমিজমার ওপর পরোক্ষভাবেও অন্য কেউ ভাগ বসাক। ঐ কারণেই যখন ১৫ আগস্ট ক্যু হলো তখন তার হত্যাকারীদের সরকারে তাঁরই মন্ত্রীরা (অবশ্য সবাই নয়) যোগ দিলেন। উল্লেখ্য, শেখ সাহেব মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য একশত টাকার নোট অচল ঘোষণা করেছিলেন। তখন দেশের যত কালো টাকার মালিক তার ওপর ক্ষিপ্ত

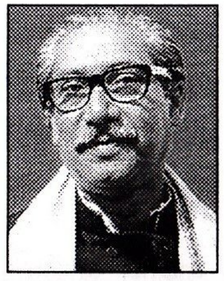
হয়েছিল। হঠাৎ বাজারে টাকা ঘাটতি হওয়ায় মোনাফাখোর ব্যবসায়ী মহল তাকে অভিশাপ দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

অনেকে বলেন যে, সোভিয়েত, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় নীতি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল, যার ফলশ্রুতি এক দলীয় প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম প্রবর্তন। আরও কারণ ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতা শেখ মুজিবকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যার ফলে কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং ও প্রফেসর মোজাফফর আহমদের পরামর্শে শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করেন। কিন্তু বাকশাল ঘোষণার কয়েক মাস পূর্বে তার সাথে Compulsary Co-operative Economy এবং Workers Participation in Management নিয়ে আলোচনার করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সে সময়ে এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত তার কাছ থেকে পাইনি। শেখ সাহেব প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে থাকলে ব্যবসায়ীদের চাপ অনর্থের সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীদের যে লবি তা কোটি কোটি টাকার, তাই ক্ষমতা যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যেই ঐসব প্রেসার গ্রুপ-এর ষড়যন্ত্র থেকে প্রশাসনকে রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। আমার এখনও অনেক সময় মনে হয় যে, গ্রাম বাংলার জন্য ঐ Compulsary Co-operative Economy এবং শিল্পাঞ্চলের জন্য Workers Participation in Management ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো ও ক্যাডার তৈরি করার প্রয়োজন ছিল তা তিনি না করেই বাধ্যতামূলক সমবায় অর্থনীতি (Compulsory Co-operative Economy) পদ্ধতি ঘোষণা করেন। যার ফলে উচ্চাভিলাষী লোকতো প্রশ্নাতীত তার নিজের দলের ভূমি মালিক ও জোতদাররাও যদি তাকে হত্যা করতো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। যে দেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকার জন্য বছরের পর বছর নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখে, যে দেশের শিক্ষকরা একবার অধ্যক্ষ হলে সারা জীবন নামের পূর্বে অধ্যক্ষ ব্যবহার করেন, যে দেশের বিচারপতিরা বিচারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেও বিচারপতি কথাটা নামে যুক্ত রাখেন, অবসরপ্রাপ্ত লেখেন না, যে দেশে সাধারণ মানুষ বিচারপতির অভাবে আদালতে বিচার পায় না, সে দেশের জমির মালিকের জমি চলে যাব Co-operative-এ অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যাবে ভূমিহীনদের হাতে এবং জোতদাররা স্বেচ্ছায় তা মেনে নেবে এটা কি সম্ভব?

আওয়ামী লীগ সংগঠন শেখ সাহেবের নতুন সিস্টেমের পক্ষে কোনো প্রচারপত্র ১৯৭৫ সালে প্রকাশ করেনি। যদিও বামপন্থী সাংবাদিকরা শেখ সাহেবের সিস্টেমের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার চালাচ্ছিল। তাদের পক্ষে সেটা ছিল স্বাভাবিক, কারণ শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী যে সে শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী মানুষের বন্দনা রচনা করতে পারে না।

আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করে শেখ মুজিব শাহাদাতের দরজা পেলেন কিনা না তা স্থির করা ওলামায়ে কেরামের কাজ। বাংলাদেশের জনগণের ভাবনা ছিল যে, তারা কোথায় দাঁড়াল? জনগণের জন্য যে ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো তা তারা বুঝেছিল। কিন্তু পিছিয়ে গেল কোথায়– আবার ১৯৫৮ সালে? আবার সেই সামরিক আইন দিয়ে শুরু?

দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক ধারা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সামরিক জান্তার শাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করল। বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার যোগসূত্র হলো বাংলাদেশ।



কামাল লোহানী

লীডার

লীডার, আজ আপনি নেই। দেশটাকে খুবলে খাচ্ছে শিয়াল শকুনেরা। লুটেপুটে খাচ্ছে লোভী অর্থপিশাচ কিছু তাবেদার এ দুঃসময়ে। বঙ্গবন্ধু, রাজাকার-আলবদর যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতাই নয়—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরাইলি জায়নবাদের সহযোগিতায় জন্মকেই স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, সেই যুদ্ধপরাধী জামাত এই বাংলার সবুজ বুকে এখন শাসনের দণ্ড ঘোরাচ্ছে ঐ তথাকথিত ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসঘাতক বিএনপির বদৌলতে। এরাই মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের অমূল্য প্রাণ এবং বিপুল রক্তস্রোতে সৃষ্ট এই রক্তোৎপল বাংলাদেশের অবমাননা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। প্রতিটি মুহূর্তে ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যে মহীয়ান সংগ্রামে উজ্জ্বল দেদীপ্যমান অধ্যায়কে একেবারে মুছে ফেলতে ব্যাপক ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আমরাও তখন যেন চোখ বন্ধ করে, যা চলছে তাকে মেনে নিয়ে নির্বিঘ্নে স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি; বুক ঠুকে বলতে পারছি না, এই অবস্থা আমরা মানি না। লীডার, দুঃসহ যন্ত্রণায় কাতর কোটি কোটি বাঙালি আজ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তি সহিংস ধর্মবাজির উন্মত্ততার শিকারে পরিণত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করছে নিরবধি। আমরা এই যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবির, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস নামের ঘাতক-দালাল নরপিশাচগুলোর কোনো বিচার করতে পারিনি। ...ওরা বিশেষ একটি রাজনৈতিক মহলের আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে আজ এমনি 'সাহসে উদ্দীপ্ত' যে, শুধু নিজেরাই সরব ও সক্রিয় হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধপরাধকে জায়েজ করে নেয়ার জন্য রাজনীতির দৈনন্দিন আন্দোলনেও

উচ্চকিত। ধর্মকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে ওরা দেশময় নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব ত্যাগ করে সক্রিয় হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী নাম ধারণ করে কত যে সংস্থা, সংগঠন, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার কোনো হিসাব নেই। লাখো কোটি ডলার তহবিলে মজুদ ওদের। ওরা সন্ত্রাসের ধর্মান্ধতা অথবা ধর্মান্ধতার সন্ত্রাস কায়েম করেছে। নিরপরাধ এবং রাজনীতিতে প্রগতিমনস্ক মানুষ হত্যা, অপহরণ করছে প্রথম পদ্ধতিতে। আর সরলপ্রাণ বাঙালি মানসকে ধর্মীয় বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘিরে নেশাগ্রস্ত করে নাস্তানাবুদ করে ফেলছে।

লীডার, আপনার সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সোনার বাংলা যেন গড়ে উঠতে না পারে, তারই যে মহড়া দেখেছিলাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এবং পাকিস্তানের তেইশ বছরে, তারই প্রেতাত্মা চেপে বসেছে আজকের শাসক গোষ্ঠীর কাঁধে—তারাই এখন বাংলাদেশী জাতিত্ববোধ এবং ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে দেশ ও জনগণকেই গ্রাস করতে চাইছে। ওরা বিপুল রক্তখরচে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গোড়া কেটে 'ইসলামী জামহুরিয়াত' প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখছে। বাংলাদেশ যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিল গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের চার মূল স্তম্ভের উপর, তাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদ বর্জন করেছেন। প্রথম জন 'বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম' এ-পবিত্র গ্রন্থে সংযোজিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার অবসান ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় সামরিক কর্মকর্তা 'ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম' করে ছেড়েছেন। ফলে সমাজতন্ত্রও গোল্লায় গেছে, আর গণতন্ত্রের তো কোনো বালাই নেই। এখন ওদেরই হাতে ক্ষমতা। জামাতের আমীর, একাত্তরের ঘাতকপ্রধান ছাত্রনেতা মতিউর রহমান নিজামী এবং জামাত সম্পাদক আলী আহসান আল মুজাহিদ মাত্র কটি আসনে জয়ী হয়ে দুটি পূর্ণ মন্ত্রীর খায়েস পূরণ করেছেন। গোলাম আজমকে অপসারণ করেছে, কারণ তরুণদের মতই জয়ী হয়েছিল। আব্বাস আলী খানতো 'বেচারা', আফসোসেই দেহত্যাগ করলেন।... নিজামী কৃষিকে খতম করে এখন শিল্পমন্ত্রী। তাই আদমজী থেকে শুরু করে আজ কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যচ্ছে। গরিব গতর-খাটানো শ্রমিকরা সব বেকার হচ্ছে। ভুখা-নাঙা এই মানুষগুলোকে জানে মারার কী কুশলী চক্রান্ত ই না এটেছে! নিজেদের শিল্প-উদ্যোগকে অবহেলা করে বিদেশীদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

লীডার, যে দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আপনার নেতৃত্বে, সেই দেশের দুরবস্থা দেখে অস্থির চিত্তে কেন জানি না আজও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে আমরা পারিনি। অথচ, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ-শক্তি আজ মার্কিনি মদদে গোটা জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিক্ষা-শিল্প, অর্থনীতি-রাজনীতি সব কব্জা করতে চাইছে। বাঙালির শত সহস্র বছরের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে নির্মূল করতে চাইছে, বিলুপ্তির চক্রান্ত এটেছে। ক্রমশ বদলে ফেলছে বাংলার মানুষের চরিত্রকে। বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের উদয়কে ওরা কোনোভাবেই মেনে নিতে চায়নি বলেইতো লীডার, অব্যাহত চক্রান্তের বেড়াজালে খোন্দকার মোশতাক আর রশীদ, ফারুক, ডালিম, নূর, শাহরিয়ার আর মহিউদ্দিনরা ঘৃণ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সপরিবারে আপনাকে হত্যা করেছিল। আপনাকে হত্যা করে দেশকে বিপন্নাবস্থায় ফেলে দিয়ে ফায়দা লোটার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তারই বাস্তবায়ন করল। এ বিপন্নতায় ঠেলে দিতে চেয়েছিল বলেই তো একাত্তরে ডিসেম্বরের শেষ দিকে যখন ওরা বুঝতে পারল বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ঠেকানো অসম্ভব, তখনই তারা মরিয়া হয়ে উঠল—বাংলাদেশ মুক্ত হলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা যেন গড়ে তুলতে না পারে, তার জন্য বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা তৈরি করেছিল। সেই ঘৃণ্য হত্যা-পরিকল্পনা সফল না হওয়ায় ওরা ওৎ পেতে ছিল কখন মিলবে সেই মোক্ষম মুহূর্ত? অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সুযোগ পেয়ে গেল সেই মোশতাক। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সৃষ্টিকালে আপনাকে প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক করায় সে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং মজলুম জননেতার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আপনার প্রতি মওলানার অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা থাকায় মোশতাক শত তর্কেও তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি।... ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংস রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এ মর্মান্তিক ঘটনা নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে এবং থাকবে এবং 'ইতিহাস' নামক শব্দটি যতদিন উচ্চারিত হবে, ততদিন এ পৈশাচিক ঘটনার উল্লেখ থাকবেই।

সত্যি কথা বলতে কি লীডার, ঐ যে রাজনীতির পটপরিবর্তন হয়ে গেল, ওটা মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ এবং এ অঞ্চলের বাঙালি নাগরিকদের জন্য বয়ে আনল এক নির্মম পরিহাস। বাঙালি জাতির কপালে কলঙ্ক লেপন করেও যেন হলো না, আরো কুৎসিত মীরজাফরদের বদৌলতে বাংলার প্রান্তরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ ক্রমশ উৎকীর্ণ হতে থাকলো। আমরা তো লীডার পাকিস্তানি

সামরিক শাসকচক্রের রাজনৈতিক লিপ্সার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পাকিস্তান প্রশিক্ষিত বাঙালি অফিসারদের মার্শাল ল'র কবলে পড়লাম নতুন করে। এ কালের সমরনায়করা—যারা ক্যু' করতে লাগলেন, তারা প্রায়ই মুক্তিযুদ্ধ-ফেরত, যেমন—খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, জেনারেল মঞ্জুর। এছাড়া এক জিয়ার আমলেই নাকি ছোট বড় ১৭টি ক্যু না হলেও বিদ্রোহ বা মতানৈক্যের ঘটনায় বহু মুক্তিযোদ্ধাই প্রাণ দিয়েছেন। যে জিয়া সেনাবিদ্রোহের সময় ঐ ৭৫-এর নভেম্বরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কর্নেল (অব.) তাহের তাঁকে মুক্ত করে এনেছিলেন সিপাহী-জনতার বিপ্লবের নায়ক হিসেবে এবং জিয়াকেই ক্ষমতায় বসালেন, সেই জিয়াউর রহমান ক্ষমতার দণ্ড হাতে পেয়ে তার ত্রাতা তাহেরকেই প্রথম শূঁলে চড়ালেন এবং মার্কিনি পুতুল খোন্দকার মুশতাকের ১৫ আগস্টের হিরোদের বিদেশ পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর মোশতাকের কোনো শাস্তিই হলো না।

সেই থেকেই, লীডার, কত যে মুক্তিযোদ্ধা সেনাসদস্য প্রাণ হারালেন অপঘাতে, তার হিসাব নেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিয়াউর রহমানকেও হত্যারই শিকার হতে হলো। যারা মারল জিয়াকে তারাই আবার জিয়া-হত্যার অপরাধে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিভাদীপ্ত সমরনায়ক তৎকালীন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি জেনারেল মঞ্জুরসহ বহু মুক্তিসেনা অফিসারকে কোর্ট মার্শালে চড়ালো তৎকালীন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এইচ এম এরশাদ। তারপর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে তিনিই হলেন 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা'। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মতো প্রায় দশক জুড়ে যেসব কীর্তি-কাহিনী এবং কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছেন, তাতে আপনার স্বপ্নে দেখা বাংলদেশকে বিশ্বে হতমান করেছে। জনগণ শিকার হয়েছে স্বেচ্ছাচারের এবং নূর হোসেনকে প্রাণ দিতে হয়েছে গণতন্ত্র বাঁচাতে। ছাত্রনেতা বসুনিয়া প্রাণ দিয়েছেন মিছিলে, ডা. মিলন চিরতরে হারিয়ে গেছেন স্বৈরাচারের চোরাগোপ্তা গুলিতে। এমনই কত যে প্রাণ হয়েছে বলিদান— তারও হিসাব নেই।

দেশের জনগণ রাজপথে নেমে এসেছিল, লীডার, সেই অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিনে। দিনরাত পাহারা দিয়েছে সম্মিলিত রাজনৈতিক শক্তির হয়ে, স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ যেন কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে না যায়।... সেই আপনার সোনার বাংলার প্রিয় জনগণই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ করলেন। কিন্তু লীডার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি এমনকি জামাতকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ

করতে দেয়া হলো তিন জোটের রূপরেখা হিসেবে। অথচ, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে রাজনৈতিকভাবে আপনি ওদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে জিতে যে অনাচার করেছিল সেই দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনায় যাব না। তারপর জামাত কৌশলে পা ছড়িয়ে রাজনীতির আঙ্গিনায় বসে পানের ডিব্বা খুলে ক্রমেই নিজেদের ঠোঁট লাল করে ফেলল মানুষের লহুতে। আওয়ামী লীগ এলো নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে যেন সেই আতঙ্কই মানুষকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। জামাত আর বিএনপির চোরাগোপ্তা হত্যার অভিযান আর প্রশাসনকে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলার সুকৌশল চক্রান্ত ফললাভ করলো এবং জামাত ও ছোট ছোট ইসলামী গ্রুপকে স্যাঙ্গাত করে বিএনপি মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলল। আর চক্রান্তের সেই কৌশলে আঁতাত করে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করল ২০০১ সালে, জাতীয় নির্বাচনে। বিএনপি-জামাত-ই-ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টি (নাজিউর)—চার দলীয় জোট নির্মাণ করে দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে দিল। কিন্তু যে জামাত সওয়ার হয়েছে ওদের কাঁধে, সে তো নাছোরবান্দা। ঘাড় মটকাবে প্রথমেই বিএনপি'র—তাই করছে। গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই যদি গ্রাস করতে পারে তবে তো আর কোনো বাধা থাকবে না। আর সেই লক্ষ্যেই তো জামাত কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বিএনপি-জামাত জোট। চারটি বছরে ওরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বারবার। জামাত লেগেছে বিএনপি'র বিরুদ্ধে, বিএনপি মারপিট করেছে জামাতের সাথে। ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলেরও একই দুরবস্থা। দলীয় নেতারা ঐ সহিংসতার ঘটনাকে যত তিক্তই হোক, মিলিয়ে দিয়েছেন। বিএনপি জানে জামাতের সাথে সখ্যতা না থাকলে জামাতী নিশ্চিত ভোটগুলো বিএনপি হারাবে, তাই তারা জামাতকে কোনোভাবেই ঘাটাতে চায় না। আর এই সুযোগ হাতে পেয়ে জামাত তাদের পরিকল্পিত পথে চলেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে তৎপর। লীডার, ওরা আজ আমাদের প্রাণের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরের জানকোরবান কোশেশ করছে। মনজিলে মকসুদে পৌঁছার পুণ্যে ওরা যত কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করতে হোক, করেই মতলব হাসিল করতে উদ্যত।

আজ ওরা—জামাত ও বিএনপি আর ক'টি ক্ষুদ্র উগ্রপন্থী ইসলামী গোষ্ঠী মিলে ধর্মকে অবলম্বন করে সরলপ্রাণ বাঙালি মানুষকে কেবল বিভ্রান্তই করছে না, তাদের বাধ্য করছে ধর্মীয় অনুশাসনের অজুহাতে নিজেদের খামখেয়ালি

নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলছে, ব্রুট মেজরিটির বদৌলতে যেমন খুশি আইন প্রণয়ন করছে। যে আইনের প্রয়োজন গোটা জাতি চাইছে, তার সৃষ্টিতে টালবাহানা দেখিয়ে, এমন কি বিচার বিভাগকে পর্যন্ত হতমান, একপেশে করে ফেলেছে। এ পৈশাচিক শক্তির নির্মম আচরণ দেশকে পৃথিবীর সামনে 'খেলো' করে ছেড়েছে, জনগণকে শান্তি, স্বস্তি এবং শৃঙ্খলা থেকে বিপন্নতা, বিপর্যয় এবং দুঃসময়ের মহাসঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। জনগণের কোনো দাবিই আজ গ্রাহ্য নয় এই ক্ষমতাসীন লোভাতুর 'রাজনৈতিক' ধর্ম-শক্তির। বিগত চার বছরে লীডার, বোমা, গ্রেনেড নিক্ষেপের ভয়াবহ ইতিহাস তৈরি করেছে। ধর্ম-কর্মস্থানে বোমা, বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে আক্রমণ, সৎ ও দেশপ্রেমিক বাঙালি রাজনীতিক নেতাদের হত্যা, শেখ হাসিনাকে হত্যার নিরন্তর অপচেষ্টা, আদালত গৃহে হামলা, সিনেমা হলে বিস্ফোরণ, বাংলার ঐতিহাসিক যাত্রা মণ্ডপে বোমা নিক্ষেপ; উদীচী, কমিউনিস্ট পার্টির পল্টন সমাবেশ, নববর্ষে রমনার বটমূলে মানুষ হত্যা, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, এমনকি সারা দেশে একই সময়ে ৪৯৩টি বোমা বিস্ফোরণ করে তারা কতখানি মজবুত ভিতে দাঁড়িয়ে যখন খুশি তখনই যে এই বাংলায় যে কোনো ধরনের তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে গোটা বিশ্বকে চমকে দিতে পারে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

কী দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যেই না কাটাচ্ছি দিন, আপনার সেই প্রিয়জন—বাঙালি জনসাধারণ, তা বলতে শরীর ঘৃণায় কুচকে ওঠে। লীডার, শুনে অবাক হবেন, আমাদের প্রত্যাশিত সেই একাত্তরের বাংলা আমরা গড়তে আজও পারিনি। আপনার নারকীয় হত্যার পর আমাদের গোটা লড়াকু জাতিটাই যেন কেমন স্তিমিত এবং ভীত হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সাহস আমরা ফিরে পেয়েছি, না হলে এরশাদের স্বৈরশাসনকে উৎখাত করতাম কি করে? জেনারেল জিয়ার উত্তরাধিকারিণী তাঁরই 'লাজনম্র' স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন, তখন যে রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন তাতে একদিন তাঁর বিরুদ্ধেও এরশাদের মতোই 'জনতার মঞ্চ' তৈরি করতে হলো। সেই যে মানুষের প্রত্যয় জীবনকে আবাহনের, তাও যখন সম্ভব হলো না তখন আবারো সেই 'খানে দজ্জাল' জামাতের দোস্তির বদৌলতে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে, ক্ষমতাসীন হয়েছিল। নাজেল হয়েছে এ দেশের মানবজাতির ওপর এক নির্মম 'অভিশাপ' হিসেবে। পিশাচ যারা, তারা বেশ আনন্দেই আছে। ক্ষমতার 'লোভ' ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী তথাকথিত গণতন্ত্রমনা

নির্বোধদের আচরণে এ দৃশ্য ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে : 'তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে।' অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধী, বাংলাদেশের অভ্যুদয়বিরোধী ঘাতক-দালাল সেই জামাত-শিবির কৌশলে বিএনপি'র কাঁধে চেপে বসেছে। কিছুতেই নামাতে আর পারছে না। ওরা যে সুযোগ পেলেই 'ঘাড় মটকাবে' সে কথা বুঝেই আমলে নিতে চাইছে না। আর জামাত-ই-ইসলামীর অবস্থা হয়েছে—বাঘের ঘাড়ে চেপেছে, নাবতে আর পারছে না। এই সুযোগে জামাতও মতলব এঁকেছে, রক্ত ওদের শুষে নিয়ে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করবেই। সেই পরিকল্পনা করেছে অনেক আগেই। কিন্তু ওরা ক্রমশ চতুর্দিকে নিজেদের ঘৃণ্য চক্রান্তের জাল বিছিয়ে চলেছে। ওরা কাউকে তোয়াক্কা করছে না এটা আমরা বুঝতেও পারছি না। ওদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে কিংবা সংগ্রাম চালাতে আমরাও ব্যর্থ হয়েছি। তাই ওরা কিন্তু মহা উৎসাহে সক্রিয়, সর্বত্র। এরই মধ্যে লীডার, সামনেই জাতীয় নির্বাচন আসছে। ফলে যত ক্রেডিট নিজেদের কোচড়ে ভরা যায়, তার কৌশল আঁটতে থাকে বিএনপি-জামাত জোট সরকার।

আর সেই উদ্দেশ্যে এ বছর (২০০৫) নভেম্বর মাসে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা 'সার্ক'-এর ত্রয়োদশ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সার্ক'-এর দুই দশক পূর্ণ হওয়ার সুযোগ নিয়ে জোট সরকার জাঁকজমকের সাথে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য গত এক বছর যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। 'সুনামি' নামের এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এশিয়ায় যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার কারণে এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যোগ দিতে না পারার কারণে সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ দু'বার পিছিয়ে যায়। এ বছর সম্মেলন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে 'লবী' করে। কিন্তু মুশকিলটা হলো আহসান উল্লাহ মাস্টার, শাহ এ এম এস কিবরিয়া, আইভী রহমানসহ কত যে অমূল্য প্রাণ নিধন হয়েছে ঘাতক বোমা আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে, তার কে হিসাব করবে? বাংলাদেশ-বিরোধী ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি গোষ্ঠী দেশে এমনই জাল বিছিয়েছে যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও কোনোটারই কোনো সুষ্ঠু বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট যারা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার নীলনকশা রচনা করেছিল তাদের সম্পর্কে সরকারি মহলে সাড়া-শব্দ নেই। এ হত্যাপ্রচেষ্টার কোনো কূল-কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার জন্য কে বা কারা অপরাধী তা নিশ্চিত করতে পারেনি জামাত-বিএনপি সরকার।

লীডার, বিদেশী অতিথিরা কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না। কারণ, ১৭ আগস্ট (২০০৫) বাংলাদেশে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেছে। দেশ জুড়ে একই সাথে একই সময়ে প্রায় ৫০০ বোমা ফাটিয়ে মৌলবাদীরা জানিয়ে দিয়েছে ওরা কতটা পারঙ্গম। কতখানি তাদের শক্তি। এর ফলে বাংলাদেশ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল, 'সার্ক সম্মেলন' যদি অনুষ্ঠিত না হয়। তাহলে? নানাভাবে দূতিয়ালি করে অবশেষে সবাইকে রাজি করিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কেমন করে হলো, শুনে অবাক হবেন, লীডার। কোনো বিদেশী অতিথি রাষ্ট্রীয় সফরে এলে কিংবা কোনো উল্লেখযোগ্য দিনে কোনো উৎসব আয়োজিত হলে আমরা দেখতাম রাস্তার দু'পাশে শিশু-কিশোররা সংশ্লিষ্ট দেশের পতাকা হাতে নিয়ে অভ্যাগত সম্মানীয় মেহমানকে সুস্বাগত জানাতো। কিন্তু লীডার, কী তাজ্জব ব্যাপার, সার্ক দেশের নেতৃবৃন্দ দেখে গেলেন, ঢাকা জনমানব শূন্য। নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র লোক ছাড়া কেউই নেই। এটা নাকি আধুনিকতম নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুকঠিন অর্গল।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির কথা আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট আজও। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত কী অকল্পনীয় জনসমুদ্রই না প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আপনার আমলেওতো কত বিদেশী অতিথি এসেছেন, তাঁদের এই সোনার বাংলায় স্বাগত জানানো হতো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কচি-কাঁচাদের আন্দোলিত হাতে সে দেশের জাতীয় পতাকায়। কিন্তু আজ জোট সরকারের আমলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ছয়জন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এলেন, গেলেন অথচ রাজধানীর রাজপথ মহাশূন্য।

লীডার, আপনারাই তো বলতেন প্রচলিত কথকতা হিসেবে, 'ক্ষতের চিকিৎসা না করে ক্ষতস্থানটাকে কেটে ফেলে দেয়া'র কথা ভাবে একশ্রেণীর নির্বোধ। সেই নির্বুদ্ধিতার প্রমাণই মিলল এবারের সার্কে। রাস্তাশূন্য, জনগণ হাঁটতেও পারবে না। এমনিই ছিল আলো ঝলমল, পুষ্পাঙ্গন এই ঢাকা। ওরা বাংলাদেশের 'পারসুয়েশনে' আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এবারও খালেদা জিয়ার চেয়ারপারসন হওয়ার কথা ছিল। এটা যে সামনে জাতীয় নির্বাচন রেখে একটা বড় প্রাপ্তি এবং নির্বাচনে প্রভাব ফেলার মতো ওরা মনে করছে। তার ওপর আরেক আবদার বাস্তবায়িত হওয়ার কথা : জেনারেল জিয়াকে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে প্রথম 'সার্ক স্বর্ণপদক' দেয়ার প্রস্তাবকে গত জুলাইয়ে ইসলামাবাদের বৈঠকে অনুমোদন করিয়েছে। সুতরাং তাকে পদক দিতেই হবে। দিয়েছেনও। স্মিত হাসির ব্যাপার, এই সুযোগে খালেদা জিয়া পুত্র

তারেক রহমানকেও সার্ক মঞ্চে ওঠালেন। এটা ঐ দুটোর সাথে উপরি পাওনা।... সার্ক শেষ। ২০ বছরে যা হয়নি, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নাকি তা করবে, এটা উদ্যোক্তাদের কামনা। কিন্তু অতিথিরা কি খবরের কাগজ বা টিভি রিপোর্ট শোনেননি? যে দেশ চালাতে অক্ষম, তার পক্ষে সাতদেশীয় সংস্থা চালানো কি করে সম্ভব হবে? ওদের মনে যে সংকীর্ণতা কাজ করে রাজনীতিহীনতার কারণে তা দিয়ে কি আদৌ আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব?

বিএনপি একজন সেনা মেজরকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে দাবি করছে, যার কোনো রাজনৈতিক অতীত নেই, যে কেবলই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন বশংবদ সৈনিক হিসেবে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন কালেও প্রমাণ দিয়েছেন, তাকে অযৌক্তিক কারণে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে জনগণের সামনে জোর করেই দাঁড় করার চেষ্টা করে কি কোনো লাভ হচ্ছে? এতে যে সত্য ঘটনা পরম্পরাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, তাও তারা বুঝতে চাইছে না। কারণ এ তো উদ্দেশ্যমূলক, জবাবদস্তি 'ইতিহাসের খ্যাতি'কে ছিনতাই করারই সামিল।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। তৃণমূল থেকে যাঁর গৌরবদৃপ্ত উত্থান। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের তেজস্বী ও বুদ্ধিদীপ্ত কিশোর পরিণত হয়ে ছিলেন সাহসী সংগঠকে। চারাগাছ যেমন মহীরুহের মাথা উচিয়ে আকাশ ফুঁড়ে ওঠে একদিন, তেমনি স্বভাবজাত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গৌরবময় রাজনৈতিক জীবন। চল্লিশের দশক থেকে সে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের যথার্থ বন্ধু, সৈনিক এবং ক্রমান্বয়ে নেতা এবং অবশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তো সাধারণ মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। আর সেই প্রগাঢ় স্নেহই তাঁকে দিয়েছিল অনন্য সাহস। সে সাহসে বলীয়ান তরুণ থেকে যুবক, তারপর পরিণত বয়সের রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তুলনা করার ধৃষ্টতা যারা করে, তাদের বুদ্ধির বলিহারি যাই। জিয়াউর রহমান তো আর্মির অর্ডার অনুযায়ী সেই 'সোয়াত' জাহাজের মাল খালাস করতে চট্টগ্রাম বন্দরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ব্যারিকেড দেখে মেজর জিয়া অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বাপমা তুলে গালমন্দ করতে ছাড়েনি। পরে যখন তাঁকে

পরিস্থিতি বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রে, তখন কিন্তু জিয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের গ্রেপ্তারই করেছিলেন। তিনি যখন প্রথমে 'ক্যু' ভাবতে চেয়েছিলেন তখন নিজেকেই তো 'রাষ্ট্রপ্রধান' ভাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যৌক্তিক পারসুয়েশনে জিয়া আন্তরিকভাবে 'ক্ষমতার লোভ' ত্যাগ করেছিলেন কিনা জানি না লীডার, তবে আপনার নামে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' পাঠ করেছিলেন বাধ্য হয়ে। সেটা তো ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ। অস্বীকার করি না যে, বেতারে এই ঘোষণা সেদিন অনেকেরই কাছে পৌঁছেছিল এবং সমস্ত পৃথিবী জেনেছিল বাংলাদেশে গণহত্যা এবং মুক্তির প্রয়াসে নিরস্ত্র মানুষের যুদ্ধের কথা। কিন্তু প্রশ্ন একটিই, কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া উপনিবেশিক সেনাবাহিনীর একজন মেজর হঠাৎ কর্মক্ষেত্র থেকে সিদ্ধান্ত পাল্টে বাঁশিতে ফুঁ দিলেই কি 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' শুরু হয় এবং 'স্বাধীনতা' এসে যায়? পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তেইশটি বছর ধরে যে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অভ্যুত্থান জনগণ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি ঘটালো, তার কি কোনো মূল্যই নেই?... 'ক্ষমতা দখলে'র মানসিকতা থেকেই ঐ দাবি উঠতে পারে এবং জিয়ার দল সেই উদ্ভট ঘৃণ্য কৌশল এঁটেছে। তাও আবার মুক্তিযুদ্ধকালে অর্থাৎ একাত্তরের বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে নৃশংসভাবে প্রতিহত করতে জানপ্রাণ নিবেদন করে যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সমর্থন শুধু নয়—তাদের ঘাতক-দালাল হিসেবে নিয়োজিত ছিল, সেই জামাত-ই-ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের (তখন ছাত্রসংঘ) সহযোগিতার করুণায়।

লীডার, ওরা যে মতলব একাত্তরে হাসিল করতে পারেনি, তাই আজ বিএনপির রাজনীতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগে ভালোভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ওরা বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বানাতে সহিংসতার হিংস্রতায় মেতেছে।

বিএনপি আজও বুঝতে পারছে না, 'তারে যে বধ করবে গোকূলে সে বেড়ে উঠছে'। জামাত চায় এ দেশ ও দেশবাসীকে তারা কব্জা করবে। কিন্তু মানুষ ক্রমশ ওদের পাতা ফাঁদে পা ফেলে আটকে যাচ্ছে। সে চায় এমনই একজনকে, যিনি এই দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে আমাদের বাঁচাবেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, সেখানে তো মানুষকে নবপ্রাণে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশকে রক্ষা করতে হবে।... কে দেবে সেই উদাত্ত আহ্বান—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কে বলবেন,

'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও।' কিংবা হুকুম কে দেবে, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।'

১৯৬২ সাল। আইয়ুব-শাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর হায়েনার পৈশাচিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রেপ্তার হলাম আমিও। আমি তখন দৈনিক আজাদ-এ কর্মরত। গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে পলাশী থেকে গ্রেপ্তার হলাম আমি। ইন্টাররোগেশন শেষে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ২৬নং সেলে গিয়ে লীডার আপনাকে পেলাম। আরও ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী (বি. চৌধুরীর বাবা প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা), তফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়া, তাজউদ্দিন আহমদ, গাজী গোলাম মোস্তফা। ছিলেন সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত, তরুণ ছাত্রনেতা হায়দার আকবর খান রণো, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি।...আমি সবে পিতা হয়েছি, কী পরম আনন্দ আমার, অথচ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মাত্র দু'সপ্তাহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে। এ কথা শুনে আপনি কী প্রচণ্ড স্নেহমমত্বে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তা সেদিনকার মনঃকষ্ট ভুলে থাকা থেকেই প্রতীয়মান হয়। জেল-জীবনে আপনার এবং রণেশদার সান্ত্বনা কী অদ্ভুত প্রভাবই না ফেলেছিল। আপনি আমাকে ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলেন।

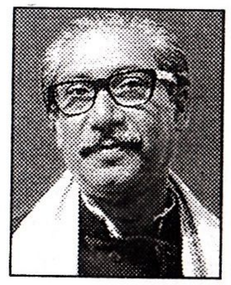
একবার মনে আছে, কোরবান আলী সাহেবের সাথে আমার প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা বেধে গিয়েছিল; আপনি ছুটে এসে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আচ্ছা বোকা তো তুই, কোরবান যদি তোর উপর পড়ে যায়, তবে তো তুই চ্যাপটা হয়ে যাবি। কোরবান আলী ছিলেন মোটা আর আমি তখন টিং টিংয়ে। আপনি বলতেন, তালপাতার সেপাই।

এমনই জেলখানার স্মৃতি। আরো কত যে স্মৃতি আছে, বলে শেষ করা যাবে না।... মনে পড়ছে, যেদিন আমি ছাড়া পেলাম, সেদিন আপনি কেঁদে ফেলেছিলেন স্নেহভরে। এমন দৃশ্য কি আমার কেন, কারো পক্ষে ভোলা সম্ভব? আপনি বলেছিলেন, ভেবেছিলাম রণেশ দা, তুই আর আমি থাকবো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তুইও চলে যাচ্ছিস। ...যাবার সময় একটা বিপদের আশঙ্কায় আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম, কারণ বাড়ি থেকে মোটা যে খাতা সেন্সরড অ্যান্ড পাশড' ছাপ মেরে আমার হাতে এসেছিল, তাতে কত পাতা বা পৃষ্ঠা আছে তা উল্লেখ করে কার খাতা তা লিখে শীল মেরে দেয়। একটি পাতা যদি খোয়া বা ছেঁড়া থাকে তবে তার জন্য পানিসমেন্ট পেতে হয়। আমার যখন রিলিজ অর্ডার এলো, দেখি খাতার বেশ কিছু পাতা নেই। ...

দুর্ভাবনায় পড়লাম। মুখ গোমড়া দেখে আপনি বললেন, কি রে সমস্যা কি? বললাম—নূরুল ইসলাম মঞ্জু নতুন বিয়ে করেই জেলে চলে এসেছে। ও আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে ডাক্তার বৌকে নিয়মিত চিঠি লিখেছে। এখন আমি কি করি?

লীডার আপনি সেদিন আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন জমাদারকে, ওর বিছানাপত্র চেক করবেন না। আমাকে বললেন, তোর কোনো ভয় নেই।... হলোও তাই। কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমি বেরিয়ে এলাম।

এই জেল জীবনে আপনার অপত্য স্নেহ আমাকে কারাবাসে দারুণ সাহায্য করেছে। মনে আছে লীডার, যেদিন আপনাকে প্রথম 'লীডার' সম্বোধন করি, সেদিনই আপনি বলেছিলেন, 'লীডার লীডার করিস নারে, তোর লীডার কে তা তো আমার জানাই আছে।' কিন্তু সেই যে 'লীডার' বলতে শুরু করেছিলাম, আজও বলি কারণ রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু মহান ঐ নেতাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম বলেই একাত্তরে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, আর সে কারণেই বোধহয়, সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচনে অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট প্যানেলে আমি যখন প্রায় পুরো প্যানেলেই জিতে গেলাম, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া ছিল : 'ও তো আমারই লোক'।



কে এম সোবহান

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়

উনিশ শ' একাত্তরের ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দান (যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বলে পরিচিত) থেকে ঠিক বিকেল ৩টা ২ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই আপ্তবাক্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৮ মিনিটের সেই বক্তৃতা পাল্টে দিল বাংলার ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস। এ আপ্তবাক্য কি হঠাৎই উচ্চারিত হয়েছিল? এর পেছনে প্রস্তুতি ছিল, সংগ্রাম ছিল, রক্ত ঝরেছিল বহুবার, সেই বায়ান্ন থেকেই। যেদিন বাঙালি বুঝতে শিখেছিল যে, সে বাঙালি, বাংলা তার ভাষা সেদিন থেকেই পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু। ১৯৪৮-এ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, 'If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis and Sindhis first, and Moslems and Pakistanis only incidentally, then Pakistan is bound to disintegate.' *(The Magazine, ১৫ মার্চ ১৯৭১)*। ৭ মার্চের আগেই বঙ্গবন্ধু Time-এর সংবাদদাতা Dan Coggin-কে বলেছিলেন, সমঝোতার আর কোনো আশা নেই।

১ মার্চ থেকেই রাজপথে রক্তপাত আরম্ভ করেছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। জেনারেল ইয়াহিয়া আবার ঘোষণা দিল যে, গণপরিষদে বৈঠক বসবে ২৫ মার্চ। জেনারেলের দম্ভভরা কণ্ঠে শোনা গেল, 'যতদিন আমি সেনাবাহিনীর প্রধান আছি, আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হয়।' বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের বক্তৃতায় ভেসে গিয়েছিল জেনারেলের দম্ভোক্তি। নিষ্ঠুরভাবে সত্য হয়েছিল জিন্নাহর আশঙ্কা।

জেনারেলের দম্ভোক্তির উত্তরে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ওদের আমি শায়েস্তা করে দেবো, ওদের হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করবো।'

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-তে শেখ মুজিব ৬ দফা প্রস্তাব লাহোরে উত্থাপন করেন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে এ কর্মসূচি বিচলিত করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ তা। ৬ দফা প্রস্তাবে ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি এবং ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন মোড় নেয়। তখন থেকেই শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি এগুতে থাকে।

৭ মার্চের ভাষণের পর ধাপে ধাপে অথচ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় রাজনীতি। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার জন্য যেন দীর্ঘ প্রতিক্ষায় ছিল এবং তার নির্দেশনা বাস্তবে রূপান্তরিত করার কঠোর শপথ নিল। বস্তুত স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় ৭ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পতনের সাথে। বিকল্প সরকার চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর আদেশে। সচিবালয়ই হোক বা মন্ত্রণালয়ই হোক, তা স্থানান্তরিত হলো ইডেন বিল্ডিং থেকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে। ছয় দফা তখন এক দফার সংগ্রামে রূপ দেয়—স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা : 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকমি দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' এ আদেশ সশস্ত্র সংগ্রামের আদেশ, যুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ আলোচনা অসমাপ্ত রেখে জেনারেল ইয়াহিয়া করাচির উদ্দেশ্য ঢাকা ত্যাগ করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা গেল দেশের সর্বত্র এবং সকলকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিলেন বঙ্গবন্ধু। 'When the First shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like a prerecorded message the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh *(David Loshake, Pakistan Crisis, London, PP. 88-89)*. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় তাঁর স্বকণ্ঠে বলা হয়েছিল, 'Peoples are fighting gallantly with the enemy

for the cause of freedom of Bangladesh. Every section of the people of Bangladesh are asked to resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help you in your struggle for freedom from the enemy. Jay Bangla.' (The Statesman, Delhi, 27 March, 1971).

বঙ্গবন্ধুর এ আদেশেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়েছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতার জন্য। ২ লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে।

মার্চের প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হারিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাংলাদেশের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা। মওলানা ভাসানীর মতো নেতাও মেনে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। ৯ মার্চ তিনি পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় বললেন, অবিলম্বে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মেনে নেয়ার জন্য। মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু না হলে আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের মতো তুমুল আন্দোলন শুরু করব। খামাখা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করে চিনি...।' *(ড. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃ. ২৮৮-৮৯)*। ১২ মার্চ ১৯৭১ ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস ময়দানে মওলানা ভাসানী বললেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। *(পূর্বদেশ, ১০.৩.৭১)*। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো হানাদার বাহিনী। তাঁর গ্রেপ্তারের বর্ণনা বঙ্গবন্ধু নিজে দেন ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ সাংবাদিক David Frost-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে, যা WNEW-TV নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত হয় David Frost show-তে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী সে রাতে আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারা আমাকে মেরে ফেলতো যদি আমি বাড়ির বাইরে আসতাম। তবে মেরে ফেলার পর বলত চরমপন্থীরা আমাকে খুন করেছে। আমাকে মেরে ফেলার অজুহাতে ইয়াহিয়া খান আমার দেশের মানুষকে খুন করত। তারা হত্যাযজ্ঞ চালাত।' 'আমি কলকাতা কেন, যে কোনো দেশে পালাতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার দেশের লোককে যুদ্ধ করার কথা বলেছিলাম, তাদের ফেলে আমি কোথায় যাব?' ফ্রস্ট-এর উত্তরে বলেন, 'সে কথা ঠিক, এই ৯ মাস আপনাকে আপনার দেশের মানুষ আস্থার প্রতীক হিসেবে দেখেছে। তারা

আপনাকে এখন ঈশ্বরের মতো মনে করে।' ফ্রস্ট জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাকে তারা কিভাবে গ্রেপ্তার করল?' উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার এই বাড়িতে তারা মেশিনগান দিয়ে গুলি করে। আমার শোয়ার ঘরেও গুলি করে।' তারা চারদিক থেকে গুলি করতে থাকে। আমি আমার স্ত্রীকে দুই ছেলেকে নিয়ে শোয়ার ঘরে থাকতে বলে বের হয়ে আসি এবং তাদের বলি তোমরা গুলি বন্ধ করো। আমি তো এখানেই আছি। তারা চারদিকে থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে। একজন অফিসার আমাকে ধরে বলে ওকে মেরে ফেলো না।' তারপর তারা আমাকে আমার সমস্ত শরীরে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করো। আমাকে আমার পাইপ এবং তামাক আনতে দাও বা স্ত্রীর কাছ থেকে এগুলো নিয়ে এসো। তারা আমার বাড়ির সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার জিনিসপত্র সব লুট করে নিয়ে গেছে, তাতে আমার কোনো দুঃখ হয়নি, কিন্তু আমার ৩৫ বছর রাজনৈতিক জীবনের যে ইতিহাস ডাইরিতে লিখেছিলাম, তা নিয়ে গেছে। তারা আমার বইপত্র এবং কিছু প্রয়োজনীয় দলিল নিয়ে গেছে।' *(বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, ২য় ভল্যুউম, পৃ. ৬১৪)*

বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার খবর সরকারিভাবে তখন দেয়া হয়নি। জে. ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টিভিতে একটি ভাষণ দেয়। তাতে সে বলে, ২৩ মার্চ রাজনৈতিক নেতারা মুজিবের সাথে কথা বলতে যায় অ্যাসেম্বলি বসার বিষয়ে। তারা আমাকে বলে, মুজিব যে কর্মসূচি দিয়েছে তা থেকে নড়তে রাজি নয়। মুজিব চায় যে, আমি সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণা দিই এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করি। শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন একটি রাষ্ট্রোদ্রাহী কাজ। সে এবং তার দল তিন সপ্তাহাধিক কাল আইনের কর্তৃত্ব অবজ্ঞা করেছে। তারা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছে। জাতির পিতার প্রতিকৃতিকে অপবিত্র করেছে। তারা একটি সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা করেছে। তারা গোলযোগ, সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে... এমনকি তারা আমার ঢাকায় উপস্থিতিতেই সে এবং তার অনুসারীরা সরকারের কর্তৃত্ব অমান্য করেছে। সে জানতো যে সামরিক আইনের অবর্তমানে সে নির্বিঘ্নে যা খুশি তাই করতে পারত। তার অবাধ্যতা, গোঁয়াতুর্মি এবং কোনো রকম যুক্তিযুক্ত কথা বলতে অস্বীকৃতি থেকে কেবল একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, সে এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানকে

সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সে এই দেশের সংহতি এবং অখণ্ডতার উপর আঘাত করেছে। সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এ অপরাধের শাস্তি না দিয়ে পারা যায় না।' *(দ্য ডন, ২৭.৩.৭১)*

বঙ্গবন্ধুকে হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় জে. ইয়াহিয়ার নির্দেশে, তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের জন্য। এদিকে বঙ্গবন্ধুর শেষ আদেশে দেশের লোক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেয়া স্লোগান, 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে শারীরিকভাবে অনুপস্থিত কিন্তু তার প্রতীকের উপস্থিতি সর্বত্রই। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগর তাঁরই নামে। ১০.৪.৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। এ ঘোষণপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ঢাকাতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

এ ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, সংবিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন, রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন এবং প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের অবর্তমানে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। এ ঘোষণাপত্রটি ১৭ এপ্রিল সর্বসমক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করেন। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ একটি ভাষণ দেন। তিনি ভাষণের প্রারম্ভেই বলেন, 'আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে...।'

১৩ এপ্রিল *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার* এক খবরে প্রকাশ—'মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের পটভূমিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে একটি যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।'

বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ করা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মস্থল। ১৭ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে দিল্লির *দ্য স্টেটসম্যান* ১৮.৪.৭১-এ লিখল : ঘোষণাপত্র প্রকাশের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের সরকার জানাল যে, কেবল ঐ সরকারপ্রধানই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নন, তাঁর নামে সরকারের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হবে এবং সরকারের কর্মস্থলের নাম হলো 'মুজিবনগর'।

৩.৫.৭১ ইস্ট পাকিস্তান (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বিশ্বের বন্ধুপ্রতিম কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক দলের কাছে এক চিঠিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা জানান। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সমর্থনের জন্য আবেদন জানান এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানানোর আবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক মানসিকতা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল এ ধরনের আবেদন জানানো।

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে নেয়ার পর তাঁর খবর দীর্ঘদিন দেশবাসী জানতে না পারলেও তাঁর নামেই সরকার এবং গেরিলাযুদ্ধ পরিচালিত হয়; তাঁর স্লোগান, বিশেষ করে তাঁর দেয়া 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করত নতুন উদ্দীপনায় যুদ্ধ করতে। একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে যুবকর্মীদের একত্রিত করা হয়। জুন মাস থেকে তাদের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয় গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য। নভেম্বর পর্যন্ত এ ট্রেনিং চলে। প্রথমে এ ট্রেনিংপ্রাপ্তদের নাম দেয়া হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স'। পরে এদের 'মুজিব বাহিনী' নাম দেয়া হয়।

২৬ এপ্রিল '৭১-এ আমেরিকার *'নিউজ উইক'* ম্যাগাজিন লিখল যে, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা বঙ্গবন্ধুকে জেলে রেখে তার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করার উদ্যোগে খুব আস্থা লাভ করছে। *নিউজ উইক* আরো লেখে যে, ৫১ বছরের প্রগতিশীল নেতা, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের মূর্ত প্রতীক, তাঁকে জেলে রাখায় বাংলাদেশ সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৭ জুলাই ১৯৭১ লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* 'পাকিস্তানের একমাত্র উপায়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখে, 'পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং মিসেস গান্ধীর ওপর চাপ ক্রমশই বাড়ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে। বিলেতের প্রেস ক্রমশই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে। ইয়াহিয়ার ভুলত্রুটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধত্ব পাকিস্তানকে যে গভীর খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে বন্দিশালা থেকে মুক্তি দেয়া এবং তাঁকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে দিলে তিনিই কেবল শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। ঐ নেতার প্রজ্ঞা তাঁর রাজনৈতিক-বিরোধীদের পথ দেখাতে পারে।'

বিদেশী পত্রিকাগুলো একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উন্মাদনা থেকে তিনিই যে কেবল তাদের উদ্ধার করতে পারেন, এ কথা পত্রিকাগুলো একবাক্যে মেনে নিয়েছিল। তাদের ভুল যেখানে ছিল, তা হচ্ছে, তারা বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি যে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটির কবর খুঁড়েছিল ইয়াহিয়া খান এবং তার পাকিস্তানি রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা। ২৬ মার্চের পর পাকিস্তান যে পর্যায়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ ছিল না। বাংলাদেশে স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেখান থেকে পিছু ফেরার আর কোনো পথ ছিল না।

কায়হান ইন্টারন্যাশনাল ২৭ জুলাই ১৯৭১ ইয়াহিয়া খানের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানায়, 'মুজিবকে শীঘ্রই রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য বিচার করা হবে, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে মামলা তৈরির কাজ শেষ হলেই। পত্রিকার পক্ষ থেকে এক প্রশ্নের উত্তরে ইয়াহিয়া খান জানায় যে, সামরিক বিচারকদের হাতে বিষয়টি রয়েছে। কাজেই সে বলতে পারবে না যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের আগে মুজিবের বিচার বা তাঁর ফাঁসি হয়ে যাবে কি না। কোর্ট মার্শালে তাঁর বিচার হবে এবং পরিষদের অধিবেশনের আগে সে বেঁচে থাকবে কিনা, তা ইয়াহিয়া খান জানে না।

এ সাক্ষাৎকার থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালে বিচারের প্রহসন চলছিল এবং বিচারে যে তাঁর ফাঁসির হুকুম হবে, তাও নিশ্চিত ছিল।

২ আগস্ট ১৯৭১-এর *নিউজ উইকে* লেখা হয় যে, মুজিবকে সামরিক ছাউনি মিয়াওয়ালির একটি জেলে রাখা হয়েছে। মুজিব একজন জাতীয় নেতা থেকে শহীদে রূপান্তরিত হয়েছেন। জে. ইয়াহিয়া গর্বের সাথে জানায় যে, তার জেনারেলরা মুজিবের সামরিক আদালতে বিচার এবং ফাঁসির জন্য কাজ করে চলেছে। সে রাজি হয়েছে এবং বিচারের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এ পদক্ষেপের চেয়ে স্বল্প দৃষ্টির আর কোনো কাজ হতে পারে না এবং এতে মুক্তিযুদ্ধকে আরো কঠিন পথে নিয়ে যাবে। পত্রিকাকে একজন পশ্চিম দেশের কূটনীতিক জানান যে, ইয়াহিয়ার মতিভ্রম হয়েছে এবং সে কী করছে, তা জানে না, এমন কি বুঝতেও পারছে না তার সেনাবাহিনী কী করছে। সে মনে করে যে, সে কয়েক লক্ষকে মেরে ফেলতে পারে, মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বিচার করতে পারে এবং এই করে সে সবকিছুর সমাধান করতে পারবে। এটা একটা নিছক পাগলামি।

বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিলে যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বা পাকিস্তানের কী হবে, তা কূটনীতিকের এ কয়টি কথার মধ্যেই বোঝা যায়। বঙ্গবন্ধুর যে ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং যে বঙ্গবন্ধুকে জে. ইয়াহিয়া সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করছে, তাঁর প্রভাব মুক্তিযুদ্ধের ওপর এত বিশাল যে, তাঁকে হত্যা করলেও তাঁর দেয়া নেতৃত্ব বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে, যা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ বলেছিলেন। করাচির এক সম্পাদক *নিউজ* উইককে বলেন যে, শেখ মুজিবের ডাকে পাকিস্তান মার্চ মাসেই মারা গেছে। কোনো কিছুই এখন আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না। পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেও লেখা হয় যে, ইয়াহিয়া বিস্মৃত হচ্ছে সে কী কাজ করছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মুজিবকে মরতেই হবে। কিন্তু যেদিন মুজিবকে ফাঁসি দেবে সেই দিন পাকিস্তানেরও ফাঁসি হবে।

১১ আগস্ট ১৯৭১ *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* জানায় যে, অতি শীঘ্রই শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ হবে। তার বিচার এবং ফাঁসি দেয়ার কথা আগেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের বিচার কঠিন মুক্তিযুদ্ধকে কঠিনতর করে তুলবে। সশস্ত্র সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এত পরিষ্কার।

১২ আগস্ট ১৯৭১-এ *দ্য টাইমস*-এর 'শেখ মুজিবের ভাগ্য' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে বিচারের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক। 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া' চার্জটি দৃশ্যত অস্বাভাবিক। এ সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য কথা বলতে পারেন, যাতে পাকিস্তানের আরও বড় ট্যাজেডি না হয়। শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি, যার উপর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা আছে। কিন্তু যদি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাহলে আলাপ-আলোচনার আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাঁর আদেশ মেনে চলবে। সমস্ত সম্পাদকীয়টি পাকিস্তানের ভ্রান্ত রাজনীতির ওপর জোর দিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করেছে। সম্পাদকীয়টির পরিশেষে বলা হয়েছে, 'আমাদের সকলকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে শেখ মুজিবকে বাঁচানোর জন্য।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোষ্ঠীর অভিমত ছিল যে, পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে হবে এবং সে কাজটি পারেন কেবল বঙ্গবন্ধু। পরোক্ষভাবে এরা বুঝতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু যদি ইচ্ছা করেন তাহলে মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ হতে পারে এবং তাতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। অপরদিকে, যদি বঙ্গবন্ধু আটকও থাকেন তবুও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলোকবর্তিকা এবং তিনি যে আদেশ

দেবেন মুক্তিযোদ্ধারা তাই মেনে নেবে। যে জিনিসটি এই গোষ্ঠী কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিল না, তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন। সেখান থেকে আর তাঁর পেছানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা থেকে ১৯৭১-এর ১ দফা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৭১-এর *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন* জানাল যে, মার্কিন সিনেটর কেনেডি, যিনি সিনেটে শরণার্থী সাব-কমিটির চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তানে ৪ দিনের সফর শেষে নতুন দিল্লি পৌঁছেছেন। তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য যে জনসমাগম হয়েছিল, তাদের হাতে ছিল প্লাকার্ড, যাতে লেখা ছিল, 'শান্তির মানুষ কেনেডি স্বাগতম'। অন্যান্য প্লাকার্ডে লেখা ছিল 'মুজিবকে বাঁচাও', 'শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা।' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি দৃঢ় হতে থাকে এবং তা আসতে থাকে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই।

১৭ আগস্ট ১৯৭১-এর *হেরাল্ড ট্রিবিউনে* লিখল, সিনেটর কেনেডি বলেছেন যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইনের ধারণার পরিপন্থী। সংবাদপত্র জানাল যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার আগের সপ্তাহে পাকিস্তানের কোনো জায়গায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর বিচার বা তাঁর সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। পত্রিকা জানায় যে, সিনেটর কেনেডির মতে মুজিবের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে যে, তিনি নির্বাচনে জিতেছেন। ঐ পত্রিকা আরো লেখে যে, রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি জোর দিয়ে বলেছেন যে, শেখ মুজিবকে যে আইনের অধীনে বিচার করা হচ্ছে, তা ব্রিটেন এবং ভারতের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তাঁকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হবে না। পত্রিকা লেখে যে, যদি শেখ মুজিবের ফাঁসি দেয়া হয় বা আরো শরণার্থী ভারতে আসে, তাহলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

সেপ্টেম্বরে মিসেস গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নে যান ওখানে জনমত গঠনের জন্য এবং সোভিয়েত সরকারকে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য। মিসেস গান্ধী জানান, ভারতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আগমনের কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভারতের অবস্থা নাজুক হয়ে গেছে। সোভিয়েত নেতারা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দিচ্ছিল, কেননা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জড়িয়ে পড়লে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পক্ষ নিতে বাধ্য করবে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ তেহরান থেকে প্রকাশিত দৈনিক *আয়েনলেগান* লিখল যে, মুজিবুর রহমানের বিচার পাকিস্তানের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে এবং তাতে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সমাধান অসম্ভব হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ-পাকিস্তান রাজনীতির একজন প্রধান নায়ক তা এই উদ্বেগ থেকেই বোঝা যায়। এই গোষ্ঠী জানত যে, যদি মুক্তিযুদ্ধ চলে তাতে পাকিস্তানের জয়লাভের আশা খুবই কম, কাজেই তাদের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে সমস্যা সমাধান না করে রাজনৈতিক সমাধানের পথ গ্রহণ করেন তাহলে পাকিস্তান রক্ষা পায়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র পথ তাই বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধ করে তাঁকে মুক্ত করে আলোচনার টেবিলে আনা। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আলোচনার সব পথ বন্ধ হওয়াতেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সংগ্রাম করে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য শেষ বাঙালি বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। সে আদেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে দেখা গেল যে, মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধে যতই সাফল্য লাভ করছে, পাকিস্তান ততই মরিয়া হয়ে উঠছে। দুটি বিষয়ের প্রথমটি হলো যে, মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের কারণ ভারতের গোপন সহায়তা এবং দ্বিতীয়টি হলো বঙ্গবন্ধুর বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে তাঁর ফাঁসি দেয়া। যদি বঙ্গবন্ধুর বিচারে ফাঁসির হুকুম হয়, তাহলে মুক্তিবাহিনী হতোদ্যম হবে এবং গেরিলাযুদ্ধে ভাটা পড়ে যাবে এবং ভারত এককভাবে তখন আর পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণায় উৎসাহ পাবে না। পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক সমাধানের কথা বললেও পাকিস্তান তত দিনে বুঝতে পেরেছিল যে, বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার টেবিল থেকে অনেক দূরে রণাঙ্গনে সমাধান হতে চলেছে। রণাঙ্গনে সমাধান বন্ধ করার পথ হিসেবে তারা বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং ফাঁসির হুকুমই একমাত্র উপায় বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নেতৃত্ব সম্যকভাবে জানত মুক্তিবাহিনীর পেছনের শক্তি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকবে। অক্টোবরের শেষে মিসেস গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে সাক্ষাৎ করের এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ৯০ লক্ষ শরণার্থীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বাতাবরণ

সৃষ্টির অনুরোধ করেন। মিসেস গান্ধী প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের কথা বললেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলছিলেন।

১ নভেম্বর ১৯৭১-এ *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের* জ্যেষ্ঠ সম্পাদক আর্নো দ্য বুরশগ্রাদের সাথে সাক্ষাৎকারে তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে জে. ইয়াহিয়া বলেন যে, তিনি যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পাঠান, তাহলে সেখানকার লোকই তাঁকে মেরে ফেলবে। জে. ইয়াহিয়া ভালো করেই জানত যে, যদি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ আরো তীব্র হবে এবং পাকিস্তানের পরাজয় ত্বরান্বিত হবে। সে যদি তার নিজের কথায় বিশ্বাস করত তাহলে বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং তারপর ফাঁসির ঝুঁকি তাকে নিতে হতো না। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়ক বুঝতে পেরেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সমার্থবোধক হয়ে গেছে।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর *লন্ডন টাইমস* জানায় যে, মিসেস গান্ধী ভারতীয় লোকসভায় এক ভাষণে জানান যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের জনগণের সমর্থিত সরকার। ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা এখন চিন্তা করছি, এই নতুন রাষ্ট্রের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের কথা।' মিসেস গান্ধীর এই উদ্বেগ সহজেই অনুমেয়।

যদি পেছনের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে কেবল রাষ্ট্রগুলোই সোচ্চার হচ্ছিল, তাই নয়, ১০ আগস্ট ১৯৭১-এ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জ্যুরিস্টসহ ২১৪টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক টেলিগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামিরক বিচারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আদালতের কাছে কোনো কিছুই গোপনীয় নয়। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জ্যুরিস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের গোপনে সামরিক আদালতে বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কোর্ট মার্শালে ৫ জন সামরিক কর্মকর্তা ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা ইত্যাদি। সর্বমোট ১২টি অভিযোগ ছিল, তার মধ্যে ৬টির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন যে, সরকার তাঁকে সমর্থনের জন্য এডভোকেট দিতে চায়, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানান, কেননা তিনি বুঝতে পারেন বিচারটি একটি প্রহসনমূলক নাটক। তিনি বিচারককে

অনুরোধ করেন, এডভোকেটদের চলে যেতে, কেননা জে. ইয়াহিয়া রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিনিই তাঁর শাস্তি পাকা করবেন এবং তিনিই আদালত বসিয়েছেন। ৪ ডিসেম্বর বিচারপর্ব শেষ হয়। জে. ইয়াহিয়া বিচারকের অর্থাৎ লে. কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ারদের ডেকে পাঠান রাওয়ালপিন্ডিতে এবং রায় দেয়ার আদেশ দেন। তারা তাঁকে ফাঁসি দেয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তারা তাঁর কারাকক্ষের কাছেই কবর খোঁড়ে, তিনি নিজের চোখে তা দেখেন। বঙ্গবন্ধু ফ্রস্টকে বলেন যে, ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে জানায়, ভুট্টোকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে না মেরে ফেলা। সে ভুট্টোকে আরো বলে যে, ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে তাকে অনুমতি দেয়া হোক শেখ মুজিবুর রহমানকে মেরে ফেলার এবং তাকে বলতে দেয়া হোক যে, অনেক আগের তারিখেই তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। *(বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৬১৭-৬১৯)*।

জে. ইয়াহিয়া ১৯৭১-এর ৩ আগস্ট সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী এবং এর জন্য তাঁর বিচার হবে। সে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা তোমাদের অপরাধীদের সাথে কী রকম ব্যবহার করবে?' *(দ্য ডন, করাচি, ৫.৮.৭১)*। আগস্টের ৯ তারিখে একটি সরকারি প্রেসনোটে জানানো হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার হবে। ১১ আগস্ট বিচার আরম্ভ হবে। তাঁকে ২৬.৩.৭১ তারিখে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় *(দ্য ডন, করাচি, ১০.৮.৭১)*।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অপরাধের বিচার যে প্রতিক্রিয়ায় হবে, তা পাকিস্তান সরকার গ্রাহ্য করে না *(দ্য ডন, করাচি, ১৬.৮.৭১)*। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা শাহি জানায় যে, ২ সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। বিচার কোথায় হচ্ছে তা জানাতে রাষ্ট্রদূত অস্বীকৃতি জানায় *(দ্য ডন, করাচি, ১.৯.৭১)*।

প্যারিসের দৈনিক *ল ফিগারোর* সাথে ১.৯.৭১ তারিখে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জনগণের শত্রু।

দ্য ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, ১১.৮.৭১ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার আরম্ভ হয়েছে। ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্য ডনের ২০.১০.৭১-এ প্রকাশ করা হয় যে, প্যারিসের ল মডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জে. ইয়াহিয়া জানায় যে, সে একজন বিদ্রোহীর সাথে কথা বলতে পারে না।

দ্য ইভিনিং স্টার, করাচি, ১৫.৯.৭১-এ লেখে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত ও আইনানুগ হবে।

২৬.৯.৭১ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানায় *(রয়টার্স, ২৭.৯.৭১)*।

রয়টার্স ৫.১১.৭১-এ জানায় যে, পাকিস্তানের ৪২ জন রাজনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, সাংবাদিক, আইনবিদ, লেখক, ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে।

ইউপিআই ইসলামাবাদ থেকে ১৮.১২.৭১-এ জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও রায় দেয়া হয়নি।

৮.৮.৭১-এ মিসেস গান্ধী শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের, যার অর্থ হচ্ছে ফাঁসি, দেয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রতিবাদ জানান।

জিডিআর ১৪.৮.৭১ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানায়। ২০.৮.৭১ ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল একই প্রতিবাদ ও অনুরোধ জানায়।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের এক সভায় আর্থার বটম বেল (ব্রিটেনের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সরকারদের অনুরোধ জানান, পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে, যাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ হয়।

মার্কিন সিনেটর এইচ পার্সি বলেন যে, যদি শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তান সরকারকে ঘৃণা জানাবে।

আরব লীগের প্রাক্তন প্রতিনিধি এবং আল আইয়ামের সম্পাদক কডিস মাকসুদ ২০.৯.৭১ তারিখে বলেন যে, আন্তর্জাতিক সমাজ এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর পক্ষ থেকে অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানাক।

বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত বিচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে; এর একমাত্র কারণ ছিল যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূর্ত প্রতীক। তিনি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর নামেই, তাঁর ডাকেই মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। বিশ্বের প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার

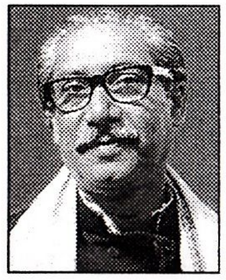
সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং তারই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর (যাঁকে মিসেস গান্ধী নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জনক বলে অভিহিত করেন) বিচার বন্ধ করতে চাপ সৃষ্টি করে, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আরো গভীরভাবে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পর বিশ্বের সব মহলে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা থেকেও বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায়ে তাঁর অবস্থান কোথায় ছিল, কী ছিল।

পেনাং-এর পত্রিকা *দ্য স্টেটস ইকো* ২২.১২.৭১-এ লেখে 'মুজিব বাংলাদেশের জনক এবং এটা অপরিকল্পনীয় যে, তিনি তাঁর জনগণকে অন্য কোনো পতাকার নিচে নিয়ে যাবেন।' একই পত্রিকা ৪.১.৭২-এ লেখে, 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা।'

খার্তুমের পত্রিকা *আল আইয়াম* ১০.১.৭২-এর সম্পাদকীয়তে লেখে, 'শেখ মুজিবুর রহমান কেবল মুক্ত ব্যক্তিই নন, তিনি সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের প্রধান।' শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ক্ষমতা এবং অধিকার আছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার।

দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান (পার্থ) ১২.১.৭২-এ এক সম্পাদকীয়তে লেখে, "বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে গেছে, শেখের পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্য কোনো জাতীয় নেতা এই রকম নাটকীয়ভাবে এক দুরূহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকে ক্ষমতায় আসতে পারতো না।'



কে. জি. মুস্তাফা

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আবার বির্তক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ তাঁর গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে। পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিদের কাছে ঐ ঘোষণার মেসেজ পাঠানো হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় ২৫ মার্চ গভীর রাতে। দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাতেই। ঘোষণাকালে উল্লেখ করা হয় ২৬ মার্চ, যেহেতু ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর ২৬ মার্চ ধরা হয়। এ নিয়ে সম্প্রতি অনর্থক বির্তক উস্কে দিল বিএনপি-জামায়াত সরকার।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন একটা দলিল তৈরির প্রকল্প হাতে নেন। প্রকল্পের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন কবি-সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পরও প্রকল্পের কাজ চালাতে থাকেন হাসান। তিনি ১৫টি খণ্ডে দলিলের কাজ প্রায় সমাপ্ত করেছেন এমন সময় অসুস্থ হন এবং পরে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। এর পর দলিলের কাজ সমাপ্ত করার কাজ পান সাংবাদিক মুস্তাফা রওশন আখতার। এম আর আখতার মুকুল যথাসময়ে ১৫ খণ্ড দলিল প্রকাশ করেন। ঐ সময় ক্ষমতায় ছিলেন জেনারেল এরশাদ। দলিলের একটি খণ্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক মেসেজটি দেশ-বিদেশে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং তার তৈরি তালিকা অনুযায়ী। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর বহু প্রত্যাশিত মেসেজটি পেয়ে মাইকযোগে প্রচার করেন এবং বেতারে সম্প্রচার করার উদ্যোগ নেন।

এদিকে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৩ মার্চ থেকে ঢাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ১৯ মার্চ আলোচনা ফলপ্রসূ স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা বানচাল করার চক্রান্ত করতে থাকেন। ১৯ মার্চ ঢাকার জয়দেবপুর এলাকায় মিলিটারি ও জনতার মাঝে সংঘর্ষ বাধে। দুজন নিহত হন। ফলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। নিহত দু'জনের লাশ নিয়ে একটা বিরাট মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। এ অবস্থার মধ্যে আলোচনার গতি স্তিমিত হয়ে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা মমতাজ দৌলতানা এবং আব্দুল ওয়ালী খান আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বিবেচনা করে ঢাকা ত্যাগ করেন ২০ মার্চ। ঐ দিনই করাচি থেকে ঢাকায় আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ২১ মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিবের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। ২২ মার্চ ইয়াহিয়া ও তার অফিসারদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন আওয়ামী লীগ ও পিপিপি নেতৃবৃন্দ। ২৩ মার্চ ঢাকার সর্বত্র আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের ডাকে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐ দিনটি পাকিস্তান দিবস হওয়ার কারণে সরকারি ভবন ও কূটনীতিকদের বাসা ও কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকার কয়েকটি দূতাবাসে পতাকা নামিয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করতে রাজি করান ঢাকার ছাত্র-যুবকরা। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যরা ২৪ তারিখের নির্দিষ্ট বৈঠকে যাননি। বৈঠক বাতিলও করেননি।

২৫ মার্চ বেলা ৩টার সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো ইন্টারকনে এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সকালের আলোচনায় আসেননি। তিনি ক্যান্টনমেন্ট গেছেন, হয়ত ট্রুপস ইনসপেক্ট করছেন সেখানে। তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ জানিয়ে দিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়তো সৈন্যদের অ্যাকশনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক একতরফাভাবে ভেঙে দিয়ে গোপনে ক্যান্টনমেন্টে চলে যান ২৫ মার্চ অপরাহ্নে। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টায় তিনি করাচি যাত্রা করেন বলেও খবরে রটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদিকে মুক্তিকামী তরুণরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সুসংহত করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সেনানীরা রাস্তায় রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করেন। যদিও ট্যাঙ্কের সামনে গাছের গুড়ির প্রতিরোধ কোনোই কাজে আসে

না, তবুও ব্যারিকেড দেয়ার সাহস সঞ্চয় করাটাও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

একাত্তরের পঁচিশ মার্চের রাতটা চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটালাম, আমরা অবজারভারের সাংবাদিক প্রেস কর্মচারীরা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর। পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে আগুন দেয়া হলো বাড়িঘরে। আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যারা বাইরে আসেন তাদের গুলিবর্ষণে স্তব্ধ করা হয়। রাত ১১টার দিকে ট্রেসার বোমা নিক্ষেপ করা হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলাবর্ষণ। সমগ্র পুলিশ লাইন্সে মৃত্যুর বিভীষিকা। একই সঙ্গে গোলাবর্ষণ করা হলো পিলখানার ইপিআর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানেও নরহত্যার তাণ্ডব। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ও পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স থেকে সরে পড়েন অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধা। তারা যোগ দেন মুক্তিফৌজে। ঐ রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ইত্তেফাক ও নিউ নেশন পত্রিকার কার্যালয় এবং জাতীয় প্রেসক্লাব। রাজধানীর শিখদের প্রাচীন গুরুদুয়ারা, হিন্দুদের মন্দির সবই ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উন্মত্ত হামলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রাবাসে চালানো হয় সেনা অভিযান, হত্যা করা হয় ছাত্র-শিক্ষক। জগন্নাথ হিন্দু ছাত্রাবাসে সকল শিক্ষক ও ছাত্রকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক ড. জিসি দেব। লাইনের একজন ছাত্র অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে হানা দিয়ে শিক্ষকদেরও লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা। সংবাদ দৈনিকে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করা হয় দু'তিন দিন পর। সেখানে নিহত হন সাংবাদিক শহীদ সাবের। ঢাকার বিভিন্ন বাজারে হত্যাকাণ্ড চালানো হয় রাতের অন্ধকারে।

২৬ মার্চ সকাল থেকে চলে বিশেষ টার্গেটে অগ্নিসংযোগ, ধরপাকড়, লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার। ২৫ তারিখের রাতেই জারি করা হয় কার্ফ্যু, সমগ্র রাজধানীতে একটানা ৭২ ঘণ্টা। ফলে ২৬ তারিখ সারাদিন ও সারারাত কার্ফ্যু চলে। কার্ফ্যুর মধ্যে পত্রিকা অফিস থেকে দেখেছি, ঢাকা জ্বলছে। চারদিকে আগুন ছোট কোনো ছাপাখানাও বাদ যায়নি। সবই ধ্বংস করা

হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রাণভয়ে পালানো মানুষজন রাস্তায় ধরা পড়লে নিহত হন জল্লাদ বাহিনীর আক্রমণে। বুড়িগঙ্গা পার হতে যাওয়া যাত্রীরা নদীর বুকেই প্রাণ দিয়েছেন হায়েনাদের গোলার আঘাতে অথবা ব্রাশফায়ারে। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পতনোন্মুখ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টিভিতে ভাষণ দেন। তিনি ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, মুজিব তার সমর্থকদের পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই হিসেবেই বিচার হবে। ইয়াহিয়ার ভাষণের কোনো অংশেই পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার চক্রান্তকারী রূপে মেজর জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চের গভীর রাতে অথবা ২৬ তারিখের সকালে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন এমন কথা কোথাও উল্লেখ করেননি প্রেসিডেন্ট বা অন্য কোনো নেতা।

কারফিউ প্রত্যাহারের পর ২৭ মার্চ সকাল আটটায় আমরা পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার অফিস থেকে বের হই। সেখান থেকে হেঁটে (কোনো যানবাহন ছিল না বলে) আজিমপুর এস্টেটের বাসায় আসার পথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যালীলার স্বাক্ষর রাজপথের দু'পাশে দেখতে পাই। দেখতে পাই প্রেসক্লাবের ক্ষত-বিক্ষত দালান, মাটিতে গুড়িয়ে ফেলা শহীদ মিনার, ইকবাল হলের (পুরনো শেড) সামনে সারিবদ্ধ মৃতদেহ ছাত্রদের, তখনও সরিয়ে ফেলা যায়নি।

বাসায় ফিরে পেলাম একটি জরুরি খবর। জননেত্রী মিসেস জাহানারা ইমাম খবর পাঠিয়েছেন, আমরা সপরিবারে যেন অবিলম্বে তার মায়ের ধানমণ্ডি ৬ নম্বর রোডের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করি নিরাপত্তার কারণে। মিসেস ইমাম এক সময় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং সাবেরা ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষিকা, সেই সূত্রে আমাদের পরিচয়। অবশ্য আমার রাজনৈতিক ও পেশাগত পরিচিতিও তিনি জানতেন। যাই হোক, তাঁর খবর অনুযায়ী যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছেলেদের নিয়ে আজিমপুর এস্টেটের বাসা ছেড়ে চলে যাই মিসেস ইমামের মায়ের বাসায়। সেখানে শান্তিনগর থেকে আমার স্ত্রীর খালু, গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস ভূঁইয়া এবং জামাতা ড. বদীউজ্জমান তাঁদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসেন মিসেস ইমামের মায়ের বাসায়।

এত লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা আমি কিভাবে শুনলাম, তা সবিস্তারে বর্ণনা দেয়া। ঐ বাড়িতে রেডিও শুনতে শুনতে

হঠাৎ কানে আসে কোনো এক মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। আমার খালু-শ্বশুর আব্দুল কুদ্দুস ভূঁইয়া এ খবর শুনে বলে উঠলেন, 'ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে জিয়া নামে আমার এক ছাত্র ছিল। এ মেজর সেই ছাত্র হতে পারে।' আমরা হিসেব করে দেখলাম, ফৌজদারহাট কলেজের ছাত্র জিয়ার সঙ্গে এই মেজরের বয়স মিলছে না। জিয়ার ঘোষণায় আমরা খুব এক্সাইটেড। কয়েক ঘণ্টা পর আরও একটি ঘোষণা শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর. খুব সহজে মেজর জিয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। জিয়া আমাদের সাংবদিক বন্ধু ফওজুল করিম তারার চাচাত ভাই। তারা জিয়ার বড়। জিয়া তাঁর দু'টি ঘোষণার কথাই স্বীকার করেন।

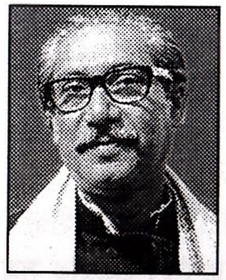
পরবর্তী কথা প্রসঙ্গে শুনেছি, একাত্তর সালের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানের দু'টি ঘোষণা প্রচারিত হয় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। দু'টি ঘোষণাই ২৭ মার্চ করা হয়েছে। প্রথম ঘোষণায় জিয়া বলেছিলেন 'আই, মেজর জিয়াউর রহমান, ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট।' এই ঘোষণা শোনার পর চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ কে খান কয়েকজন নেতাকে ডেকে বলেন, কে জিয়া, তাকে কেউ চেনে না। ঐ ঘোষণা সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিতে বল। তাহলে লোকে বিশ্বাস করবে।' এ কথা শুনে দ্বিতীয় ঘোষণা দিতে জিয়াউর রহমান রাজি হন এবং দ্বিতীয় ঘোষণা ব্রডকাস্ট করা হয়। আমরা মিসেস জাহানারা ইমামের মা'র বাসার শ্রোতারা দু'টি ঘোষণাই শুনেছি এবং দু'টি ঘোষণাই ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ দেয়া। দ্বিতীয় ঘোষণায় জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

একাত্তরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের একদা বিশিষ্ট ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব আবদুল হাফিজ কারদার ঢাকায় আসেন। তিনি তখন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপির) অন্যতম নেতা এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক আইনসভার সংসদ সদস্য। তিনি ঢাকায় এসে অন্যদের মধ্যে আমার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিপিপিতে তখনকার দুই নম্বর নেতা ছিলেন মিরাজ মোহাম্মদ খান। মিরাজের বড় ভাই মেনহাজ বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং পাকিস্তানের ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (পিএফইউজে)-এর প্রথম সারির নেতা। সেই সূত্রে মিরাজ ছাড়াও পিপিপিতে আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁরা সবাই হাফিজ কারদারকে আমার খবর নেয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।

কারদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ইন্টারকন্টিনেটাল (বর্তমান শেরাটন) হোটেলে। তিনি আমার ব্যক্তিগত খবরাদি শোনার পর জানতে চাইলেন শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া কি। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন এ খবর তো আমরা-পাইনি। তিনি হেসে বললেন, 'আপনারা যে পরিস্থিতিতে বাস করছেন তাতে অনেক খবরই জানতে পারবেন না। শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষাণার মেসেজটি পাকিস্তানি সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করে। এটা পাকা খবর। এ ব্যাপারে পাকিস্তান শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে হাইট্রিজনের মামলা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া কি?

আমি বললাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা যে অত্যাচার করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর তাতে কেউ যদি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন তো সমর্থন পাবেন সমগ্র জাতির। যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করবেন তারা চিহ্নিত হবেন পঞ্চম বাহিনী, রাজাকার ইত্যাদি অভিধায়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করে থাকলে সারা দেশ তাঁর পক্ষে দাঁড়াবে, তাঁর জয়গান গাইবে এটা সুনিশ্চিত।

এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও আজ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার প্রচার করছে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এসব ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে জোট সরকার নিজেদের অবস্থা দুর্বলতর করবে মাত্র।



খান সারওয়ার মুরশিদ

মালরো, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব ও কতিপয় নায়ক

এক

শেখ মুজিবকে দেখে তার মনে হয়েছিল 'এক অশ্বারোহী সেনানায়ক, যিনি ক্রুসেডের কালে অনায়াসে সালাউদ্দিনের সেনাবাহিনীতে স্থান পেতে পারতেন। সেই পুরনো দিনের সেনানায়কদের মতোই তিনি মর্যাদামণ্ডিত, উদারমনা এবং ভাবপ্রবণ।' তার সাথে মুজিবের সাক্ষাৎ যেন 'এক ভাইকাউন্টের সাথে আরেক ভাইকাউন্টের দেখা'—এক অভিজাতের আরেক অভিজাতের মুখোমুখি হওয়া। মালরো তো শুধু লেখক ছিলেন না—ছিলেন এক অভিযাত্রী সৈনিক। তার নিজের নায়ক ছিলেন শার্ল দ্য গল, যার অধীনে তিনি আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন, শান্তির সময়ে যার মন্ত্রিসভায় তিনি সংস্কৃতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উপরে উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরের কথাগুলো মালরোর যে প্রকাশিত মন্তব্য থেকে নেয়া তাকে কাব্যিক রূপকের ভাষায় এই শিল্পী-সৈনিক অন্তত আরো একটি রহস্যময় উক্তি করেছিলেন, যার ভাবার্থ এ রকম : ধ্যানী বুদ্ধ মানবসেবা শেষ করে যখন মোক্ষ লাভ করেন এবং আলোর জগতে প্রবেশ করেন তখন আকাশে সারসরা উড়ছিল। একই সারসরা যখন পৃথিবীর এক সেনাপতি অর্থাৎ কর্মযোগীর দিকে উপর থেকে তাকাল, তখন তিনিও আলোয় উদ্ভাসিত হলেন। অন্য কথায় (কবি ইয়েটসের চিন্তায় যেমন দেখতে পাই) ধ্যানী পুরুষ এবং যোদ্ধা বীর নিজ নিজ স্থানেই মোক্ষ লাভ পেলেন। একই সাথে মালরো সশস্ত্র নায়ক দ্য গল এবং দীর্ঘ কারাবরণকারী অহিংস অসহযোগের বীর মুজিবকে কিংবদন্তিতে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের দু'জনের

মধ্যকার মিলকেও তিনি এভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বাংলাদেশের শেখ মুজিব মালরোর ব্যক্তিগত মিথলজিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন আশ্চর্যভাবে।

দুই

১৯৭৩ সালে মালরো রাজশাহী বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন। তাকে পুরনো বিমানবন্দর থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা সরকারি হেলিকপ্টারে করে মোতিহার ক্যাম্পাসে নিয়ে আসেন। ফেরার সময়ে আমি তাকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাই। আমি ছাড়া তার সাথে ছিলেন তার তখনকার সার্বক্ষণিক সহচরী সাফি দ্য ভিলমোর‍্যার। তার বিমানের যাত্রার উদ্যোগ নিতে কিছু বিলম্ব ঘটে। সেই ছিল তার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা বলার আমার একমাত্র সুযোগ। বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান গ্রহণ করার সময়ে মালরো তার বিশিষ্টতায় দ্যুতিময় এবং মর্মস্পর্শী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সমাবর্তন শেষে উপাচার্যের বাসভবনে মধ্যাহ্ন ভোজের পর যৌথ সভায়ও তার সাথে কিছু আলাপ হয়েছিল, কিন্তু আমার মন ফিরে যায় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে আমাদের একান্ত মতবিনিময়ের কিছু কিছু অংশে। কিন্তু সে কথা এখনো নয়।

মালরো কেমন করে এলেন বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানসূচক ডিগ্রি নিতে, আর কেনই বা আসলেন? স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দিনগুলোতে মনে হতো দেশটা দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে সুন্দর এবং মহৎ কোনো কিছুকে স্পর্শ করেছে। এতো মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভেতরটা জীবনের প্রতি ভালোবাসায় এবং কৃতজ্ঞতায় কেমন ভরাট মনে হতো তখন—যেন অপরিচিতকে বুকে জড়িয়ে ধরা যায়। 'We are blest by everything/Everything we look upon is blest'—এমন একটা অনুভূতি। ঢাকার রাস্তায় শত শত কৌতূহলী বিদেশী, অনেকে সাংবাদিক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের কারো কারো ভূমিকা সততা এবং মানবিতকতায় অবিস্মরণীয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তখনকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তাদের একটি দলকে এক সংবর্ধনায় আপ্যায়িত করেন। সংবর্ধনার শেষের দিকে শুরু হলো পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন ও সহায়তাদানকারী সকল সুহৃদয়ের স্বাস্থ্যপান বা সম্মান ও শুভ কামনা

জানানো। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সংগ্রামে আঁদ্রে মালরোর আশ্চর্য অবদানের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে এবং তাঁর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করতে উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানালাম। মালরোর বিদ্যুৎসঞ্চারী নামটি উচ্চারিত হওয়ার মাত্র হর্ষোৎফুল্ল সব অতিথি আমার সাথে একযোগে তাদের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকালেন। দু'জন ফরাসি সাংবাদিক, একজন পুরুষ, একজন মহিলা এগিয়ে এসে উষ্ণভাবে আমার করদর্শন করলেন। মহিলাটি বললেন, নাৎসিবিরোধী প্রতিরোধে আমাদের বীর মালরো আপনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধেরও একজন দূরস্থিত সৈনিক। কী আশ্চর্য ফরাসি ও বাঙালির মধ্যে এ সেতু যা মালরো বেঁধে দিলেন, আর কি স্বাভাবিক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মালরো স্মরণীয়ভাবে একাত্মতা জানিয়েছিলেন এবং তার সমর্থনে স্বাতন্ত্র্য ছিল।

আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য লড়াইয়ের এক সঙ্কটময় পর্যায়ে মালরোর একটি ঘোষণা বাঙালিদের মনে গভীর রেখা ফেলেছিল এবং সারা বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে ভারতের সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের সমস্যার যথাযথ আন্তর্জাতিক উপলব্ধির জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। মালরো তাতে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু যোগদান করেননি। তবে একটি অসাধারণ চিঠিতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার অঙ্গীকারের প্রতিকৃতি ব্যক্ত করেছিলেন : 'সম্মেলনে আলোচনা হবে, প্রবন্ধের মালমশলা সৃষ্টি হবে, কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানি ট্যাঙ্কগুলো আরো অনেকদূর অগ্রসর হবে। আর বাংলাদেশের পক্ষে সেসব বুদ্ধিজীবীই কথা বলতে পারেন, যাঁরা বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমি মুক্তিবাহিনীর অধীনে একটি দল পরিচালনার দায়িত্ব চাই।' মালরোর ঘোষিত অভিপ্রায়ে নাটকীয়তা ছিল, কিন্তু সেই সাথে ছিল নিজের প্রত্যয়কে কাজে পরিণত করার অনমনীয় দায়িত্ববোধ। মালরো এমন একজন শিল্পী-দার্শনিক-সৈনিক, যিনি তার বর্ণাঢ্য জীবনের সকল পর্বে বিশ্বাসের সত্যতা খুঁজেছেন কর্মে, বাস্তব প্রয়োগে। তিনি লেখনি ছেড়ে অস্ত্র ধরেছিলেন স্পেনের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ত্রিশের দশকে, আবার সত্তরের দশকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চাইলেন কথায় নয়, একটি ট্যাঙ্ক বহরের পরিচালক রূপে। তার বয়স তখন সত্তর। বাংলাদেশের যোদ্ধাদের তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন, 'গেরিলা পদ্ধতিতে তোমরা লড়াই করো, প্রথাগত যুদ্ধে একটা পেশাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমরা টিকবে না।' আর সব শেষে Le Figaro-তে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উদ্দেশ্যে তার খোলা চিঠি, যার একটি অংশ

এ রকম : 'আপনার বিমানবাহী রণতরী কোলকাতাকে বিপন্ন করতে পারলেও যুক্তরাষ্ট্র ওখানকার মৃত্যুমুখী শরণার্থী মানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে না। পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী যদি নগ্নপদ ভিয়েতনামীদের গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম না হয়, আপনি কি বিশ্বাস করেন ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী ১২ শত মাইল দূর থেকে স্বাধীনতার উদ্দীপ্ত একটি দেশকে আবার দখল করতে পারবে? পৃথিবীর ভাগ্য যখন ঝুঁকির মুখে, বঙ্গোপসাগরে বিমানবাহী রণতরী পাঠানো কোনো নীতি নয়—অতীতের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।' যে নৈতিকতা এবং মানবিক বোধ এ মহৎ উচ্চারণের পেছনে রয়েছে, যে যুক্তি, আবেগ এবং দৃষ্টি এতে সমন্বিত হয়েছে, তার কাছে পরম শক্তিধর রাষ্ট্রকেও ক্ষুদ্র মনে হয়।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সে সন্ধ্যায় আমার মনে একটি সঙ্কল্প জেগেছিল : ঔপন্যাসিক দার্শনিক উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামী পুরুষ, মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী মালরোকে, সমসাময়িক বিশ্বের এই আশ্চর্য প্রতীকী ব্যক্তিত্বকে স্বাধীন বাংলাদেশে একবার যথাযথ মর্যাদায় বরণ করতে হবে। ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূল পরিবেশে এ সঙ্কল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল।

তিন

একটা উদ্বেল মুহূর্তের চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত কার্যকর হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, ডিন, অধ্যাপক ও অন্য সহকর্মীদের সানন্দ সমর্থনে এবং চ্যান্সেলর আবু সাঈদ চৌধুরীর অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। অনিশ্চয়তা যে ছিল না এমন নয়, কেননা আমরা জানতাম না নিমন্ত্রণ পেলেও মালরো আসবেন কিনা। প্রথমত, তিনি এতবড় একজন ব্যক্তিত্ব, মানুষ হিসেবে প্রত্যাশিতভাবেই জটিল, আবার প্রটোকলেরও একটা ব্যাপার আছে। আমাদের তখনকার প্যারিসস্থিত রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহর মতে, মালরোর কথোপকথনের ভাষা একটু অতিরিক্ত আড়ম্বরপূর্ণ, যাতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত, ফরাসি বিপ্লবের সন্তানসন্ততিরা আজো সামন্ত কায়দায় একে অপরকে মহাশয়/মহাশয়া বলে সম্বোধন করে। ঢাকার ফরাসি দূতাবাসও খুব করে চেয়েছিল মালরো আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। দুই দেশের রাষ্ট্রদূতদের পরিশীলিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা নিঃসন্দেহে ফলপ্রসূ হয়েছিল : আনন্দচিত্তে এবং যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে মালরো আমাদের কাছে এসেছিলেন। মানবমন এবং মানবমুক্তির এমন একজন অভিযাত্রীর সম্মাননার জন্য এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে? সমাবর্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে সম্মানসূচক ডিগ্রির জন্য মঁসিয়ে মালরোকে উপস্থিত করে ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজিতে যে কথাগুলো বলেন তা সংক্ষেপে পুনর্ব্যক্ত করলে এ রকম দাঁড়ায় : মঁসিয়ে মালরো শিল্প ও সাহিত্যে এবং মানুষের মুক্তি ও মর্যাদা অর্জনের সংগ্রামে গৌরবময় অবদান রেখেছেন। তার সৃষ্টি ও কর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সুন্দর আর অর্থপূর্ণ করেছেন। মানবতাবাদী রেনেসাঁসের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মালরো মানুষের স্বাধীনতার আদর্শ এবং অর্থ খুঁজেছেন বিচিত্র ভূমিকায়:

ইন্দো-চীনে এবং চীনে বিপ্লবী হিসেবে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের পক্ষ স্বেচ্ছাসেবী বিমানযোদ্ধা হিসেবে, নাৎসিদের বিরুদ্ধে গোপন প্রতিরোধের নেতা হিসেবে, রাজনীতিক, পুরাতাত্ত্বিক, পণ্ডিত, ঔপন্যাসিক, চারুকলা বিষয়ে লেখক ও দার্শনিক হিসেবে। মঁসিয়ে মালরোর চারুকলা বিষয়ে রচনা ও তার উপন্যাস তার জীবনেরই সম্প্রসারণ এবং তার কাছে চিন্তা ও কর্মের মিলিত আয়তনই জীবন। নিজের মতাদর্শকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে তিনি সব সময়ে রাজি বলে তার নৈতিক কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত। বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তিনি তাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলেন।

মালরো গভীর আবেগের সাথে মানুষকে বিশ্বাস করেন। তার মানবজীবনের অর্থের অন্বেষা, তাঁর সব রচনা এবং কাজের একই বাণী : মানুষ যা সৃষ্টি করে মানুষ তা-ই, আর মানুষকে বিপ্লব করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, শিল্প সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে সে তার ভাগ্যকে মুক্তিতে রূপান্তর করতে পারে। সৃষ্টিশীলতাই মনুষ্যত্ব, যার চর্চার মধ্য দিয়ে সময় এবং ভাগ্যের হাতে বন্দি মানুষ, নিঃসঙ্গ মানুষ, মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষ, নিজ মহত্ত্বকে শনাক্ত করতে পারে।

মানুষের স্বাধীনতা যন্ত্রণাবিদ্ধ, সৃজনশীল ও রহস্যময়, শিল্প এবং ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টিকারী। বস্তুত মালরো মানুষের স্বাধীনতা এবং ঐক্যকে সংস্কৃতির ভিন্নতা এবং বিভাজনের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। মানুষের নিগ্রহের এ যুগে মানুষের সৃষ্টিশীলতায় গভীর প্রত্যয় জাগ্রত করেছেন, মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তার হৃত গরিমা। খর্বকৃত হতমান আধুনিক মানুষের জন্য এ মালরোর মহত্তম দান।

এই গরিমা ভাস্বর হয়েছে 'মানুষের ভাগ্য' এবং 'নীরবতার কণ্ঠস্বর'-এর মহান স্রষ্টা মঁসিয়ে মালরোর মধ্যে, যিনি তাঁর উপস্থিতি দিয়ে আজ আমাদের

সমৃদ্ধ করেছেন। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্যানের জন্য এই গরিমার চেয়ে মহত্ত্বের বস্তু আর কি হতে পারে।

এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ আঁদ্রে মালরোকে চ্যান্সেলর সম্মানসূচক ডক্টরে ভূষিত করলেন এই বলে : 'মালরো একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক, একজন মহাকর্মী এবং সর্বোপরি একটি সদাজাগ্রত বিবেক। তিনি মানুষকে দিয়েছেন তার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান, অত্যাচারী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা, তার আত্মপ্রত্যয় উজ্জীবিত করে তাকে নির্মম নিয়তির বিরুদ্ধে জয়লাভের সাহসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মান জানিয়ে প্রকৃতপক্ষে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজের নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতায় মানুষের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানাল।'

মালরো জবাবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করলেন। থার্মোপাইলিতে গ্রিকবীররা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন 'আইনের সম্মান রক্ষা করার জন্য।' 'বাংলাদেশের প্রতিরোধ যোদ্ধারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন কারণ, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের মধ্যে তারা দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন নিরস্ত্র প্রতিরোধ।' মালরো ফরাসি বিপ্লব, লালফৌজের লড়াই, মাও-এর দীর্ঘ পদযাত্রার কথা শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাংলার যুদ্ধকে বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের মহান ঐতিহ্যে এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করলেন। 'আপনাদের শহীদেরা প্রমাণ করেছেন মৃত্যুভয়হীন একটি জাতির আত্মাকে পদদলিত করা যায় না। মাথা নোয়ায় না কোনো অকুতোভয় জাতি হৃদয়হীন স্বৈরাচারের বেদিমূলে। আপনাদের অগণিত মানুষের শোভাযাত্রা মুক্তি এনেছে শেখ মুজিবের এবং শত শত মানুষের শোভাযাত্রা বরণ করেছে তাকে ঢাকার রাজপথে।'

ফরাসি বিপ্লব এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্টতাকে তিনি চিহ্নিত করলেন এভাবে : 'ফরাসিরা আর বাঙালিরা যুদ্ধ করেছে কেবল তাদের একার জন্য নয়—অনেকের জন্য। এ দেশের 'মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি রচিত হয়েছে ন্যায় ও মুক্তির জন্য—যাঁদের স্মৃতিসৌধ সুবিচার ও স্বাধীনতার বিজয়-অর্চনা।'

মালরো স্পষ্টতই ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিকে আধ্যাত্মিকভাবে অখণ্ড মনে করেন। 'গ্রিকরা আবিষ্কার করেছিল জ্যামিতি আর আপনারা গণিতশাস্ত্রে সংযোজন করেছিলেন শূন্যের মতো মূল্যবান একটি ধারণার এবং গান্ধীই আমাদের যুগের একমাত্র স্বাধীন-সৈনিক যিনি ডাক দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ, আত্মার অধিকারের দাবি নিয়ে। মানুষের প্রয়োজন আছে বিশ্বপ্রকৃতি

জয়ের। কিন্তু এর সাথে প্রয়োজন আছে আত্মজয়েরও। চাঁদে গিয়ে লাভ কি এই পৃথিবীতে যদি আমরা আত্মহননে ব্রতী হই?'

মালরোর ভাষণের শেষের দিকের কথাগুলো এই রকম : 'জগৎ মনে হয় বুঝতে চায়নি আপনাদের নিঃসঙ্গ সংগ্রামের মর্মকথা, কেবল ভারত ছাড়া, যে ভারত কবলিত হয়নি কোনো সামূহিকতাবাদী একনায়কত্বের কবলে। স্টালিন নয়, হিটলার নয়, মাও নয়—গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান। যদি জগৎ এখনো না বুঝে থাকে এঁদের মতের মর্মবাণী, তবে সময় এসেছে এ বিষয়ে দৃষ্টি উন্মোচনের। আর আমি হতে চাচ্ছি এই কর্মেরই শরীক।'

'এ কারণেই আমি গ্রহণ করেছি আপনাদের প্রদত্ত সম্মান। অক্সফোর্ড ও বেনারসের সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে আপনারা আমাকে দিচ্ছেন এ সম্মান। আমি বাংলাদেশকে বলতে চাই, আমি এ সম্মান ধারণ করতে পেরে নিজেকে সত্যি বোধ করছি গৌরবান্বিত।'

আমাদের শহীদদের স্মৃতির অরণ্যের বেষ্টনি থেকে এই বিশিষ্ট মনীষী তার উপলব্ধির আলো প্রত্যাশিত এবং খানিকটা আশ্চর্য ও অপ্রত্যাশিত দিকে বিচ্ছুরিত করে দিয়ে চলে যান। 'নয় মাসের নিরস্ত্র প্রতিরোধ', 'গ্রিসের জ্যামিতি' আর 'ভারতের শূন্য' সামূহিকতামুক্ত ভারত, শতাব্দীর মহৎ নামের মিছিলে পাশাপাশি দুটি নাম 'গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান।'

মালরোর অবিস্মরণীয় ভাষণে আন্তরিকতা ও নাটকীয়তা ছিল, এর মূল্যায়ন ও পরিপ্রেক্ষিত চেতনায় ছিল চিন্তার খোরাক।

চার

১৯৭১ সালে মালরোর বয়স ৭০। তিনি ঐ বয়সে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি ট্যাঙ্ক বহর পরিচালনা করবেন জানিয়ে বিশ্বে চমক এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন—এ আমরা দেখেছি। তাকে অভ্যর্থনা করতে যাওয়ার পথে ভাবছিলাম, তার ঘোষিত ট্যাঙ্ক-ব্রিগেডটি বাংলাদেশে পৌঁছল না কেন। মালরো কেন ঐ আশ্চর্য সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন, কেনই বা তা কার্যকর করতে পারেননি। পৃথিবীর অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক, চারুকলার দর্শন এবং ইতিহাসের বিদ্যুৎ তীক্ষ্ণ ভাষ্যকার, বিরান মরুতে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রী, ইন্দো-চীনের ফরাসি উপনিবেশের কারাগার, বিচারব্যবস্থা ও সমাজ, পুরো উপনিবেশবাদের দ্বিধাহীন নির্মম সমালোচক, চীনের জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাক্ষাৎ বিপ্লবী পর্যবেক্ষক, স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিমান বহরের নায়ক হিসেবে মাদ্রিদ অবরোধে

অংশগ্রহণকারী, আপন ভূমি ফ্রান্সে দু'দুবার নাৎসি বন্দিশালা থেকে পলায়নকারী ও সফল সশস্ত্র প্রতিরোধের বীর, নিহত হওয়ার ভয় দিয়ে নয়—কেননা সাহসী হওয়ার সৌভাগ্য তার ছিল—মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রতিকারহীন মৃত্যুচিন্তা দিয়ে তাড়িত এই জীবনশিল্পী, বেঁচে থাকতেই এক কিংবদন্তি এবং কিংবদন্তির একটা দায় তাকে কিংবদন্তি থাকতেই হয়। জীবনের মননের সৃজনের এই অবিশ্বাস্য অভিযাত্রী এতো অর্জনের মধ্যেও কি সচেতন কৌতুকে কখনো কখনো কিছু মেকিত্বের আশ্রয় নিয়েছেন? কে জানে। তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি আমার সম্পর্কে কল্পকথা বলি কিন্তু তা সত্যি হয়ে যায়।' এও এক আশ্চর্য রহস্য। তিনি কি মনের মতো পটভূমিকায় মৃত্যু খুঁজছিলেন? তার প্রিয় এশিয়ায় এক রক্তাক্ত জনগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামে বিরোচিত মৃত্যুর উদ্ভাসে তিনি জীবনের শেষ অঙ্কটি সমাপ্ত করবেন ভেবেছিলেন? যেমন বলেছেন তার এক জীবনীকার? কিন্তু তা হয়নি। হেলিকপ্টার এসে গেল। সহাস্য মালরো সঙ্গিনীসহ আমার সামনে। কই, ৭০ বছরের ছাপ তো মুখে নেই? অপসৃয়মাণ চুল, প্রশস্ত ললাট, কিন্তু কালো, ঈগলচক্ষু একটু দূরভিসারী। আচ্ছা, এ মানুষটি কি কখনো নিজেকে নিজের প্রস্তুতমূর্তি হিসেবে দেখেছেন। যেমন—মিউজিয়ামে কোনো দর্শক আলেকজান্ডার কিংবা বুদ্ধের মূর্তি দেখেন? সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আমরা রওনা হলাম মোতিহারের দিকে।

কয়েক ঘণ্টা পর সমাবর্তন উৎসব, সংবর্ধনা, লাঞ্চ, বরেন্দ্র জাদুঘর পরিদর্শন শেষে আবার বিমানবন্দরে ফেরার পালা। আমি তখন অনেকখানি স্নিগ্ধ, জনাকীর্ণ উত্তেজক এবং তীব্র কিছু সময়ের পরে যেমন লাগে।

পথে জিজ্ঞাসা করলাম অতিথিকে বাংলাদেশ কেমন লাগছে। 'চমৎকার অন্তত আমার চোখে। আপনারা তো বেশ সামলে উঠেছেন। রাস্তাঘাট যাতায়াতযোগ্য, খাবার দাবার সহজেই পাওয়া যায়, শরণার্থীরাও শুনতে পাই প্রায় সবাই ভারত থেকে ফিরে এসেছে এবং বাড়ি, ঘরদোর ঠিকঠাক করে নিতে পেরেছে। আপনাদের পৌরসেবাও দেখছি দিব্যি সক্রিয়।' নীরবতা। হঠাৎ, 'কিন্তু জানেন, আপনারা বাঙালিরা বড় ধৈর্যহীন। আপনারা সব কিছু একসাথে পেতে চান—একটুও অপেক্ষা করতে নারাজ। জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের ফ্রান্সের অবস্থা? প্রথম ক'বছর আমাদের কি কষ্টে কেটেছে। খাবার, বিদ্যুৎ, পানি, কয়লা, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা সবকিছুর সঙ্কট ছিল। পৌরসেবা তো ছিল না বললেই চলে।' আবার বেশ দীর্ঘ নীরবতা। বিমানবন্দরে আসতে যে কথাটি আমার মনে এসেছিল অর্থাৎ তার

বাংলাদেশের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক-ব্রিগেড পরিচালনার ব্যাপারটি আলতো করে তুললাম। ক্ষিপ্রগতিতে মালরো আমার দিকে একবার তাকালেন, কিন্তু নীরবতা ভাঙলেন না আরো কিছুক্ষণ। তারপর আমি শুনবার মতো করে স্বগতোক্তি করলেন, 'ইন্দিরা গান্ধী একজন রাজনীতিক, তার পিতা ছিলেন একজন স্বাপ্নিক এবং স্রষ্টা।' আমার কথার জবাব তো এ নয়—কিন্তু এরপর যে দীর্ঘ মনোলগ নেহেরু বিষয়ে চলতে থাকলো, তাতে বুঝলাম তিনি তার ট্যাঙ্ক-ব্রিগেড সম্পর্কে কিছু বলতে চান না এবং ইন্দিরার চেয়ে নেহেরুই তার কাছে প্রিয়তর প্রসঙ্গ। নেহেরুর ন্যায় উপায়ে একটি ন্যায়রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন, কেননা ঐতিহাসিকভাবে ভারত শুধু প্রশাসন দেখেছে, একটি রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি, সাম্প্রতিককালে তার একটি আধুনিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠার বাস্তব সমস্যা—এসব বিষয়ে এখন যা শুনছিলাম তা মালরোর আত্মজৈবনিক কিন্তু বিশেষভাবে শিল্পিত রচনা 'এন্টি-মেমোয়ারস'-এর নেহেরু সম্পর্কিত ৬০-৬৫ পৃষ্ঠার নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তার একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি থেকে বোঝা গেল, রাজনীতিকদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এবং দেশ নির্মাণের স্বপ্নের ব্যাপারে তার নায়ক শার্ল দ্য গল এবং ইতিহাসের অপর নায়ক নেহেরুর মধ্যে মালরো মিল দেখতে পান এবং মাও ও নেহেরু এক সাথে কিঞ্চিৎ তুলনামূলকভাবে দু-একবার উল্লিখিত হলেন।

Ends and Means এবং আধ্যাত্মিকতা বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বপীড়িত ভারতীয় নায়কের প্রতি মালরোর সহানুভূতি বেশি বলে মনে হলো। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে কেবলই ধ্বনিত হচ্ছিল মালরোর রাজশাহীর সম্মান গ্রহণোত্তর ভাষণের শেষ কথাগুলো : গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান। নিঃসন্দেহে এই শিল্পী-সৈনিক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নামহীন মানুষের নয় মাসের প্রতিরোধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ এবং মহৎ ঘটনা হিসেবে দেখেছেন, তবুও তিনি যেন অসহযোগ আন্দোলন এবং ঐ আন্দোলনের অতিকায় মুজিবকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। নিজের অজান্তে আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম, 'মুজিব পারবেন তো একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে? তীক্ষ্ণ ত্বরিত জবাব এলো, 'অবশ্যই, যদি না আপনারা শিক্ষিতরা, বুদ্ধিজীবীরা তাকে মেরে ফেলেন।' এ দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা নেতিবাচক সমালোচনায় পটু এবং সময়ের আগেই মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকেন। 'You are a cynical lot. Don't kill him like one of those tribes which kill their leaders and eat their flesh.' মন্তব্যে অভাবনীয়তা এবং তীব্রতায় আমি হকচকিয়ে গেলাম।

তারপর অনেক নীরবতা কাটিয়ে অতিথির সাথে সৌজন্য বিনিময় শেষ করে গান্ধী এবং নাথুরাম গডসের কথা ভাবতে ভাবতে মোতিহার ফিরলাম। প্যারিসে ফিরে মালরো নিজ হাতে হৃদ্যতাপূর্ণ দুটি লাইন লিখে তার এন্টি-মেমোয়ার্স বইখানার একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঁচ

মালরো জীবনে অনেকবার মৃত্যুর চোখে চোখ রেখেছেন, তবুও ১৯৭০-৭১-এর এই সময়টায় মৃত্যুকে তার খুব কাছাকাছি মনে হয়েছিল। তার এক জীবনীকার থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৩৩-এ হারিয়ে যাওয়া ১৯৬৮-তে ফিরে পাওয়া তার প্রিয় বান্ধবী এবং সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী লুইজ দ্য ভিল মোরাঁ ১৯৭০-এ হঠাৎ মারা যান, তার অশেষ শ্রদ্ধেয় নেতা জেনারেল শার্ল দ্য গলও চলে গেলেন। একে একে এ শতাব্দীর বড় মানুষগুলো যেমন—নেহেরু, চৌ এন-লাই, ব্রাক, মাতিস, পিকাসো অন্তর্হিত হচ্ছিলেন। নিঃসন্দেহে মালরো রিক্ত বোধ করছিলেন। কামনা করছিলেন বীরের যোগ্য মৃত্যু। কিন্তু নেহেরুর 'পলিটিশিয়ান' কন্যা তাকে ভারতে যাওয়ার ছাড়পত্র দিতে দেরি করলেন। ভারত ছাড়া তো মৃত্যুকামী মালরো বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী কেন সাহায্য করবেন মালরোকে? আক্কেলমন্দরা জানেন, যা হবে তার দেশের সাফল্য, তার নিজের গৌরব, তা কেন ভাগাভাগি করে নেবেন কোনো এক আন্তর্জাতিক মালরো ব্রিগেডের সাথে? বিশেষ করে যখন 'চীন পাকিস্তানকে স্বেচ্ছাসেবী পাঠিয়ে সাহায্য করার হুমকি দিচ্ছিল।' উল্লিখিত জীবনীকারের বই থেকে আমরা আরো জানতে পারি, মালরো প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাসে বারকয়েক মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করেছিলেন। ১০ দিনে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ইন্দিরা তার পিতার বন্ধুকে নতুন জাতির বিজয় উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য তার সাথে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ক্লান্ত বিষণ্ন মালরো তার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, এখন আর গিয়ে কি হবে—ওরা তো এখন আর আমাকে হত্যা করবে না। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের সরাসরি আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই হৃদয়ের কোনো এক তাগিদে।

মালরোর বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং তার অসাফল্যের ঘটনাটির মিশ্ররসের দিকটি পরিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর নাট্যমঞ্চ হাস্যকর, বাস্তবতা ভয়ঙ্কর, তবু বীরের ভূমিকা সম্ভব—অন্তত মালরো তা বিশ্বাস করতেন। তার বহুমুখী প্রতিভা, বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের যে একটা

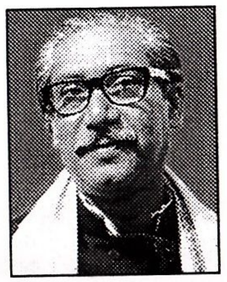
মানবিক ভিত্তি ছিল তা অবিসংবাদিত। যারা তার চরিত্রের নাটকীয় উপাদানের জন্য তাকে লর্ড বায়রন কিংবা শাতোব্রিয়ঁ-এর উত্তরসূরি বলে ভাবতে চান, তারা একই সাথে স্বীকার করেন তার অহঙ্কার, দ্রোহ, প্রকাণ্ড সাহিত্যিক কীর্তি, ব্যক্তিত্বপ্রবল রাজনৈতিক মত, তাকে কিংবদন্তি করলেও তা তাঁর জীবন থেকেই সত্যতা অর্জন করে।

জীবনের মধ্যাহ্নে মালরো তার একটি গ্রন্থে একটি বহুল উদ্ধৃত কথা বলেছিলেন : 'সবচেয়ে বড় বিস্ময় এই নয় যে বস্তু এবং নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝখানে আমাদের বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, বরং এই যে আমাদের বন্দিত্বের সীমায় নিজেদের ভেতর থেকে আমরা সৃষ্টি করতে পারি এমন প্রতিমা, যা আমাদের অনস্তিত্বকে নাচক করে দেয়।' তার জীবনের শেষ রচনা 'দ্য রোপ অ্যান্ড দ্য মাইস'-এর শিরোনামটি মালরো এভাবে ব্যাখ্যা করেন : একজন শিল্পীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, তার পায়ের আঙুলগুলো কোনোরকম একটু মাটি স্পর্শ করতে পারে। শিল্পী অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। কিন্তু তার স্বভাব অনুযায়ী ঐ অবস্থাতেই শিল্পী নখ দিয়ে বালিতে কয়েকটি ইঁদুর আঁকেন। আর কি আশ্চর্য, ইঁদুরগুলো অলৌকিকভাবে প্রাণ পেয়ে গেল। আর ফাঁসির রজ্জু কেটে শিল্পীকে মুক্ত করে দিল।

ছয়

পরিশেষে খানিকটা পেছনে ফিরে গিয়ে ভাবি, শেখ মুজিব ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করলেও তিনি মালরোর চেতনায় এক ঐতিহাসিক 'বিজয়ীদের' মিছিলে স্থান নিয়েছিলেন, যে মিছিল এ রকম : মুজিব-গান্ধী, গান্ধী-নেহেরু, নেহেরু-শার্ল দ্য গল, শার্ল দ্য গল-মালরো।

রচনাকাল : ১৯৮৯



খালেদা এদিব চৌধুরী

পঁচাত্তরের সেই কালো দিন

ইতিহাসের সেই কালো দিন। বাঙালি জাতির ঐতিহ্যমণ্ডিত হাজার বছরের একটি কালো কালিমার দিন। মহা শোকের দিন। কেউ কী কখনো চিন্তা করতে পেরেছিল এমন একটি দিন আসবে কোনো দিন—যার জন্য বাঙালিকে কাঁদতে হবে শত শত বছর ধরে! আমরা ভুলতে পারি না সেই দিনটির কথা—যা আমরা অবলোকন করেছি আমাদের জীবদ্দাশায়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি কল্পনা করতে পারবে সেই রক্তাক্ত দিনের ঘটনা প্রবাহের চিত্র?

সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের সংগ্রামের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশ, নবীন দেশ-বাংলাদেশ। কত আনন্দ, কত উচ্ছ্বাস, কত আবেগ যে জড়িয়ে ছিল সেই দিনগুলোতে! আমরা স্বাধীন, আর কারো অধীনে থাকতে হবে না আমাদের। আমরা যখন চব্বিশ বছরের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছি প্রতি মুহূর্তে, তখন এক মহানায়কের আর্বিভাব ঘটে আছে ইতিহাসের অধ্যায় ভেঙে। কী স্বপ্নময় সেই দিনগুলো! মুক্তির এত আনন্দ।

এল উনিশ'শ পঁচাত্তর সাল। যেন বড় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছিল বছরটা। এল আগস্ট মাস। সেই কালো আগস্টের ১৫ তারিখ। দিনটি ছিল শুক্রবার। সেদিন দৈনিক বাংলা পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ছিল বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এদেশের অগ্রগতি, বঙ্গবন্ধুকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত জানাবে—এমন আরো সব শিরোনম। কিন্তু শুক্রবার দিনটি আর এল না বঙ্গবন্ধুর জীবনে। এর আগেই নিভে গেছে তাঁর জীবনের প্রদীপ। ভোরে আলো ফোঁটার আগেই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন একদল হায়েনার হাতে।

হায়েনার দল একই সাথে হানা দিয়েছে কয়েক জন জাতীয় নেতার বাড়িতে। হত্যা করেছে তাদেরও। শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউ রক্ষা পায়নি তাদের আক্রমণের হাত থেকে। মুহূর্তে এই নির্মম নিষ্ঠুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে। স্বাধীনতার স্থপতি মহান নেতা আর নেই এই পৃথিবীতে। সেই দিনটির ছবি আজো চোখের সামনে ভাসে। চোখ বন্ধ করলেই বুঝি দেখতে পাই কালো অধ্যায়ের প্রতিটি স্তর। বড় নির্মম সেই স্মৃতি।

আগের দিন বৃহিস্পতিবার। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে বর্ণাঢ্য আয়োজন। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তাঁকে সংবর্ধনা জানানো জন্য কয়েকদিন থেকেই আয়োজন চলছিল। সবার মনে আনন্দ, উৎসাহ উদ্দীপনা। বৃহস্পতিবার রাতভর প্রস্তুতি চলছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু একবার এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিন শুধু তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। আজকের আয়োজন, আর আসার ব্যাপারটা অন্যরকম গুরুত্বপূর্ণ। পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দেয়াল। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে চারদিকে। গার্ড অব অনারের প্রস্তুতি সম্পন্ন। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী, ছাত্র-নেতৃবৃন্দ বার বার দেখে গেছেন প্রস্তুতি পর্বের প্রতিটি অধ্যায়।

বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন সেই ১৯৪৯ সালে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন সেদিন তিনি। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই আন্দোলনের জন্যই তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল। সেখানেই তিনি আবার গেলেন স্বাধীনতার পর বিজয়ী বেশে।

...এর মধ্যে কেটে গেছে কতগুলো বছর। সংগ্রামের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে, জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন একজন মহান নেতা—সে কাহিনী বিরাট। বিশাল।

১৫ আগস্ট। ভোর হলো এক সময়। মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে সেই নির্মম সংবাদ। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা কীভাবে দেব, সে ভাষা আমাদের জানা নেই। তবুও তা করতে হবে, জানাতে হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের—কীভাবে বাঙালি জাতির জনককে প্রাণ দিতে হয়েছে স্বাধীনতার শত্রুদের হাতে! কারা জড়িত ছিল এই হত্যাকাণ্ডের সাথে! বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত মূল্যবোধকে মুছে ফেলার জন্য, চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্য

শত্রুরা হত্যা করেছিল তাঁকে। এই নির্মম সত্যটি তো জানানো উচিত। আমাদের স্মৃতি থেকে সেই দিনটির ছবি কোনোদিন মুছে যাবে না।

১৫ আগস্ট। সেই কালো দিন। সারাদিন স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম ঘরের ভেতর। প্রতিটি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। হায়েনাদের ভয়ে শিশুরা মুখ লুকিয়েছিল মায়ের বুকে। সামরিক শক্তির সামনে কেউ বেরুতে পারেনি প্রাণের ভয়ে। আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের বন্দি করা হলো একে একে। মোশতাক তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে অনেককেই করেছে বন্দি। আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার কেউ কেউ আবার মোশতাকের ডাকে তার পাশে গিয়েও দাঁড়িয়েছিল। কেউ হয়েছে মন্ত্রী, কেউ বা হয়েছে উপদেষ্টা। ঘৃণায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘটনাও ঘটে ইতিহাসে!

জাতির জনককে এভাবেই প্রাণ দিতে হলো ঘাতকের হাতে! আইয়ুব খানের তৈরি কবরে যেতে হয়নি তাকে, ইয়াহিয়া পারেনি তাকে হত্যা করতে কিন্তু তিনি প্রাণ দিলেন বাঙালি জাতিরই কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের হাতে। বঙ্গবন্ধু গোটা জীবনটায় কাটিয়েছেন কারাগারে, যৌবনের সোনালি দিনগুলো করেননি উপভোগ, তাকাতে পারেননি পরিবার-পরিজনের দিকে—শুধু ভালোবেসেছিলেন বাঙালিকে। একটি জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন নিরন্তর—সবচেয়ে বড় কথা বাঙালিকে দিয়েছেন আপন পরিচয়ের উপাদান বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পৃথক জাতিসত্তার পরিচয়ে বাঙালিকে করলেন সমৃদ্ধ। বাঙালি মাথা উঁচু করে দাঁড়াল বিশ্বের দরবারে। আজ এত বছর পরেও একটা সত্য স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পেছনের শুধু ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যটাই বড় ছিল না। এর পেছনে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধ্বংস করা। প্রতিপক্ষ শক্তি মনে করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারলেই শুধু মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তারা জানত, সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে আর তাদের মধ্যে আরো বেশি রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হলে খুনিদের আশা পূরণ হবে না। এসব গণশত্রুরাই '৫৪ সালে বিজয়কে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। '৫৬, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০ সালের আন্দোলনের বিজয়কে টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করেছিল। শুধু পারেনি একাত্তরে, আর সে প্রতিশোধ তারা নিয়েছে পঁচাত্তরে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আইয়ুব-ইয়াহিয়া না থাকলেও ছিল তাদের অনুসারীরা। এদের অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করেছে এসব দালাল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে।

একটা কথা আজ স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, বঙ্গবন্ধু সাধারণভাবে পাকিস্তানপন্থীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ক্ষমা ঘোষণায়

যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি। ক্ষমা সব হয়নি আমাদের, রাজাকার, আল-শামসদের যারা কারাগারে ছিল। বিচারের অপেক্ষায়, এদের সংখ্যা ছিল ৩৭৪৭১ জন। সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্তদের বঙ্গবন্ধু দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত। এরা ষড়যন্ত্র করে অপ্রচার চালাতে থাকে সরকারের বিরুদ্ধে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল চালাতে থাকে ষড়যন্ত্র। সরকারকে উৎখাত করার প্রকাশ্য হুমকি দালালদের বিচারকার্যকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে। মওলানা ভাসানীর 'হককথা' পত্রিকাটিতে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

'বাকশাল' গঠন, যার জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—এমন কথাও প্রচার হতে তাকে। কী সোজা হিসাব! কিন্তু এতটাই সোজা ব্যাপার ছিল না তা। এই ষড়যন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল অনেক গভীরে। শত্রুদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক চক্রের কথাও উল্লেখ করা যায়।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল প্রবল বন্যা ও খরা। ফলে হলো দুর্ভিক্ষ। সে সময় বাংলাদেশে সরবরাহ করা দুটি খাদ্যশস্যের জাহাজ আসা বাতিল করা হয়েছিল। যদিও এ খাদ্যশস্য পাঠানোর চুক্তি হয়েছিল আমেরিকার সাথে।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি আল বদর, আল শামস পাকিস্তানপন্থী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই কাজ করছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এরা নগ্নভাবে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

সেনাবাহিনীতে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, শেখ মুজিব সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে দেবেন। এজন্য রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল। কিন্তু এ গুজবটি ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন।

নানাভাবে শত্রুরা বঙ্গবন্ধু সরকারকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য কাজ করেছিল। বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন সাধারণ মানুষকে। সংগ্রাম করেছেন তাদেরই সুখের জন্য। তাঁর নিরাপত্তার বিষয়েও কোনো কড়াকড়ি ছিল না। খুনিরা সে সুযোগও গ্রহণ করেছে।

সেই কালো দিনের পর থেকে এ দেশে যা যা ঘটেছে তা পর্যালোচনা করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেন, কী কারণে, কোন পেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। যেমন—বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিসর্জন দেয়া, রাজাকারদের প্রধানমন্ত্রী করা, জামায়াত নেতাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুমতি দেয়া, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা—এমনি আরো সব ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় সবকিছু।

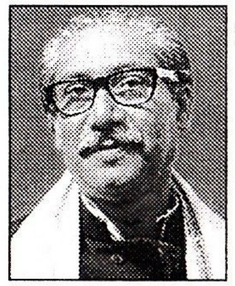
১৯৭৬ সালে ২ আগস্ট লন্ডন টেলিভিশনে ফারুক-রশীদের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারে ঘাতকচক্রের মুখ হতে সত্য তথ্য বেরিয়ে আসে। আজ সবাই তা জানে। অন্যদিকে ১৯৮৩ সালে নভেম্বর বেশ কয়েকটি পত্রিকায় আত্মস্বীকৃত খুনিরা আরো একটি সাক্ষাৎকারে নিজেদের বক্তব্য পেশ করে। তাতেও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। দিনের আলোর মতোই ফুটে ওঠে সমস্ত চিত্র। অর্থাৎ একুশ বছরের স্বৈরাশাসনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার বিশ্লেষণ করলেও সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

সেই কালো দিনের স্মৃতি আজো আলোড়িত করে যায় আমাদের। কাজেই বলা যায়, শুধু 'বাকশাল' কায়েমের জন্য মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়নি, খুনিরা তার পাশেই ছিল পূর্ব থেকে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

ভাড়াটে খুনিরাই হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধুকে। প্রকৃত চক্রান্তকারী ছিল কিছুটা আড়ালে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী গোবিন্দ সিংহ কিংবা জন এফ কেনেডির হত্যাকারী অসওয়াল্ডও ছিল এমনি ভাড়াটিয়া খুনি।

কিন্তু আদর্শের কোনো মৃত্যু নেই। ইতিহাস যুগ যুগ ধরে তা প্রমাণ করেছে। শেখ মুজিবের আদর্শ, তার বৈপ্লবিক চেতনা এ দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত। তিনি হঠাৎ করেই আসেননি। সুদীর্ঘকালের সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন মানুষের মনে। এ দেশের মাটির সাথে ছিল তাঁর প্রাণের সম্পর্ক। তিনি নিজের রক্ত দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। এই রক্তের ঋণ তাই শোধ হবে না কোনোদিন।

সেই কালোদিন, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫, শুক্রবার। বাংলাদেশের আকাশের রঙ তখন কেমন হয়ে গিয়েছিল? সে কি নীল ছিল না ধূসর? সমুদ্রের জোয়ার ভাটা কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? শিশুরা কান্না ভুলে ভয়ে বুঝি মুখ লুকিয়েছিল মায়ের বুকে, বড়রা মুখ বুজে পড়েছিল ঘরের ভেতর। এই ঢাকা শহরের বাতাস হয়ে উঠেছিল ভারি। নিঃশব্দ। ভয়ে আতঙ্কে মায়েরা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল—সেই দিনটির কথা ভুলব কেমন করে? খুনিরা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। তারা রক্তেরঞ্জিত করেছিল বাংলাদেশের পতাকা। বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি ভেসে গিয়েছিল রক্তের বন্যায়। ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের সেই নির্মম চিত্র অনন্তকাল ধরে বাংলার মানুষকে কাঁদাবে।



চন্দন চৌধুরী

কবিতায় সূর্যসংগ্রামের ধ্রুবপুরুষ

১.

যতো দিন রবে পদ্মা-মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান,
ততোদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান,
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।
[যতদিন রবে/ অন্নাদাশঙ্কর রায়]

বাংলা কাব্যে কোনো কীর্তিপুরুষকে নিয়ে সম্ভবত এত অজস্র কবিতা আর রচিত হয়নি। তাও প্রথম শ্রেণীর কবিতা। যারা আধুনিক বাংলা কবি, তাদের মননে জাতির জনকের বীজটি সম্ভবত কাব্যপরিণয় কিংবা কাব্যের দ্রোহী চেতনায় ঢুকে গেছে। একজন রাষ্ট্রনায়ক কতটা মহৎ হলে মানুষ ভালোবাসায় তাকে কাব্যের শরীরে আশ্রয় দেয়। আবার সাথে সাথে এসেছে সূর্যের ক্ষতচিহ্নে আর্তনাদের অশ্রু। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সেই আর্তনাদকে নিজের ভেতরে ধরে রাখতে না পেরেই হয়তো অন্নদাশঙ্কর রায় জাতির জনককে নিয়ে 'যতদিন রবে' কবিতার দ্বিতীয় অংশটি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বাঙালিদের পিতৃঘাতী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বাঙালি চরম বিশ্বাসঘাতক, তারা তাদের পিতাকে হত্যা করেছে।'

বাংলা কাব্যে এবং কবির মানসে বাংলার শ্রেষ্ঠ মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁর বঙ্গবন্ধু পরিচয় নিয়ে সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন ওপার বাংলার কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি সরাসরি 'বঙ্গবন্ধু' নামে কবিতাটি লিখেন—

'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান—
এই এক নাম এক করে দিল হিন্দু মুসলমান;
শেখালো মানুষে মানুষ বলেই মানুষের পরিচয়,
ধর্মের নামে পশু-আচরণ ধর্মীয় কভু নয়।'

দ্বিতীয় কবিতাটি লিখেছেন জসীমউদ্‌দীন। তিনি প্রমত্ত অগ্নির সাথে তুলনা করে লিখেছেন—

'মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।'

কবিতাটির শিরোনামও 'বঙ্গবন্ধু' এবং এর রচনাকাল ১৬ মার্চ ১৯৭১। 'বঙ্গবন্ধু' পরিচয়ের তৃতীয় কবিতাটির রচনায়ক কবি হাবীবুর রহমান। রচনাকাল ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল।

'বঙ্গবন্ধু, তুমি আছ বলে—
বিভীষিকাময় অন্ধকারের শব ঠেলে ঠেলে
প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে
আমরা এগিয়ে চলি উদয়াচলের পথে।'
[বঙ্গবন্ধু, তুমি আছ বলে]

১৯৭১-এ আমাদের এপার বাংলা যখন অসম্ভব উত্তাল ঠিক তখন ওপার বাংলার কবিগণ সেই উষ্ণতায় ছিলেন জাগরিত। আমাদের তখন জন্মের প্রতীক্ষা এবং সেই প্রতীক্ষাকে ঘিরে চলছে আমাদের অজস্র প্রাণের ক্রন্দন। ওপার বাংলার কবিগণ তাই ক্রন্দনকে লালিত করেছিলেন নিজেদের মেধায়, প্রজ্ঞায়, ভালোবাসায়। উত্তাল একাত্তরে ওপার বাংলা থেকেই রচিত হয়েছে অধিক কবিতা। বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) লিখলেন এভাবে—

'সর্বসুখ সাধ আশা পশুত্বের অহং-আহবে
তখনও ওপার হতে দৃপ্তকণ্ঠ শুনিলাম কার
জয় বাংলার!'
[সহস্র সেলাম]

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাত্তরের জুলাইয়ে লিখলেন 'মুজিবের ডাকে' নামক একটি কবিতা। যেখানে তিনি উল্লেখ করেন মুজিবের ডাকে এক হয়ে

গেছে হিন্দু-মুসলমান, আলোর উদ্ভাসে পালাচ্ছে আঁধার। মনীশ ঘটক 'সূর্যপ্রণাম' নামক চমৎকার কবিতা লিখেন—

'কাচের গেলাস ভরা রাত
উঠন্ত সূর্যের দিকে তুলে ধরলাম
কই, কোথায় রক্ত?
যমুনা-পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী
বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষা-সুরমা-কুশিয়ারা
কর্ণফুলী-আড়িয়াল খাঁর
তীর্থ সলিল টকটকে লাল
নবোদিত সূর্য কিরণে
চারটি বাংলা হরফে রূপায়িত হয়ে গেছে
মুজিবর।'

একজন প্রকৃত মানুষকে নিয়েই হয়তো প্রকৃত কবিতা হয়। অমানুষকে নিয়ে হয় কাব্যবন্দনা। পূর্বে আমরা রাজকবিদের সে-ভূমিকা পালন করতে দেখেছি। রাজকবি কিংবা সভাকবি যে নামেই আখ্যায়িত করি না কেন, মোটকথা হলো তারা কেবল গুণাগুণ করতো। সে-প্রশংসা কিংবা স্তুতিবাক্য ছিল বিপুল বর্ণাঢ্য, পড়ন্ত মিথ্যার চর্বিতে ফাঁপানো। সেখানে রাজা বা জমিদার তাদের ইচ্ছা-মতো সভাকবি নির্বাচন করতেন এবং যে-কবি বেশি স্তুতিবাক্য পাঠ করতে পারত সে-ই পেত রাজকবি বা সভাকবির মর্যাদা। তাই রাজকবি ভিন্ন অন্য কবিগণ খুব অল্পই রাজার বন্দনায় মত্ত থাকতেন। কিন্তু সভাকবি না হয়েও অসংখ্য কবি যখন একজন মানুষকে হৃদয়ে রাজার আসন দেয় তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় ভিন্ন। কাব্যে শেখ মুজিবুর রহমানও পেয়েছেন সেই অনন্তর গৌরবের মর্যাদা—

'মুজিব, এই লুপ্ত মহাদেশকে
নতুন করে আবিষ্কার করে
আমাদেরও বুকের মধ্যে ধ্বনিত করেছো তুমি
এক উজ্জ্বল নাম—
মানুষ।'
[মানুষ/মণীন্দ্র রায়]

অথবা কবি বিনোদ বেরা'র সেই অসাধারণ পঙ্‌ক্তি—

'বাংলাদেশ বলতে বুঝি আজ
শেখ মুজিবুর রহমান।'

ওপার বাংলার প্রথম সারির কবিদের অনেকের কবিতায়ই ১৯৭১ সালের নায়ক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবিতায় এভাবেই ইতিহাস আসে; ব্যক্তির মধ্য দিয়ে, সমাজের মধ্য দিয়ে কিংবা কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যক্তিই রূপান্তরিত হয়েছেন ঘটনায়, উদিত হয়েছেন এক সূর্যের মহিমায়। নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় শেখ মুজিবকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে—'শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার দু'হাতে ঠেলে/ পূর্বে দিগন্তে নব-সূর্যোদয়।' কেউবা তাকে বলেছেন মুজিবুর—শুধু নামেই নয়, তিনি হচ্ছেন বাঙালির হৃদয়পদ্মের শাশ্বত আলোর ধ্যান। কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ এভাবেই এঁকেছেন একাত্তরের এই নায়ককে। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন 'বাংলাদেশের ছড়া'—

'মুজিব কোথায় কোথায় মুজিব
মুজিব গেছে রণে।
ঢাল ধরছেন, হাল ধরছেন
আছেন মনে মনে।'

কবিতায় বঙ্গবন্ধু এক আশ্চর্য মানুষ। আসলে কবিতা উঠে এসেছে তো বাস্তবতার ঢাল থেকেই—

'নানা পরিচয়ে আসে,
কত যুগ কত দেশ ভিন্ন নামে তবু
শোনে তার একই কণ্ঠস্বর,
আজ শুধু আমাদেরই মাঝে মুগ্ধ মন জানে
নাম তার শেখ মুজিবর ॥' [বন্ধু/ প্রেমেন্দ্র মিত্র]

কারো কারো কবিতায় শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহানায়ক। তিনি শাণিত সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন বাংলায়। তিনি মহাজাগরণের এক মহান উদ্‌গাতা। তাঁর কণ্ঠধ্বনি সমুদ্রস্বরের মতো উদাত্ত গম্ভীর। এমন কথা উচ্চারণ করেছেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তার কাব্যস্বর যথেষ্ট উচ্চ—

'আজ তুমি সাত কোটি মাথা আকাশে তুলে,
চৌদ্দ কোটি বজ্রবাহুতে খাপখোলা তরোয়াল উঁচিয়ে,
সৃষ্টি করেছ
বাঙালির আত্মমর্যাদার জ্বলন্ত ইতিহাস!'
[ইস্পাতসূর্য মুজিবুর/বিমলচন্দ্র ঘোষ]

কবি পরমানন্দ সরস্বতী মুজিবকে কেন্দ্র করে লিখেছেন 'পূর্ব বাংলার ছড়া', কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন মুজিবকে এভাবে—'তুমি কান্নার

নদীকেও সাজালে রূপসী।' কবি শান্তিকুমার ঘোষ 'মহানায়ক' কবিতায় শেখ মুজিবকে সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এভাবে—'একা একটি মানুষ সংগ্রামরত'। এছাড়াও ১৯৭১ সালের উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে দীপ্ত উচ্চারণ করেছেন কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত মজুমদার, আবদুস সামাদ, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, অমিত বসু, মৃণালকান্তি কালী, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, অলককুমার চৌধুরী, শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, তারক ঘোষ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, বিভূতি ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, আনন্দগোপাল মণ্ডল, জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মকবুল হোসেন, নির্মল আচার্য প্রমুখ কবি তাদের নিজস্ব অভিব্যক্তির কাব্যভাষায়।

একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে দারুণ প্রশ্ন হিসেবে এসে যায়। তা হলো ওপার বাংলার কবিগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ১৯৭১-এ অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু এপার বাংলার কবিদের কাছ থেকে আশানুরূপ কবিতা পাওয়া যায়নি কেন! হয়তো এমনও হতে পারে অপশাসনের ভার তাদের ওপর এতো বেশি ছিল তারা স্তিমিত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ কথাটি এজন্য প্রযোজ্য যে, পরবর্তীকালে এপার বাংলা থেকে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসম্ভব প্রাণাবেগময় সব কবিতা। যেগুলো তাঁকে ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করেছে, দিয়েছে জাতির জনকের মর্যাদা।

২.

এপার বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন একদিকে স্বপ্নের রাজপুত্র অন্যদিকে জাতির পিতা হিসেবে। তাঁর ভূমিকা অনেকটা প্রমিথিউসের মতোই। অপার মানসিক ক্ষমতা, দূরদর্শী হিসেবে একজন মানুষের আগমন যেন। এপার বাংলার কবিতায় তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে ভালো কবিতা রচনা করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। জাতির পিতা হিসেবে কবিতায় শেখ মুজিবুর রহমানকে এক উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করার ভূমিকায় তার মতো কেউ অসম সাহসী হতে পারেনি। তার বহুল পঠিত এবং অসম্ভব সুন্দর কবিতা 'হুলিয়া'য়ও দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের কথা এসেছে; তা পরোক্ষভাবে হলেও সেখানে তিনি একজন নায়ক। 'হুলিয়া'তে পাওয়া যায়—'আইউব খান এখন কোথায়?/ শেখ মুজিব কি ভুল করছেন?' সুতরাং মূল ঘটনার মধ্যে না থেকেও শেখ মুজিব এক্ষেত্রে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। গুণের রচিত 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে

ইতিহাসের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—

'সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি
রেসকোর্স পার হতে যেতে সেইসব গোলাপদের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।
... ...
আমার পায়ের তলার পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই পলাশের কথা
রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম।
আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।'

দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের 'যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতিবলয়'-এ মূলত আগস্টের সেই ভয়াবহ কৃষ্ণরাতের ঘটনা উঠে এসেছে কাব্যের মহিমায়। সেখানেও শেখ মুজিবের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—

'অকস্মাৎ
স্বপ্নাদ্য হরিণের আর্তনাদে জেগে উঠে তিনি, প্রশস্তবক্ষ, দীর্ঘকায়,
সুকান্ত পুরুষ, যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতিবলয়,
এসে দাঁড়ালেন, অসীম সাহসের প্রতিভূ।'
[যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতিবলয়/শামসুর রাহমান]

বাংলাদেশের অন্যতম প্রিয় কবি মহাদেব সাহার 'তোমার পায়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থটি মূলত শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েই রচিত। গ্রন্থটির পরতে পরতে জাতির জনকের গন্ধ লেগে আছে স্বপ্নের মতো আবার কান্নার মতো। একদিকে গৌরবের দীপ্তভাষ্য, অন্যদিকে পিতৃ খুনের দায় কাব্যগ্রন্থটিকে করেছে মহিমান্বিত—

'আমার কাছে বার্লিনে যখন একজন বায়োলিন-বাদক
বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো
আমি আমার বুকপকেট থেকে ভাঁজ-করা একখানি দশ
টাকার নোট বের করে শেখ মুজিবের ছবি দেখিয়েছিলাম
বলেছিলাম, দেখো এই বাংলাদেশ;
এর বেশি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না!
আমি কি বলতে পেরেছিলাম, তার শেষবার ঘুমিয়ে পড়ার
আগে আমি কি বলতে পেরেছিলাম?'
[আমি কি বলতে পেরেছিলাম/মহাদেব সাহা]

অথবা কবিগণ শেখ মুজিবের নামকে মানুষের পরিচয়ে মানুষের নামকরণ করেন—

'এ-ভাবেই একদিন দেশের নাম 'বাংলাদেশ' হয়ে গেলো—
মানুষের নাম হয়
শেখ মুজিবর রহমান।'
[নাম/হাবীবুল্লাহ সিরাজী]

কিংবা—

'বাঙালির ডাক নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।'
[বাঙালির ডাকনাম/ত্রিদিব দস্তিদার]

বাঙালি, বাংলাদেশ বলতে যদি কোনো চিহ্নকে স্মরণ করতে হয় তবে সে-চিহ্নে ভেসে আসে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখচ্ছবি। তাই মানুষ ফিরে ফিরে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে চায়, দেখতে চায় কবিও। মানবহৃদয়, বাঙালিহৃদয় সবকিছুতে মুজিবের স্পর্শ চায়—

'এই বাংলায় আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি'
[ডাকিছে তোমারে/সুফিয়া কামাল]

যে-বুক পিতার মতো ছায়া দেয়, নির্ভয় দেয় নির্ভরতায়, সে-বুকই প্রকৃত পিতার বুক। জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে অসংখ্য অসংখ্য কবি তাদের কবিতায়।

ক.

'পিতার বক্ষের মত নির্ভরতা
মেলে ধরে বলে—
ভয় নেই, কল্যাণের ধ্রুব পদতলে
চূর্ণ হবে অসত্য অশিব,
সে নাম মুজিব।'
[সে নাম মুজিব/সিকান্দার আবু জাফর]

খ.

'আমি সাক্ষী। লিখে রেখো এ আমার নাম।
তেরোশ' বিরাশি সন। মেঘার্ত শ্রাবণ। শেষ রাত।
অকস্মাৎ!— বৃষ্টি নয়, ঘটে গেলো রাষ্ট্রস্বপ্ন থেকে রক্তপাত।
ছাপান্না হাজার বর্গমাইলের মতো ব্যাপ্ত ছিল যার বুক—

জাতির পিতার— বিদ্ধ হলো উত্তপ্ত বুলেটে।'
[আমি সাক্ষী/সৈয়দ শামসুল হক]

গ.

'এত দিন
কোথায় লুকোনো ছিল
এ-রকম বঙ্গীয় প্লাবন?
আমি এই জলে
পিতৃ-প্রতিকৃতি থেকে
সমস্ত শৈবাল মুছে দেব।
[মুছে দেব সমস্ত শৈবাল/অরুণাভ সরকার]

ঘ.

'যে চেনে না জাতির পিতা, সে-জন কাঙালি—
পিতা তুমি, ত্রাতা তুমি, হে শ্রেষ্ঠ বাঙালি।
[জাতির পিতা/মুহম্মদ নূরুল হুদা]

ঙ.

'প্রথম জন
দ্বিতীয় জন
শেষ জন
একবাক্যে উচ্চারণ করলেন,
লোকটির বসবাস
বাঙালির হৃদপুরে।
জাতির জনকের ডাক নাম 'খোকা'।
[হৃদপুরে/মাকিদ হায়দার]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম লোমহর্ষক ঘটনা বাংলার কবিদের, বাংলার প্রতিটি মানুষকে পৃথিবীর বুকে পিতার হত্যাকারী হিসেবে কলঙ্কিত করেছে। কেঁপে উঠেছে কবিদের মনুষ্যহৃদয়। বাঙালি এতো বড় বেঈমান হয়! সেদিন আকাশ থেকে বাংলার সূর্যটা কালো আলো ছড়াতে লাগল। তারপর থেকে আজোবধি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি বাংলার সূর্যের শাণিত মুখ।

কবিতায় এসেছে ভীষণভাবেই পিতৃহত্যার মতো অন্যায় ও একসাথে তার অপরাধবোধ। সর্বদাই কবিকে তাড়না করে। তাড়না করে অপার দুঃখবোধ। এই অপরাধবোধ ও দুঃখবোধ একজন মানুষকে কবি করে তুলতে পারে। তেমনি ১৫ আগস্টের দুঃখবোধ অপরাধবোধ বাঙালির চেতনায় এক

জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে—যার জ্বালা বইতে হবে বাঙালির আগামী প্রজন্মকে। কবিগণ অপরাধবোধের পীড়নে দহনে নিজের ভেতর পুড়ে দগ্ধ হয়েছেন। জাতির জনকের বিপন্ন বিদায় বাঙালিকে শুধু কলঙ্কিতই করেনি, দিয়েছে বর্বর জাতির পরিচয়।

একজন প্রকৃত মানুষের অভাব স্বভাবতই ভাবনাময় মানুষকে তাড়িত করে, তাঁর অভাবে শূন্য হয়ে যায় বিশাল অঞ্চল। কারণ একজন মানুষ যখন মহতের কাতারে দাঁড়ান তখন দেখা যায় মনুষ্যত্ব তার শরীরকে অতিক্রম করে ব্যাপক স্থান দখল করে নেয়, তেমনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল শূন্যতা। কাব্যে তা ধরা পড়েছে এভাবে—

ক. *'তুমি নেই বলে সমস্ত আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে আছে—*
চৈত্রের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন গ্রাম জনপদ পুড়তে থাকে,
চরাচরে কোনো প্রাণ নেই মনে হয়
ব্যাপ্ত নিখিলে শুধুই জড় ও মৃতের উত্থান'
[তুমি নেই বলে/দাউদ হায়দার]

খ. *'পিতা, যদি জানতাম, আমারই ভুলের জন্যে*
এত রক্ত, এত ক্লেদ জমা হবে পিতৃভূমিতে,
... ...
যদি জানতাম, তোমার বক্ষ থেকে সিঁড়ি বেয়ে
নেমে যাবে সাত কোটি রক্তের ধারা—
তাহলে এই হাতের প্রতিটি আঙ্গুল দিয়ে
আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখতাম
আমার উদ্‌ভ্রান্ত আত্মাকে,
আমি আমার চোখে বিঁধিয়ে দিতাম
অভ্রভেদী শিমুলের কাঁটা।'
[যদি রাজদণ্ড দাও/অসীম সাহা]

গ. *'যদি একশ' বছরও লাগে, লাগুক*
আমি তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেব।
[প্রতিশোধ/লুৎফুন নাহার লতা]

এপার বাংলার প্রগতিমনা একজন কবিকেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে যিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কবিতা লিখেননি। কবিতায়, পদ্যে, ছড়ায়, গীতিকাব্যে মুজিব যেন এক মহানায়ক। তার শূন্যতায় বাংলার আকাশে নেমে এসেছে অশান্তির কালো মেঘ। পদ্যেও

আমরা জাতির পিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করি দারুণভাবে—

ক. *'মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি*
মুজিব গেল কার বাড়ি?
আয়রে মুজিব ঘরে আয়
হুতুম পেঁচায় দাঁড় বায়,
শকুনগুলো দিচ্ছে থাবা—
লাল সবুজের পতাকায়।'
[মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি/লুৎফর রহমান রিটন]

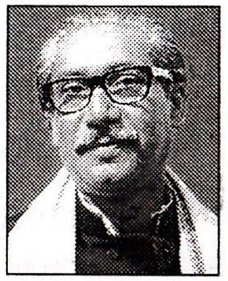
খ. *'হাতের মুঠোয় প্রাণটা নিয়ে*
বারুদ-চাপা আগুন দিয়ে
একাত্তরের সাতই মার্চে
কোন্ সে মহাকবি।' [জয় মুজিবের জয়/রফিক আনোয়ার]

সত্যিই তিনি কবি ছিলেন বটে। কবি না হলে সাতই মার্চের মতো এমন অসম্ভব ভাষণ তার পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল না। ভাষণটি যে একটি জন্মবেদনার চমৎকার কবিতা। সেই কবিতা আমরা বাঙালি ধারণ করছি প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে—

'এবারের সংগ্রাম
মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম..."

এমন গোছানো কবিতা কবি না হলে কি হঠাৎ করেই আসে! হয়তো জাতির জনকের অন্তরে ঘুমিয়ে দিলেন এক রুদ্রপ্রতাপ কবি। আর সেই সৃষ্টি করেছিল একটি জাতির জন্মের কবিতা।

বাংলা কবিতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক অপরাজেয় মহানায়ক। আজও যারা বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চেতনা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের বুকে তিনি একেকটি অগ্রন্থিত কবিতা। এখন শুধু লিখে ফেললেই হয়। আমাদের প্রতিটি স্মরণই হয়তো পিতৃহত্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ পিতা মরতে পারে, তাঁর চেতনা তো মরতে পারে না। আমরা যারা কবি, আমরা সেই চেতনার কারিগর, সত্যের ভারবাহক। তাই কবিতায় শেখ মুজিব মানেই একটি সংগ্রামের সূর্য, একটি দেশের নিঃশর্ত পরিচয়।



জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ইতিহাস বিনির্মাণ এক চলমান প্রক্রিয়া

সাধারণ বুদ্ধিতে বলে ইতিহাস একটি নিরপেক্ষ সত্তা—সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে। ইতিহাসবিদের দায়িত্ব তার সেই নিরপেক্ষ, স্বয়ংসৃষ্ট রূপটিকে তুলে ধরা। ইতিহাসের পিতা বলে যিনি পরিচিত, সেই হেরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০-৪২৫) সেভাবেই বিষয়টিকে দেখেছিলেন, কঠোর বস্তুনিষ্ঠতায় ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন, সংগৃহীত উপাদানের সত্যতা পরখ করেছিলেন এবং বিশাল বিচিত্র উপাদানের বিন্যাসে সর্বপ্রথম এক অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর ইতিহাসের মূল বিষয় হলো এশিয়া-ইউরোপের দ্বন্দ্ব। তিনি এ দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধানে যত পিছনে যাওয়া সম্ভব, গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত গ্রিসের সাথে পারস্যের বিরোধ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এ বিরোধকে তিনি চেয়েছিলেন একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ফেলে দেখতে। এই তো ইতিহাসবিদের কাজ।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকেও ইতিহাসবিদ এভাবে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখবেন এবং তা যদি দেখেন, তাহলে ঘটনার প্রবাহমানতার মধ্যে যেমন বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব চোখে পড়বে, তেমনি যাঁরা, ইতিহাসের যে নায়কেরা, একদিকে ঘটনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছেন, অন্যদিকে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁদের ভূমিকাও তার বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে আসবে যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে। বহুজনের সম্মিলিত প্রয়াসে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার এর মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসেন একজন মহানায়ক, যাঁর একক অবদান তাঁকে দেয় এক বিশেষ মর্যাদা। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের দীর্ঘ ইতিহাসে, তার চূড়ান্ত পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সমগ্র বাঙালি জাতির মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে

একটি প্রবল আন্দোলনে পরিণত করা, সেই আন্দোলনকে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের রূপ দেয়া, যুদ্ধকালে তাঁর বন্দিদশা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দৃষ্টিতে তিনিই এ যুদ্ধের প্রকৃত নায়ক, এই পরিচিতি লাভ করা, এরই যুক্তিসম্মত পরিণতি জাতির পিতা, রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে তাঁর অবিসংবাদিত আসন। ইতিহাসে অনেক ছোট বড় প্রসঙ্গে দ্বিমত থাকে, আবার কিছু বিষয় আছে, যা তর্কাতীত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এমনই এক তর্কাতীত বিষয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একটি রাজনৈতিক দল ও একটি সরকার কি কারণে ইতিহাসের বিপরীত স্রোতে ইতিহাস রচনা করতে চায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় কোনো দূর অতীতের ঘটনা নয়। আজ থেকে মাত্র ৩৩ বছর আগের ঘটনা। লক্ষ-কোটি মানুষ দেশে ও প্রতিবেশী দেশে এখনো জীবিত আছেন, এঁদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা সেই ঘটনার সাক্ষী। যাঁরা ইতিহাসের ওপর আস্থা রেখেছেন, তাঁরা জানেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির মুক্তির এক দীর্ঘ ইতিহাসের চূড়ান্ত অধ্যায় মাত্র। বলা যায়, চূড়ান্ত অধ্যায়েরও শেষ পাতা। কারণ চূড়ান্ত অধ্যায় বলতে আমরা '৪৭ পরবর্তী পর্যায়টিকেই ধরবো। এর পূর্ব পর্যায়ের নায়ক ছিলেন এ.কে ফজলুল হক, এরপর নায়কত্বের ভার গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তাঁর মৃত্যুর পর সে ভার ন্যস্ত হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওপর। তিনিই এক অব্যাহত সংগ্রামকে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় পরিণত করেন। সেই পরীক্ষায় বিজয়ী হলেন, দেশকে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করলেন এবং ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এত বিরাট এ কৃতিত্ব যে এক নিরপেক্ষ, বিদেশী সংস্থা পরিচালিত জনমত জরিপে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির স্বীকৃতি লাভ করলেন।

এমন একটি তর্কাতীত বিষয়কে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কেন মানতে রাজি নয়? বা অন্যভাবে বলা যায়, কেন একটি সমুন্নত মিনারের পাশাপাশি একটি দ্বিতীয় মিনার তুলে দেশকে দিতে চায় একটি টুইন টাওয়ার? সারা বিশ্বের চোখে এক কৌতুকজনক, এর হাস্যকর দিকটি ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে না শুধু অপরাজনীতির নেশায় বুঁদ কিছু ব্যক্তির কাছে। কি উদ্দেশ্য তাঁরা হাসিল করতে চান? স্কুলপাঠ্য বই, এ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম এবং সর্বশেষ সরকারের একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রকাশিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে একটি আজগুবি তথ্য ঢুকিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের স্বোপার্জিত গৌরবকে আরো গৌরবান্বিত করতে? মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদানকে কেউ অস্বীকার করে না। ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ কালুরঘাট থেকে বেতারে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। কোন ঘটনা পরম্পরায় তিনি

এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার প্রামাণ্য বিবরণ আমরা পেয়েছি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখায়। এখন প্রশ্ন, ২৭ মার্চের রেডিও প্রচারিত ঘোষণাকে ২৬ মার্চে এগিয়ে আনায় মানুষের কৌতূহল (ও আরও কিছু) উৎপাদন ছাড়া কি লাভ আশা করছে সরকার পক্ষের কিছু লোক? জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি প্রমাণ করা? কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাসই তো তার সত্যতা স্বীকার করে না। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করা? ২৬ মার্চের ঘোষণা যদি সত্য নাও হয়, তবু এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্বের বা গৌরবের। কারণ ঐ একটি ঘোষণার ওপর তৈরি হয়নি তার খ্যাতি ও কীর্তি। এর পিছনে আছে এক দীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহস ও প্রজ্ঞার এক অতুলনীয় কাহিনী। সে এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান।

সদ্য প্রকাশিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সংবাদপত্রের মারফত যা জানার জানতে পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণা তথ্যভিত্তিক নয় বলে বাদ পড়েছে। আর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে ২৬ মার্চে এগিয়ে এনে দেশের প্রচলিত স্বাধীনতা দিবসের সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে কে বা কারা নির্জলা আনন্দ অনুভব করবেন, জানি না, তবে কবরে শায়িত জিয়াউর রহমান বোধহয় পাশ ফিরে শোবেন। তিনি নিজে যা কখনো দাবি করেননি, তাঁর তো রীতিমতো অপ্রস্তুত হওয়ার কথা। ভাগ্য ভালো, তিনি আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ভক্তদের এই লাফালাফি তিনিই বন্ধ করতেন। সত্যের প্রতি একজন সৈনিকের যে শ্রদ্ধাবোধ থাকার কথা, সেটা তাঁর ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি।

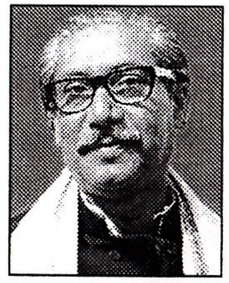
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমান, কেউ জড়িত নন এই ইতিহাসের বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে। কোনো ইতিহাসবিদ জড়িত বলে আমি বিশ্বাস করি না।

এটা সম্পূর্ণ কিছু রাজনীতিকের কাজ; যাঁরা চাতুর্যকে সত্যের চেয়ে শক্তিশালী মনে করেন। চলমান রাজনীতির মধ্যে মিথ্যাচার ও চাতুর্যের যথেষ্ট জায়গা আছে। জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছেন রাজনীতিকেরা। কিন্তু এর প্রয়োগক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত করা এক অমার্জনীয় অপরাধ।

যে প্রকাশনাকে নিয়ে এত কথা সেটা প্রকৃত অর্থে ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদান, দলিলপত্র। ইতিহাস রচিত হবে এই উপাদানের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে। সে কাজ করবেন ইতিহাসবেত্তা। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—রাজনীতিকেরা কেউ কেউ, সবাই নয়—অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। কবে

ইতিহাস রচিত হবে, কাদের হাত দিয়ে সম্ভব হবে সে কাজ, মনে হয় তারা অপেক্ষা করতে রাজি নন সেই অনাগত সময়ের জন্য, সেই অনিশ্চিত ফলের জন্য। তারা বিস্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে এসেছেন, সংসদে বসেই যেন তারা তাদের রাজনৈতিক আখের গুছিয়ে নিতে চান। কিন্তু এভাবে আখের গোছানো যায় না। এভাবে ইতিহাসের মুখে মুখোশ এঁটে দেয়া যায় না। পাঠ্যপুস্তকে সত্যের বিকৃতি কিছু নতুন ঘটনা নয়। পাকিস্তানে এটা হয়েছে, কারণ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বেরিয়ে আসার প্রকৃত বিবরণ ওরা চায় না ওদের নতুন প্রজন্ম জানুক। জাপানে হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনী কোরিয়ায় ও চীনে যা করেছে, সেই কীর্তিকলাপের কলঙ্কময় কথা ওরা দেশের উঠতি প্রজন্মকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু ওদের পাঠ্যপুস্তকের মিথ্যাচারে কোরিয়ায়-চীনে প্রবল প্রতিবাদের মুখে ওরা পিছু হটেছে, আর আমরা বুঝেছি কোন বিবেচনায় ওরা পাকিস্তান ও জাপানে এভাবে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বির্নিমাণ কর্মটি করেছে। এখানে জড়িত আছে একটি জাতীয় লজ্জা ঢাকার প্রয়াস। বাংলাদেশের এ লজ্জা ঢাকার প্রয়োজন আছে যাদের, তারা এখন জোট সরকারের অঙ্গ। তাহলে কি জোট সরকার তাদের হয়েই সমভাবে কাজটা করছে, যাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তলপেটে আঘাত করে নিজেদের অবস্থানকে একটু দৃঢ় করা যায়? এ কী ধরনের রাজনৈতিক কৌশল? স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র কাটাছেড়া করে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন, এ দুর্বুদ্ধি কীভাবে মাথায় থাকে তাদের! তারা তো সরকার পরিচালনা করছেন। অনেক দায়িত্ব তাঁদের। প্রধান দায়িত্ব দেশকে সুশাসন দেয়া। সেই কাজে তারা ব্যর্থ বলেই কি মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার এই হাস্যকর প্রয়াস?

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের নতুন সংস্করণ নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে, হাক্কানী পাবলিশার্স এই প্রকাশনার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছে আদালতে। আমরা ফলাফলের অপেক্ষা করবো। যতদিন না সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মিলছে, ততদিন এই বিতর্কিত সংস্করণের প্রচার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।



জিয়াউর রহমান

একটি জাতির জন্ম

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু—এই তিনটি শব্দ অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনন্য নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত-শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি। সেই অনন্য ঐক্যের কারণেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এক অসমযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মাত্র ন'মাসে স্বাধীনতা অর্জন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ১৯৭১-এ মেজর, পরবর্তীকালে জেনারেল এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জিয়া নিহত হওয়ার পর স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান ম্লান করা এবং স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির নানা চেষ্টা শুরু হয়, এখনো যার সমাপ্তি ঘটেনি রাজনৈতিকভাবে। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় (অধুনালুপ্ত) সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান একটি স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ লেখেন 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে, যা ইতিহাস বিকৃতিরোধে সহায়ক তথ্য হতে পারে। এ লেখাটি তার জীবদ্দশায় তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্র এবং ১৯৯৩-পরবর্তীকালে দৈনিক জনকণ্ঠেও দু'বার পুনর্মুদ্রিত হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মি. জিন্নাহ যেদিন ঘোষণা করলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'—আমার মতে, ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই

মি. জিন্নাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামির। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তি উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগররূপে। অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এক হানাদার, দখলদার দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যু বাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি এই সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহখানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে, আমাকে তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাস করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানি বাহিনীতে।

স্কুলজীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনেই বহুদিনই শুনেছি আমার স্কুল-বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ

সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেয়া হতো স্কুলছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনও দিন আসে তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। স্বযত্নে এই ভাবনটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো—বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলতো ভেঙে দাও এর শিরদাঁড়া। এ থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের উপর ছড়ি ঘোরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়রথের চাকার নিচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ।

যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই, পর্বতে ঘেরা এবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধ ভাঙা আনন্দের

তরঙ্গমালা। একাডেমি কাফেটারিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানি গোঁয়ার্তুমিরে মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানি ক্যাডেট। নাম তার লতিফ (পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্যই গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো, অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো—আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদ আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানিদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের, সংগ্রামের। এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এ হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালাবদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ। আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্রজনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে একটি বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে একটি অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নত করার সরকারি অভিপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ন এখন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এ ব্যাটেলিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়নের পুরস্কার বিজয় কোম্পানি ছিল আমাদের কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত ঊনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাবালরির (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশকিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মতবিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবতো বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাঙ্কের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল তাদের।

এ যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল, তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে

উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকর করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকদের মনে। বিমানবাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলাই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমিতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনও তেমনি স্থানেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেয়া হতো না ক্যাডেটরূপে। রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমিতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিলেন বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সঙ্কেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিলো বাঙালি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের ওপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবিতে। ইসলামাবাদের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অস্ত্র তুলে নেয়ার মধ্যেই যে আমাদের দেশের কল্যাণ নিহিত তাতে কারো কোনো সন্দেহই ছিল না আমাদের কারো মনে। এটাও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের আরেক দিকদর্শক। এ সময় থেকেই এ ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে খোলাখুলি আলোচনাও শুরু করেছিলাম।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে আমি ছিলাম সেখানে সেকেন্ড ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে কিনা তাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং এ কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনেশুনেই বলেছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এ সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দপ্তরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক

নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে, তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করি—এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে।

গতিক যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানি যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাশে কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি অ্যাটাশের সাথে কথা বলছিল। এ ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা ডনের একটি সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা, ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল—নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি।

এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বললো, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে। এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা—বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়নকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ন। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর

বাজারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যাটালিয়নকে পাকিস্তানের খারিয়ানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর জন্য আমাদের সেখানে পাঠাতে হয়েছিল ২শ' জোয়ানের এক অগ্রগামী দল। অন্যরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল তিনশ' পুরনো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের অ্যান্টিট্যাঙ্ক বা ভারি মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জোয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম, প্রতিরাতেই তারা যায় কতক নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনজিওরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম, পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা-যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সাথে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো, ফাতমী সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যতো কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিলো। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েকদফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালরাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দর যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরীর প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে হত্যা করেছে।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম—আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করো। ওলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি।

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চিফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম হাত তোলো। আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। নৌবাহিনীর লোকরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিলো। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সাথে এসো।

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানলাম—আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

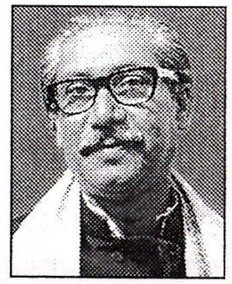
ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানলাম—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি

ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কো-নো-দি-ন না।



জ্যোতি বসু

অবিসংবাদী নেতা ছিলেন মুজিবুর রহমান

মুজিবুর রহমান যখন ছাত্র আন্দোলন করেন, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছাত্রদের যখন সংগঠিত করেন তখন আমি ওঁকে চিনতাম না। যদিও ওঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি জানতাম। পরবর্তী কালে ওদের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন হয়, সে সময় ওঁর নাম সকলেই জেনে যায়। একটা ভালো হয়েছিল যে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তখন কয়েক লক্ষ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছিলে। আমরা, আমাদের পার্টি থেকে ওঁদের সাথে যোগাযোগ করি, ওঁরাও অনেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা ওঁদের জন্য ক্যাম্প ইত্যাদি গড়ে নানাভাবে সাহায্য করি। তখন ইন্দিরা গান্ধীও এ মানুষদের সাহায্যের জন্য একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন, যে কমিটিতে আমরা ছিলাম। এখানে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভারত সরকারই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

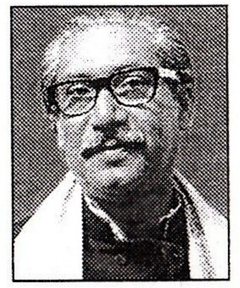
তখনও বাংলাদেশ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। তখন সেখানে খুবই অত্যাচার চলেছিল। গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানকে একটা কলোনির মতো মনে করতো পাকিস্তানের শাসকরা। বাংলা ভাষাকেও ওরা মর্যাদা, সম্মান কিছুই দিতো না। এসবের বিরুদ্ধেই মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক মৃত্যুর বিনিময়ে অবশেষে সেখানে স্বাধীনতা আসে এবং পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলদেশ' নামে ভূষিত হয়।

কোন সময় আমার ঠিক স্মরণে নেই, পরবর্তীকালে একবার কোলকাতায় রাজভবনে এক ভোজসভায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তখন তাঁর ছেলেরাও ছিলেন– যে ছেলেদের পরে মুজিবুর রহমানের সাথেই হত্যা করা হয়। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবে উনি যে অবিসংবাদী নেতা এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এটা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। তবুও পরে দেখা গেল তাঁর বিরোধী লোকজনও কিছু ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যখন শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতায় আসেন তখন ইন্দিরা গান্ধী দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। তাঁর সাথে আমিও ছিলাম। সেখানে মুজিবুর রহমানের সাথে নানা বিষয়ে কথা হয়েছিল। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম বাংলাদেশে বারদি বলে জায়গায় আমাদের একটি পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। এছাড়া কিছু জমি-টমিও আছে। সেই বাড়িটা আপনারা নিয়ে নিন। ওখানে এখন আমাদের কেউই থাকে না। এক পুরোহিত সেই বাড়িতে থাকতে চাইলে আমার বাবা সেই বাড়িতে তাঁকে থাকতে দেন। কিন্তু সেই পুরোহিত পরে মুসলিম লীগের একজন লোকের কাছে বেআইনিভাবে সেই বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে এখানে পালিয়ে আসেন। যাই হোক, আমি বললাম, সেই বাড়িটা আপনারা নিয়ে সরকার থেকে কিছু একটা করুন। সেটা অবশ্য আজ অবধি হয়নি, তবে বাংলাদেশ সরকার ওটা মেরামত করেছে। শেখ হাসিনার সময়ে আমি যখন বাংলাদেশে গিয়েছি তখন সেসব দেখে এসেছি।

যাই হোক, আমরা হতবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম এমন একজন মানুষকে তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকে খুন করা হলো, তাঁর ছেলেদের হত্যা করা হলো। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি তারাই এই জঘন্য হত্যালীলা চালিয়েছে। হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মুজিবুর রহমানের সেই ধানমন্ডির বাড়িতে। সেখানে দেখেছি কিছু ছবি টাঙানো রয়েছে।

উনি খুবই সচেতন মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর মতো মানুষকে নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি আশা করছি এই বই থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। এই উদ্যোগের সাথে যারা জড়িত তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।



তোফায়েল আহমেদ

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্নের বাংলাদেশ

প্রতি বছর যখন আমাদের জীবনে আগস্ট মাস আসে, তখন জাতির জনকের স্মৃতি আমাকে আন্দোলিত করে। বঙ্গবন্ধু আমার জীবনে চলার পথের প্রেরণা। পরিচয় হওয়ার পর থেকেই পরমাদরে বঙ্গবন্ধু আমায় কাছে টেনে নিয়েছেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরম মমতায় নিজের কাছেই রেখেছেন। বিশেষ করে '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যখন বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্ত করে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংবর্ধনা দিয়ে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম, সেই দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলাম।

'৬৯-এর পর থেকে বঙ্গবন্ধু যত রাজনৈতিক সফর করেছেন আমি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছি। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আমাকে মাত্র ২৭ বছর বয়সে জাতীয় পরিষদে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার আনাচে-কানাচে সফর করেছিলেন। বাসে-ট্রেনে-স্টিমারে এক সঙ্গে গিয়েছি, একই কামরায় থেকেছি। একদিনে ৮-১০টি করে জনসভা, পথসভা। দিন শেষে সন্ধ্যা নামলে চারদিক অন্ধকার; এর মধ্যে লোকজন লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকত শুধু বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখবে বলে। এমনকি বহু জায়গায় পায়ে চলার পথও নেই। ক্ষেতের আইল দিয়ে হাঁটা পথ। কোথাও পায়ে হেঁটে, কোথাওবা গরুর গাড়িতে। নাগেশ্বরী, রৌমারী, চিলমারী, ভুরুঙ্গমারী, বুড়িমারীসহ কুড়িগ্রামের প্রতিটি থানায় তিনি জনসভা করেছেন। আমরা হেঁটে আর বঙ্গবন্ধু গরুর গাড়িতে। স্বচক্ষে দেখেছি লক্ষ মানুষের জনস্রোত।

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। বিশাল জনসভা। মানুষের মনোভাব তিনি হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে উপলব্ধি করতেন। সেদিন বক্তৃতা শেষে গাড়িতে উঠেই বলেছিলেন, 'এই আসন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। লোকজন এসেছে শুধু আমাকে দেখতে। বঙ্গবন্ধু যখন আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছিলেন, তখন নূরুল আমীন তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন, 'দুজন আমাকে সমর্থন করেছিল। একজন প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ এবং অপরজন নূরুল আমীন।'

অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। ৬৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে যখন ঢাকায় ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়, তখন তিনি ভুট্টোকে বলেছিলেন, 'মিস্টার ভুট্টো, পাকিস্তান আর্মি ষড়যন্ত্র করছে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে। তুমি পাকিস্তান আর্মিকে বিশ্বাস করো না। ওরা প্রথমে আমাকে হত্যা করবে, পরে তোমাকে।'

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৪ জানুয়ারি আমাকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় তাঁর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম বিদেশ সফর ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতায় স্মরণকালের সর্ববৃহৎ সেই জনসভায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের উদ্দেশে বক্তৃতার শেষে কৃতজ্ঞচিত্তে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই।' রাজভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠকের পর স্বাক্ষরিত হয়েছিল পঁচিশ বছর মেয়াদি ঐতিহাসিক 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি'। আলোচনা বৈঠক শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার জন্মদিনে আপনাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' বঙ্গবন্ধু পুনরায় অনুরোধ করে বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সফরের আগেই আমি চাই ভারতের সেনাবাহিনী আপনি ফিরিয়ে আনুন।' ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'আপনি যা চাইবেন আমি তাই-ই করব।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কথা রেখেছিলেন। তিনি '৭২-এর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে স্বাধীন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক একই বছরের ১২ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

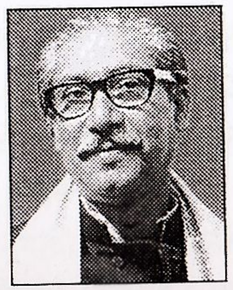
তাঁর সমগ্র চিন্তাজুড়েই ছিল দেশ ও দেশের মানুষ। তিনি আমাদের স্বাধীন দেশ, জাতীয় পতাকা, গণতান্ত্রিক সংবিধান ও নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদ দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশ গঠনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অর্থনৈতিক মুক্তির কাজ শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতার পর গোলাঘরে চাল ছিল না। ব্যাংকে টাকা ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। রাস্তাঘাট ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকবাহিনী। ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছিল বোমা মেরে। ভৈরব ব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। একটা প্লেন ছিল না, রেল ছিল না, বাস ছিল না, ট্রাক ছিল না, স্টিমার ছিল না। পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ করে দিয়েছিল। অর্থনীতি ছিল ধ্বংসপ্রায়। মাত্র ৩ বছর ৭ মাস উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটাকে আমরা স্বাভাবিক করেছিলাম। '৭৪-এ বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেটা ছিল মানুষের তৈরি। খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও বন্যার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত থাকায় আমরা মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারিনি। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি মোতাবেক দুই লাখ টন খাদ্যসামগ্রী মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এত সব কিছুর পরেও বঙ্গবন্ধু দেশটাকে স্বাভাবিক করেছিলেন। যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, সেদিন গোলাঘরে চাল, ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রা আছে এবং দেশে স্বাভাবিকতা বিরাজ করছে।

নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইস্পাত-কঠিন। সুদৃঢ় সংকল্পবোধ নিয়েই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাঁকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করেছিল। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা নেতৃত্ব দিতেন বা বারংবার নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের এবং সরকারের—ঐতিহাসিক মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেব—আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য তাঁদেরকে কারাভ্যন্তরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ধ্বংসাত্মক ষাড়যন্ত্রিক প্রয়াসকে আমরা সফল হতে দেইনি। বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে ধারণ করেই ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে

এগিয়েছি। চরম প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সাংগঠনিক তৎপরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে মূল দলসহ সহযোগী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করে নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে কেবল দলকেই ধ্যান-জ্ঞান করে, দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দিয়েছি। সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সাফল্যের সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আজ তিনি জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। অতীতে ৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে মানুষের খাদ্যাভাব ছিল, আজ ১৬ কোটি মানুষের দেশে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক সময় দেশে বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না, আজ ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রেমিট্যান্স ছিল না, আজকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমাদের রেমিট্যান্স। এক্সপোর্ট ছিল মাত্র ৩০০ মিলিয়ন ডলার, আজ তা ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। শুরুতে বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৭ কোটি টাকা। আজ তা দুই লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এখন আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাংলাদেশ সম্পর্কে বলে, 'বিস্ময়কর উত্থান বাংলাদেশের'। মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাকস্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, 'পরবর্তীকালে যে ১১টি দেশ অর্থনৈতিকভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তার অন্যতম।' আরেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জেপি মরগ্যান, 'বাংলাদেশ উদীয়মান দ্রুতগতির অর্থনীতি' বলে অভিহিত করেছে। ইতিমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তিতে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হবো। বঙ্গবন্ধুর যেমন দুটি লক্ষ্য ছিল—এক. দেশ স্বাধীন করা এবং দুই. অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় রূপান্তর করা। তিনি গর্ব করে বলতেন, 'আমার বাংলা রূপসী বাংলা, আমার বাংলা সোনার বাংলা।' তিনি বলতেন, 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবো আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ।' একইভাবে ২০০৮-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকন্যাও বাংলাদেশের মানুষের জন্য দুটি লক্ষ্য স্থির করেছেন—এক. ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং দুই. বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়। ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মোবাইল ও তথ্যপ্রযুক্তির সেবায় দেশের মানুষ ইতিমধ্যে

তার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। অপরদিকে বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মতে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২১-এ আমরা পরিপূর্ণভাবে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে রয়েছি। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন, আজ তাঁর কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেই পথেই এগিয়ে চলেছে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তব রূপলাভ করতে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশ আগামীতে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে এবং সমগ্র বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।



দাউদ হায়দার

সেইদিন, একজন পাঁড়েজি

ভূগোলটা এ রকম, আনোয়ার শাহ রোডের প্রবেশমুখেই যাদবপুর থানা। থানার গা ঘেঁষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হোস্টেল। একই কম্পাউন্ডে তিনটি বিল্ডিং। একটু দূরে দূরে। হোস্টেল 'এ' ব্লক একেবারে শেষে। 'সি' মাঝখানে, 'বি' গেট লাগোয়া।

উনিশ শ' সত্তরের গোড়ায় মেইন হোস্টেল ছিল নকশালপন্থীদের ঘাঁটি। পুলিশের সাথে কেবল মারপিটই নয়, যুদ্ধও হয়েছে নকশালপন্থী ছাত্রদের। হোস্টেলের দেয়ালে গোলাগুলির দাগও দেখেছি ১৯৭৫ সালে।

আমার রুমমেট ব্যারাকপুরের অলোক চট্টোপাধ্যায়। ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র। অসম্ভব মেধাবী। নকশাল রাজনীতির সমর্থক। রাত বারোটার আগে লেখাপড়া ধাতে নেই তার। ভোর চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। অভ্যেসটা রপ্ত করলুম আমিও।

থানার ঠিক বিপরীতে সুবিমল দত্তর আড়াই-তলা বাড়ি। প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশে। আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। প্রায়ই তার আস্তানায় যাই। স্নেহ করেন আমাকে। কথায় কথায় একদিন অনেকটাই আপন মনে যেন বললেন, বঙ্গবন্ধু কী বাঁচবেন? কেন এই শঙ্কা? প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান, কূটনীতির কৌশলে। লক্ষ্য করি, চেহারা বিষাদমাখা। বলেন, ঘরের শত্রু বিভীষণরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে।

—কে, কারা বিভীষণ, খোলাসা করেন না কিছুই।

দুই

মেইন হোস্টেলের পয়লা গেটকিপার পাঁড়েজি। বিহারের। তেলেজলে এবং আগুনে পাকানো শরীর।

বয়স তেত্রিশ। লম্বা-চওড়া। ঝাঁকড়া চুল। কড়া গোঁফ। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'বাংলার ডাকাত'-এর সাথে হুবহু মিশ খায়।

আমি বাংলাদেশের এবং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি আমরা, পাঁড়েজির কাছে খুব সম্মানিত এবং গর্বের আমি। দেখা হলে কুর্নিশের ভঙ্গিতে কথা বলেন। 'শেখ মুজিব শের কা বাচ্চা নেহি, শের কা শের লিডার।' শুনে মজা পাই। 'হা বাবু, শেখ সাহাব আচ্ছি আদমি হ্যায়। বাংলাদেশ আজাদ কর দিয়া।'

পাঁড়েজি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেখ মুজিবের জীবনচরিত্র শুনতে চান। প্রায়ই নানা ছলে আমার রুমে আসেন। দু-একটি কথার পরেই মুজিব প্রসঙ্গ। বলি একদিন, 'মুজিব নিয়ে এতো উৎসাহ কেন?'

—'ও তো শের কা শের। আমার ঘরে মুজিব সাহাবকা তসবীর হ্যায়। দেখবেন? আসুন আমার কামরায়।'

—বলে কী লোকটা? আমার রুমে শেখ সাহেবের ছবি নেই দেখে বিস্ময় মানেন। 'আপ কা কামরা মে শেখ সাহাব কো তসবীর নেহী? আজিব বাৎ।'

পাঁড়েজি সাধারণ মানুষ। শেখ মুজিবকে নিয়ে কেন এত উৎসাহ?

একটু গোয়েন্দাগিরি করি। আরো বেশি মিশি। শেখ মুজিবের কথা বলি। তার চোখ উজ্জ্বল হয়। বলেন, 'শেখ সাহেব যখন জেলে, পাকিস্তানে, পুজো দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধে—সেনাদের ৩৭ টাকা দিয়েছি তহবিলে। আমার তো টাকা নেই বাবু।' শুনে আমি ৩৭ টাকা দিতে চাই। 'না বাবু, মাফ করবেন। বাংলাদেশ আজাদ হো গিয়া, মুজিব সাহাব আ গিয়া, ছব ঠিক হো যায়েগা। আজ কা তকলিফ, দু-পাঁন্চ (পাঁচ) বরষ দুখ হ্যায়, ছব মুশকিল আসান হো যায়েগা।'—পাঁড়েজি অভয় দেন।

তিন

রাত দেড়টায় ঘরে ফিরছি। রুমমেট অলোক জেগে। পড়ছিলেন। বাথরুমে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসি। গল্প হয় কিছুক্ষণ। অলোক বললেন, রাত আড়াইটের বেশি। মুঘোই। তুমি পড়ো।

জুলিয়াস সিজার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নোট লিখছি। জমা দিতে হবে টিউটোরিয়াল।

বিছানায় যাই পাঁচটার দিকে। ঘুমিয়ে পড়ি। দশ মিনিটও হয়নি। দরজায় হঠাৎ কড়া নাড়া। সশব্দে। অলোক জেগেই খিস্তি শুরু করলেন। ঘুম পোক্ত হয়নি। মেজাজ তিরিক্ষে। স্বাভাবিক। দরজা খুললেন অলোকই। সামনেই পাঁড়েজি। মুখে কোনো কথা নেই। দাঁড়িয়ে। চোখে জল।

ঘরে ঢুকেই জড়িয়ে ধরেন আমাকে। নির্বাক। অলোক-আমি তাজ্জব। মাথায় চক্কর দেয়, মার শরীর ভালো। গতকালই ঢাকা থেকে দাদুভাইয়ের (রশীদ হায়দার) চিঠি পেয়েছি। কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? জিজ্ঞেস করি ঢাকা থেকে ফোন এসেছিল? টেলিগ্রাম? পাঁড়েজি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে যা বললেন, মর্মার্থ এই, 'শেখ সাহাবকো কোতল কোর দিয়া। বহু (বউ), লাড়কা-লাড়কি ভি জিন্দা নেহি। পরিবার খতম হো গিয়া।' পাঁড়েজির চোখে জল এবং চোখ লাল। অলোক বললেন, সারারাত নিশ্চয় গাঁজা ও দিশি টেনেছে। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে সাতসকালে ড্রামা করতে এসেছ? শেখ মুজিবকে হত্যা করবে কার সাহস? সাথে বউ, ছেলেমেয়েদেরকেও? ইমপসিবল।

তুমি কোথায় শুনলে?

প্রসূন বাবু (থানার পুলিশ) বলেছেন।

তিনি কি করে জানলেন?

'রেডিওতে শুনছেন। আমাকে ডেকে নিয়ে এই 'কাহিনী শোনায়ে, আউর বলিয়ে, 'হোস্টেল মে বাংলাদেশের হায়দার সাব হ্যায়, উসকো বলিয়ে। ...বাবু শেখ সাহাব আচ্ছি লিডার হ্যায়।' বলে নিশ্চুপ। চোখে জল।

আমাদের রুমে রেডিও নেই। রেডিও একমাত্র কমনরুমে। এত সকাল যে, পান-বিড়ির দোকানও বন্ধ। পান-বিড়ির দোকনে রেডিও আছে।

অলোক বললেন, চলো থানায়।

থানায় প্রসূন বাবু নেই। যে কয়জন পুলিশ ডিউটিরত, আমাদের চেনা। একজন বললেন, ট্রানজিস্টর আনছি। শোনান বিবিসি'র ইংরেজি সংবাদ। সকাল সাতটা থেকে আকাশবাণীর খবর। একটিই মাত্র খবর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত।

পনেরই আগস্ট ছুটির দিন। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। লোকজন উঠবে ধীরে ধীরে। আটটার আগে কেউ বাজার-সওদা করবে না। রাস্তা ফাঁকা কিন্তু বাস চলাচল কম কেন? নগরী নিঃশব্দ। মৃতপ্রায়।

রুমে ফিরে আসি। অলোক চুপচাপ। আমার চোখে জল। শরীর এলিয়ে দিই, বিছানায় ঘুমিয়েও পড়ি। বেশিক্ষণ নয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর হোস্টেলময় ছড়িয়ে পড়েছে। বলেছেন অলোকই। আমি যেন শেখ মুজিবের আত্মীয়। ঘরোয়া। ছাত্ররা আসেন জড়িয়ে ধরেন আমাকে তাদেরও চোখ ভেজা। জামশেদপুরের অনির্বাণ বললেন, আমার বাবা ১৯৪৮ সালে ফরিদপুর থেকে চলে আসেন। তিনি শেখ

মুজিবকে জানতেন। ...বাংলাদেশ আজ থেকে পিতৃহীন হলো। আজ থেকেই বাংলাদেশের মৃত্যু। সুদীপ দা বললেন, বাঙালিরও মৃত্যু।

মেইন হোস্টেল থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের যোধপুর পার্কের বাড়ির দূরত্ব পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটও নয়।

তিনি মুজিবভক্ত। বাংলাদেশ প্রেমিক। বারকয়েক গেছি তার বাড়িতে। বাংলাদেশের কথা শোনেন। বলেনও। "বাকশাল করে ভুল করেছেন মুজিব", বললেন একদিন, "এর জন্য হয়তো মাশুল দিতে হবে বঙ্গবন্ধুকে", ভাবলুম, তিনি খবরটি শোনেননি বোধহয়। গেলুম তার বাড়িতে। পরিচারিকা পূর্ণিমা দরজা খুললেন বটে, কিন্তু চুপচাপ। অন্নদাশঙ্কর জড়িয়ে ধরেন আমাকে। চোখে জল। নির্বাক। কয়েক মিনিট কথা নেই কোনো।

দিদু, লীলা রায়, বললেন, সকাল সাতটায় খবর শুনেছেন। তখন থেকে চোখে জল। এখন পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট করেননি। পায়চারি করছেন সারাক্ষণ। হাঁটতেও যাননি। দাদুকে বলো ব্রেকফাস্ট করতে।

দাদা শুধু চা আর বিস্কুট খেলেন। খেতে খেতে একটিই কথা, কাঁদো, প্রিয় দেশ। কাঁদো, প্রিয় দেশ। কাঁদো প্রিয় দেশ। কাঁদো (বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে, 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' নামে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশ নিয়ে তার 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' নামে বইও আছে) সেইদিন রাত্রেই লেখেন : "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে।" সনেট।

নরহত্যা মহাপাপ, তার চেয়ে আরো বড়ো
করে যদি যারা তার পুত্রসম বিশ্বাসভাজন
জাতির জনক যিনি অতর্কিতে তারেই নিধন।
নিধন সবংশে হলে সেই পাপ আরো গুরুতর।
সারা দেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে ঘোর পাপের
যদি দেয় সাধুবাদ, যদি করে অপরাধ ক্ষমা।
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ হয় বজ্ররূপে সে অভিশাপের।
রক্ত ডেকে আনে রক্ত, হানাহনি হয়ে যায় রীত।
পাশবিক শক্তি দিয়ে রোধ করা মিথ্যা মরীচিকা।
পাপ দিয়ে শুরু যার নিজেই সে নিত্য বিভীষিকা।
ছিন্নমস্তা দেবী যেন পান করে আপন শোণিত।
বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো নীরব দর্শক
ধিক্কার মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

খাঁটি ও যথার্থ কবি সত্যদ্রষ্টা। ভাবছি, কী সত্যি কথাই না লিখছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী।

'কাঁদো, প্রিয় দেশ'-এর ভূমিকায় লিখেছেন : "শেখ মুজিবুর রহমান শত অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তার নিধন যেভাবে হলো, তা অমানুষিক। গভীরভাবে বিচলিত হয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে লিখি 'কাঁদো, প্রিয় দেশ'।"

গোটা কোলকাতা স্তম্ভিত। পথের মোড়ে মোড়ে জটলা। আলোচনা। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, "এ কী ঘটনা, এ কী ঘটনা! অসম্ভব অবিশ্বাস্য।" "না, হতে পারে না।" "হতে পারে না।" সিগারেট-পানের দোকানে তারস্বরে আকাশবাণীর খবর প্রচারিত হচ্ছে। ফুল ভলিয়্যমে রেডিও বাজছে। মূল খবর একটিই। শুনছে পথচারী। দোকানের সামনেও লোকের ভিড়। নানাজনের নানা কথা।

বারোটা বাজার আগে, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে যাই। গেটবন্ধ। কলিংবেল টিপলুম। কেউ খোলে না। মিনিট দশেক পরে অন্য ফুটপাত থেকে দারোয়ান এসে বললেন, "আপনি অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছেন। দেখেছি। স্যার (ডেপুটি হাইকমিশনার) বলেছেন, দরজা খুলবে না। কাউকে ঢুকতে দেবে না। সাংবাদিক এলে বলবে, স্যার বাড়িতে নেই।"

তিনি কী বাড়িতে আছেন?

"আছেন, কিন্তু নিষেধ করেছেন বলতে।"

বলুন, আমি এসেছি।

দারোয়ান মাথা চুলকে বললেন, "আপনি আমার চাকরি খাবেন?"

পার্ক সার্কাসের মোড়ে ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে দেখা। আমাকে দেখে, দুপুরবেলায়, জ্যান্ত মামদো ভূত দেখেছেন যেন, কেঁপে উঠলেন। চোখে-মুখে ভয়। ভয়ার্ত কণ্ঠে জানান, দ্বিধা জড়িত নিচু গলায়, "আমরা কিছু জানি না। ঢাকার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। ফোন বন্ধ। রেডিওতে যা শুনেছি, শুনেছেন আপনিও, তার বেশি খবর নেই। স্যারের কাছে হয়তো খবর আছে। কিন্তু তিনি দেখা করবেন না কারোর সাথে। টেলিফোনেও পাবেন না। আপনার মতো আমিও অন্ধকারে।"—লক্ষ্য করি, তার দু'চোখে টলমল করে জল।

ফিরে এলুম হোস্টেলে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। রুমের সামনে ভিড়। আমি ও আমার বাংলাদেশ যে পিতৃহারা, জেনেও, ছাত্ররা সান্ত্বনা দেন আমাকে।

অলোক বললেন, তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। বিকেলের আগেই, বাংলাদেশের ছাত্ররা আসেন। ধারণা ওঁদের, আমি হয়তো বাড়তি কিছু খবর জানি।

মানিক (শাহ মোহাম্মদ তৈজীহ) ও জহীর ঢাকায় ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকবার, সব লাইনই বন্ধ। রেডিও'র সংবাদ ছাড়া কেউ বিশদ কিছু জানি না। মানিক বললেন, "আনন্দবাজারে চলো তুমি ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে এসো। আমরা গেটে অপেক্ষা করবো।"

গেলুম আনন্দবাজারে। গোটা নিউজ ডিপার্টমেন্ট ব্যস্ত। কিন্তু অতিরিক্ত খবর নেই। কয়েকটি গ্যালি দেখলুম, রয়টার-এপি'র সংবাদ। রেডিওতে যা বলেছে, বলছে, প্রায় একই সব।

বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী বললেন, সন্তোষদা (সন্তোষ কুমার ঘোষ) তোমাকে খুঁজছিলেন। চলো।

সন্তোষদা বললেন, শেখ মুজিবকে নিয়ে এখনি লিখে দাও। বললুম, পারবো না।

পরদিন দেখি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছেন তুষার পণ্ডিত। ঢাকায় ছিলেন। আনন্দবাজারের ব্যুরো চিফ। ডালিম, জিয়াউর রহমান ওঁর বন্ধু। সখ্য সম্পর্ক। হত্যার মোটিভ নিয়েই শুধু নয়, এমন সব বর্ণনা দিচ্ছেন লেখায়, যেন প্রত্যক্ষদর্শী। হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত। লিখেছেন ধারাবাহিক। মিথ্যের পাহাড় গল্পে। এতোটা মিথ্যে বোধহয় সহ্য করতে পারেনি সম্পাদক অশোক কুমার সরকার। হঠাৎই ধারাবাহিক রচনার ইতি।

ওদিকে, যুগান্তরও কম যায় না। লিখছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বানোয়াট কাহিনী। প্রতিবাদপত্র পাঠাই। তুষারকান্তি ঘোষ ডেকে পাঠান। দেখা করি। বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ধারাবাহিক লেখো, ছাপবো।" বলি, "বঙ্গবন্ধুর শোকে অন্ধ, কিছুই লিখতে পারবো না। শোক কবে দূর হবে, অজানা।"

"আরে মশাই, দেশপিতাকেই হত্যা করলেন?" যাদবপুর বাজারের মাংস বিক্রেতার প্রশ্ন। "দেশটা কী আবার পাকিস্তান হয়ে যাবে?" জানতে চান পান-বিড়ি-সিগ্রেটের দোকানদার। "যাই বলুন মশাই, বঙ্গবন্ধু ছাড়া কী বাংলাদেশ? —না।" বলেন ঐ প্রসূন, পুলিশ।

পাঁড়েজি আসেন, রাত বারোটার পরে। দরজায় কড়া নাড়েন। ঘর খুলি। মাথা নিচু করে একটিই কথা বলেন, "দাদাবাবু, আপকো দেশ বাপ নেহি হ্যায়, আপ তো এতিম হো গিয়া।"



নাসির আহমেদ

ইতিহাস বিকৃতির আর এক অধ্যায়

জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রেই নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। সেসব রেকর্ডের তালিকায় এখন ইতিহাস বিকৃতি সর্বকালের সব রেকর্ড ভঙ্গ করতে চলেছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র' শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থমালার পুনর্মুদ্রণ করতে গিয়ে জোট সরকার এখন সর্বজনমান্য ইতিহাসও পাল্টে দিতে চাচ্ছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১৫টি খণ্ডে এ দেশের বরেণ্য কবি হাসান হাফিজুর রহমানের জীবদ্দশায় তারই হাতে সম্পাদিত হয়েছিল, যা ছিল দলমতের ঊর্ধ্বে সর্বজনগ্রাহ্য এক প্রমাণিত দলিল, যেখানে মুক্তিযুদ্ধে যাঁর যা ভূমিকা তা নির্মোহভাবেই লিপিবদ্ধ ছিল এতকাল। কিন্তু জোট সরকার আমলে সৃষ্ট 'মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়'-এর উদ্যোগে সর্বজনগ্রাহ্য সেই ইতিহাসের তথ্যও পাল্টে দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে চলেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্থলে জেনারেল জিয়াকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ করতে এ অপচেষ্টা। মহান স্বাধীনতার ইতিহাস ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে। সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভের তিনটিই গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে গত দুই যুগে। এমনকি ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামের সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর জিয়াকে একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিকৃত তথ্যও ইতিপূর্বে উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। তা হয়েছে সংবাদপত্রে, বিবৃতিতে, বক্তৃতায়। কিন্তু তারপরও 'স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' ছিল বিকৃতি থেকে দূরে। এবার সেই দলিলপত্রও পাল্টে দেয়া হচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে (গ্রেপ্তার হওয়ার আগে)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে শেষ ম্যাসেজটি দিয়েছিলেন, যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঘোষণা ছিল, সে ঘোষণা নিয়ে স্বাধীনতার পর ৩৩ বছরেও কোনো বাদপ্রতিবাদ কেউ না করলেও এখন জোট সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সে তথ্য আর মানতে রাজি নয়। অর্থাৎ মহান স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাকেও বিতর্কিত আর বিভ্রান্ত করার পথ বেছে নিয়েছে তারা।

যে কারণে 'স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র'র তৃতীয় খণ্ডের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে মেজর জিয়াকেই স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর আহ্বান জানানো প্রথম ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, তিনি ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে। অথচ বাঙালি সৈনিক হিসেবে বিদ্রোহ ঘোষণা আর স্বাধীনতার ঘোষণা যে এক নয়, তাও এখন গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা হিসেবে। অন্যদিকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর 'ওয়্যারলেস ম্যাসেজটি তথ্যনির্ভর ছিল না' বলে তা স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাবেক ভিসি এমাজউদ্দিন আহমেদ ও মনিরুজ্জামান মিঞাদের নিয়ে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত কমিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেয়া ২৫ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার ব্যাপারে কোনো উৎসই নাকি খুঁজে পায়নি! স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করার নানা চেষ্টা হয়েছে গত ২৮ বছরে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একমাত্র অবিকৃত ইতিহাস হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের এই দলিল। কিন্তু সেই একমাত্র অবিতর্কিত দলিলপত্রও বিকৃত আর বিকর্তিত করার পথ বেছে নিল এ সরকার।

২০০১-এর অক্টোবরে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিসহ নানামুখী পন্থা গ্রহণ করে। এমনকি বহুকাল ধরে সকলের জানা জিয়ার ২৭ মার্চ বেতার ঘোষণার তারিখটি ২৬ না ২৭ এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়। তার চেয়েও বড় কথা, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটাই শুরু করতে চায় মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা থেকে! তার আগের যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, পাকিস্তানি শাসকচক্রের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানে গড়িমসি তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা এবং এর প্রতিক্রিয়ায়

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তথা বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালির বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠা, ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চের উত্তাল ঘটনাপ্রবাহ, যার ফলে রমনা রেসকোর্সে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ উদাত্ত আহ্বান, ঐ আহ্বানে দেশব্যাপী শুরু হয় শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন, অচল হয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রের শাসন। বাংলাদেশের প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং যার চূড়ান্ত পরিণতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যার সূচনা এবং পরদিন থেকে শুরু হয় গণপ্রতিরোধ। অবশেষে ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ। এর কোনো কিছুই জাতীয়তাবাদী জোট সরকারের ইতিহাস রচয়িতাদের মনোপূত নয়। কারণ তাতে সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক নিরঙ্কুশ বিজয়ের কথা এসে যায়। জাতি হিসেবে বাঙালিত্ব বেরিয়ে আসে। তাহলে আজকের প্রজন্ম জেনে যাবে যে, বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল ঐ নির্বাচনে বিজয়ীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পরিণতিতে সংঘাত সৃষ্টির ফলে। কারা সেদিনের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে জানা হয়ে যাবে যে, সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে যে ভোটের জোয়ার এসেছিল, তার মূল প্রেরণা ছিল এই বোধ : আমরা শোষিত বঞ্চিত বাঙালি, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা দাবির আন্দোলনে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে বাঙালি। আর তাতে বাঙালি জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এ দেশে বহু দল, বহু নেতা ছিলেন কিন্তু মহানায়ক ছিলেন একজন, তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ডাকেই ১৯৭০ সালে বাঙালি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিল। তার ডাকেই পাকিস্তানি শাসকদের প্রশাসন যন্ত্র অচল করে দিয়েছিল বাংলার মানুষ। তার ডাকেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন, এমনকি খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছিল, কোর্ট কাছারি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। সমগ্র জাতির স্বপ্নের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন শেখ মুজিব। এমনকি যে নেতাকে আজ জোট সরকার স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ বা কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে চাইছে সেই একাত্তরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানকে পর্যন্ত তার ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দেয়া বেতার ঘোষণায় স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করতে হয়েছিল যে, অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান...। এমনকি জেনারেল জিয়ার স্বাক্ষরিত যে নিবন্ধটি দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রাসহ একাধিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে সেখানেও তিনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধ শুরুর আগের অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরম শ্রদ্ধার সাথেই উল্লেখ করেছেন। এমনকি বারবার শেখ মুজিব নামটি লেখার আগে বঙ্গবন্ধু শব্দগুলো সসম্ভ্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী এমপির একটি প্রস্তাব মনে পড়ে। তিনি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে বলেছেন যে, মেজর জিয়ার সে ভাষণটি জাতীয় সংসদে বাজানো হোক, তা হলেই বোঝা যাবে তিনি কার পক্ষে কার সামনে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন কালুরঘাট বেতারে। কিন্তু কাদের সিদ্দিকীর ঐ প্রস্তাব রাজাকার কবলিত জোট সরকারের পক্ষে সংসদে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

গোটা জাতিরই দুর্ভাগ্য যে আজ স্বাধীনতার শত্রুরা শুধু নয়, প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধা হননকারী, বাঙালি নিধনকারী একাত্তরের পরাজিত শক্তি জোট বেঁধে সরকারের অংশীদার হয়েছে। সুতরাং এ দেশে এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসের জন্য যা যা করণীয় তারা তো তা সম্পন্ন করবেই—যদিও প্রকৃত ইতিহাস কখনো কোনো বিকৃতির ধার ধারে না। সে তার আপন অবস্থানেই থাকে অনড়। ইতিহাসের চাকা কেউ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলেও যে তা সম্ভব নয় তার অগণিত দৃষ্টান্ত আছে ইতিহাসেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার পর মীর জাফর ও তার দোসররা কলঙ্কিত করতে চেয়েছে সিরাজের চরিত্র, যুগের পর যুগ সে চেষ্টা চলেছে, বিকৃত ইতিহাসও রচিত হয়েছে। কিন্তু তা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে, প্রকৃত ইতিহাস সিরাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য বীর শহীদের আসনটিই দিয়েছে। কারণ ইতিহাস কারো ক্রীতদাস নয়, সে সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। শুধু সাময়িক বিকৃতি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু স্থায়ী নয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন করেছিল বিবিসি তার শ্রোতা জরিপে। সেই শ্রোতারা শুধু আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিলেন না, সকল দলমতের মানুষের জনমতেই তা হয়েছিল বলে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধী মৌলবাদী নেতা গোলাম আযমও কিছু ভোট পেয়েছিল। কিন্তু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শীর্ষ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামটিই উচ্চারিত হয়েছিল গরিষ্ঠ ভোটারের ভোটে। সেখানে জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্থানটি কোথায়?

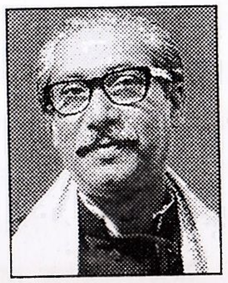
না, জেনারেল জিয়াকেও খাটো করা যাবে না। শ্রেষ্ঠ বাঙালি না হোন, ইতিহাসে তারও একটি স্থান আছে।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার এবং এক দুঃসময়ে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি বঙ্গবন্ধুর নামেই পাঠ করেছিলেন, সেদিনে মেজর জিয়ার সেই কণ্ঠস্বর বাঙালি সেনা সদস্য, ইপিআর, পুলিশসহ সর্বস্তরের যোদ্ধাদের মধ্যে বিশাল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তারা বুঝতেন, তাদের নেতা বঙ্গবন্ধুসহ তাদের নেতৃবৃন্দ গেরিলাযুদ্ধের জন্য হয়তো আত্মগোপনে চলে গেছেন, বাঙালি সেনারা যুদ্ধে নেমেছে। কারণ বঙ্গবন্ধু তো তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' জনগণ সেই দুঃসময় জিয়ার কণ্ঠস্বরে উদ্বুদ্ধ তো হয়েছিলেনই। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, জিয়া সেই প্রেরণায় সৃষ্ট একজন সক্রিয়যোদ্ধা। সাড়ে তিন বছরে দেশের শাসক বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক ২৪ বছর পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে বারবার জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগকারী বঙ্গবন্ধু হয়তো এক ছিলেন না। শাসক বঙ্গবন্ধু ভুলত্রুটি করেননি এমন নয়, দলীয়করণও কিছুটা হয়নি তার আমলে তা নয়, একদলীয় শাসনব্যবস্থায়ও তাঁকে যেতে হয়েছিল। সমালোচনা করার অনেক কিছু আছে, তাই বলে স্বাধীনতার প্রধান সংগঠক, বাঙালি জাতির সর্বদল সর্বজনমান্য নেতার অবদান কি মুছে যাবে? বঙ্গবন্ধু ছাড়া একাত্তরেরই প্রেক্ষাপট পেতো না জাতি। জিয়ার মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা আর শাসক জিয়ার ভূমিকাও কি এক? জিয়া তো রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধীকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছিলেন, তাই বলে তাঁর একাত্তর কি মিথ্যে? না মিথ্যে নয়। সাফল্য-ব্যর্থতায়, ভালোমন্দে মানুষ। এ সত্য যারা ইতিহাস বিকৃতি করতে গিয়ে ভুলে যায়, ইতিহাস তাদেরকে কালক্রমে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেই। এটাই ইতিহাসে সত্য। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গত বছর ২৫ মার্চ এক বক্তৃতায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'কাউকে টেনে উপরে যেমন তোলা যায় না, তেমনি কাউকে ঠেলে নিচেও নামানো যায় না।' এ সত্য কি এখনো তার মনে আছে? বঙ্গবন্ধুর অবদান মুছে ফেলার এই বিশেষ মুহূর্তেও?

ঐদিন মনে থাকলে, তাহলে নিশ্চয়ই এমন আত্মঘাতী কাণ্ড করতে পারতেন না তার দলের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে মুক্তি সংগ্রামের শুরু, তার ইতিহাস তো মুজিবনগর সরকারের ইতিহাসেও আছে। মেজর জিয়াকে যে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারের মতোই মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনের নির্দেশেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তাও কি জোট সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে?

মেজরকে মুজিবনগর সরকার কর্নেল পদে উন্নীত করেছিল, আর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলকে করেছিল জেনারেল, সেই জেনারেলের অধীনেই তো কর্নেল জিয়া যুদ্ধ করেছেন। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন সরকারপ্রধান। এই কাঠামোর মধ্যেই জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে কর্নেল জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ইতিহাসের এই সত্য মুক্তি সংগ্রামের ৯ মাসের সরকার ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে।

সুতরাং ইতিহাস বিকৃত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যেমন তাঁর পর্বততুল্য উচ্চ মর্যাদার আসন থেকে এক ইঞ্চি নামানো যাবে না, কিংবা মুছে ফেলা যাবে না তাঁর দীর্ঘকালের গৌরবময় সংগ্রামের অবদান, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের অপর একটি গৌরবের টিলার ওপর থেকেও স্পর্শাতীত পর্বত চূড়ায় উত্তোলন করা সম্ভব হবে না। ইতিহাসে সবার স্থানই নির্ধারিত হয়ে আছে। এ সত্য বিস্মৃত হয়ে যারা ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, ইতিহাস তাদেরকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে।



নির্মলেন্দু গুণ

শেখ মুজিব : এক আত্মঘাতী জাতির নেতা

লেখক শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙালিকে আত্মঘাতী জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এই লেখাটি তৈরি করার জন্য একটি জুতসই নামের সন্ধান করতে গিয়ে নীরদবাবুর এই নামের প্রতি আমার চোখ যায়। আমার মনে হয় আমি যা বলতে চাই তা এই নামকরণের মধ্যে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমি লেখার আগেই আমার লেখাটির শিরোনাম নির্ধারণ করে ফেলি। পরে নীরদবাবু কী কী কারণে বাঙালিকে আত্মঘাতী বলেছেন, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি এক সময় বইটি যোগাড় করে পড়ি। জন্মসূত্রে কিশোরগঞ্জের মানুষ নীরদবাবু, যিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা নেতা শরৎ বসুর সচিব, কানাডায় গিয়ে লেক ওন্টারিওর পাশে দাঁড়িয়ে যিনি ভৈরবের হাওরের সাথে ওন্টারিওর মিল খুঁজে পান, তাঁর বাঙালিত্ব সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাঙালির শক্তি কোথায়, কোথায় তার দুর্বলতা, তার মানস গঠন প্রতিক্রিয়াকে সন্ধান করতে গিয়ে তিনি জীবনের বহু সময় ব্যয় করে বাঙালির অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আমি তার সাথে একমত বলেই আমার রচনার শুরুতেই আমি তাঁর ঋণ স্বীকার করছি। বাঙালি, সন্দেহ নেই এক আত্মঘাতী জাতি। কিন্তু এ আবিষ্কারের মধ্যেই সীমিত নয় তাঁর দৃষ্টি—তিনি ভবিষ্যতের বাঙালির একটি শুভ সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। ব্যক্তির পুনর্জন্মে তিনি বিশ্বাসী নন, কিন্তু বলেছেন, জাতি হিসেবে বাঙালির পুনর্জন্ম সম্ভব। এই সম্ভাবনাটাই আমাকে চারপাশের নিরাশ আঁধারে আশান্বিত করে। তিনি মোটামুটিভাবে ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়কালকেই তাঁর বিবেচনায় নিয়েছেন।

পরবর্তী কালের বিচার তিনি করেননি। আমি আমার আলোচনায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়কে বিবেচনায় নিয়ে, ঐ সময়ের সবচেয়ে বড় অর্জন যেটি, সে সম্পর্কে বলবো।

ঐ সময়ে খণ্ডিতভাবে হলেও বাঙালির একাংশের পুনর্জন্ম ঘটেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, সেই বিরোধ কীভাবে ক্রমশ ম্যাচিউর হতে হতে এক সময় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায় এবং ফরিদপুরের টুঙ্গীপাড়ায় এক অজগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি কী করে ঐ সময়খণ্ডের উজ্জ্বলতম প্রতীকসূর্যে পরিণত হন সে ইতিহাস, ইতিহাস বিকৃতির ক্লান্তিহীন প্রয়াস সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বাঙালির অতীতকে যদি রবীন্দ্রনাথ নামে শনাক্ত করি, তাহলে আমি ১৯৪৭ পরবর্তী, অর্থাৎ বাঙালির রবীন্দ্র পরবর্তী সময়কে শনাক্ত করবো শেখ মুজিব নামে। আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের পর যদি কাউকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির সম্মান জানাতে হয়, তাহলে আমি শেখ মুজিবের নামই বলবো। যিনি বাঙালির কাছে অধিক পরিচিত 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে। আমি পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার সকল কৃতী বাঙালিকে বিবেচনায় রেখেই কথাটা বলছি। আমি মনে করি, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আত্মাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্য দিয়ে, গান দিয়ে, নাটক-গল্প দিয়ে। আর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে, শেখ মুজিবই প্রথম বাঙালিকে 'স্টেট ক্রাফট'-এর অধিকারী করেছেন, তাঁর দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, সাহস এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখিনি, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শেখ মুজিবকে আমি দেখেছি।

ঘটনা হিসেবে, শেখ মুজিবের নেতৃত্ব এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বড়, নাকি ১৯৭৫-এর মুজিব হত্যার ঘটনাটির গুরুত্ব অধিক—সেও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। ১৯৭৫-এর আত্মঘাতী ঘটনাটিকে আমি এই জাতির চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে করি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বলেই বাঙালি আত্মঘাতী এমন নয়, বরং আত্মঘাতী বলেই সে এমনটি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অদৃষ্টকে মানবজীবনের মতোই জাতির জীবনেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করতেন। শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাঙালির জীবনে যেন বঙ্কিম কথিত সেই অদৃষ্টেরই এক নির্মম খেলা দেখা গেল। ১৯৭৫-এ বাঙালির আত্মঘাতী চরিত্রটি মোটাদাগে প্রকাশিত হলেও তার সূত্রপাত তো আমরা জানি, সেই ১৯৪৭-এ ঘটেছিল।

তুষ্ট নন যে বিধাতা, এই বাঙালি জাতিটির প্রতি, তাও বিবেচনায় নিতে হয় বৈকি। পৃথিবীতে এমন জাতি, একমাত্র লেবানন বা নাইজেরিয়া ছাড়া আর কোথায়, যেখানে দুটি ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান? ধর্ম যদি প্রকৃতির খেয়াল হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয়, প্রকৃতির হাতে সে যেমন মার খেয়েছে, খাচ্ছে এবং খাবে—তেমনি ধর্মের হাতে মার খাওয়ারও শেষ হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে সে কথাটিই বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে গিয়ে স্মরণ করতে পারি ভারতের জাতির জনককে, স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই উগ্র হিন্দুর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সৌভাগ্য মুজিবের, তিনি তাঁর সাধের বাংলাদেশে তিন বছর বেঁচেছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হিন্দিভাষী উগ্র হিন্দুদের তুলনায় বাংলাভাষী উগ্র মুসলমানদের ধৈর্যের বরং প্রশংসাই করতে হয়। তবে এ কথাও ঠিক যে মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী—এই তিন গান্ধীকে হত্যা করেও ভারতের উগ্রবাদীরা ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে টলাতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশকে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হলে, বাংলার হিন্দুরা তাদের নেতার সাথে কেমন ব্যবহার করতো তা আমাদের জানার সুযোগ হয়নি। তবে অনুমান করতে পারি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে, একদল বাঙালি যেমন পাকিস্তানের সাথে, তেমনি আরেক দল বাঙালি ভারতের সাথে যুক্ত থাকার পক্ষপাতী ছিলেন বলেই বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্ব জিনিসটি জিন্নাহর নামে চালু হলেও হিন্দু বাঙালির মধ্যেও তার যথেষ্ট সমর্থন ছিল। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু জিন্নাহর অভাব ছিল না এবং এখনো নেই যে, তা আমি সেখানকার অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সাথে কথা বলে বুঝেছি। বাঙালির ধর্মের নামে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কে কতটা দায়ী তার বিচার করার জন্য আমি বসিনি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্য কথাটি বিনয়ের সাথে বলা যে, বাঙালি ভাষায় এক হলেও ধর্ম-প্রকৃতির দিক থেকে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিভক্ত হওয়ার অধিকার রাখে। ভাষাগত মিল তার মধ্যে যে ঐক্যসম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, ধর্মগত বৈপরীত্য তা কেড়ে নিয়েছে। এখানে না মুসলমান না হিন্দু— কেউ-ই কারো সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। কেননা তাদের দোঁহার অতীতই নানা তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারটিকে

ইংরেজদের রাজনৈতিক চাতুরি বলে বর্ণনা করে, সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের আছে। এটা আত্মপ্রতারণার সামিল। জার্মান, কোরিয়া বা ভিয়েতনামও ভাগ হয়েছিল বাইরের চাপে; বাংলা ভাগ হয়েছিল ভেতর থেকে, ভেতরের চাপে। ফলে অন্যদের মধ্যে একত্রীকরণের বা পুনর্মিলনের স্পৃহা সর্বদাই ছিল (ভিয়েতনাম ও জার্মান মিলে গেছে ইতোমধ্যেই)—বাংলায় তা এখনো পর্যন্ত দুর্লক্ষ্য। বাংলার বিভাজন রেখাটিকে মীমাংসিত সত্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী লোকের সংখ্যাই এখনো উভয় অংশে বেশি বলে মনে হয়।

শেখ মুজিব, প্রকারান্তরে বাঙালি চরিত্রের এই সাম্প্রদায়িকতাজাত হীনমন্যতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালিকে 'মানুষে' পরিণত করতে। তাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে তাঁর স্বাধীন স্বপ্নের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় তিনি তাঁর মানসগুরু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'কবিগুরু, তুমি বলেছিলে, সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি। কবিগুরু, আজ আমার বাঙালিরা মানুষ হয়েছে, তোমার আক্ষেপ মিথ্যা প্রমাণ করেছে, আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে...।' আজ আমি মুক্ত বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি : আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

কেউ কেউ বলেন, মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকার আওয়ামী লীগের কাঁধে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দিয়েছিল, যা পরে সংবিধানে গৃহীত হয়। এর সমর্থনে তাদের বক্তব্য, ৬ দফা বা ১৯৭০-এর নির্বাচনী মেনুফেস্টোতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিল না। এ কথা ঠিকই। কিন্তু আমরা জানি, ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুলভাবে বাঙালির ম্যান্ডেট পাওয়ার পর ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল, সেখানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, 'হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ভায়েরা, আপনারা শুনে রাখুন—আপনারাও এ দেশের সমান নাগরিক। আপনাদের ওপর এ যাবত ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাচার হয়েছে জানি। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি, আর আপনাদের ওপর অত্যাচার হবে না। এই দেশ একা কারো নয়, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের এই দেশ। ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না, শোষণ চলবে না। আমাদের লক্ষ্য একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে রাষ্ট্রীয় নীতি।'

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির ইতিহাসের হ্যামলেট। ভারতের কাছ থেকে তিন বিঘার করিডোর পেতে যাদের ষোল বছর অপেক্ষা করতে হয়, তাদের মুখে শেখ মুজিব সম্পর্কে ভারতের দালালির সস্তা অভিযোগটি ধর্মনিরপেক্ষতা মানেন না এমন মুসলমানরাও চিরদিন নির্বিচারে মেনে নেবে না। কেননা বছর না ঘুরতেই বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্যদলকে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব প্রমাণ করে গেছেন যে, ভারতের কাছে মাথানিচু না করেই তিনি পাক-ভারত বৈরি সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন।

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই তিনি চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা হাতে অগ্রসর হতে। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কবিগুরু এবং সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। পেয়েছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, সম্রাট আকবর এবং তাঁর সূফীসাধক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা ভাষাভাষী সকল বাঙালিকে জাতিতৃষ্ণার এক রশিতে বেঁধে তাকে ক্রমশ মানুষে পরিণত করার আর কোনো উপায় অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। ভুল রবীন্দ্রনাথের নয়, ভুলটা মুজিবেরই। তাই তাঁর মৃত্যুঅন্ত ক্ষণিকের আনন্দলোকে জ্বলে ওঠা আত্মঘাতী বাঙালি দ্রুত পরিণত হলো বাংলাদেশীতে। এখন আমরা বাঙালি থেকে বাংলাদেশীতে পতিত হয়েছি। এখন আমরা সংগ্রাম করছি আমাদের বাঙালি পরিচয় পুরুদ্ধারের জন্য। এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার পরই শুরু হবে আমাদের 'মানুষ' হওয়ার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শেখ মুজিব আমাদের চেতনায় আলো ফেলবেন, যোগাবেন আমাদের চিত্তের সাহস। তিনি ক্রমশ পরিণত হবেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, বাঙালির অখণ্ডিত সত্তা ও শক্তির প্রতীকে। বাঙালি হিন্দুরা অনেক বড় বড় মনীষীর জন্ম দিয়েছে, কিন্তু মুজিবের মতো বড় নেতার জন্ম দিতে পারেনি। বিরোধ নয়, শেষ বিচারে মিলনই যে সত্য এবং অনিবার্য, বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রকৃতি, মনে হয় বাঙালি মুসলমানের ঘরে শেখ মুজিবের মতো বড় নেতাকে জন্ম দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক চিত্তের ক্ষুদ্রতার কারণে আমরা তাঁকে কল্পিত অভিযোগে হত্যা করেছি।



নীলিমা ইব্রাহিম

আমার স্নেহময়ী ভগ্নি রেণু বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

বেগম মুজিবকে তাঁর অনুরোধে প্রথম থেকেই 'তুমি' সম্বোধন করতাম। কিন্তু সংলাপে কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। বঙ্গবন্ধু তখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও উৎস। বেগম মুজিব অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবেন। খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে গেছি। নিজের ঘরে চৌকিতে শুয়ে আছেন। কাছে গিয়ে বসতেই আমার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন। মনে হলো দেহের চেয়ে মনটাই ভারাক্রান্ত। উঠে বসলেন, বললেন, 'আপা, জানিনা আমি বাঁচবো কি না'। তারপর আমার হাতখানা ওর মাথার উপর রেখে বললেন— 'আপা, আমাকে দোয়া করবেন। আপনি আমাকে রেণু বলে ডাকবেন, আমি তো আপনার ছোট্ট বোনের মতো'। আমি আদর করে ওকে শুইয়ে দিলাম। বললাম, 'রেণু, সত্যিই আমি তোমার বড় বোন। আমার এক বোন আছে ওর না রেণু। আমি বলছি তুমি ভালো হয়ে, সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।' নিজের ওপর অনেক জুলুম গেছে। মন মানলেও দেহ মাঝে বিদ্রোহ করে। সত্যিই সুস্থ হয়ে হাসিমুখে রেণু ফিরে এলো। কিন্তু সেই যে রেণু আমার বুকের মাঝে ছোট্ট বোনের মতো জায়গা করে নিলো, আর তো তাকে সরাতে পারলাম না। পেরেছি কি সরাতে? না হৃদয়ে লালন করেছি। আজ তার কথা লিখতে গিয়ে ভাবছি, কি ছিল তার ভেতর, যা এমনভাবে আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল? আমি তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পত্নী হিসেবে কখনও অতিরিক্ত সমীহ করিনি, প্রধানমন্ত্রীর বেগম হিসেবেও কুর্নিশ করিনি, রাষ্ট্রপতিমহিষী রূপেও আভূমি আনত সালাম জানাইনি। আমি শুধু

রেণুকে ভালোবেসেছি। ঠিক রেণুকে উপলক্ষ করে বা তার কাছে কোনো কাজে ৩২ নম্বরে গিয়েছি এমন মুহূর্ত স্মরণ করতে পারি না। সব সময়ই যেতাম ঐ অসীম শক্তিধর মহাপুরুষের কাছে। কারণ যে কোনো সমস্যা হলেই তো কোনোরকমে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই সমস্যার সমাধান। অনেক সময়ে সাথে আশাব্যঞ্জক কথা বলে ধরে রেখেছে—'আপা, বসুন এই তো এক্ষুণি এসে যাবে।' এমনিভাবে একদিন অপেক্ষায় থেকে দেখলাম লুঙ্গিপড়া, গেঞ্জি গায়ে চটি ফট ফট করতে করতে সন্ধ্যায় সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন। দেখে বললেন, 'আপা কতোক্ষণ'? এই শব্দ দুটি সব সময়ই ব্যবহার করতেন। আমি বললাম, 'এতো রাত একা এভাবে গিয়েছিলেন কোথায়? কোথায় আর যাবো, এই তো বোনের বাড়ি মণিদের ওখানে'। ভয়, ভীতি,... কোনো শব্দই তাঁর অভিধানে ছিল না, তিনি মানতেন না। এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে আমিও কেমন যেন মানসিক স্বপ্ন ভারাক্রান্ত হয়ে গেছি। ওরা যেন আমার চারপাশে ঘুরছেন, কথা বলছেন। বঙ্গবন্ধুর কথা সহস্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, হবে। কিন্তু রেণু, আমি কি পারবো ঠিক যেমন তুমি ছিলে তেমনি করে তোমাকে তুলে ধরতে? আমি চেষ্টা করবো, তোমাকে কথা দিচ্ছি। বাংলাদেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাতে হয়'। সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই এ উক্তি সত্য। তাই ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে রেণুর যে সংসারের চিত্র তুলে ধরেছি ঐ সংসার গড়তে তাকে দীর্ঘদিনের সাধনা করতে হয়েছে। প্রায় দুশো বছর আগেরকার যৌবনমদে মত্তা মধুমতির লাস্যময়ী গতি থেকে জন্ম হয় অববাহিক বাইগার শাখা স্রোতের, যা পরে নদীতে পরিণতি লাভ করে। চঞ্চলা মধুমতি তার ছন্দোময় লাস্যে সরে যায় গ্রামের এ প্রান্ত থেকে। তাই বাইগার এ বনানীকুঞ্জের স্তন্য-দায়িনী ধাত্রী। এই ধীর স্নিগ্ধ বাইগারের তীরে গড়ে উঠেছে গ্রাম, জনপদ, আর সেই সাথে আম, জাম, কাঁঠাল, আমড়া, পেয়ারা শোভিত মানববসতি। দূরে দূরে বট, অশ্বত্থ বাঁশঝাড় যেন মধুবনী নিকুঞ্জ। চারদিকে অভিরাম সঙ্গীতের ঝর্ণাধারার মতো পাখির কল-কাকলি। পূর্বের আকাশে আলো ফুটবার মুহূর্তে গাছে গাছে ডানা ঝাপটানো কতো নাম না জানা পাখ-পাখালির নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন। মোরগের ডাক 'গৃহস্থ জাগো' আল্লাহকে স্মরণ করবার সময় হয়েছে, গ্রমাবাসীকে সজাগ করে। কোকিলের ডাকে বাসিন্দারা বসন্তের আগমনী জানতে পারে। পথে পথে ঝরে থাকে শিউলী, বকুল, কখনও বালিকাবধূ তুলে মালা গাঁথে। হঠাৎ করে তাকে সজাগ সচেতন করে ডেকে ওঠে, চোখ গেল চোখ গেল', ত্রস্ত হয়ে গৃহবধূরা দৈনন্দিন কাজে

হাত দেয়। আবার কখনও যদি বালিকাবধূ বিরহ কাতর হয়ে দাওয়ায় বসে, অভিমান ভাঙায় এই পাখিরা। 'বউ কথা কও', 'বউ কথা কও', ইস্টকুটুম ইত্যাদি। সেদিনও গ্রামের বাসিন্দারা পাখির ডাক বুঝতো কারণ, বৃক্ষ, লতা, প্রাণী নিয়েই তো তাদের নিত্যকার জীবন।

প্রায় দুশো বছর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব-পুরুষরা এ গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। নদী থাকায় কোলকাতা থেকে কারিগর এনে দুটি ইমারত নির্মাণ করা হয়েছিল। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় আরও অনেক ঘরবাড়ি নির্মিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাবাহিনীরা ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিল। আমার দাদা-দাদীকে সামনের রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল'। *(পৃ. ১০, 'ওরা টোকাই কেন' শেখ হাসিনা)* এই গ্রামেই নিজস্ব আবাদ গড়ে তোলেন শেখ মুজিবুর রহমানের দাদা শেখ আব্দুল হামিদ। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের পিতা শেখ লুৎফর রহমান ওখানেই বসবাস করতেন।

শেখ মুজিবের নানা শেখ আবদুল মজিদ দৌহিত্রের আকিকার সময় নামকরণ করেন 'শেখ মুজিবুর রহমান' এবং দৌহিত্রকে সামনে রেখেই তাঁর সব সম্পত্তি কন্যা সায়রা খাতুনকে দান করে যান। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে সেরেস্তাদার ছিলেন। সুতরাং, অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি প্রবাস জীবনযাপন করেছেন। অবশ্য বাড়ি কাছে হওয়াতে সুযোগ পেলেই পরিবারের সাথে মিলিত হতেন। এরা ধনী ছিলেন না কিন্তু সংসারে অভাব কাকে বলে তাও জানতেন না। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ এদের ছিল। তখন এমন অনেক গৃহস্থ ছিল যারা সংসারে শুধু লবণ আর কেরোসিন তৈল কিনতেন। আর এ কারণেই বোধহয় মুজিব 'সোনার বাংলার' স্বপ্ন বাস্তবে দেখেছিলেন।

আমি এতোক্ষণে যে গ্রামের কথা বললাম তার নাম টুঙ্গিপাড়া। অখ্যাত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হঠাৎ ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানচিত্রে অসামান্য উজ্জ্বলতা নিয়ে ভেসে উঠলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি মহানায়ক, অক্লান্ত সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম এই টুঙ্গিপাড়ায়। আজ তাঁর সেই প্রিয় ভূমিতে অন্তিম শয়নে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত পিতামাতার বুকে তাদের আজন্ম লালিত খোকা।

এবারে একটু চোখ তুলে রেণুকে দেখি। ৫ আগস্ট ১৯৪৯ সালে কোল আলো করে এসে গেছে কামাল রেণুর বুকে। বালিকা জননী হলেও সন্তান সম্পর্কে রেণু ছিলেন বরাবরই অতি সতর্ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

পরিবারের সবার প্রতি ছিল সমদৃষ্টি। স্বামী থাকতেন না দেশে, রেণুর সময় কাটতো নানা রকম বই পড়ে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রবোধ স্যান্যাল, বিভূতিভূষণ সব সময় পড়তেন। আর ছিল গান শুনবার শখ। এ আনন্দ তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই আস্বাদন করেছেন। আর স্বামী যখন ছুটিতে আসতেন তখন তার সাথে নানা বই-পুস্তকের বিষয় ও কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতেন। শেখ হাসিনার কাছ থেকে জানা যায়, তিনি গোপালগঞ্জে মিশনারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সে কালের বিবাহিত একপল্লী বালিকার পক্ষে এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলকে নিয়েও আলোচনা হতো। এরই ফলশ্রুতিতে কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ হয় রাসেল। গ্রামের বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সঙ্গীতের সব রকম বাদ্যযন্ত্রই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও ছিলেন অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। ঢাকায় অবস্থানকালীন পরবর্তী জীবনে বঙ্গবন্ধু বার বার কারারুদ্ধ হলে অর্থাভাবে রেণুকে গৃহসামগ্রী বিক্রি করতে হয়েছে। তিনি অনেক প্রিয় অলঙ্কার বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র আর রেকর্ডগুলো কখনও হাতছাড়া করেননি। এছাড়া স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় হলে খোলাখুলিভাবে দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক কর্মপন্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হতো।

দেশ বিভাগ হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে এলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেন। তিনি অবশ্যই পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং আন্দোলনে শরিকও হয়েছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে মোহ ভঙ্গ হয়ে গেল। ২৩ ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা দিলেন উর্দুই হবে সকলের রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানিরাও তা মেনে নেবে। তাৎক্ষাণিকভাবে শেখ মুজিব এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, মুজিব ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাথে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেন। ২ মার্চ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রশ্নে ফজলুল হক মুসলিম হলে শেখ মুজিবের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময়ে ১৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে নেতৃত্ব দিলে ১১ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু এ সময় মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী নানাবিধ আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের

সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ভুখা মিছিল বের করে এবং যথারীতি শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন। এবারের জেলের মেয়াদ দু'বছর।

এই কর্মপ্রিয় মানুষটিকে সরিয়ে রেণুর কথা বলবার সুযোগ আমি খুঁজে পাই না। এ সময়ে হাসিনা ও কামাল মায়ের সাথে দেশের বাড়িতে, নানা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা দিয়েই দিন কাটে। কিন্তু প্রথম থেকেই রেণুর মনোবল অসীম। ১৯৫২ সালে বাবাকে দেখবার জন্য দাদা নৌকাযোগে দাদী, মা, হাসিনা, কামালকে ঢাকায় আনেন, তখন ঢাকায় আসতে দীর্ঘ সময় লাগতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঢাকায় পা দিয়েই শুনলেন মামলার প্রয়োজনে মুজিবকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভগ্নমনোরথ হলেও ত্বরিত গতিতে দাদা নাতনীকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

মামলা উপলক্ষে জেল থেকে মুজিবকে গোপালগঞ্জ আদালতে আনা হতো। এ সময়ের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন শেখ হাসিনা—'কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে কখনও দেখেনি। চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, 'আব্বা আব্বা' করে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাই-বোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম, আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছেই ছুটে আসতাম। অনেক ফুল পাতা কুড়িয়ে এনে কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' *(পৃ: ৪৯ বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্রের জন্ম—শেখ হাসিনা)* এই দুঃসহ নির্যাতনের স্মৃতি বয়ে আজ গণতন্ত্র অর্জনের পথে চলেছেন শেখ হাসিনা।

এলো ভাষা আন্দোলন, গুলি চললো ঢাকার রাজপথে। সালাম, বরকত, রফিক শফিউল শহীদ হলেন। বাংলা ভাষার জন্য প্রথম রক্তার্ঘ্য বঙ্গজননীকে। জেলে থেকে আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রাখবার অজুহাতে মুজিবকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি সতের দিন অনশন ধর্মঘট করেন। অতঃপর ২৬ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্তিলাভ ঘটে। ১৯৫৩ সালের ২৮ এপ্রিল জামালের জন্ম হয়। তিন সন্তানের জননী রেণু এখন দীপ্ত প্রতিষ্ঠিত গৃহিণী। এভাবে গ্রামে থেকে স্বামীকে ছন্নছাড়াভাবে জেল, জুলুমের মুখে ঠেলে দেয়াটা রেণু সমীচীন মনে করছিল না। রেণুর মনে সন্দেহ, কোথায় যেন তার কর্তব্যে অবহেলা হচ্ছে। স্বামীর প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে। অতএব, এখন ঢাকায় চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁর সান্নিধ্যের প্রয়োজন আছে

মুজিবের। এসব চিন্তা করে ১৯৫৪ সালে প্রথমবারের মতো পাকাপাকিভাবে ঢাকায় বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সন্তানসহ গ্রাম থেকে চলে আসেন। দু'ভাইয়ের এক বোন হাসু তখন আরও বড় হয়েছে। ১৯৫৪ সালে রজনী চৌধুরী লেনে বাসা ভাড়া করা হলো। রেণুর এই প্রথম শহরের সংকীর্ণ পরিবেশে বসবাস। কোথায় টুঙ্গিপাড়া বিশাল বিস্তার আর কোথায় এ সুরু গলির রজনী চৌধুরী লেন। তবুও রেণু মহাসুখী। স্বামী-সন্তানদের একান্তভাবে নিকট সান্নিধ্যে পাবে, অত্যন্ত প্রাণভরে যত্ন করা আর গল্প করা দুটিই হবে। শৈশব আর কৈশোরের সলজ্জ পরিবেশ অসম্পূর্ণ পরিচয়ের দুলহা আজ তার সব পূর্ণতা নিয়ে শুধু রেণুর দুলহা নয়, সখা, সচিব। এ আনন্দ রাখাবার জায়গা কোথায়। মুজিব প্রচণ্ড ব্যস্ত। নির্বাচনের পর ঢাকায় আসেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন মুসলিম লীগকে চিরতরে নির্বাসিত করার জন্য। বাংলার মাটিতে মানুষ, মানুষ হিসেবেই থাকবে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান হিসেবে নয়।

ক্লান্ত মানুষটি ঘরে ফিরলে রেণু তাঁর সেবা-যত্ন করে, পরিপাটি করে তাঁর প্রিয় খাদ্যবস্তু যথাসাধ্য তাঁর সামনে তুলে দেয়, সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কাহিনী শোনে। তারপর আলোচনা হয় ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে। রেণুকে সব কথা না বললে মুজিবের স্বস্তি নেই। রেণু বড় বুদ্ধিমতী। অনেক সময় আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে সুপরামর্শ দেয়। একারণে সব সময়েই রেণুর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তাকে মুজিব সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। জীবনের প্রথমে যেমন ছিল, শেষ দিনে রাষ্ট্রপতিরূপে ঐ একই আচরণ।



পান্না কায়সার

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আজকের সেমিনারে অনেক মূল্যবান ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে—যা বঙ্গবন্ধুকে জানার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ প্রজন্মকে দেবে সঠিক নির্দেশনা। এ সেমিনারের গুরুত্ব এ কারণে অপরিসীম। আমিও এ গুরুদায়িত্বের অংশীদার হতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি আগেই মাফ চেয়ে নেব এজন্য যে, বঙ্গবন্ধুর তথ্যবহুল বিচিত্র জীবনের বিচিত্রতা আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই আজকের আলোচ্য প্রবন্ধে অনেক কিছুই উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা—এ তিনটি শব্দ পারস্পরিকভাবেই সম্পৃক্ত। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) মূলত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিস্তৃতি। আর এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল নেতৃস্থানীয়। হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু এ ভূমিকায় উপস্থিত হননি। ইতোমধ্যে জনগণের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে তাঁর ভেতর একটা সংগ্রামী চেতনা দৃঢ়মূল হয়। যেমন—কিশোর মুজিব যখন গোপালগঞ্জ স্কুলের ছাত্র তখন যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক স্কুল পরিদর্শনে যান। সমবেত ছাত্রসমাবেশে কিশোর মুজিব স্কুল ঘরে পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরে তা সংস্কারের দাবি জানান। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের দৃপ্ত উচ্চারণের যাত্রা শুরু সেখান থেকেই।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে চলে যান। সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও অধিকার আদায়ে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বের কারণেই সে সময়ে কোলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনে

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শুরু হলো রাজনীতিতে তাঁর পদযাত্রা। সে সময়ে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে এসে নিজের দক্ষতা ও দেশপ্রেমের স্বচ্ছতার পরিচয় দেন। ইতোমধ্যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতায় প্রগতিশীল মহলে আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ হলো, ফিরে এলেন ঢাকায়। ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিপীড়িত মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠেন। মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর যাত্রা শুরুর পালা। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরেই প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক চেতনার আদর্শ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকালের মধ্যেই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে শোষক শ্রেণীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে বিনষ্ট করতে হলে আঘাত হানতে হবে ভাষার ওপর। ১৯৪৮-এ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জিন্নাহর উক্তিতে শাসকগোষ্ঠীর আসল স্বরূপ উদঘাটিত হলো। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হলো—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই। এ ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি হলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে জনগণ রাজপথে মিছিল বের করে। পুলিশের নির্যাতনে অনেক ছাত্র-জনতা আহত হয়। গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু তার আগেই ১৯৪৮-এর জানুয়ারিতেই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চক্রান্তকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পুরনো ঢাকার মোগলটুলীতে ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নামে এক সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলা ভাষা ও বাঙালির অধিকারের সার্বিক স্বার্থে তিনি যে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন তা ছিল ভাষা আন্দোলন তথা বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮-এর ৪ জানুয়ারিতে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই এ সংগঠন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সংগঠিত হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার ও অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান-সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশ। ১৯৪৮ সালে বর্ধমান হাউজে খাজা নাজিমুদ্দিন

ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈঠক ডাকলে বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে বুদ্ধিজীবী-ছাত্রসমাজ মিছিল সহকারে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। এ মিছিলটিরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮-এ ভাষার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে যে চেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল—সে চেতনারই বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৫২-এর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৯৫২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষার দাবিতে ধর্মঘট হয়েছিল। শত শত ছাত্র-জনতা মিছিল করে বটতলায় সমবেত হয়েছিল পরবর্তী নির্দেশের জন্য। কে দেবে নির্দেশ? যিনি নির্দেশ দেবেন তিনি জেলে অন্তরীণ। না, বঙ্গবন্ধু জেলে বসেও নীরব বসে থাকেননি। জেল থেকে তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়ার জন্য। নির্দেশ দিয়েছেন আইনসভার সদস্যদের ভাষার লক্ষ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহের। শুধু তাই নয়, তিনি এবং (প্রয়াত) মহিউদ্দিন আহমেদ ভাষার দাবিতে জেলখানায় অনশন করবেন, তাও জানালেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাত্ররা সঠিকভাবে পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে তুললো। ভাষার দাবিতে জনতা হয়ে উঠলো সংঘবদ্ধ। আন্দোলন-প্রতিবাদকে প্রতিহত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা জারি হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ভাষার দাবিতে বঙ্গবন্ধু অনশন করবেন, এ সংবাদ পাওয়ার পরপরই শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুরে স্থানান্তরিত করার সময়ে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে জনাব শামসুদ্দোহাসহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর দেখা হয়। কারণ তারা পূর্বেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, এ পথ দিয়েই বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে সাহসী মুজিব জনতার সামনে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর অবিচল সিদ্ধান্ত ও একুশের হরতালের প্রতি জোর সমর্থন জানিয়ে ভাষণও দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশে ছাত্র-জনতার মনোবল আরো বেড়ে যায়। ভাষার দাবির সাথে তীব্রভাবে সংযুক্ত হয় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি। সচিবালয় ঘেরাও করার সিদ্ধান্তে শাসকশ্রেণী বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

২১ ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আর আমি যাচ্ছি না।

২১-এর আন্দোলনে পশ্চিমা শাসকশ্রেণীর ভিত নড়ে ওঠে। জনগণের দাবির মুখে ওরা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন ভাষা আন্দোলনের ত্যাগকে সমুন্নত রেখে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের স্রোতধারায় বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে।

ভাষার সংগ্রাম থেকে স্বাধিকারের সংগ্রাম—স্বাধিকারের সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম—এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু উজ্জীবিত করেছেন সকল জনগোষ্ঠীকে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে ছাত্র সংগঠনটিকে ছাত্রলীগে রূপান্তরিত করেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করা হয়।

১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, 'অন্য কোনো ভাষা জানি কি না জানি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা এখানে বাংলাতেই কথা বলতে চাই।... যদি আমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হয়, তবে আমরা হাউজ পরিত্যাগ করব। বাংলাকে অবশ্যই গ্রহণ করে নিতে হবে—এটাই আমাদের স্ট্যান্ড।'

১৯৫৫ থেকে ১৯৭১। অনেকগুলো বছর। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে : বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন বঙ্গবন্ধু। নিজের দিকে, পরিবারের দিকে তাকানোর সময় হয়নি তাঁর। যাঁর নেতৃত্ব মাথা পেতে নিয়েছিল এ বাংলার জনগণ, সে নেতৃত্বের মূল ভিত তৈরি হয়েছিল ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ত্যাগের ফলে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল ১৯৪৭-এর পর ধাপে ধাপে। ভাষার জন্য আন্দোলনের পরিবেশ ও মানসিক প্রস্তুতি গঠনের ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৯৪৭-এর পর বাঙালির বোধে যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল—সে চেতনার মূল ভিত তৈরি হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও নেতৃত্বে। ভাষার দাবিতে বেশিরভাগের পর পরই গোটা জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধুসহ আরো অনেক নেতা। আজকে তাদের কথাও স্মরণ করি।

১৯৫২-তে ঘটলো বাঙালি চেতনার বহ্নিশিখায় বিশাল বিস্ফোরণ। বাঙালি অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠল। আর বঙ্গবন্ধু তাঁর পরবর্তী সংগ্রাম আর প্রতিবাদের ধাপে ধাপে গোটা জাতির সামনে তুলে ধরলেন স্বপ্নে ঘেরা সুখী-সমৃদ্ধিশালী একটি নীড়।

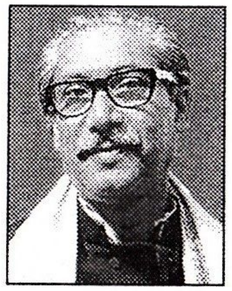
দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু তাই আত্মবিশ্বাসের সাথেই ১৯৬৯ সালেই বলতে পেরেছিলেন :

'জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুই বাংলাদেশ হইবে।'

১৯৬৬-তে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় হোটেল ইডেনে। উক্ত অধিবেশনে আজকের জাতীয় সঙ্গীত—'আমার সোনার বাংলা' গানটি ছিল উদ্বোধনী সঙ্গীত। তখনই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এটিই হবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গত।

বাঙালির স্বার্থ সংরক্ষণে যে নেতা বিরামহীন সংগ্রাম করে সকল শ্রেণীর চেতনায় জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করতে সক্ষম হলেন, তার মূল স্রোত ছিল বাংলা ভাষার আন্দোলনের রক্তের স্রোত। উর্দুর পক্ষে শাসকশ্রেণীর মনোভাবের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক তৎপরতায় ছাত্র-জনতা এমনকি পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির স্বল্পকালের মধ্যেই 'মিথ্যার স্বাধীনতা' শব্দটি বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ভাষাসত্তা ও জাতিসত্তার এ অভিন্ন সম্পৃক্ততা ১৯৫২-এর ত্যাগেরই ফসল।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর মতো এক নেতার জেলখানায় অনশন সাধারণ ঘটনা নয়। তাঁর অনশনের সিদ্ধান্তের ফলে জনমনে বিপুল সাড়া জুগিয়েছে। পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্র-জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে।



ফারুক চৌধুরী

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি না থাকলে এ দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় কবে হতো তা বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তার মেয়াদ ছিল তাঁর পরবর্তী ধর্তব্য সকল সরকারপ্রধানের চাইতে কম। সেই সরকারপ্রধানগণ হলেন জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ এবং বেগম জিয়া। শেখ হাসিনা সবে সরকারপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু তার বর্তমান পাঁচ বছরের মেয়াদ বঙ্গবন্ধুর সরকারপ্রধান হিসেবে সাড়ে তিন বছরের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারপ্রধান বিভিন্ন কারণে এই গণনাবহির্ভূত। খন্দকার মোশতাক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কোনো অংশ নন। তিনি জাতির একটি বিরাট কলঙ্ক। রাতের অন্ধকারে, কারও আবাসগৃহে অতর্কিতে কোনো সশস্ত্র দস্যুর আগমন এবং ক্ষণিকের অবস্থান তাকে গৃহস্বামীতে রূপান্তরিত করে না। ঠিক তেমনি হত্যাকারীদের কাঁধে চেপে, এ দেশের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত খন্দকার মোশতাক সরকারপ্রধান হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। বিচারপতি সায়েম কিছু দিনের জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সরকারপ্রধান ছিলেন। কিন্তু তা শুধু কাগজে-কলমেই। আসলে তিনি ছিলেন একটি সামরিক পরিবেষ্টনীতে ক্ষমতাহীন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার পর, বিচারপতি সাত্তারও তাঁর নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সময়ে, দুই কিস্তিতেই সরকারপ্রধান ছিলেন। তবে সর্বাবস্থায়ই মূলত তিনি ছিলেন একটি সুপরিকল্পিত এবং অবধারিত সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় প্রতীক্ষারত থরথর কম্পমান বলির পাঁঠা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি

সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সরকারপ্রধান হিসেবে সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এদের ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে কেউই সরকারপ্রধান ছিলেন না। তাদের ভূমিকা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক।

অতএব, সরকারপ্রধান হিসেবে, তা রাষ্ট্রপতি পদেরই হোক অথবা প্রধানমন্ত্রী হোক, বঙ্গবন্ধুর মেয়াদ ছিল, সত্যিকার অর্থে অন্য সরকারপ্রধানদের তুলনায় ন্যূনতম সময়ের। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন আগমনের ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড অবধি, মাত্র সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি।

সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের মতো একটি ভাষা ও কৃষ্টিভিত্তিক দেশ সৃষ্টির অনুকূলে ছিল না মোটেও। উপমহাদেশে তখন পাকিস্তান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য মিত্ররাষ্ট্র এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্বার্থে হৃদ্যতাপূর্ণ এবং বহুমুখী। তখন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মসূচিতে, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ছিল অগ্রাধিকার। নিক্সন-ইয়াহিয়া সহযোগিতা তখন ছিল তুঙ্গে। হেনরি কিসিঞ্জারের পাকিস্তান হয়ে চীনে গুরুত্বপূর্ণ অতি গোপনীয় সফরটি তখন অনুষ্ঠিত হলো। অতএব, পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোন বিবর্তনই তখন যক্তরাষ্ট্রে অথবা চীন, কারোই মনোপূত ছিল না। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান ছিল একটি বৃহৎ এবং প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র। তা ভেঙে দু টুকরো হবে, তা পূর্ব অথবা পশ্চিম এশিয়ার কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পছন্দ ছিল না আর তেলগর্বে গরীয়ান পশ্চিম এশীয় মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক প্রভাব তখন ছিল ক্রমবর্ধমান। তৃতীয়ত, তদানীন্তন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই ছিল টানাপোড়েন। তাদের ভীতি ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত দেশ ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রভাব পড়তে পারে তাদের নিজের আঙিনায়, উৎসাহিত করতে পারে তাদের দেশের অপকেন্দ্র বলকে। নীতিগতভাবে তাই তারা ছিল যে কোনো দেশ বিভাজনের বিরোধী। চতুর্থত, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জনসাধারণের মাঝে বাঙালিদের স্বাধীনতার পক্ষে যদিওবা যথেষ্ট সমর্থন ছিল, তা রাষ্ট্রীয় নীতিতে যাতে প্রতিফলিত না হয়, তার জন্য পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং শক্তিশালী। তাছাড়া, দেশ-বিদেশে আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলোও হয়ে উঠেছিল সক্রিয়।

এই অবস্থায় সরকারপ্রধান হিসেবে তাঁর কর্মমুখরতা কিছু বেশি। এক হাজার দিন-রাতের মাঝেই, এক আশ্চর্য সাবলীলতায় সহস্র প্রতিকূলতার

মাঝেও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং দূরদর্শিতায় তিনি বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন একটি গতিশীল, বলিষ্ঠ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির কাঠামো—যা আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তরকালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু উপরউল্লিখিত কারণগুলোর জন্য পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ ছিল একটি প্রধান সমস্যা। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর কর্মতৎপরতা আমাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সুগম করেছিল।

সেই সময়ের দুটি বিশ্বশক্তির একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমাদের স্বীকৃতি প্রদান করে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা ফেরার পর, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২-এ। পরদিনই বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে আমন্ত্রিত হলেন। বঙ্গবন্ধু যেসব কারণে তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস যে, একটি সুপার পাওয়ার দেশ সফর বাংলাদেশের বিশ্বস্বীকৃতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। তাই তিনি তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদটি বার্তা মাধ্যমে কালক্ষয় না করেই প্রচারিত করার নির্দেশ দেন। তার ফলে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ শেষ হতে না হতেই প্রায় পঞ্চাশটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করল। ১২ মার্চ ১৯৭২ এ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বের নজরে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় আমরা চীন এবং সৌদি আরব ব্যতীত বিশ্বের সকল দেশেরই স্বীকৃতি লাভ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই দুই দেশের সঙ্গে আমাদের অচিরেই গড়ে উঠবে আনুষ্ঠানিক ও অর্থবহ সম্পর্ক। তাই তাঁরই উৎসাহে, স্বীকৃতির অপেক্ষা না করেই, এই দুই দেশের সঙ্গে আমাদের শুরু হয়েছিল উচ্চপর্যায়ের আনাগোনা এবং বাণিজ্যিক লেনদেন। ১৯৭৪ সালে বন্যায় সৌদি আরব আমাদের দিয়েছিল দশ মিলিয়ন ডলারের অনুদান। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৎপর ও দূরদর্শী।

ভারত, পাকিস্তান এবং আমাদের এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর শেখ মুজিব সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। অতীত অভিজ্ঞতার কোনো তিক্ততাই তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত

করতে দেননি। পাকিস্তান থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরপরই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ তিনি পাকিস্তানকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বৈরিভাব পোষণ করি না। তোমাদের স্বাধীনতা তোমাদেরই রইল।

আমাদেরকেও স্বাধীনতায় থাকতে দাও। সঙ্গত ক্ষোভে ভরা নবীন দেশের এই রাষ্ট্রনায়কের পাকিস্তানের প্রতি আচরণে এই সংযম ও স্পষ্টবাদিতা ছিল প্রশংসনীয়। পাকিস্তানের স্বীকৃতির পরপরই তিনি ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে নির্দ্বিধায় যোগদান করেন এবং বিশ্বের ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে তাদের অধিকাংশই দুই বছর আগেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল, তাদের সঙ্গে স্থাপন করেন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। ১৯৭৪-এর শেষার্ধে বঙ্গবন্ধুর কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর এই অঞ্চলে বাংলাদেশীদের কর্মলাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটি অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২-এ যখন ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলেন তখন কোনো ভারতীয় সৈন্য বাংলার মাটিতে ছিল না। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্বন্ধে এ দেশে কখনও কখনও আলোচনার ঝড় বয়ে যায়, রাজনীতির অঙ্গনে এ নিয়ে হয় অযথা মাতামাতি। সিঁকি শতাব্দী আগেকার আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। চুক্তিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে গত মার্চ মাসে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে এ চুক্তি নবায়নের আর কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে বঙ্গবন্ধুর দিল্লি সফরকালে ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। বঙ্গবন্ধুর হত্যার দুই যুগ পরেও যাতে হয়নি কোনো অগ্রগতি। বঙ্গবন্ধুর সময়েই দহগ্রাম আর আঙ্গরপোতা ছিটমহলে বাংলাদেশ তার অধিকার স্থায়ী করে নেয়। আর ভারতের হাতে তার বদলি রয়ে যায় বেরুবাড়ি। দহগ্রামকে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য তিন বিঘা করিডোরটি চুক্তি অনুযায়ী পেতে আমাদের লেগেছে দুই যুগ। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই সমস্যাটির সমাধান ১৯৭৫ এ হতো বলেই আমার বিশ্বাস। ফারাক্কার পানি বণ্টনে বঙ্গবন্ধু সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। তার বিশ বছর পর ১৯৯৫ তে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়েছিল ১৩ হাজার কিউসেক পানিতে। উপমহাদেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রকাশ আমরা দেখি তাঁর

বিভিন্ন বিবৃতিতে। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ কোলকাতা সফরের সময়ে রাজভবনে তার সম্মানার্থে ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত নৈশভোজসভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার একান্ত কামনা, উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার বন্ধ্যানীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পত্তির অপচয় না করে আমরা যেন তা আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করায় আমরা সচেষ্ট রইবো। যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে পারি। যদি আমরা সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হই, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।' দেশেও বঙ্গবন্ধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৭৪-এর ৪ মার্চ দাউদকান্দিতে এক জনসভায় বলেছিলেন, এই উপমহাদেশে আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল আর শ্রীলঙ্কা মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ চাই না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করতে চাই। আমি চাই না যে, আমাদের বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। আমরাও অন্যের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই। তার এক যুগ পরে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে সার্কের ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ঘোষণাপত্রটি মূলত ছিল এক দশক আগেকার বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত উপরিউক্ত ভাবনা আর ভাষারই প্রতিধ্বনি।

সত্তরের দশকের স্নায়ুযুদ্ধের সেই সময়টিতে শেখ মুজিব একটি জোট নিরপেক্ষ, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৭২-এ তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর সেই দেশের সঙ্গে আমাদের অর্থবহ সহযোগিতার সূচনা করেছিল। ১৯৭৪-এ বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা সফর দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক ছিল। হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বাংলাদেশ সফরের পর আজ পর্যন্ত মার্কিন মুলুক থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের কেউ এ দেশ সফর করেননি।

অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৭৩-এর ১৮ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করেন। তাঁর সফর শেষের যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সংহত করার ক্ষেত্রে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে গুরুত্ব আরোপ করে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার

ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলাদেশকে নিয়ে শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল অনেক। ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর উদ্বোধন হবে তার একটি স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। তার সফরকালে বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র উন্নয়নশীল এশিয়ায় জাপানকে অর্থনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তাঁর সফরের পরেই বাংলাদেশ সফর করে ৪৫ সদস্যের একটি জাপানি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মিশন। জাপানের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখনই বাংলাদেশের সুসম্পর্কের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্বের সাড়ে তিন বছরের মাঝে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রেখেছিল তার আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ যাত্রার পথে লন্ডনে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কমনওয়েলথে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর পাকিস্তান নিয়ে কিছু দেশের বিরোধিতার মুখেও বাংলাদেশ সেই এপ্রিলে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করল। বঙ্গবন্ধু সেই উপলক্ষে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ রাখলেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। ভাষা আন্দোলনের সময়ের জেলে বন্দি তরুণ নেতা শেখ মুজিব ১৯৭৪-এ জাতিসংঘে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, ১৯৫২ তে অপমানে জ্বলে ওঠা বর্ণমালায় বাংলায় প্রদত্ত তার ভাষণ। জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের মুহূর্তটি ছিল এক নিবিড় আত্মতৃপ্তির। বঙ্গবন্ধুর বাংলা বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ জাতিসংঘে তাৎক্ষণিকভাবে পাঠ করার দায়িত্ব বর্তে ছিল আমার ওপর। তা হয়ে রয়েছে আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে চির অম্লান একটি অভিজ্ঞতা, চির জাগরুক একটি স্মৃতি।

১৯৭৪-এ বঙ্গবন্ধু নিজ শর্তে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লাহোরের ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে। মুসলিম বিশ্বেও দেশগুলোর সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। সেই বছরে আলজিয়ার্সের জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের একজন সম্মানিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন সমাদৃত।

১৯৭৩-এর আগস্টে অটোয়ায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। তাঁর

কর্মবহুল জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছিল ১৯৭৫-এর ২৯ এপ্রিল থেকে ৬ মের কিংসটন, জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন।

এ দুটি সম্মেলনেই তার সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মনের মণিকোঠায় জমা আছে তাঁর অনেক স্মৃতি। অটোয়াতে প্রথমবারের মতো অনেক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়। অস্ট্রেলিয়ার হুইটলাম, জ্যামাইকার মাইকেল ম্যানলি, মালয়েশিয়ার টুন রাজ্জাক, মরিশাসের শিবসাগর রাম গোলাপ, সিঙ্গপুরের লি কোয়ান ইউ, নিউজিল্যান্ডের নরম্যান কার্ক, শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাঁদরেল সব ব্যক্তিত্ব। প্রথম পরিচয়েই মনে হতো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যেন তাদের পরিচয় অনেক দিনের। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের উষ্ণতা এবং অমায়িকতা তাদের সবার মনকে ছুঁয়ে যেতে দেখেছি। তাঁদের সবার মাঝে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আত্মবিশ্বাসী, সমুন্নত শির।

১৯৭৫-এ কিংসটনে শীর্ষ সম্মেলনের ৬ মের একটি স্মৃতি থাকবে চির অম্লান। তাঁর জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেটাই ছিল অন্তিম দিন। সেই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নরম্যান কার্ক মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নরম্যান কার্কের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭২ সালে ঢাকায়, যখন নিউজিল্যান্ডের বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি ঢাকা সফর করেন। ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর পরিচয় হয় নিবিড়তর। ১৯৯৪ এর জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরম্যান কার্ক আবার বাংলাদেশ সফর করেন। তারপর তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

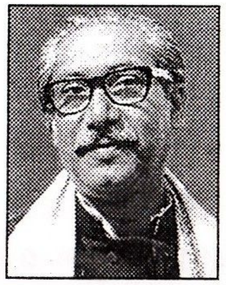
কিংসটনে শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন, ৬ মে তে বঙ্গবন্ধুর মনে হলো যে, সম্মেলন চলাকালীন কোনো রাষ্ট্রনায়কই নরম্যান কার্কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি। তিনি সম্মেলনের সভাপতি জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলির কাছে একটি চিরকুট পাঠালেন যে, তিনি নরম্যান কার্কের স্মরণে দুই একটি কথা বলতে চান। মাইকেল ম্যানলি সেই সভায় ঘোষণা করলেন যে, একটি বিশেষ এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু বলার সময় চেয়েছেন (Sheikh Mujibur Rahman has asked for time to raise a special and commendable point)। বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলার অনুমতি দিলেন তিনি।

নরম্যান কার্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, নরম্যান কার্ক ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁকে প্রথম পরিচয়েই ভালো লেগেছিল আর নিবিড়তর পরিচয়ে লেগেছিল আরো বেশি ভালো। (Norman Kirk was

one of that persors whom one like at the first meeting and liked still more when one got to know him more intimately) তিনি আরো বলেছিলেন, নরম্যান কার্ক ছিলেন একজন মহান প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন মহান (Norman Kirk was a great prime minister, but more than that, he was a great man).

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটাই ছিল তার শেষতম উক্তি। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটার রাউলিং তার আসন ছেড়ে এসে অশ্রুসজল নয়নে, আবেগভরা কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে তার এই ভাষণের জন্য তার দেশের তরফ থেকে জানিয়েছিলেন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধুর এই মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর ভাষাতেই জানান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন মানুষ তাকে প্রথম পরিচয়েই ভালো লেগেছিল আর নিবিড়তর পরিচয়ে লেগেছিল আরো বেশি ভালো। তিনি একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি ছিলেন মহান একজন মানুষ।



বেবী মওদুদ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫

শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ফজরের আযান শুরু হয়েছে মাত্র। রাতের অন্ধকারের শেষ রেশটুকু ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। শ্রাবণের শেষদিন, বাতাস ভেজা ছিল। গাছের পাতায় পাতায় মৃদু শব্দ তুলছিল সে বাতাস।

ধানমণ্ডি ৩২নং সড়কে হঠাৎ সামরিক জিপ, ট্যাঙ্ক ও ভারী ট্রাকের ছোটাছুটি শোনা গেল। তারপর গুলি আর গুলি, শুধু গুলির শব্দ। আশপাশের বাড়িগুলো সে শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে, কান ভারী হয়ে ওঠে। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা দিল, এমন গুলি তো আর হওয়ার কথা নয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে একবার শোনা গিয়েছিল। এখন আবার কেন? যাদের একাত্তরের অভিজ্ঞতা ছিল তারা সাথে সাথে রেডিও খুলে বসে। ঠিক তখুনি কিছু শোনা যায়নি। শোনা গেল আরো পরে। মেজর ডালিম কর্কশ কণ্ঠে বিকৃত বাংলায় ঘোষণা করলো : 'শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। দেশে সমারিক আইন জারি করা হয়েছে।'

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ৩২নং বাড়িটি প্রথমে ঘিরে ফেলা হয়। গেটের রক্ষীরা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে তাদের থামানো হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল খবর পেয়ে ৩২নং এলে তাকে রাস্তার ওপর গুলি করে হত্যা করা হয়। দোতলায় ততোক্ষণে খবর চলে গেছে। বাড়ির সবাই জেগে উঠে দোতলায় এসেছে। টেলিফোন বেজে উঠলো দু'বার। বঙ্গবন্ধু নিজেও দু'বার টেলিফোন করলেন। বড় ছেলে শেখ কামাল ঘুম ভাঙা চোখ নিয়ে নিচে নেমে এলে তাকেও অফিস ঘরের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

প্রথমেই খুনিদের একটি দল নিচতলার প্রতিটি ঘরে ঢুকে গুলি চালায়, বসার ঘরের আলমারি ও ছবিতে গুলি করে। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লাইব্রেরির বইয়ের আলমারিতে গুলি করে। কার্ল মার্কস ও অনেক বইয়ের ভেতর এখনো গুলির ফুটোর চিহ্ন আছে। বুলেটও বিঁধে আছে, আলমারির ভাঙা কাচও আছে। লাইব্রেরির পাশের কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের, যিনি পাঁচদিন আগে এসেছেন, তাকেও গুলি করে হত্যা করে। এরপর নিচতলায় খাবার ঘরে ঢোকে। রান্নাঘরে ঢোকে। তারা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল, অস্থির তৎপর ছিল। কাজের লোকজনদের কেউ পালালো, কেউ দোতলায় গেল, কেউ ভয়ে মাটিতে বসে কাঁদতে লাগলো।

ঘাতকদের একজন দোতলায় ওঠা সিঁড়ির প্রথম ধাপ পেরিয়ে দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধু লুঙ্গির উপর সাদা পাঞ্জাবি চাপিয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন—বললেন, 'কি ব্যাপার' এতো গুলি কেন? কি হয়েছে? তোমাদের অফিসার কোথায়?' নির্দেশ হয়তো ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখামাত্র গুলি করার। কিন্তু সে করতে পারলো না। অস্ত্র তুলেই নামিয়ে নিল। ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি তাকে কি আচ্ছন্ন করেছিল? বললো, 'স্যার, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'কেন? কোথায় যেতে হবে?' হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে আরেকজন অস্ত্র তুললো, তারপর একটানা গুলি, গুলি শুধু গুলিই। বঙ্গবন্ধু পড়ে গেলেন লম্বা হয়ে সিঁড়িতেই। বেগম মুজিব চলে এসেছিলেন তাঁর পেছন পেছন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে ভেতরে যেতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের ছেলে আবদুলও সেদিন বুলেটবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়, আহত অবস্থাতেই সে ঘাতকদের দেখে, তাদের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শোনে। ঘাতকরা চলে গেলে সে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বের হয়ে যায়। আবদুল এখনো সে স্মৃতি মনে করে শিউরে ওঠে। এরপর খুনিরা বঙ্গবন্ধুর লাশ টপকে ভেতরে ঢুকে শোবার ঘরে দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাকুল বেগম মুজিবকে গুলি করে হত্যা করে। বাথরুম থেকে টেনে বের করে এনে বাকি সবাইকে গুলি করে। নিচতলায় রাসেলকে কাজের লোকরা আগেই নিয়ে গিয়েছিল। রাসেল কাঁদছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিল, 'মার কাছে যাব। আমি মার কাছে যাব।' সৈন্যরা তাকে সবক'টি লাশের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে মায়ের কাছে এনে গুলি করে হত্যা করে।

কারফিউ জারি থাকায় সেদিন পথঘাট ছিল জনশূন্য। খবরের কাগজ ছাপা হলেও বিক্রি হয়নি। বাজার বসেনি। দোকানপাট খোলেনি। অফিস-আদালতও হয়নি। বড় রাস্তাগুলোতে সেনা জিপ, ট্যাঙ্ক ও ট্রাক, কিছু সরকারি

গাড়ি চলাচল করেছে। সৈন্যদের প্রহরায় রেডিওর সামনে ট্যাঙ্কটা অনেকদিন ছিল। সকাল ৬টায় রেডিও থেকে বারবার মেজর ডালিম ঘোষণা করছিল যে, 'শেখ মুজিব খুন হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক আইন জারি হয়েছে।' সামরিক আইনের বিধিনিষেধ প্রচার হচ্ছিল। আর কাজী নজরুল ইসলামের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' গানটির যন্ত্র সঙ্গীত বাজানো হচ্ছিল। খবরে জানা গেল, খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছে। সন্ধ্যায়ও টিভিতে একই খবর। সামরিক আইনের বিধিনিষেধ জারি ও প্রচার করা হয়। সঙ্গীত বাজানো হয়। সেদিন বিদেশী বেতারের খবরে এ সংবাদটি প্রধান ছিল। সন্ধ্যায় বিবিসি এ সংবাদ প্রচার করে। তবে ভোয়া ভোর ৬টায় প্রথম সংবাদটি প্রচার করতে সমর্থ হয়। এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের খবর পূর্ণাঙ্গ না দিতে পারলেও সে মুহূর্তে বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুর কথা উদাত্তভাবে প্রচার করছিল।

ঢাকায় বিকালের মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল যে, বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা এবং রোজী, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ও কর্নেল জামিল ৩২ নম্বরে নিহত হয়েছেন। মিন্টু রোডে কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত তাঁর এক কন্যা বেবী, এক পুত্র আরিফ, নাতি বাবু ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারা হয়। শোকবাণী দিয়েছিল। বাড়ির কয়েকজন কাজের লোক ও পুলিশকেও ঘাতকরা হত্যা করে। তাঁর স্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সেজ বোন আমেনা বেগম ও মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হন। তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়। ধানমণ্ডিতে শেখ মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ঢুকে গুলি করে মারা হয়। তার দুই শিশুপুত্র খাটের তলায় লুকিয়ে রক্ষা পায়। বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ সেদিন ৩২ নম্বরে ছিল। তবে তা সৈন্যদের কঠোর পাহারায়। অন্য বাড়ির লাশগুলো এনে এ বাড়ির লাশগুলোর সাথে একত্রে রাখা হয়। রাতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় লাশ কিভাবে দাফন করা হবে। অনেক রাতে গোসল ও জানাজা ছাড়া সব বনানীতে দাফন করা হয়। টুঙ্গিপাড়ার ওসিকে খবর পাঠানো হয় পরদিন লাশ যাবে সুতরাং কবর যেন খনন করা থাকে।

রাতে বঙ্গবন্ধুর লাশ বরফ দিয়ে ৩২ নম্বরে রাখা হয়। সারারাত দুশ্চিন্তা নিয়ে কঠোর সতর্কতার সাথে তা পাহারায় রাখে একদল সৈন্য। লে. কর্নেল আবদুল হামিদকে দায়িত্ব দেয়া হয় হেলিকপ্টারে করে লাশ টুঙ্গিপাড়া নিয়ে দ্রুত দাফন করে কবর পাহারায় রেখে চলে আসার জন্য। সকালে লাশ বহনের জন্য একটা বাক্স এনে তাতে আবার বরফ দিয়ে সম্পূর্ণ লাশ মুড়ে

নিয়ে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়। শনিবার দিনও ঢাকা শহর ছিল থমথমে। সকালেই টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি নুরুল আলম চৌধুরী সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মসজিদের ইমাম মৌলভী আবদুল হালিমের কাছে খবর দিলেন লাশ আসছে। সুতরাং কবর যেন খুঁড়ে রাখা হয়। ইমাম সাহেব আগের দিন দুপুরেই এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে শোকাহত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেওছিলেন তাকে শেষ সাক্ষাতের সময় যে, 'আমার জানাজা আপনাকেই পড়াতে হবে।'

বাড়ির সামনে বঙ্গবন্ধুর স্নেহময় পিতা-মাতার মাজারে সাদা মার্বেল সেট বসানোর কাজ করছিল মিস্ত্রীরা। বঙ্গবন্ধুই এ পাথর সেট করানোর কাজ করাচ্ছিলেন। এ পাথর তিনি নিজে পছন্দ করে কিনে পাঠান। ইমাম সাহেব মিস্ত্রী আলী আসগর মিয়ার সাহায্যে দুটি কবর খনন করে রাখলেন বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের জন্য। ১২টা বেজে গেলে তিনি ঘরে গিয়ে গোসল সেরে নামাজ পড়ে এলেন।

বেলা দেড়টায় একটা হেলিকপ্টার এলো। বাড়ির কাছে থানার পাশে মাঠে নামলো। প্যাকিং করে বরফ ঢাকা লাশ বহনের খাট নামানো হলো। লে. কর্নেল হামিদের নেতৃত্বে মোট ১২ জন সৈন্য কফিন বয়ে আনলো। চারদিকে খুব কড়া নিরাপত্তার পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। পুরো টুঙ্গিপাড়ায় কারফিউ জারি ছিল। জনগণকে একেবারে আসতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই মামা শ্বশুর শেখ মনসুরুল হক ও শেখ মনজুরুল হক কফিন বুঝে নিলেন। বাড়ির লোকজন আগেই সরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মেজ চাচী ও ছোট চাচী লাশ দেখার অনুমতি পেলেন। লাশ থেকে বরফ সরানো হলো, বরফ গলা পানির সাথে রক্তও গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে। দুই চাচীর কান্নায় শোকের কোনো সীমা ছিল না। একটা ময়লা সাদা মার্কিন চাদরে লাশটা ঢাকা ছিল। বরফে তা ভিজে যায়। বঙ্গবন্ধুর পরনে ছিল সাদা গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ও সাদাকালো চেক লুঙ্গি। পাঞ্জাবির পকেটে চশমাটা ছিল, সারা শরীর রক্তাক্ত।

লে. কর্নেল হামিদ ইমাম সাহেবকে দ্রুত লাশ দাফনের ব্যবস্থা করতে বলল। লাশ দেখার পর ইমাম সাহেব বললেন, দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। কর্নেল হামিদ বললেন, কেন? ইমাম সাহেব : শরীয়ত অনুযায়ী গোসল করাতে ও জানাজা পড়াতে সময় লাগবে। কর্নেল হামিদ এসব ছাড়াই করা যায় কি না বলতেই ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, একজন মুসলমানের লাশ গোসল ছাড়াই দাফন করা যায়, যদি সে শহীদ হয়। হামিদ তখন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'আপনি দাফন করবেন কি-না?' 'না, পারব না। যদি লিখে দিন যে শহীদ

করে এনেছেন তাহলে পারি।' ইমাম সাহেবের বুকজুড়ে যে শোকাহত কান্না, তা তাকে শক্তিশালী করেছিল।

: না, সেটা লিখতে পারব না। ঠিক আছে গোসল করান, তবে দেরি করাতে পারবেন না। কর্নেল খুব টেনশনে ছিলেন। সৈন্য ও পুলিশদের বারবার সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। ঘনঘন ঘড়ি দেখতে থাকেন। সেই ১২ জন সৈন্য নিহত বঙ্গবন্ধুর লাশ ঘিরেই থাকলো।

৫৭০ সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুর যথারীতি গোসল করানো হলো। রেডক্রস থেকে চার ইঞ্চি পাড়ের সাদা শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে ফেলে কাফনের কাপড় বানানো হলো। একটা গুলি মাথার পেছনে করা হয়েছিল। নয়টা গুলি চক্রাকারে বুকের নিচে করা হয়। পায়ের রগ কাটা ছিল, একটা আঙ্গুলেও গুলি লাগে। খুব দ্রুত দাফন হয়ে গেল। উপরে মাটি চাপা দিয়ে, উঠানের বরই গাছের কাঁটাভরা ডাল চাপানো মাটিতে ফেলে যায়।

কবর পাহারার ব্যবস্থা হলো। বাড়িতে দরজা-জানালা সিল করে রেখে সৈন্য পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর পিতাকে দেখাশোনা করার জন্য নির্মল নামের যে ছেলেটি সার্বক্ষণিক সাথী ছিল, সেই নির্মল শুধু কান্নাকাটি করে পড়ে রইলো। বঙ্গবন্ধুর কোনো আত্মীয় বা গ্রামের লোকজনদের কবরের কাছে যেতে দেয়া হতো না।

বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুলনায় ছিলেন। বুধবার দিন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর টেলিফোনে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে চলে এসো।' শেখ নাসেরের স্ত্রী তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে খবর শুনেই তিনি খুলনায় মায়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তাদের খুলনার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নেয়া হচ্ছে খবর পেয়ে তিনিও সেখানে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু আশেপাশে সব থানা-পুলিশ সতর্ক ছিল। কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় বাড়ির পেছনের খাল থেকেই তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন। এ সময় মোল্লার হাটের থানার ওসি তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছিলেন। ১৬ আগস্ট তিনি লঞ্চে কাটান, কারফিউ থাকার কোথাও নামতে পারেননি। খুলনার বাড়ি ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সিল করা থাকে। এপ্রিল মাসে তিনি টুঙ্গিপাড়া গিয়ে মাজারের চারপাশ বাঁশের ভাঙা খুঁটি দেখতে পান। এটা বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাইয়ের ছেলে নজীব অনেক কষ্টে দিয়ে যায়। আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিজে সব পরিষ্কার করান এবং ইটের গাঁথুনি দেন। তাঁর চারপাশে বাঁশের বেড়া দেন। তারপর থেকে এখনো তিনি প্রতিবছর এই দিনে টুঙ্গিপাড়া নিজে

গিয়ে দেখাশোনা করেন। মিলাদ পড়ান। বঙ্গবন্ধুকে মাটি চাপা দিয়ে বরই গাছের ডাল চাপা দিয়ে রাখা হয় প্রায় দু'বছর। চারপাশে তিন চটার বাঁশের খুঁটি পোতা ছিল। মাথার কাছে একটা হাসনাহেনা, পায়ের কাছে একটা নারকেল গাছ– এই ছিল একমাত্র নিঃসঙ্গ অথচ প্রাণময় সঙ্গী। আর মধুমতি নদী থেকে আসা ভেজা বাতাস। পাশেই বাবা-মার মাজার। সামনের রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে যে কেউ কবরের দিকে একবার থমকে তাকিয়ে না দাঁড়িয়ে যেন দোয়া দরুদ পড়তো মনে মনে। মাজারে ফুলও দেখা যেত। এতো কঠিন পাহারায় কিভাবে ফুল আসতো, কোথা থেকে ঐসব ফুল আসতো কেউ বলতে পারে না। কোটালীপাড়ার সিকান্দর পাগলা নামে এক ব্যক্তি প্রায় দু'বছর পর্যন্ত এখানে ছিল। সে-ই চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুর কথা বলতো।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা পশ্চিম জার্মানি ছিলেন। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ আলী পশ্চিম জার্মানিতে একটি উচ্চতর বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করতে যান। ৩০ জুলাই শেখ হাসিনা ছেলেমেয়ে ও ছোট বোন রেহেনাকে সাথে নিয়ে যান। যাওয়ার সময় পিতার নিরাপত্তার কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। সেবার তাঁর মা বিমানবন্দরে বিদায় জানানোর সময় তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলেন। তাঁকে ওভাবে কাঁদতে দেখে হাসিনা এক সময় বলেছিলেন, 'তুমি এভাবে কাঁদলে আমি যেতে পারব না মা।' সে কান্নার স্মৃতি আজও শেখ হাসিনা ও রেহেনাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। রেহানা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বোনের সাথে বেড়াতে যান। ঐ সময় তারা ব্রাসেলসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট রেহানা বঙ্গবন্ধুর সাথে টেলিফোনে কথা বলে ঢাকায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি জানান যে, রাষ্ট্রদূতকে খবর দেবেন সব ব্যবস্থা নিতে। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খবর জার্মান রাষ্ট্রদূত তাদের জানান। দূতাবাস থেকে ড. ওয়াজেদকে অবিলম্বে বন ফিরতে বলা হয়। বনে ফিরে শেখ হাসিনাকে জানান হলো, বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। শেখ হাসিনা শুধু বললেন, 'কেউই কি বেঁচে নেই?' পরে তারা ভারতে আসার সময় প্লেনে কাগজ পড়ে জানতে পারেন কে, কিভাবে নিহত হয়েছেন। বাবা-মা-ভাইহারা দু'বোন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। সান্ত্বনা দেয়ারও কেউ ছিল না।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন সকালে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে যাওয়ার সময় সংবাদটা পান এবং হতবাক হয়ে যান। তারা শোকাচ্ছন্ন ছিলেন সারাদিন। ঢাকা রেডিও থেকে তখন শুধু

বঙ্গবন্ধুবিরোধী কথা ও গান প্রচার করা হতো। খান আতাউর রহমান ঐসব গানের রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। দেশজুড়ে সব মানুষকে শুধু কাজ করার কথা বলা হতো। গুলিস্তান, বঙ্গভবন প্রভৃতি বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাংক ও সৈন্যরা দীর্ঘদিন মোতায়েন ছিল। কারফিউ জারি হতো সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সারা শহর থাকতো স্তব্ধ-শোকাহত বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা একে একে বিনষ্ট হতে থাকলো।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনি মোশতাক কুখ্যাত অধ্যাদেশ জারি করলো যে, এই হত্যার কোনো বিচার হবে না। অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হলো গেজেটে :

1. Short titlte- This ordinance may be called the Indemnity Ordinance 1975.
2. Restrictions on the taking of any legal or other proceedings against persons in respect of certain acts and things-(1) notwithatanding anything contained in any law, including law relating to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in, before or by any court, including the Supreme Court and Court Martial, or other authority against any person, including a person who is or has, at anytime, been subjceted to any law relating to any defence service, for or on account of or in respect of act, matter or things done or step taken by such person in connection with, necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the Morning of the 15th August, 1975.
3. For the purposes of this section or certificate by the President, or a person authorised by him on this behalf, that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in certificate in connection with or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards the change of

the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the 15th August 1975 shall be sufficint evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with or in preparation of execution of any plan for, or as necessary step towards, the charge of the Government and the Proclamation of Martial Law that morning.

জেনারেল জিয়া এই অধ্যাদেশ সংবিধানের ৪র্থ তফসিল ৩ক অনুচ্ছেদে সংযোজিত করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার যাতে না হয় সে ব্যবস্থা মজবুত করে। এ এক কলঙ্কিত ইতিহাস।

১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে কর্নেল ওসমানী সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী মনোনীত হলে সেবারই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করেন।

১৯৮১ সালের ১৭ মে এক বর্ষণমুখর দুপুরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে লাখ লাখ ছাত্র-জনতা-কর্মী-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা জানান। শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর কন্যা সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার রাজনীতি হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের আন্দোলন চলবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সেনা শাসনের বিরুদ্ধে, যার দুঃশাসনের ফলে দেশে আজ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নস্যাৎ হয়েছে।'

১৮ মে টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি পুলিশরা ছেড়ে চলে যায়। সৈন্যরা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯ মে শেখ হাসিনা লঞ্চযোগে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া যান। সেদিন তার ১০৩ ডিগ্রি জ্বর ছিল। বাবা-মা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজন হারানো শোক ছিল আবেগাপ্লুত গভীরতাপূর্ণ। পরবর্তীতে সেই শোক তাকে শক্তিশালী ও সাহসী করেছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারী ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত সদম্ভে শাসন করেছে। খন্দকার মোশতাক ছিল রাষ্ট্রপতি। একটি মন্ত্রিসভা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর খবর দেশ-বিদেশে মিথ্যা ও বিকৃতভাবে প্রচারিত হয়েছে। দু'দিন আগে যেসব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর গুণগান গেয়েছে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের

বিদেশে দূতাবাসের বিভিন্ন চাকরিতে পুনর্বাসিত করে। খন্দকার মোশতাকের মামলা চলে। রাজনীতি বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্নেল ফারুক, রশীদ পরে বিদেশে পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে তাদের হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা মেনে নিতে পারেনি, তারাই সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। জে. এরশাদ বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছে। জে. জিয়ার মতো তিনিও মুক্তিযুদ্ধের রাজাকার-দালালদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে মন্ত্রী বানিয়ে।

জানা যায়, নিহত হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময় কেটেছে সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততায়। গণভবনে যাওয়া, ফাইলপত্র দেখা ও সাক্ষাৎকার সবই ছিল। এরপরও তিনি গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন। ৯ আগস্ট আবু সাইদ চৌধুরী মন্ত্রীপদে শপথ গ্রহণ করেন, ১০ আগস্ট চালনা বন্দর-শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের আদেশে স্বাক্ষর দান, বন্দর-শ্রমিকদের মজুরি ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। ১১ আগস্ট ছোট বোনের মেয়ের বিয়েতে যান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বেলগ্রেড সফরে গেলে। তাঁর হাতে প্রেসিডেন্ট টিটোকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। ১৪ আগস্ট কোরীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত মি. সোয়ান চু-এর সাথে সাক্ষাৎকারের ছবিটি সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ সরকারি ছবি। ১৫ আগস্ট সকাল ৯টায় তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। ১৬ আগস্ট বাকশাল জেলা নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত হলেও বিলি করা হয়নি। ১৭ আগস্ট ৪ পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশিত হয়। এদিন বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয় 'পূর্ণ মর্যাদায় পরলোকগত রাষ্ট্রপতির দাফন সম্পন্ন' (হেডিং)। খবরটি হলো 'পরলোকগত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ গতকাল (শনিবার) বিমানে করিয়া তাহার নিজ গ্রামে টুঙ্গিপাড়ায় (ফরিদপুর) লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের পারিবারিক গোরস্থানে পূর্ণ মর্যাদায় দাফন করা হয়। একজন সরকারি মুখপাত্রের বরাত দিয়া বাসস এ খবর জানিয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক)।'

বুধবার ৪ চৈত্র ১৩২৬, ১৭ মার্চ ১৯২০ বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন দেশ ও জনগণের কথা ভেবেছেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেছেন, জেল-জুলুম ছিল চিরসঙ্গী, 'রাষ্ট্রদ্রোহী; ঘোষণা নিয়ে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে নির্জন কারাগারে

বন্দি রেখে গোপন বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাঁকে জাতির জনকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করা এবং শহীদ পরিবার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাসহ কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করে যখন তিনি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই ঘাতকদের দল তাঁকে নির্মমভাবে গত্যা করলো। শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিব বাঙালি-বাংলাদেশে ও বঙ্গবন্ধু এক অভিন্ন সত্য, শুদ্ধতম মানবিক।

টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির সামনের আঙিনায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকের খোলা আকাশের নিচে প্রায় ২০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বঙ্গবন্ধুর মাজার। লম্বায় ১০ ফুট, পাশে ৫ ফুট, ১৯৮৮ সালের ১৫ আগস্টের পর শেখ হাসিনা মাজারটি সংস্কার করান। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাপ-মার কবর বাঁধানোর জন্য যে সাদা পাথর কিনেছিলেন, তাঁর বেশ কিছু টুকরো বেঁচে যায়। শেখ হাসিনা সেগুলো দিয়েই মাজারে পাথর সেট করিয়ে নেন। কবরের উপরের অংশে খোলা সবুজ ঘন ঘাস ও ফুল গাছ লাগানো আছে। মাজারের চারপাশে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সারারাত বিদ্যুতের বাতি জ্বলে একটা। ফুল-ফল গাছ লাগানো আছে মাজারের চারদিকে। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের মাজার জিয়ারত করতে প্রতিদিন মানুষ আসে। ১৫ আগস্ট হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ আসে। শিরিষ-কদম-নিম-নারিকেল-তাল-তমাল-বকুল গাছের নিভৃত ছায়ায়, সবুজ প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় বঙ্গবন্ধুর মাজার। মধুমতির ভেজা বাতাস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। যে মাটিতে তাঁর জন্ম, যার স্নেহ-মমতা মেখে তিনি বড় হয়েছেন, যে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পরিপুষ্ট করেছে তাঁকে দেশ ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে; সে মাটিতেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ আজ শায়িত, সমাহিত।



মমতাজউদদীন আহমদ

বাংলা, বাঙালি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

দর্শন ও শ্রবণ অযোগ্য স্থূল স্তাবক বাংলাদেশ টেলিভিশনকে অনেকেই কালো তালিকাভুক্ত করেছে। দেখে না বিটিভি, বিপদে পড়েও বিটিভি দেখতে দর্শকের রুচিতে বাধে। যত মিথ্যা আছে, যত মোটা দাগের সরকারি প্রচার আছে, সবই বিনা সংশয়ে, বিনা নীতিজ্ঞানে বিটিভি প্রচার করে চলেছে। সম্প্রতি এই মিথ্যা এবং অযোগ্য ব্যবস্থাটি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস চালু করেছে। শুনলাম, মহাসমারোহে ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়ে গেল। যারা উপস্থিত থাকতে বাধ্য তারা নিশ্চয় ছিল। সরকারপ্রধানের লিখিত ভাষণ বরাবরের মতোই একই ভঙ্গিতে পড়া হয়েছে আর উপস্থিত থাকতে বাধ্য কর্মচারি ও মন্ত্রীবর্গ অতি বিস্ময় নেত্রে তাই গিলে গিলে খেয়েছে।

আরো শুনলাম, এই তথাকথিত বিশ্বপ্রচার অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। যদি তাই সত্যি হয়ে থাকে, তবে তো সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেল। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কারো ব্যক্তিগত খায়েসের জন্য নির্বাচন করা হয়নি। দালাল আর স্তাবকদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত বাজানো অন্যায় বা ভীতির কারণ হতে পারে। কিন্তু এ অনির্বচনীয় জাতীয় সঙ্গীতের সাথে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এবং রক্তের বন্যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। আমার সোনার বাংলা শুনলেই যাদের পেটে ব্যথা হয় এবং হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগে তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় টিক্কা খান-ঝানঝুয়া খানদের সাথে বসে মজা করে খানা-দানা খেয়েছে কিন্তু এ সঙ্গীতের সাথে বাংলার কৃষক-মজুরের সন্তানদের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার যুক্ত হয়ে আছে। আর সেই কৃষক-মজুররা ট্যাক্স ও ভ্যাট দিয়েই সরকারি টেলিভিশন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখছে বা রাখতে বাধ্য

হচ্ছে। বাংলার কৃষক-মজুর-ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে টেলিভিশন কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু এ ভাতা ও বেতনভোগীরা জোট সরকারের অনিচ্ছার সাথে নিজেদের দাসত্ব মিশিয়ে দিয়ে বাংলার জাতীয় সঙ্গীত প্রচারকে স্থগিত করে দিয়েছে। এটা কি তারা সচেতনাভাবেই করেছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকর্তাদের মনস্তুষ্টির জন্য? কেননা পত্রিকাতে (জনকণ্ঠ) বলা হয়েছে যে, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ যে প্রোগ্রাম ফাইনাল করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল সেই প্রোগ্রামে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না। তার পরিবর্তে জিয়াউর রহমানের অতিপ্রিয় 'আমার জীবন বাংলাদেশ, মরণ বাংলাদেশ' গানটির উল্লেখ ছিল, আর তাই চূড়ান্ত হয়েছে। সেজন্য ওয়ার্ল্ড সার্ভিস অনুষ্ঠানে 'মরণ বাংলাদেশ' বাজানো হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতের কোনো এন্ট্রি রাখা হয়নি। বাহ্! বাহ্‌রে বাহ্! তবে তো চূড়ান্ত ঘটনাই ঘটে চলেছে। বিটিভিও তো সরকারি 'ভেতরে ভেতরে' খায়েস প্রতিফলিত করে দিল। এরপর কোনোদিন হয়তো 'পাক সার জমিন সাদবাদ' বাজিয়ে দিয়ে টিক্কাখানদের দোসরদের 'দেলে' জেল্লা জ্বালিয়ে দেবে। এরই নাম বোধ হয় সেই যে সেই 'সাবাস বাংলাদেশ'। আমরা পরম ভাগ্য বলে জানি যে, রুচিতে বাধে বলে স্তাবক বিটিভির কোনো অনুষ্ঠান দেখি না বা শুনি না। এমন কি কোনো কারণে চ্যানেল লাইন বন্ধ থাকলেও বিটিভির অনুষ্ঠান কেউ খুললে সাথে সাথে বাড়ির ছোট-বড় সবাই হা হা করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কেউ দেখবে না বা শুনবে না কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যা ও স্তাবকতা।

হায়রে মুক্তিযুদ্ধ আর এক স্বপ্নময় বাংলার জন্য রক্তপাত—তার আজ কী পরিণতি?

ঠিক আছে, যা চলছে তাই চলুক। আর কতকাল চলবে? সবটারই একটা পরিণতি আছে। হয়তো ভয়াবহ ও দুর্দান্ত এক পরিণতি! মুক্তিযুদ্ধ একবার শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় না। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায় ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে ইয়াহিয়া-ঝানঝুয়াদের তাড়ানো হয়েছে। তাই কিন্তু শেষ নয়। এ দেশ থেকে সব রকম মিথ্যাচার, দুর্নীতি, অসদাচারী এবং লোভ-লালসা ও চরিত্রহীনতারও দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর মুক্তিযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। আর সেই যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুতি চলছে—ব্যথা ও হাহাকারের যন্ত্রণায়। জোট সরকারের হাতে বার বার বাংলার জাতীয় সঙ্গীত এমনভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে কেন? এ সরকার কি তবে সত্যি সত্যি বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রাহ্য করে? অথবা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করার মতো শক্তিও সরকারের নেই। যদিও লোক দেখানো বা লোক ঠকানোভাবে এ সরকারের

কিছু কিছু মন্ত্রী বা বশংবদ কর্মচারী মাঝে মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করে—কিন্তু এদের বগলমে ইট লুকিয়ে আছে। এরা স্বাধীনতার সমুদ্রে পাড়ি দিবে কেমন করে? এদের চারদিকে স্বাধীনতার অকাট্য দুশমনরা 'চাকু-কাঁচি' নিয়ে বসে আছে। একটু এদিক সেদিক করলেই আস্তিনে গুটানো সেই সব অস্ত্র বেরিয়ে আসে। এরা আবার সব রকম নীতি-নৈতিকতা অস্বীকার করে আর একমাত্র মূলধন নেতাকে ঘোষক বলে বারংবার ঘোষণা করে চলেছে। এমনকি কোমলমতি শিক্ষার্থীর চিত্তের মধ্যে অসৎ-মিথ্যাকে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। একটি প্রজন্মকে ধ্বংস করার সমস্ত অপ-আয়োজন করে ফেলেছে জোট সরকার। কার স্বার্থে, কার মুনাফার জন্য এমন পাপকাজে নিয়োজিত হয়েছে জোট সরকার? দেশে এমন একটিও প্রতিষ্ঠান আর নেই, যার মধ্যে অন্যায়, পাপ ও মিথ্যাচার ঢুকিয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রহানি করা হয়নি। সবখানে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর সন্ত্রাসের তাণ্ডব চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন মিথ্যার কলুষ আর অন্যায়ের কালো আখড়ায় পরিণত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিককালের অবস্থা যা হয়েছে তাতে সমস্ত আশা ও স্বপ্নের বিনাশ ঘটেছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা একজন চরিত্রহীন দুর্বৃত্তকে বহিষ্কারের জন্য আন্দোলনে নেমেছে।

টর্নেডোর করালগ্রাস ও হিংস্র থাবায় নেত্রকোনায় আশ্রয়হীন মানুষ দিশেহারা। খাবার নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই, সহায় নেই, সম্বল নেই। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ক্রোধভরা কণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছে, সবকিছু করা হয়েছে, তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয়েছে এমনি রান্না করে খাবারও দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিক কাগজে নির্বিবাদে খবর আসছে, সরকারি ত্রাণ অতি সামান্য। এ যেন সমুদ্রের মতো হাহাকারের মধ্যে এক ফোঁটা চিনির ঢেলা ফেলে সমুদ্রকে শরবত বলে ঘোষণা করা।

সরকারি টেলিভিশন আর বেতারে চলছে যত সব মিথ্যার প্রচার। যেন দেশের কোথাও কোনো দুর্ভোগ ও দুরপনেয় কষ্ট নেই। প্রচারের মিথ্যাচার শুনে দুর্যোগকবলিত মানুষ কি শান্তি পাবে, সান্ত্বনা পাবে? কোথাও কোনোকালে কোনো দেশে কি কেবল মিথ্যার থুতু দিয়ে কঠিন চিড়া বা দুঃসহ কষ্টকে ভিজিয়ে দূর করা যায়? কে পেরেছে এমন করতে? মিথ্যা কি কখনো সত্যের সাথে মুখোমুখি হয়ে বিজয়ী হতে পেরেছে। কই, ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা তো গেল না। এমনকি সেই হতভাগ্য মানুষটির কোনো রকম তথ্যই তো পাওয়া গেল না। এ কেমন সরকার? এ কেমন ব্যবস্থা যে একজন মানুষ সীমাহীন প্রশাসনিক অসাধুতার জন্য

একেবারে গায়েব হয়ে গেল? সাধে কি আর টাইম (এশিয়া) ম্যাগাজিন দেশটাকে 'ডিসগ্রেসপুল' দেশ বলেছে। টাইমের দেশ শব্দটার ক্ষেত্রে আরো সত্য বলা হবে– সরকার শব্দটি বসিয়ে। কোথায় গেল দুটি সোনার দোকানের লুট হয়ে যাওয়া প্রায় চুয়ান্ন কেজি সোনার তদন্ত? কোথায় গেল বাঁশখালিতে এক বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে এগারজন সদস্যকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা? কোথায় গেল বুলেটপ্রুফ গাড়িতে হামলা করে ছাপান্ন লাখ টাকা লুট করার ঘটনার তদন্ত? আরো কত বলব? আরো দু-একটা বলে দিই। অজস্র দুর্বৃত্তির মধ্যে মাত্র দু'টি একটি!

ঐ যে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে 'জাতীয় সঙ্গীত' বাজানো হলো না—কেন হলো না? সে সব সন্ধান করার জন্য তদন্ত কমিটি হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট কোথায় গেল? স্পিকার সাহেব কি দয়া করে সঙ্গীত না বাজানোর জন্য দায়ীর নামটাও জাতিকে জানিয়ে দেয়ার সাহস রাখে না? তিনি যদি এতই ভীতু এবং কাতর, তবে তিনি জাতীয় সংসদের জটিল প্রশ্নের মোকাবিলা করবেন কেমন করে?

এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হলে গভীর রাতে পুলিশকে হানা দেয়ার জন্য অবৈধভাবে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, সেই অবৈধ অনুমতিদানের কাজটি কে করেছে, কেন করেছে?—তদন্ত কমিটি হয়েছে—কিন্তু রিপোর্ট কোথায়? বের কি কোনোদিন হবে না?

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দরোজায় কে লাথি মেরেছে? কে সেই মহাবীর? তার পরিচয় কি পাওয়া যাবে না এবং সে ব্যক্তির লাথিটির কি কোনো বিচার হবে না?

অনিয়ম, অন্যায়, অনাচার কি চলতেই থাকবে? এমন নিরাপদ নির্দ্বন্দ্ব অনাচার অবাধে যে সরকার চলতে দেয়—সে সরকারের প্রচার মিডিয়াগুলো তো কোনোদিন এসব বিষয়ে একটি বাক্য অথবা শব্দও ব্যবহার করল না? সেই মিডিয়ারই 'বিশ্ব সার্ভিস' চালু হয়েছে। সেই সার্ভিসের সত্যকে কে মেনে নেবে? কার দেশপ্রেমে এমন ঘাটতি হয়েছে যে, দিবারাত্র মিথ্যা শুনবে আর মুখ হা করে তৃপ্তির হাসি হাসবে? বাঙালি এবার হেসেছে। প্রাণখুলে হেসেছে। বহুকাল হলো বাংলার মানুষ নিঃসঙ্কোচে হাসেনি, আনন্দও করেনি। কেন হাসবে? যখন প্রতিটি ঘরে ডাকাতি, চাঁদাবাজি আর অপহরণের অভিশাপের ছায়া ছড়িয়ে আছে, সেখানে অশ্রুভরা চোখ ও হৃদয় জুড়ে কান্নাই জমে থাকে।

তবু এবার পহেলা বৈশাখে বাঙালি হেসেছে। বন্ধ ঘরের সমস্ত অবসন্নতা আর যন্ত্রণার অভিশাপকে কিছুক্ষণের জন্য ঝেড়ে ফেলে বাঙালি ঘরের বাইরে

এসেছিল। এমন মানবসমুদ্র আর দেখা যায়নি। ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন বাঙালি উচ্চমূল্যে পণ্যের পাথরের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঘরের মধ্যেই বন্দি থাকে। এবার সমস্ত বেদনা ও শঙ্কাকে তাড়িয়ে দিয়ে পথে নেমেছিল, পহেলা বৈশাখে।

এবারের পহেলা বৈশাখ এক বিশিষ্ট দিন ছিল। শুভ নববর্ষের এদিনে বাঙালি সাহস ও উল্লাসের সন্ধান পেয়েছে। এ দিন বিবিসি শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম ঘোষিত হয়েছে। এ জরিপ নিরপেক্ষ, এ জরিপ তথাকথিত বেতনভুক্ত স্তাবক কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত নয়। বিবিসি এমনই এক সংস্থা, যার সততা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করা দুরূহ। বাংলাদেশের দুঃসময়ে সৎ এবং সত্য সংবাদ এবং যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য আপামর বাঙালি বার বার বিবিসি শুনেছে আর শুনেছে বিপ্লবী বাংলা বেতারের 'চরমপত্র' ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।

সত্য শোনার এবং দেখার আগ্রহ মানুষের মনে চিরন্তন। সত্যের জন্য কাঙাল সকলে। তবে কিছু মুনাফিক এবং স্বাধীনতার দুশমনদের কথা আলাদা। তাদের শ্রবণযন্ত্রের মধ্যে কুকুরের লেজ ঢুকে বসে আছে। শতবার প্রেম বা পরামর্শেও তাদের কানের লেজ সোজা হবে না। তাদের কাছে ইয়াহিয়ার মতো চরিত্রহীন লম্পট এবং টিক্কাখানের মতো এক নৃশংস হায়েনার আচরণই সত্য। তারাই তাদের আরাধ্য সেনাপতি।

বিবিসি জরিপে বিশজন বাঙালিকে চিরকালের সেরা বাঙালি ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা চলেছে মাসকাল ধরে। এতে যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা চিরকালের ভাস্বর বাঙালি। বাংলাদেশী নয়, তারা বাঙালি। স্বঘোষিত কোনো বাংলাদেশী যদি জরিপে বাঙালি হয়ে গিয়ে তাকে, তবে সে দায়িত্ব নেবে বিবিসির শ্রোতারা। তবে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচন করে অসংখ্য শ্রোতা একটি চিরভাস্বর এবং অবিনশ্বর সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখে দিল।

বিশজন বাঙালি নির্বাচিত হয়েছে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন, এসেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, এসেছেন লালন, এসেছেন শেরে বাংলা, মজলুম নেতা ভাসানী, এসেছেন মহাবীর তিতুমীর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া। আরো হয়তো আসতে পারতেন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আসতে পারতেন সূর্যসেন, প্রীতিলতা, ইলা মিত্র। বিশজনের মধ্যে না এলেও এদের অবদান হয়ে আছে অসামান্য! এরা বাঙালি জাতির অতীততে যেমন উজ্জ্বল করে রেখেছেন, তেমনি ভবিষ্যতের চলার পথ এরাই নির্মাণ করে রেখেছেন। চৈতন্যদেব, মহাকবি আলাওল, সাহিত্যবিশারদ অনেকের নাম এক এক করে মনে পড়ে যায়।

তবে ভালো লেগেছে ভাষা আন্দোলনের চারজন শহীদকেও সেরা বাঙালির তালিকায় আনা। বাঙালির মর্যাদা, বাঙালির মহিমা নতুন করে নতুন প্রজন্মের কাছে আবার জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। একটি জাতির জন্য জরিপ বড় দরকার ছিল। সর্বশেষ উজ্জ্বল সংবাদটি হলো, বাংলার স্বাধীনতার প্রধানতম স্থপতি, স্বাপ্নিক, নির্ভীক এবং বাংলাপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি।

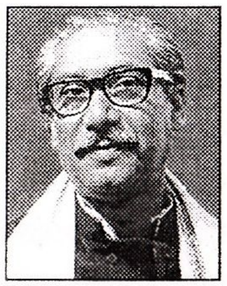
আমরা জানি না, (কেননা দেখি না বা শুনি না) এই বিশজন বাঙালির পরিচয় এবং নাম কি সরকারি স্তাবক বিটিভি প্রচার করেছে? তবে বঙ্গবন্ধুর নামগন্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর কোনো নিদর্শন পর্যন্ত বিটিভিতে রাখা হয়নি। যদি আবার তেমন দিন আসে (নিশ্চয় আসবে) তখন এসব স্তাবকরা কী করবেন? তখন তো বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ছাড়বে। হা হা হা এদের বিষয়ে কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেও ঘৃণা জাগে।

যাকগে, এই যে বিশজন বাঙালি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ওপর জরিপ হয়ে গেল এবং বিশ্বময় একটা মহৎ কাজ হলো, এমন কাজটিকে কি আমাদের হতভাগা দেশের কোনো সরকারি নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা, স্তাবক নেতা অথবা প্রধানমন্ত্রী অথবা মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয় স্বাগত জানিয়ে শুভবাদ জানিয়েছেন? জানি না, আমরা সেসব কিছুই জানি না। তাঁদের তো সংকুচিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাদের তো সমভাবে উল্লসিত হওয়ার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তাঁদের মতামতে বাংলাদেশী বাঙালি হয়েই নির্বাচিত হয়েছে। তবে সংকোচন কেন? বঙ্গবন্ধু সেরা হয়েছেন বলেই কি সংকোচ? আর তো মিথ্যাচার ও বিকৃতির ব্যাভিচার চলবে না। এরপরে।

তারা কি চেয়েছিলেন, টিক্কাখান, ইয়াহিয়া খানের নামও বাঙালি হয়ে নির্বাচিত হবে? তাঁরা কি চেয়েছিলেন গোলাম আযমের নামও বিশজনের মধ্যে আসুক, আরো নাম আসুক মওদুদীর।

কী চেয়েছেন তাঁরা—তা আমরা জানি না, জানতে চাই না? জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমাদের নেই।

আমাদের প্রার্থনা, হাজার বছর ধরে যে জাতি তার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন রচনা করেছে, বাংলার গানে কবিতায় এবং আচরণে সেই অমৃত জাতি বারবার উজ্জ্বল হোক তার মহান মানুষদের নিয়ে।



মযহারুল ইসলাম

মধ্য আগস্টের ক্রন্দন

প্রথম বুলেট যখন তার হৃদয়টিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, হায়রে আমার দেশ, এই কি আমার পাওনা, এই কি আমার পরিণাম? তবু দেশ, তুমি ভালো থেকো। অথবা ভেবেছিলেন আমার হাসিনা কোথায়, তাকে কিছু বলে যেতে পারলাম না। জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাবার বড়ই আদরের ধন। স্বাভাবিকভাবেই তার কথাই হয়তো মনে পড়েছিল, তুমি রইলে, তুমি দ্যাখো মা, দেশটিকে হেফাজত করো। অথবা মনে পড়েছিল চারজন জাতীয় নেতার কথা। আমি গেলাম, তোমরা আমার বঙ্গ জননীকে দেখে রাখবা। অথবা সারা দেশের মানুষকে তাঁর মনে পড়েছিল, আমি আর হুকুম দেবার পারলাম না। তোমার যার যেমন ক্ষমতা তাই দিয়ে দেশকে হেফাজত করবা। অথবা মনে পড়েছিল তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর কথা, কৈশোর থেকে যার সঙ্গে ঘর করেছিলেন, অস্ফুট স্বরে বলেছিল, এক গ্লাস পানি দেবা? তোমার হাতের পানি বড় মিষ্টি। বুকটাকে শীতল করে দ্যায়। এই সময় তোমার হাতের পানির বড়োই প্রয়োজন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অথবা কিছুই বলতে পারেননি। শুধু বলেছিল, হে আল্লাহ, আমার দেশকে দেখে রেখো।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর মুহূর্তের ভাবনাগুলোকে সামনে রেখে এই কথাগুলোই মনে হওয়া স্বাভাবিক। তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই কথাগুলো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কে একজন সেই মানুষ, যিনি সারা জীবন দেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। তাঁর মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ছিল না তা বলি না। তিনিও দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। তার কোনো বিরূপ

সমালোচনা করা যাবে না, এমন নয়। তবুও এ কথাটি সত্য যে, তাঁর দেশপ্রেম ছিল হৃদয় বৃত্তির সবচেয়ে বড় ধন। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর কোনো খাদ ছিল না। এই নিখাদ দেশপ্রেমই তাঁকে উদ্দীপিত করছিল। দেশের প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে অশান্ত করে তুলেছিল। দেশপ্রেমের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে তিনি এক অপার চাঞ্চল্যে সর্বদাই ছটফট করতেন। তাঁর বুকে অসীম জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করেছিল। তাই তিনি কঠোর আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

একদা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শাসননীতির যাঁতাকলে বাংলাদেশের মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছিল। একদিন এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় সোনার ফসল ফলত। কবির উক্তি—গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধান'—নিছক কল্পনা নয়। তখন গৃহস্থের ঘরে ঘরে বসত আনন্দ-উৎসবের মেলা। পায়েস, পুলি, পিঠা আর নবান্নের সপ্তব্যাঞ্জনের, আউল-বাউলের গানে বাংলার গ্রামগুলোর শক্তি বিনষ্ট হলো। অতঃপর ব্রিটিশ সরকারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান' নামে একটি দেশের জন্ম হলেও জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালি জাতির ভাগ্যে স্বাধীনতার আস্বাদ পূর্ণতা পেল না। এ দেশের সঞ্চিত সম্পদ চলে যেতে শুরু করল পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে বাঙালির কণ্ঠস্বর চিরতরে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা এ দেশ গড়েছিল তারা হলো বঞ্চিত। রোগে, শোকে, বন্যায়, অনাহারে বাংলার লাখ লাখ মানুষের অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার চারদিকে শুরু হলো আবার হাহাকার, ক্রন্দন ও হা-হুতাশ। এ অবস্থা থেকে বাঙালি জাতিকে উদ্ধার করার জন্য সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে নিরলসভাবে সংগ্রাম করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর হিংসা নয়, অহিংস জ্যোতিই আমরা বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। তাঁর এ সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারি সরকারের বিরুদ্ধে। মোটকথা জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর এ সংগ্রাম। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর আকৈশোর। পাকিস্তান সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থন ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় আমরা পাই তার ছাত্রজীবন থেকে। ইংরেজদের শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কৈশোর-উত্তীর্ণ

জীবনের এ মহান প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু এর চাইতেও একটা বিরাট পরিকল্পনা সেদিন থেকেই তাঁর অন্তরে লুকিয়ে ছিল—তা হলো বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত করা। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে নিজের ভেতর এ পরিকল্পনা লালন করেছেন এবং তার বাস্তবায়নে তিনি তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে নিত্যসঙ্গী হিসেবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। কোনোদিন তিনি সংগ্রাম ও সংগ্রামী চেতনা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। শেখ মুজিবের জীবনকাহিনী সংগ্রামময় ইতিহাসসমৃদ্ধ। সেই ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—প্রথম অধ্যায় (১৯২০ থেকে ১৯৪৭) জন্ম থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮) পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ভাষা আন্দোলনে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকাসহ প্রথম সামরিক শাসন জারির পূর্বকাল পর্যন্ত। তৃতীয় অধ্যায় (১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫) প্রথম সামরিক শাসন জারির পর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত। চতুর্থ অধ্যায় (১৯৬৫-১৯৬৮) পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তীকাল ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণঅভ্যুত্থান, দ্বিতীয় সামরিক শাসন। পঞ্চম অধ্যায় (১৯৬৯-১৯৭১) ইয়াহিয়ার শাসনামল, নির্বাচন, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন। ষষ্ঠ অধ্যায় (১৯৭২-১৯৭৫) সংবিধান, সংবিধানুসারে নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ, আরেক সংগ্রাম অর্থাৎ দেশগড়ার সংগ্রাম, শাহাদৎবরণ।

অবশ্য শেখ মুজিবের ঘটনাবহুল জীবনের কোনো অধ্যায়ই একটি থেকে আরেকটি কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন নয়। তার সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায় তিনি যে উদ্দেশ্যে ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেই অচরিতার্থ বাসনাই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে সাফল্যের সিংহদ্বারে উপস্থিত করেছিল। সেই বাসনা যে পূর্ণতা লাভ করেছিল, এ কথা বলতে পারিনে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রধানতম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু মানবতাবাদের যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনবাসনার অঙ্গীভূত ছিল, যে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বেল ছিল তা আজো বাস্তাবায়িত হয়নি। অবশ্য ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করে রেখে গিয়েছেন, তাঁর আদর্শ ও আজীবনের সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা তা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি আজ নেই। তাঁর মানবতাবাদী ও সমাজবাদী আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে এই

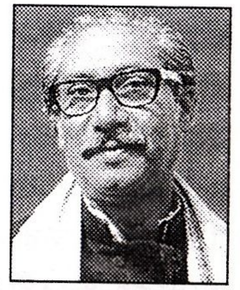
বাংলাদেশ সগৌরবে মাথা উঁচু করে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে নিতে পারবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিব এক মহানায়ক। মুজিবের পরবর্তী আমলে সচেতন প্রয়াস হয়েছে মুজিবকে বর্জন করে অথবা তাঁর অবদানকে তুচ্ছ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের। বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকে। এমন কি কোনো সরকারি করুণাপুষ্ট পত্রিকায় স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টাও বার বার হয়েছে। জিয়াউর রহমানের আমলে এমন চেষ্টাও হয়েছে যে, জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার প্রধান স্থপতি, মুজিব কেউ নন। কিন্তু আমরা জানি, এসব প্রয়াসকে যথার্থ ইতিহাস বড়ই নির্মম হাতে বর্জন করবে। সরকারি নির্দেশে যারা আইয়ুবের উজ্জ্বল দশক সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছিল, অতি উৎসাহে তা ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস-এর বহুল প্রচারকল্পে বঙ্গানুবাদ করেছিল, তারা বর্জিত বুদ্ধিজীবী। মুজিবকে ছোট করার এবং ইতিহাসে তাঁর যে স্থান নির্ণীত হওয়া উচিত তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চলছে পঁচাত্তরের পর থেকে, এমনকি এখনও চলছে। ভবিষ্যতেও হয়তোবা চলবে, কিন্তু সত্যানুসন্ধনী গবেষক, বিজ্ঞাননিষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং তথ্যানুরাগী রাজনীতিবিজ্ঞানীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে মুজিবের কৃতিত্ব ও গৌরব কোনোদিন ম্লান হতে পারে না। তাঁর নেতৃত্বের বিরূপ সমালোচনা নিশ্চয়ই করা যায়, তাঁর ভুল ও ভ্রান্তিও যে চোখে পড়ার নয় তাও নয়, কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকদ্বয়ে এবং সত্তর দশকের পনেরোটি বছর, পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী মূলত এই একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বার বার আবর্তিত হয়েছে। মুজিবই ছিলেন ঘটনার প্রধান নিষিদ্ধ নিয়ন্ত্রক, কাহিনী-নাট্যের প্রধান কুশীলব। তাঁকে হত্যার পর তাঁর নামোচ্চরণ নিষিদ্ধ ছিল, তাঁকে বর্জনের সচেতন নানাবিধ আয়োজন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, বঙ্গবভন থেকে তাঁর ছবি অপসারিত হয়েছিল—সবই কিন্তু মুজিব ভীতি থেকেই উৎসারিত। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরেও তিনিই যেন পরবর্তী সরকারগুলোকে পরিচালিত করেছেন। কবরে শুয়ে থেকে তিনিই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁকে অস্বীকার করা এক হাস্যকর নেতিবাচকতার মধ্যে তিনি এসেছেন, তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি ভীতির মধ্যেই তিনি যেন সোচ্চর হয়েছেন। অনেক বিদেশী তথ্যনিষ্ঠ লেখক তাই বলেছেন, 'মুজিব রুরস ফ্রম দ্য গ্রেড।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদিনে হঠাৎ মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো নয়। তিনি তিলে

তিলে নিজেকে এ সংগ্রামের জন্য নিবেদন করেছেন, কঠোর ত্যাগের মধ্য দিয়ে আপোসহীন মনোভাব নিয়ে প্রথমে বাংলাদেশের স্বাধিকারের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যখন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম ফলপ্রসূ হওয়ার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ বলে নিশ্চিত জেনেছেন, তখনই সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সার্থক রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। তিনি জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই ভারতের অন্য একটি রূপ আমরা দেখতে পেতাম। ভারতের ইতিহাসের গায়ে তাই একটি করুণ ক্রন্দন লেগে আছে। একই কথা বাংলাদেশের সম্পর্কেও বলা যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জীবিত থাকলে আজ বাংলাদেশের রূপ কী দাঁড়াত, আশপাশের দেশগুলোর মধ্যে দেশটির অবস্থান যে কোথায় হতো? এসব কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আমাদের ইতিহাসেও মধ্য আগস্টের একটি ক্রন্দন লেগে আছে। এই ক্রন্দন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না।



ড. মসিউর রহমান

বঙ্গবন্ধু ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠন

মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। ধ্বংসের চিহ্ন দেশের সর্বক্ষেত্রে প্রকট। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব হাতে নেন। অগণিত মানুষের হাতে তখন যুদ্ধাস্ত্র। অস্ত্রমুক্ত না হলে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পুলিশ, আধাসামরিক ও সামরিক বাহিনী এমন সুসংহত নয় যে, শক্তি প্রয়োগ করে অস্ত্র উদ্ধার করা যায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যই এ উদ্যোগ সফল হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রশাসন পুনর্বাসিত না হলে অন্য কোনো কর্মপরিকল্পনাও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। প্রশাসন থেকে উগ্র পাকিস্তানপন্থীদের বাদ দেয়া ছিল অত্যাবশ্যক। তাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার সমস্যা ছিল। বঙ্গবন্ধু অতি সতর্কতার সঙ্গে উগ্র পাকিস্তানপন্থীদের চিহ্নিত করেন, যাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রশাসন কর্মকর্তাদের মনে যাতে আতংক সৃষ্টি না হয়, বঙ্গবন্ধু সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। পাকিস্তান থেকে খেতাবপ্রাপ্ত অনেক কর্মকর্তা সাময়িকভাবে চাকরিচ্যুত হন; বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে পুনর্বহাল করেন।

দেশের অবকাঠামো, বিশেষত পরিবহন অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। জাহাজ ডোবার ফলে বন্দর হয়ে পড়ে অচল। বন্দর সচল না হলে আমদানি-রফতানি সম্ভব নয়; বিশেষ করে খাদ্য আমদানি ছিল জরুরি। শত্রুবাহিনী পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে; ফলে অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছিল ব্যাপক। পরিবহন অবকাঠামো পুনঃস্থাপন ও পুনর্নির্মাণ জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।

শিল্প-কারখানা অচল হয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য হারিয়েছিল গতি। কলকারখানার মালিক ও পরিচালনা পদে নিযুক্ত ছিল অবাঙালি। তারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আইনের মাধ্যমে এসব কলকারখানার কর্তৃত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং পরিচালক পদে বাঙালিদের নিয়োগ দেয়। পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় অনেক বাঙালি এসব কলকারখানার আংশিক মালিকানা পেয়েছিল। তারা ছিল নিদ্রাবিভোর অংশীদার; পুঁজি বিনিয়োগ ও পরিচালনার ভার ন্যূনতম, মুনাফার অংশভোগী প্রধানত। তারা আশা করেছিল, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা পাবে। তাদের আশা পূরণ হয়নি। আশাহত সম্পদলিপ্সু অনেকেই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলায়।

বাংলাদেশের জাতীয়করণ নীতির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—পাকিস্তানি মালিকদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্র গ্রহণ করে। একই খাতে ছিটেফোঁটা বাঙালি মালিকানাও সরকার নেয়—অর্থাৎ খাতগুলো জাতীয়করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে ভারত ও শ্রীলংকায় অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। গুনার মিরডাল (অর্থনীতিতে নোবেলপ্রাপ্ত, সুইডেনের মন্ত্রী) এরূপ জাতীয়করণ প্রক্রিয়াকে 'রেডিক্যাল ন্যাশনালিজম' নামে অভিহিত করেছেন। গুনার মিরডালের ব্যাখ্যা বাংলাদেশের বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সদস্য পদ গ্রহণ করা ছিল আবশ্যক। বিশ্বব্যাংক বেশকিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের দাবি স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান যে ঋণ নিয়েছিল, তা পরিশোধের আংশিক দায়ভার বাংলাদেশ সরকার যেন গ্রহণ করে। অবিভক্ত পাকিস্তানের জাতীয় আয় ও রফতানির বড় অংশ আসত বাংলাদেশ থেকে, তাই বাংলাদেশ অর্ধেকের বেশি ঋণ পরিশোধের দায়ভার নেবে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে তাদের প্রস্তাব জানায়। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট কারগিল বঙ্গবন্ধুকেও ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর উত্তর এবং সমস্যা সমাধান উভয় ছিল অভিনব ও সাহসী কিন্তু যুক্তিসঙ্গত। ভাইস প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন : 'যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং তার ডাকে বাঙালি প্রাণ দিয়েছে, বিশ্বব্যাংক সেই অবিচারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। তার ডাকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়েছে, বাঙালি ত্যাগ স্বীকার করেছে; প্রয়োজন হলে তিনি আবার তাদের ত্যাগের জন্য আহ্বান জানাবেন। জাতি ত্যাগ স্বীকার করবে, কিন্তু অন্যায়কে মানবে না।'

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিষয়টি পরীক্ষা করতে বলেন। সমাধান সম্পর্কে তার পরামর্শ ছিল নিম্নরূপ :

ঋণের অর্থে যে প্রকল্প তৈরি হয়েছে, তা যদি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত হয়, বাংলাদেশ সেই ঋণের অপরিশোধিত অংশের দায়িত্ব নিতে পারে। এ মূলনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বিষয়টি মীমাংসা করে।

আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট কারগিলের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উত্তর পাঠান। বিশ্বব্যাংক বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য মেনে নিয়েছে এবং তার আলোকে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ডলার ভাসমান ঘোষণা করেন, ফলে বিশ্বমুদ্রা বাজারেও অস্থিরতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সংস্থা ইউএসএআইডির সঙ্গে সহায়তার জন্য আলোচনা শুরু করে। ওই সময় বাংলাদেশ কিউবায় যৎসামান্য পাট বিক্রয়ের জন্য চুক্তি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের আইনানুসারে কিউবা কিংবা অন্য কোনো কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়ার অনুপযুক্ত। চুক্তির শেষ পর্যায়ে এবং স্বাক্ষরের জন্য যখন প্রস্তুত, তখন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ জানায়, কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি হওয়ার ফলে তারা সহায়তা দিতে অপারগ।

দুই বছর বা তার অধিক সময় আলোচনার পর আকস্মিক তারা এ তথ্য দেয়। বাংলাদেশ থেকে জানতে চাইলে তাদের উত্তর—যুক্তরাষ্ট্রের আইনে অনেক জটিল শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে; তারা এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তাদের বক্তব্য যুক্তিহীন। কংগ্রেসকে শর্ত শিথিলের জন্য অনুরোধ করার ক্ষমতা আইনে প্রেসিডেন্টকে দেয়া ছিল। তিনি বাংলাদেশের জন্য এ ক্ষমতা ব্যবহার করেননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বৈরী মনোভাব দেখিয়েছিল, প্রেসিডেন্টের আচরণ ছিল তারই পরম্পরা।

১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অন্য দেশকে দেয়ার উদ্বৃত্ত খাদ্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিতে অস্বীকার করলে বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ে। ভারত সরকারকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে জরুরি ভিত্তিতে কিছু

পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়। ভারতেও এ সময় খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল।

রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য চুক্তি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিশ্বখাদ্য পরিস্থিতি ও আর্থ-রাজনীতি (পলিটিক্যাল ইকোনমি) বোঝার জন্য তথ্যটি উল্লেখ করা হলো।

দেশের সংবিধান রচনার জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নেন। অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান অধ্যাদেশ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে নির্বাচিত সব জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন পর্ষদ (কনস্টিটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) গঠন করা হয়। সংবিধান প্রণয়ন চূড়ান্ত হয়ে গেলে এ পরিষদ অবলুপ্ত হয় এবং নতুন সংবিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতি অল্প দেশেই যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর এত কম সময়ে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিচক্ষণতার সঙ্গে সংবিধান রচনায় পাকিস্তানের বিভ্রান্তি পরিহার করেন। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান উপমহাদেশ বিভক্তির আগে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংবিধান প্রণয়ন পর্ষদ গঠন করে। তারা একাধারে সংসদ ও সংবিধান রচনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম সংবিধান রচনায় তারা প্রায় ১০ বছর কাটিয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধান অনুমোদনের ২ বছরের মধ্যে (১৯৫৮) সংবিধান ও গণতন্ত্র নস্যাৎ করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি ওই সময় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদে আইনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

পাকিস্তানে সংবিধান রচনার দীর্ঘসূত্রতার বড় কারণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক চরিত্র। উপমহাদেশ বিভক্তির (১৯৪৭) আগে একমাত্র বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের সব প্রদেশে ক্ষমতায় ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী দল। বিভক্তির পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেন ভারত থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতারা; বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের ঘোষণা করা হয় দেশের শত্রু। ফলে তৈরি হয় কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা, সমর্থকবিহীন নেতৃত্ব। ক্ষমতায় থাকতে হলে নির্বাচন পরিহার তাদের জন্য আবশ্যিক। ক্রমেই এ সরকারের বৈধতা ক্ষয় পায়। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ছিল বৈধতাহীন সরকারকে নর্দমায় নিক্ষেপ করা।

যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে জাতিকে একতাবদ্ধ করা একটি বড় দায়িত্ব। স্বাধীনতার আগে অবৈধ দখলদার সরকারের সঙ্গে অনেকেই সম্পৃক্ত থাকে। তাদের অনেকে অবৈধ দখলদারদের সমর্থক, কেউ অবস্থার চাপে এবং সাধারণ জীবনযাপনের প্রয়োজনে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে না। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের পতনের পর এ সমস্যাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—যারা উগ্র সমর্থক ও অপরাধ করেছে তারা শাস্তি পাবে; যারা অবস্থার শিকার হয়ে জীবন কাটিয়েছে তারা ক্ষমার যোগ্য; অনুশোচনার আন্তরিকতাও বিচার করা হয়। বঙ্গবন্ধু তার নেতৃত্বের ক্ষমতাবলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সফল হন। পূর্ব ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পরবর্তীকালে যে পদক্ষেপ নেয়, বঙ্গবন্ধু তার অঘোষিত পথিকৃৎ।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে কারিশমা বাদ দিয়ে তার অবদান ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না। ম্যাক্স বিবর সরকারের বৈধতার তিনটি উৎস চিহ্নিত করেছেন—ইতিহাসের ধারানুসারে বংশপরম্পরায় ক্ষমতা হস্তান্তর/গ্রহণ; যুক্তি ও আইনভিত্তিক রাষ্ট্র; এবং কারিশমা। কারিশমা শব্দের আভিধানিক অর্থ অলৌকিকত্ব। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞান বা রাজনীতি আলোচনায় অলৌকিকত্ব প্রয়োগ হয় না, সম্মোহনী ক্ষমতা বা অসাধারণ কিছু করার ক্ষমতা বোঝায়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনে নেতৃত্ব এবং পরিবর্তিত সরকারের বৈধতার উৎস নেতৃত্বের কারিশমা।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আলোচনায় কারিশমা শব্দের ব্যবহার কমে গেছে, তার স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে রূপান্তরকারী নেতৃত্ব (ট্রান্সফরমেটিভ লিডারশিপ) অর্থাৎ সমাজ ও অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য যে নেতৃত্ব আবশ্যক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ক্ষমতার উত্তরাধিকারী এবং রূপান্তরকারী নেতা।



মহীউদ্দীন খান আলমগীর

বঙ্গবন্ধুর কথা

আবার বছর ঘুরে এল ১৭ মার্চ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। জাতীয় স্বতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার, আর সবচেয়ে বড় কথা মানুষ হিসেবে জন্মের অহংকারের অঙ্কুর বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেই এ দেশের সোঁদা মাটিতে পাতা মেলেছে।

এ কথাটির সাথে মনে আসছে ২০০২-এর ১৭ মার্চে আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে ছিলাম। খালেদার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্তরীণ রাজবন্দী। বঙ্গবন্ধু যে সেলে বছরের পর বছর অন্তরীণ ছিলেন, যে বকুল গাছটি তাঁর সেলের উত্তর দিকের চত্বরে তিনি লাগিয়েছিলেন নিজ হাতে, তার উত্তরে পুরনো ২০ নং সেল আমার অন্তরীণস্থল। গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরতান্ত্রিকতার অত্যাচার আর জুলুমের শিকার হয়ে সেই সেলে থাকার স্মৃতি লিখেছিলাম 'জেলের কথা, মানুষের কথা'য় এমন ভাবে : "সকালের প্রথম আলোয়, প্রদোষের উদাস আবহে, আর বিকালের মিষ্টি রোদের সস্নেহ পরশে চত্বরের দেয়াল ছাড়িয়ে শেফালি আর সফেদা গাছের মাথা ছুয়ে চোখ যেয়ে পড়ত হাত চল্লিশেক দূরে বঙ্গবন্ধুর হাতে লাগানো বকুল গাছের ঘন সবুজ পাতার ডালগুলোয়। বঙ্গবন্ধু এই জেলে আমার এই পুরনো বিশ নং সেলের দক্ষিণে একটি আলাদা সেল-ঘরে থাকতেন। এই সেল ঘরে এখন কেউ থাকে না। থাকতে রাজি হন না। তিনি যেখানে শুয়ে গেছেন, বসে ছিলেন, সেখানে কোন রাজবন্দী বা বিচারাধীন কয়েদি শুতে বা বসতে রাজি হন না। তার উত্তরে খালি জায়গায় তিনি একটি বকুলের চারা লাগিয়েছিলেন ১৯৬০-এর দশকে। এটি এখন বড় গাছ, বেশ ডালপালা ছড়িয়েছে, ঘন সতেজ সবুজ পাতার সমারোহ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধুর কথা ভাবতাম। আঠার বছর বয়সে তিনি প্রথম জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ এ নাজিমুদ্দিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে ভাষার দাবিতে, আবার নূরুল আমিনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় টানা আড়াই বছর, ১৯৫৮ সাল থেকে আইয়ুবের সামরিক শাসনের সময় প্রায় দেড় বছর, ১৯৬২ সালে ৬ মাস, ১৯৬৬ সাল থেকে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আবার প্রায় ৩ বছর। কখনো মাথা নোয়াননি বাংলার সেই মহানায়ক। তাঁর জীবন, সংগ্রাম, ত্যাগের কথা মনে আসত যখন তখন, মানুষের মুক্তির অবিনাশী পদাবলী হয়ে জেলের দেয়ালঘেরা সকল নীচতা, মলিনতাকে ছাপিয়ে অনুরণিত হতো বার বার। অবচেতন মনেই বলে উঠতাম : "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক স্বাধীনতার" *(মহীউদ্দীন খান আলমগীর, 'জেলের কথা, মানুষের কথা,' পৃষ্ঠা-২৮)।*

বঙ্গবন্ধু আমার কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, ন্যায় আর অধিকার অর্জনের সংগ্রামের বিমূর্ত অভিব্যক্তি, দেশ ও জনগণের প্রতি অবিচল আনুগত্যের অবিনাশী প্রতিফলন, সকল নীচতা ও শঠতা ছাপিয়ে মনুষ্যত্বের জ্বলজ্বলে নাম। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫৬ সালে। তারিখ মনে নেই, ঘটনা অবিস্মরণীয়। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র, ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। মিশরের বিপ্লবী নেতা জামাল আব্দুল নাসের সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। সাথে সাথেই ইঙ্গ-ফরাসি-ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ। ঢাকা কলেজ থেকে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে প্রতিবাদ জানাতে গেলাম সচিবালয়ের দিকে। তারুণ্যের প্রতিবাদের তীব্রতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল আজকের মুক্তাঙ্গনে দাঁড় করানো তৎকালীন ব্রিটিশ তথ্যকেন্দ্র। ফিরে আসার পথে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আজকের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পূর্ব-উত্তরের গেটের কাছে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে। পেছনের ঘটনা আর সামনের করণীয় নিয়ে কথা। হঠাৎ ষণ্ডামার্কা দশ-বারোজন হামলা করল লোহার ডাণ্ডা হাতে। সম্ভবত তখনকার বখে যাওয়া ছাত্রনেতা আখতার আহাদের নেতৃত্বে। ভীত ও হকচকিয়ে লোহার গেটের পেছনে নিরাপত্তা লাভের লক্ষ্যে ঢুকতে নিষ্ফল চেষ্টা করছি। তখন দেখলাম দীর্ঘদেহী একজন, পাজামা-কুর্তার উপরে কালো জহর-কোট-জহরলাল নেহেরু ঐ ধরনের কোট পরতেন বলে তখন তার এই নাম—গায়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন : 'সাহস থাকলে আয়, আমার ছাত্রদের গায়ে হাত দিয়া দেখ, ঢাকায় থাইকবার পারবি না।' থমকে দাঁড়াল গুণ্ডাষণ্ডার দল, খানিক দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে সেই মৈনাকসম দৃঢ়তার

কাছে মাথা নুয়ে পিছিয়ে গেল ভাড়াটে সন্ত্রাস। জানলাম সেই বিশালদেহী সাহসিকতা ও দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো মানুষটিই শেখ মুজিবুর রহমান। সেই থেকে দেখেছি এই এক মহামানবকে—যিনি অন্যায়ের কাছে কোনোদিন মাথা নোয়ায়নি, যাঁকে কেউ কোনোদিন চাপ প্রয়োগ করে তাঁর পথ থেকে চ্যুত করতে সমর্থ হয়নি। ক'দিন আগে, এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল ১৯৭১-এর উত্তাল মার্চে বঙ্গবন্ধুর নিত্যসহচর সহযোগী রাজনীতিক আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের সাথে। তাদেরও কথা : চাপ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে, কোনো কথা বলাতে কেউ কোনোদিন পেরেছে বলে তাদের জানা নেই। ১৯৫০-এর দশকের সেই সময় থেকে যখনি দেখেছি কুটিল হিংসা স্বৈরতন্ত্রের কপট প্রতিরক্ষণে নিঃসহায়ের ওপর অন্যায় ও অবিচার হেনে যাচ্ছে, তখনই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দাঁড়াতে সচেষ্ট হয়েছি তার বিরুদ্ধে, ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের প্রতিকূলে। ভয় পাইনি। এখনো পাই না। সাহসের পেছনে সাহসিকতা, সামনে চলার পথে প্রেরণা শেখ মুজিব।

তার পরের আরেক ঘটনা। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব হিসেবে আমি কর্মরত (তখনকার সিভিল সার্ভিসের অফিসারদিগকে ভিন্নতর পাকিস্তানে ন্যূনতম ৩ বছর কাজ করতে হতো)। বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে পিন্ডি যাচ্ছেন আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে। বাংলার জনতার কাছে তিনি এখন থেকে বঙ্গবন্ধু—ত্যাগ আর মমত্ববোধের বিমোহে বঙ্গবন্ধু বাংলার সকলের অবিচল ও চিরায়ত বন্ধু। ১৯৬৬-র ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী ছয় দফার প্রচণ্ড বিরোধিতায় ফুঁসছে। লাহোর-পাঞ্জাব ভয়ানক উত্তপ্ত। কথাবার্তায় মনে হয়েছে, তারা বাঙালির স্পর্ধা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। লাহোর বিমানবন্দরে প্লেন বদল করে বঙ্গবন্ধুর পিন্ডিতে যাওয়ার পথে বিরতি। সাদা পোশাকধারীদের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে বাংলার সেই মহানায়ককে দেখতে গিয়েছি। সাদা পাজামা-কুর্তার ওপর মুজিবকোট গায়ে (তদ্দিনে জহর কোট শেখ মুজিবের পরনে কালো এবং আরও লম্বা ঝুল নিয়ে মুজিব কোট হয়ে গেছে) স্মিত হাসি নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে। কাছে গেলাম, চিনলেন, অসম্ভব শক্তিশালী তাঁর স্মরণশক্তি। বললাম, 'নেতা এরা এসব মানবে না, ছয় দফায় হবে না—এক দফার কথা বলুন। হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছ, এক দফাই হবে।' জানতে চাইলাম, 'আমাদের কি করণীয়।' বললেন, 'কাজ শিখে দাঁড়িয়ে যাও। দেশ চালাতে দক্ষ লোকের প্রয়োজন আছে।' শুনে

৩৪ ইঞ্চি বুক ৪০ ইঞ্চি হয়ে উঠল যেন। সুনির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্যে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য অর্জনে অটল ও অনড়, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, জনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। সমসাময়িক অন্যান্য নেতার আপেক্ষিকতায় এসব গুণেই ত' তিনি অদ্বিতীয়, অবিসংবাদিত। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সমসাময়িক সমকক্ষতার সাধারণত্ব থেকে অসাধারণত্বে তুলে নিয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ করাচি থেকে বদলি হয়ে ফিরে আসি স্বাধীনতার আর্তিতে উত্তাল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্পন্দিত বাংলাদেশে। করাচি-ঢাকার প্লেন তখন শ্রীলঙ্কার ওপর দিয়ে ঘুরে আসত। কুচক্রী ভুট্টোর প্ররোচনায় ইন্ডিয়ান এয়ার লাইসেন্সের একটি বিমান লাহোরে হাইজ্যাক করে এনে উড়িয়ে দেয়ায় ভারতীয় আকাশ পাকিস্তানি বিমানের জন্য বন্ধ। দেখলাম প্লেন ভর্তি সাদা পোশাকের পাকিস্তানি সৈন্য। অফিসার ১০/১২ জন। তৎকালীন সিন্ধু সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপসচিব ছিলাম আমি। সেই সুবাদে কথা বলতে চেষ্টা করলাম। ওরা মুখ খুললেন না। আসার আগে করাচিতে সিন্ধু সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিব—আমার ঊর্ধ্বতন অফিসার ইসানী বলেছিলেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও। স্টুপিড ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সমাধান আনার লক্ষ্যে লারকানায় শিকার করার উছিলায় ভুট্টোর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। খুনের দরিয়া বইবে তোমাদের ওখানে। এখানে থাকলে নিরাপদে থাকবে। শান্তি ফিরে এলে যেতে পারবে।' দেশের টান, স্বাধীনতার আর্তি। রাজি হইনি। সিপাহী ভর্তি প্লেন দেখে বুঝলাম ইসানী সত্যি কথাই বলেছেন। ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে—বাংলাদেশের অঘোষিত গভর্নমেন্ট হাউজে হাজার লোকের ভিড় এড়িয়ে দেখা করলাম। বললাম, 'ইয়াহিয়ার আলোচনার প্রতিশ্রুতি ভাওতা মাত্র। সামরিক সমাধানের জন্য ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। সিন্ধী অফিসার ইসানী জানিয়েছেন, সে সিদ্ধান্তের কথা, হাজার হাজার সৈন্য আনছে ইয়াহিয়া চক্র আমাদের দমন করার জন্য। আপনি তৈরি হোন—আমাদের যথা প্রয়োজন নির্দেশ দিন।' শুনলেন, আগেও শুনে থাকবেন হয়তোবা, খানিকটা চিন্তিত মনে হলো বিশালদেহী নেতাকে। পাইপ ধরালেন বার কয়েক। তারপর বললেন, 'অনেকটা নিজে নিজে, হয় বাঁচব, না হয় মরব। এ দেশের মানুষকে মুক্তি পেতেই হবে। আমার সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হবে না।' তারপর ৭ মার্চের তাঁর সেই বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা : এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। লাখো জনতায় নিজের অস্তিত্ব

ও বিশ্বাসকে মিলিয়ে দিয়ে সেই সভায় উপস্থিতির প্রত্যক্ষতা নিয়ে শুনলাম আমিও জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, নগর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সকল মানুষের স্বাধীনতার আর্তিতে তাজা রক্তের উন্মাদনা ছড়িয়ে গেল যেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের দেয়া ভাষণ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দেয়া শ্রেষ্ঠ তিন ভাষণের একটি, আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম। আর দুটির একটি লিঙ্কনের গেটিসবার্গের ভাষণ, আর একটি চার্চিলের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রদত্ত নাৎসি আগ্রাসনের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ না করার সাহস জাগানিয়া ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর এই অবিস্মরণীয় ভাষণের একটি অনুপুঙ্খ পাঠ তৈরি করেছেন এ বছর শ্রদ্ধাভাজন শামসুজ্জামান খান। পড়েছেন ২০০৪-এর ৪ মার্চে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত সেমিনারে। শামসুজ্জামানের উপস্থাপনার পর আলোচকদের আলোচনা শেষে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, সবারই হৃদয়ে গাঁথা অনুক্ত কথাটি, যা শামসুজ্জামান খান লিখেননি, আলোচকরা বলেননি : পৃথিবীর আর কোনো নেতার আর কোনো ভাষণও এতবার বাজিয়ে শুনেনি জনগণ। সেই ১৯৭১-এর ৭ মার্চ থেকে প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনোখানে, কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে বেজে আসছে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা সেই অমর আহ্বান। মুক্তি আর স্বাধীনতার পদাবলী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শ্রুত ভাষণ। মুক্তি ও স্বাধীনতার আহ্বানের এই অনবদ্য আবেদন শিলায়িত অবয়বে দেখেছি আমি এক অপ্রত্যাশিত স্থানে—ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে-রাজবন্দীদের অন্তরীণালয়ে। সেই কারাগারে থেকে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার কথাগুলো অনুরণিত হয়েছে আমার অনুভূতিতে এমনিভাবে : 'সেলে ফেরার পথে নতুন বিশ নং সেলের পশ্চিমে বঙ্গবন্ধুর সেই সেলের উত্তরে ছয় দফার স্মরণে স্থাপিত ছটি প্লাটফরম বা পাটাতন দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ডেপুটি জেলার ও মিয়াসাহেব দুজন আমার দাঁড়ানো খুব পছন্দ করলেন না। কিন্তু বাঁধাও দিলেন না। আমি পাটাতনগুলো দেখি। একেকটি পাটাতন দুই ফুট উঁচু স্তম্ভের উপরে লাগানো গোলাকার সাদা রংয়ের কংক্রিটের স্থাপনা। ব্যাস হবে প্রায় ছয় ফুট। সমান আয়তন, সমান উচ্চতায় স্থাপিত। বুঝলাম, এর একেকটি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার একেক দফার প্রতিবিম্ব। ছ'টি দফার সারিবদ্ধ অবস্থান একটির সাথে অন্য দফার লক্ষ্য ও কার্যভিত্তিক সংশ্লিষ্টতা এবং এই অর্থে সম্মিলিতভাবে একার্থকতার দ্যোতনা। ছয় দফার এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও একার্থকতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যক্রমের সংহতি এবং অপরিবর্তনীয়,

অসংশোধনীয় ও অপরিমার্জনীয় লক্ষ্য, বাংলার স্বায়ত্তশাসনের শেষক্রমে স্বাধীনতাকে প্রতিফলিত করেছে। ছ'টি পাটাতনের পশ্চিমে প্রায় ২৫ ফুট উঁচু দুটি লাল ইটের ১২ ফুট প্রস্থের দেয়াল। দুই দেয়ালের মাঝখানে প্রায় দেড় ফুট ফাঁকা। আমার কাছে লাল ইটের এই দুই গাঁথুনি ছয় দফার মূল লক্ষ্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির দ্যোতক বলে মনে হলো। তেমনি মনে হলো, দুই গাঁথুনির মাঝে এই অবকাশ স্বাধীনতা ও মুক্তির বলে অবারিত পৃথিবীর পথে জাতির এগিয়ে যাওয়ার অমিত পরিধির নিশানা' *(দ্রষ্টব্য, 'জেলের কথা, মানুষের কথা,' মহীউদ্দীন খান আলমগীর, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৫)।*

সমকালীন রাজনৈতিক নীচতার চাপে জর্জরিত অথচ মুক্তির প্রত্যাশা আর অনুশীলনে আগুয়ান রাজবন্দীদের জন্য সামনে চলার পথের দিক-দর্শন হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার এই শিলায়িত দ্যোতনা সকলকে দেশ গড়ার অবিনাশী স্বপ্ন দেখায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিকলপরা মানবতা কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে সুশীল সৃজনশীলতার পথে এগুবেই।

সেই উত্তাল মার্চের কথা বলি। ৭ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে বাংলাদেশ, চলছে সর্ব পর্যায়ের অসহযোগ। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পালনীয় কর্তব্যাবলীর সাথে আর্থিক ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী প্রায় প্রতিদিনই আসছে, প্রকাশিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নামে। খসড়া তৈরিতে সহযোগী আমরা ক'জন। শহীদ মিনারের উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ফ্লাটে থাকতেন অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান। পাশের আরেক ফ্লাটে থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা। প্রায় সন্ধ্যায় ড. আনিসের ফ্লাটে একসাথে হতাম আমরা ক'জন। আসতেন অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শিদ। অন্যদের মধ্যে মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের সকলের স্যার, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। অসহযোগ সফল করার লক্ষ্যে আর্থিক ক্ষেত্র অনুসরণীয় নির্দেশাবলীর খসড়া তৈরি হতো, আলোচনা হতো প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিচ্ছন্ন অনুলিপি তৈরির পর ড. খান সারওয়ার মুর্শিদ তা পৌঁছে দিতেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের কাছে, তিনি পৌঁছে দিতেন বঙ্গবন্ধুর হাতে। পরদিন দেখতে পেতাম তাঁর অনুমোদিত ও সংশোধিত অবয়ব খবরের কাগজে। জানতাম তার বাইরে গোপনীয় বার্তা পৌঁছে গেছে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে। মনে পড়ে, অসহযোগ কালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংকের ঢাকাস্থ কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজ, টাকার স্টক ও স্থানান্তর যথা প্রয়োজন নির্দিষ্টকরণের জন্য

ডাকা হয়েছিল তখনকার অর্থ বিভাগের উপসচিব মনোয়ারুল ইসলামকে। অশেষ মেধাসম্পন্ন অফিসার, জীবনে কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন অর্থনীতিতে আমার শিক্ষক। হাসি মুখে কি কাজটি কি প্রক্রিয়ায় করা ফলপ্রসূ হবে বলেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর কাছে যথা পথে যেয়ে অনুমোদিত হয়ে ফিরে এল সেই নির্দেশের খসড়া। সেই সন্ধ্যায় অনেক ভিড় এড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা আবার ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে, এখনকার বঙ্গবন্ধু ভবনে। আমরা কি কাজ করছি জানিয়ে অসহযোগের সহযোগী বলে আবারও পরিচয় করিয়ে দিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। বঙ্গবন্ধু বললেন, তাজউদ্দিন আহমদের সামনে আমার পিঠে হাত রেখে, 'আমি এদের চিনি, কাজ করে যাও এমনিভাবে, তৈরি হয়ে থাক, দরকার হবে আমার।' ইতিহাসের মহানায়কের সান্নিধ্যের সন্তোষে আর কাজ করার চেষ্টার এই স্বীকৃতিতে ভরে উঠল সারা মন। আমি বাংলার গান গাই, বাংলার জয় চাই সারা জীবন, কথাগুলো গুণ গুণ করে উঠে সারা মন ভরিয়ে দিল যেন। হৃদয়স্পর্শী, সারা শরীর কাঁপানো মুক্তির স্বপ্ন দেখানো সেই গান, সেই সুর, সেই প্রাণ-মাতানো জীবন-স্পন্দিত সরোদ-মৃদঙ্গের অর্কেস্ট্রার মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধু।

তারপর ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন স্বাধীন বাংলায়। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ চারদিকে। সম্পদের অপ্রতুলতা দাবিয়ে দেয়নি আমাদের চেষ্টার নিরবধিতা। আমি তখন অর্থ-মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন)। সেই সুবাদে আর্থিক সংশ্লেষ সম্বলিত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় সকল সভায় উপস্থিত থাকি। আজকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণাগার সুগন্ধা তখন গণভবন—প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কার্যালয়। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে উন্নীত ও বিস্তৃত করতে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভা ডেকেছেন। শুরুতেই বললেন, 'সারা দেশে বিনা বেতনে সকল শিশুকে একই মানের শিক্ষা দিতে হবে, সমাজে সকলের বেড়ে ওঠার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় ১৯,০০০ তখনকার দিনে, জাতীয়করণ করতে হবে। কিভাবে, কত ব্যয়ে, বল তোমরা।' শিক্ষামন্ত্রী ইউসুফ চমকে উঠলেন, এতটা আশা তিনিও করেননি। পারবেন কিনা ভাবলেন হয়ত। বললেন, 'জেলা বোর্ড থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের রেকর্ডপত্তর এনে এখন থেকে এগুলোকে সরকার থেকে প্রশাসিত করা কঠিন কাজ, সময় লাগবে, তিন বছরে পর্যায়ক্রমে করলে সুষ্ঠুতর হবে।' অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন থমকে গেলেন যেন। চারদিকে অর্থের টানাটানি, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিশাল চাপ রয়েছে। কল-কারখানা সব চালু

হয়নি। কৃষি পুনর্বাসনে বিরাট উদ্যোগ প্রয়োজন। কর আদায় কম। বিদেশী সহায়তার প্রতিশ্রুতি তেমন নেই। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বারে ১০ গুণ অর্থের সমাহার, প্রায় ৪০ কোটি টাকা, এক বছরের বাজেটে সংকুলান করা কঠিন। বললেন, 'এদিক-ওদিক চেয়ে, হয়ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের রক্ষণশীলতার ঐতিহ্য অনুসরণ করে, পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো হবে, পাঁচশালা পরিকল্পনার আওতায় কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করা সুবিধাজনক হবে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর বেতের গদিবিহীন চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, পাইপটি হাতে নিয়ে তাঁর টেবিলের পেছনে পায়চারী করলেন মিনিট তিনেক। তারপর বললেন, 'দেশের সকল মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ না দিলে সমসমাজ গড়া যাবে না, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চড়িয়ে দেয়া যাবে না, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে না। স্বাধীন দেশে এ যদি আমরা না বুঝি, না করি তাহলে কি জন্য এই স্বাধীনতা? তাজউদ্দীন, ইউসুফ—আর তোমরা সরকারি অফিসাররা শোন—কাল থেকে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হবে, শিক্ষকদের বেতন সরকার দেবে, ছাত্রদের বেতন লাগবে না, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার বানাবে। শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষাকে, সাক্ষরতাকে নাগরিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে সবখানে। এ আমাদের, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের দায়িত্ব তোমাদের। আর দেরি না করে তাই করো। কাল যেন জাতীয়করণের প্রজ্ঞাপন ইস্যু হয়।' সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করায় তার দৃঢ়তা ও সামাজিক সমতার প্রতি আনুগত্যবোধ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ বঙ্গবন্ধুর এই কথার অনুরণন করে পুরো গণভবনময় ছড়িয়ে গেল। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়কৃত হলো, তাঁর প্রতীতি অনুযায়ী সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসেবে সারা দেশে একই মানের সর্বজনীন ও বেতনবিহীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃতকরণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রন্থিত হলো। বঙ্গবন্ধু ছাড়া ঐ সময়ে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ ধরনের সাহসিক সিদ্ধান্ত অন্য কেউ দিতে পারতেন না। দেশের সকল শিশুর সমভাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনার স্বপ্নে অনাবিল হাসির দ্যোতক হিসেবে তাই ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস—হাজার ফুল ফোটানোর ব্রতে সকলের শপথ নেয়ার মহালগ্ন।

সেই বছরের আরেক ঘটনা। পুরনো গণভবনের দোতলায় ১৯৭২-৭৩ সালের প্রাক-বাজেট আলোচনা। বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করছেন। অন্যান্যের

মধ্যে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, যোগাযোগমন্ত্রী জেনারেল ওসমানী উপস্থিত। বাজেটের এক প্রস্তাবনায় সিলেট ও চট্টগ্রাম এলাকায় চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এক বা দু'চোয়ানী দেশী মদের ওপর শুল্ক রেয়াত প্রদান। যুক্তি—যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ ব্যবস্থায় চা বাগানের কুলি-কামিনরা কাজের শেষে সস্তায় নেশা করার সুযোগ পায়, অধিকারের চেতনায় 'বিপথে' না যেয়ে উদয়াস্ত কাজ, কেবল কাজের মাধ্যমে রপ্তানি বাড়ায়, মালিকের আয় উপরে তোলে, মালিক নতুনতর খাতে আরও লাভের খোঁজে বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। বঙ্গবন্ধু নীরবে শুনলেন, পাইপটি নাড়াচড়া করলেন বার দুয়েক, তারপর বললেন, 'কুলি-কামিনদের অচেতন রেখে মানুষ হিসেবে অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবা কেন? এর জন্যই কি স্বাধীন হয়েছি আমরা?' তাঁর প্রশ্নটি এখনও উত্তরবিহীনভাবে আমাদের বিবেককে দংশন করে যাচ্ছে বলেই তা জানি।

সেই গণভবনের আরেক ঘটনা। ১৯৭২ সালের মে মাসের কোনো এক সন্ধ্যায় কি এক কাজে, সম্ভবত অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট বক্তৃতার খসড়া দেখাতে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুকে। সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী নিয়ে গেলেন দোতলায় বঙ্গবন্ধুর অফিস কামরায়। সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই ইশারা করে বসতে বললেন আমাদের দুজনকে কোনার সোফায়। তাঁর টেবিলের পাশে তৎকালীন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান। ছোট কামরা, শুনতে পেলাম গোয়েন্দা সংস্থার মৌখিক প্রতিবেদন। মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরোধিতা করছেন, ঢাকা ও টাঙ্গাইলে জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছেন, জাসদের নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দেখা করছেন, তাদের সরকারবিরোধী কাজে মওলানা উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছেন। এখন তিনি সন্তোষে। ওখানে চীনপন্থীরাও নাকি তাঁর পাশে সমবেত। এ প্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে বিবেচনীয়। বঙ্গবন্ধু শুনলেন, পাইপে টান দিলেন দু'একবার। সংস্থার প্রধান নির্দেশ নেয়ার জন্য তাকিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি। বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েক মিনিট নীরব থেকে সচিব রফিকউল্লাহর দিকে চাইলেন। বললেন, 'রফিক, জাফলং থেকে সবচেয়ে ভালো কমলা আন এক ঝুড়ি। আমার সালাম দিয়ে পৌঁছে দাও ভাসানী সাহেবের কাছে। কমলা খেতে ভারী ভালোবাসেন তিনি। আর ও, ভুলে যেও না কমলার সাথে সন্দেশ আর দইও যেন যায় টাঙ্গাইল থেকে। অনেক দিন দেখা নাই তাঁর সাথে।' ভাসানী ও তাঁর সহযোগীদের অন্তরীণ করার প্রস্তাব নিয়ে প্রতিবেদনকারী গোয়েন্দা সংস্থা

প্রধান অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে। কি প্রস্তাব আর কি নির্দেশ। রাজনৈতিক মতবিরোধ, এমনকি বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের মঙ্গলের সূত্রে তখনকার প্রধান রাজনীতিবিদরা যে গাঁথা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ যে এ পথে সার্বিক সফলতার সূচক, সে সূত্রটি বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করলেন তাঁর আচরণে। কি পরিচ্ছন্ন সহনশীলতা ও সম্মানবোধ সারা জীবন ভরে দেখিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিপরীতে নানা কল্পকাহিনী দিয়ে বানানো 'শাবাশ বাংলাদেশ'-এর রূপকার এক সময়ের রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরী গত ১১ মার্চ মহাখালীর রেলপথ ধরে বিএনপির কর্মীদের ইট-পাথর থেকে প্রাণ বাঁচানোর আশায় ছোঁচা দৌড়ানো দেখে দুঃখ পেলাম, জাতি হিসেবে অপমানিত বোধ করলাম। সাথে সাথে মনে এল তিনি ও তাঁর এককালীন সাগরেদরা অন্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রাগাঢ় সম্মানবোধ ও সহনশীলতার প্রতিফলক এসব ঘটনার বিষয়ে তেমন কিছু হয়ত জানেন না। কিংবা সত্যিই তারা জ্ঞান-গুনাগহার। দু'দিন পর কাগজে দেখলাম, আইনবিদ রোকনউদ্দীন মাহমুদ 'শাবাশ বাংলাদেশ'-এর শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ করার ডাক দিয়েছেন তাকে।

যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিরোধিতা করেছেন, তাঁর ভূমিকার সমকক্ষ করে ডনজুয়ানসম ব্যক্তি বিশেষকে তুলে ধরার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছেন—তারা কারা? আবার ১৯৭২ সালে ফিরে যাই। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী অসুস্থ হয়ে সেই সময়কার স্নাতকোত্তর হাসপাতালের মূলভবনের ২১০ নং কেবিনে আছেন। কোনো এক বিকেলে ৪টার দিকে বঙ্গবন্ধু তাঁকে দেখতে গেলেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী আমার মামা, সেই সুবাদে আমিও উপস্থিত। বঙ্গবন্ধু মিনিট দশেক মামার সাথে কথা বললেন, ডাক্তারদের কাছ থেকে অসুখের খোঁজ নিলেন, তারপর বেরিয়ে এলেন। দরজা পার হতেই লম্বাদেহী এক লোক, ধূসর রং হাফ-সাফারি পরনে, পায়ে কাবুলি জুতো, বঙ্গবন্ধুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন; কালি লাগান চকচকে কালো পাম্প জুতোয় ঠোঁট রেখে শব্দ করে চুমো খেলেন। 'আরে কর কি কর কি' বলে বঙ্গবন্ধু তাকে দু'হাত দিয়ে টেনে তুললেন, দেখলাম দু'গালে এবং কাপালে জুতোর কালি লেগে আছে সেই সাফারি সতেজ লম্বাদেহীর। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কি হয়েছে তোমার, এত কষ্ট কিসের, চিন্তা কেন? কাল ১০টায় এস, দেখা করো গণভবনে।' লোকটির নাম জানলাম। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এক জবরদস্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। ইয়াহিয়ার সামরিক আইন প্রশাসনের প্রক্রিয়ায় বাঙালির উপর বেশ জুলুম করে পাকিস্তানি প্রভূদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ছিলেন। লোকটিকে

পুনর্বাসিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেক্টর কর্পোরেশনের প্রধান হিসেবে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় উঠিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে জেনারেল জিয়ার মন্ত্রিসভায় ভোল পাল্টিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে যে কত ক্ষতির কারণ হয়েছিলেন, তা তখন বলতে বলতে বার বার পানি চেয়ে খেয়ে নেমক হালাল গোলাম হিসেবে নিজ নাম জারি করতে কোশেশ করেছেন হরহামেশা। মুখে মাখা বঙ্গবন্ধুর জুতোর কালিকে সৌভাগ্যের তিলক হিসেবে ব্যবহার করে রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে চেহারাকে অধিকতর মোবারক মণ্ডিত করার অভিপ্রায়ে বঙ্গবন্ধুর কথা ভুলে গেলেন কে সেই লোক? প্রিয়ভাজন আলমগীর কুমকুমের সভাপতিত্বে গত ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠানে কাহিনীটি বলার পর অন্যান্যের মধ্যে জানতে চাইলেন পাশে বসা ফাল্গুনি হামিদ। সবাইকে নয়, চুপিসারে তাকে বললাম। খুব একটা আশ্চর্য হলেন না বলে মনে হলো। লোকটি এখনও মারা যাননি। অকৃতজ্ঞতা আর মোনাফেকীর কালিমা নিয়ে আরও কতিপয়ের সাথে একজনও জীবিত আছেন বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট এই বাংলাদেশে। এদেরই এই কৃতঘ্ন পাতকী ভূমিকা পারবে কি বঙ্গবন্ধুর অবদান ম্লান করতে? পারবে না। কেন পারবে না? বলি তাহলে সে কথা।

১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারি। আমি তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিব। বিকেলে ফোন পেলাম রীতা আর মনির। যত কাজই থাকুক সন্ধ্যায় আপাকে নিয়ে ক্লিনিক হয়ে যাবেন। তাদের একজন চোখের ডাক্তার আর একজন দৃষ্টি নান্দনিক। শেখ সেলিমের পরিচিত। ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় শেখ সেলিমসহ বেশ কয়েকজনকে ১৯৭৫-এর পৈশাচিক হত্যার নারকীয়তা থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন মনি। গেলাম। তাদের একজন ২৪/২৫ বছরের তাদেরই এক সহকারীকে ডাকলেন। নাম ভুলে গেছি কিংবা বলার প্রয়োজন নেই। সহকারী এলেন তার মাকে নিয়ে। বিধবার বেশ, মলিন চেহারা, ক্লেশক্রান্ত জীবনের ভার বয়ে যাওয়ার প্রতিচ্ছবি। হোগলা দিয়ে সযত্নে মোড়ানো ৫ ফুট লম্বা ২ ফুট পাশবিশিষ্ট কি যেন কিছু তাদের হাতে। নিঃশব্দে খুললেন হোগলার পর নকশী কাঁথার আবরণ। তার নিচে খবরের কাগজের আচ্ছাদন। খুললেন তাও। অবাক হয়ে দেখলাম, বঙ্গবন্ধুর এক জ্বলজ্বলে পুরো প্রতিকৃতি। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো। বললেন, ১৯৭৫-এর সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর সন্ত্রাস আর লুটের নায়করা তছনছ করেছিল তখনকার সংসদ ভবন। মূলকক্ষের প্রবেশ পথ থেকে, সংসদের দেয়াল থেকে ছুঁড়ে দেয়া বঙ্গবন্ধুর এই প্রতিকৃতি যুবকটির পিতা, স্ত্রীটির স্বামী, সংসদে তখন কর্মরত ছোটখাটো

চাকুরে, সযত্নে তুলে নিয়েছিলেন। সঙ্গোপনে নিয়ে এসেছিলেন তার দেশের বাড়িতে। বহুজন নিতে চেয়েছেন, কিনতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। দেননি। ১৯৯২ তে মারা গেছেন তিনি। যক্ষের ধন হিসেবে আগলে রেখেছেন বঙ্গবন্ধুর এই প্রতিকৃতিটিকে মা আর ছেলে। এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশের হাল ধরেছেন। একুশ বছর ধরে সযত্নে চিত্রকল্পটি রক্ষা করে এখন তাঁর হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। শুনলাম। হাত দিয়ে চোখ মুছলাম অজান্তে। পানি। পানি স্ত্রী সিতারার চোখে, দৃষ্টিনান্দনিক রীতার চোখে, চক্ষু বিশারদ মনি'র চোখে। পানি সেই যুবকের চোখে, সেই মায়ের চোখে, স্থির বিশ্বাসের গভীরতা নিয়ে। সকলের চোখের পানির অস্পষ্টতা ছাড়িয়ে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছেন জীবন্ত হয়ে চিত্রকল্পের বঙ্গবন্ধু। জানা-অজানা, স্বজন, দুর্জন, সবার চোখের পানি, মমতা, শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধে এক হয়ে জীবনের চলার পথের দিকদর্শন চাইছে বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি সকল দৃষ্টির এক হওয়া এক মমতা, শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধ দাবিয়ে রাখতে পারবে কি ইতিহাস বিকৃতির দানবকূল? কোনো দিনই পারবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সযত্নে লালিত বঙ্গবন্ধুর এই চিত্রকর্মটি ওদের সকলকেসহ তুলে দেয়ার সময় তাই ভাবছিলাম। অনুক্ত কথাটি মানুষের মন থেকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রসারণের প্রক্রিয়ায় এমনি ভাবেই হয়ত উক্ত হচ্ছে দেশব্যাপী নিরবধি।

১৯৯৬ সালের শেষ দিকে গিয়েছি টুঙ্গিপাড়ায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে। তখন আমি তাঁর, প্রধানমন্ত্রীর সচিব। বঙ্গবন্ধু তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের পাশে শুয়ে আছেন চিরনিদ্রায়। শিশিরভেজা সকালে পৈতৃক ভিটার দক্ষিণে মাজারের চারদিকে বসানো সীমানাসূচক সাদা মার্বেলখচিত সম্মান-প্রতীকগুলো পরম মমতা আর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে মুছে ধুলোমুক্ত করছেন শেখ হাসিনা। মাজার সীমানার মাঝখানে শ্যামল দূর্বা ঘাসের মমতাময় আবরণ। কয়েকজন, নারী ও পুরুষ, গাঁয়ের ও বাইরের, স্বজন কিংবা অচেনা, যেতে চাইলেন শেখ হাসিনার কাছে, মাজারের পাশে। মানা করলাম। স্বজন হারানোর হাজারও দুঃখের নদী বেয়ে এই সময়কার চিরশায়িত পিতার সান্নিধ্য একান্ত তাঁরই থাক। তিনিই বলুন কথা পিতার সাথে, শুনে যান তাঁর স্নেহময় কথামৃত। জনকের সাথে তাঁর বন্ধন প্রত্যক্ষ, চিরায়ত, অবিনাশী, ঘুম-ভাঙ্গানিয়া। এ বন্ধন ছিঁড়তে কখনো পারবেন না সাফারি শোভিত পাপাচারী কৃতঘ্ন কতিপয়। বাংলাদেশের স্থপতির স্বপ্নের কথাগুলো, দেশ গড়ার উপকরণ হিসেবে ছড়িয়ে থাক সকলের মাঝে, সকল শহর, বন্দর ও গ্রামে। তাঁরই

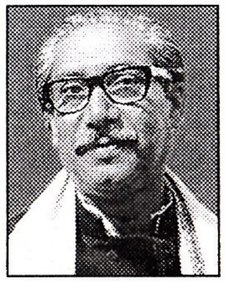
দুহিতা হাসিনার মুখ দিয়ে। তাঁকে, রবার্ট পেইন এর ভাষায় যেতে তো হবে বহু দূর, বহু মাইল, তার ঘুমানোর আগে।

১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করতে আবারও গেলাম টুঙ্গিপাড়া। শেখ হাসিনাকে কখনও বলিনি, অথচ ভেবেছিলাম, কয়েকজন সহযোগীর সাথে—বঙ্গবন্ধুর দেহাবশেষ ঢাকায় সংসদ ভবনের দক্ষিণে, আজকের 'ন্যাম' ইমারতগুলোর স্থানে নিয়ে এসে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করলে কেমন হবে? টুঙ্গিপাড়ায় হাঁটলাম ইতিউতি, কথা বললাম সাধারণ মানুষের সাথে, বঙ্গবন্ধুর দুরন্ত কৈশোরের বাইগার নদীর পাড়ে, আম, নারকেল গাছের ছায়ায়, ফসলের খেতের আলে বসে। বললাম বঙ্গবন্ধুর মাজার ঢাকায় নিয়ে গেলে কেমন হয়? ধর্মে তো কোনো বারণ নেই।

ঢাকায় দেশ-বিদেশের সকলে আসতে পারবেন, দেখতে পারবেন, সালাম জানবেন সবসময়। সকলের কথা একটাই, 'আপনাদের শহরের ষণ্ডারা তাঁকে মাইরছে। আমরা তাঁকে বুকে ধইরা বড় করছি, তিনি আপনাদের তাঁর বুকে যা ছেল সব দেছেন, আপনারা তাঁর লাশও রাইখলেন না। বুকে ধইরা চিরকাল আমরাই তাঁর রাইখব।' তিনি গ্রাম বাংলার বুকে, আম-নারকেল গাছের ছায়ায় মাধবীলতার বিমোহে তাঁর প্রিয় সাধারণ মানুষদের সান্নিধ্যে, যত্নের পরিমণ্ডলে, মায়া মমতার আবরণে শুয়ে আছেন, থাকবেনও। সেখানেই হলো স্মৃতিসৌধ।

জেল থেকে মুক্তির পর ২০০৩-এর মার্চে আবারও গিয়েছি টুঙ্গিপাড়ায়। সেটি বছরের কোনো এক সাধারণ দিন। স্মৃতিসৌধের দক্ষিণ দিক থেকে আসা দলে দলে সাধারণ মানুষের সাথে মাজারের দিকে দিকভ্রান্তের মতো হাঁটছি। এক মা, কোলে তিন বছরের এক শিশু, পা খালি, গা জড়ানো ব্লাউজবিহীন মলিন শাড়ি, যাচ্ছেন মাজারের দিকে। দেখলাম আমার সামনে আরও কয়েকজন তেমনি। মিশে গেলাম খেটে-খাওয়া এই সাধারণ মানুষদের সাথে। বাঁদিকে মোড় নিয়ে মা শিশুকে দেখাচ্ছেন, 'এটা বঙ্গবন্ধুর মসজিদ, এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দোয়া করেন সবাই বঙ্গবন্ধুর জন্য। দেশটা তো তিনি দেছেন আমাদের।' তার অজান্তে চুপিসারে দেখছি, শুনছি। ডান দিকে এসে উন্মুক্ত মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটা না(ই)ট মহল—এখানে তোর বড় বাইবোনেরা দ্যাশের কতা কয়, দ্যাশ কেমনে হলো, দ্যাশ কোথায় যাবে এসব বলে। তুই বড় হলে আসবি কিন্তু এখানে, তোর মার কথা, বাপের কথা, দ্যাশের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা বইলবি।' তারপর হেঁটে এগিয়ে ধাপে ধাপে মাধবীলতা মোড়ানো মাথার উপরের ফোয়ারাটি দেখলেন,

দেখালেন, বললেন, 'খোকা দেখ দেখ কেমন করে আসমান থেকে পানি নাইম্যা আসে, মোদের দ্যাশে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলায়।' তারপর এগিয়ে গেলেন মাজারের পাশে। মাজারের দেয়ালের চিকন আবরণীর ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে চাইলেন বেশ কতক্ষণ, বঙ্গবন্ধু শুয়ে আছেন শ্যামল দুব্বার আবরণে। সম্বিৎ ফিরে এলে বললেন, 'খোকা ঐ খানে বঙ্গবন্ধু শুইয়া আছেন, বঙ্গবন্ধু যিনি আমাদের দেশ দিছেন, স্বাধীন করছেন। খোকা তুই বঙ্গবন্ধুর মতো হবি, হবি না?' পেছন থেকে শুনছি,—দেখছি। শিশুটি মায়ের বাম কাঁখে, ডান হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে, বাম হাত সামনে ছড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ তার অভিব্যক্তি। মনে হলো মা তার অবচেতন মনের দেশ—আর মুষ্টিবদ্ধ হাত তার দেশ গড়ার সচেতন সংকল্প। আজ কোনো বিশেষ দিন নয়। তথাপি শ'য়ে শ'য়ে মানুষ, একাকী কিংবা দলে দলে, নতমুখে শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধের সাথে দেশ গড়ার, বাঁচার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবচেতন মনে ধারণ করে আসছেন বঙ্গবন্ধুর মাজার প্রাঙ্গণে, শুনছেন শাশ্বত বাংলার মাধবীমোড়ান কলতান, এগিয়ে যাচ্ছেন জীবন যুদ্ধের প্রতিফলক-বেদীর পদাবলী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উন্মুক্ত নীলাকাশের নিচে জীবনের নাট্যশালে। ভাবছি এদের আসন, এদের ভাবনা, এদের আকাঙ্ক্ষা রুখবার কে আছে এই বাংলায়, এই পৃথিবীতে? ভাবছি, দেশের লাখো শিশু বঙ্গবন্ধুর মতো হয়ে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বুকে ধরে এগুবে, দেশকে নিজের অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাতের সংকল্পে সচেতন হয়ে, কৃতঘ্ন কতিপয় কোনোদিনই পারবে না দেশের মায়ের সন্তানদেরকে বঙ্গবন্ধুর মতো গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে। মোনাফেকী আর মীরজাফরী থেকে বের হয়ে আসা কৃতঘ্নতা, বাঁধা ব্যত্যয় ও পৈশাচিকতার পাপ ছড়িয়ে পরিচ্ছন্ন উদার অকৃত্রিম নীল আকাশের পবিত্রতার পথে, মানুষ হিসেবে বাঁচার মহাযোগে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের অগণিত নরনারী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে বুকে ধরে, হৃদয়ে সযত্নে লালন করে, দিশারীর মতো সেই বিশালদেহী মহামানবের ডাকে আজীবন সাড়া দিয়ে। বঙ্গবন্ধু, জয় হোক আপনার।



মাহবুব উদ্দিন আহমদ

বঙ্গবন্ধু প্রশাসন ও তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে এক অসাধারণ মহামানব মুজিব বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু, টানা ছাপ্পান্ন বছর এ দেশের অগণিত মানুষের জীবনের টানাপোড়েনের ক্যানভাস। বাঙালি জীবননামক চিত্রপটে তিনিই আক্ষরিক অর্থে সর্বগ্রাসী ছবি—আবার তিনিই সে ছবির প্রধানতম শিল্পীও বটে। এ আলোচনার মধ্যেই রয়েছে মানব মুজিবের মহামানব মুজিবে রূপান্তরের কাহিনী। আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না। আমি মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি। মানুষ হিসেবে যেমন তাঁকে দেখেছি—প্রশাসক হিসেবে তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত নিবিড়-ভুবনে। আমার দেখা পরিধি বহুধাবিস্তৃত ছিল—এ কথা কোনোক্রমেই বলা চলবে না। তবে অবশ্যই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তিতে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সার্বিক বৃত্তের পরিসরে বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হওয়ার পর বহু অস্ত্র রয়ে যায় পাকিস্তানিদের সার্বক্ষণিক সহায়ক এবং জঘন্য হত্যাযজ্ঞের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদরদের হাতে। এহেন হাতিয়ারের সংখ্যা কম তো ছিলই না, এদের ফায়ার পাওয়ার ছিল সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর মতোই। ১৬ ডিসেম্বরের সূর্যস্নাত পবিত্র সকালে আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র অবস্থায় দেশে অবস্থান করছিলাম, তাদের সাথে রাজাকার আল-বদরদের অনেকেই রাতারাতি খোলস পাল্টে মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়, আর এরা এদের হাতিয়ারগুলো লুকিয়ে রাখে ভবিষ্যতে সরকারকে আঘাত করার লক্ষ্যে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ তৎকালীন পাকিস্তান-সৌদি আরব-চীন অক্ষশক্তি আমাদের

হাতে মার খেয়ে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে আমাদের এ মিত্রবাহিনীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেও তারা তাদের পরাজয় মেনে নেয়নি। এমনকি ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী সরকারকে ঘায়েল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নীলনকশা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একই নীল নকশায় যোগ দেয় অতি বিপ্লবী বামপন্থী তথাকথিত সর্বহারা পার্টি, মুসলিম বাংলার প্রবক্তারা, হক, মতিন, তোয়াহা প্রমুখ গ্রুপ। অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম লীগের পাতিবুর্জোয়া বণিক শ্রেণীর হাত থেকে ফসকে নতুন আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের দলীয় ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাক, এটা ঐ পাতি বুর্জোয়ারা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। ফলে পাকিস্তানচ্যুত এ ব্যবসায়ীর দল আওয়ামী লীগ সরকারকে পর্যুদস্ত করার জন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। খাদ্য সংকট, বস্ত্র সংকট, শিক্ষা সংকট, বাসস্থান সংকট, তথা অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এসব তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ডাকাত, চোর, লুটেরা, বদমাশ, কালোবাজারি, চোরাকারবারীদের মদদ দিতে শুরু করে। এর সাথে সর্বশেষে এসে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগ/ছাত্রলীগের একটি উচ্চাভিলাষী মহল। এদের মধ্যে একদল তরুণ নেতৃত্ব—যারা বিদেশে বসে বাংলাদেশের প্রবাসী নেতৃত্বকে নানাভাবে হয়রানি করে সুবিধা করতে পারেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করার মতো ঔদ্ধত্য দেখায়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় মুকুট ধারণকারী এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দশ মাসের মাথায় আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে জাসদ নামীয় এক ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত রাজনৈতিক দল গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধবাদীদের একটা প্লাটফরমে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ দলের মোনাফেকির রাজনীতি, দেশকে রাতারাতি ধনসম্পদে ভাসিয়ে দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আপামর জনসাধারণকে সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতার বিরুদ্ধে তাঁরই এক সময়কার দলভুক্ত বিপথগামী সন্তানেরা যখন কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের হাতে লুকায়িত অস্ত্রসম্ভার দিয়ে রাতারাতি বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে, থানা লুট করে, অস্ত্র লুট, পাটের গুদামে আগুন, সার ফ্যাক্টরিতে স্যাবোটাজ করে ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দেয়ার মতো ন্যক্কারজনক কাজ শুরু করে, তখন একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা তাদের টাকা-পয়সা,

আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং সার্বিক সহযোগিতা দিতে দশগুণ উৎসাহে নেমে পড়ে। এতো কিছু ষড়যন্ত্র করেও কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা কমাতে পারেনি। শত বাধার পাহাড় অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে চলছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাকে ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ দান করতে সংস্থাপক বিভাগকে আদেশ দেন। ঐ দিনই আমি ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করি। বলে রাখা ভালো যে, আমি ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তানের সদস্য হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তানি ব্যুরোক্রেসিতে যোগ দিই। (অনেকের মনে মিথ্যা ধারণা যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর স্নেহভাজন হিসেবে ঢাকার পুলিশ সুপারের মতো মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন)। ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদানের পূর্বে ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে আমি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে সময়ে একদিন সন্ধ্যায় পশলা পশলা বৃষ্টির পর গোধূলি বেলার আলো-আঁধারিতে আমাকে সাথে করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় শহর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন শহরের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য। সেদিন সন্ধ্যা ৬টার সময়ে বর্তমান জিরো পয়েন্টটা ছিল জনমানবহীন। কোনো গাড়িঘোড়া নেই বললেই চলে। শহরের মধ্যে একটা থমথমে অবস্থা। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেশ কি এভাবেই চলবে মাহবুব?' এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর কয়েক মাস ঢাকা শহরে অস্ত্রের ঝনঝনানি এতো বেশি ছিল যে, জনজীবনে স্বস্তি বলতে কিছুই ছিল না। খুন, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজবিরোধী অস্ত্রধারী মাস্তানদের ভয়ে জনসাধারণ সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বের হয় না। বিকাল হতে না হতেই বাজার, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভ্রমহানির ভয়ে নারীরা একা ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। তখন হাইজ্যাকিং শব্দটি নতুন ব্যবহার হচ্ছে ঢাকার রাজপথে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একটা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে হাজার হাজার মানুষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর কে বিপক্ষে তা বলার কোনো উপায় নেই। এমনি পরিস্থিতিতে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। এ অবস্থার বিপরীতে ১৯৭৪ সালের শীতকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিরাট কলেবরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের জন্য শিল্পমেলা

হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা প্রতিদিন উৎসাহে উপভোগ করেছে শিল্পমেলা। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত অবধি নির্বিবাদে চলেছে এ শিল্প ও রপ্তানি মেলা। এ থেকে ১৯৭৪ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির কথা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে দেশের হাল ধরেন। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁকে এ দেশটাকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অহর্নিশ প্রাণপাত করে অবিরাম পরিশ্রম করতে হয়েছে। এক কোটি গৃহহারা এবং বিধ্বস্ত বাড়িঘরওয়ালা মানুষের পুনর্বাসন থেকে শুরু করে শূন্য খাদ্যগুদামে খাদ্য জোগান দিতে হয়েছে। শত শত ভেঙে ফেলা পুল নির্মাণ করে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। হাজার হাজার পরিত্যক্ত শিল্প-কলকারখানাকে বেহাত হয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে সংরক্ষিত করতে নতুন নতুন আইন তৈরি করতে হয়েছে। শূন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু করতে হয়েছে। বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্র জোগান দিতে হয়েছে। বন্ধ কল-কারখানা চালু করতে হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান করে দিতে হয়েছে, গণশিক্ষার জন্য হাজার হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করতে হয়েছে, সর্বোপরি ১৯৭৪ সালের সর্বগ্রাসী বন্যা শেষে বৈরীভাবাপন্ন পরাশক্তির ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করতে হয়েছে। বৈরী শক্তির চোখ রাঙানির পাশাপাশি তাদের অবিরাম ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও স্বাধীনতার শত্রুরা যখন বঙ্গবন্ধুর হিমালয় সমান জনপ্রিয়তায় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি, তখনই তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে পাকিস্তানি কায়দায় এ দেশের ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধুর সরকারকে দেশ-বিদেশে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি ও তাদের এ দেশীয় এজেন্টরা সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এহেন অবস্থা অনুধাবন করেই বঙ্গবন্ধুর সরকার সঠিকভাবেই কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর দলীয় কর্মী ও নেতাদের তিনি কঠোরভাবে অসামাজিক ও আইনশৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ এমপিদের বেআইনি তদ্বির বন্ধ করার জন্য উপদেশ দেন এবং সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তাদের তাদের কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

১৯৭২/৭৩ সালের গোড়ার দিকে এ দেশে পুলিশবাহিনীর সর্বসাকুল্যে

সংখ্যা ছিল তেত্রিশ হাজারেরও কম। এদের হাতে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছাড়া কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। বিপরীতে সমাজবিরোধীদের হাতে ছিল পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশবাহিনীর চলাচলের জন্য যানবাহন ছিল না বললেই চলে। বস্তুত বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম ভারত থেকে পাওয়া মাত্র ১০ খানা উইলি জিপ ঢাকা পুলিশকে প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনেও লাঠি হাতে লুঙ্গি-পরা পুলিশবাহিনী ট্রেনিংরত দেখা গেছে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়া থেকে মাত্র কয়েক ডজন মস্কোভা জিপ বার্টার ট্রেড-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম ঢাকায় ১০ খানা টয়োটা ফোর হুইল জিপ সরবরাহ করা হয় ঢাকা পুলিশ চলাচলের জন্য। এ সময়ে পুলিশকে শক্তিশালী করার জন্য বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের আদলে গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর তিরোধানের পর এ স্কিম কার্যকর করে ১৯৭৬ সালের গোঁড়ার দিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্ম হয়। এ বছর রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ২১ বছর পূর্তি উদযাপিত হলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে তাদের আক্রমণের প্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। পুলিশবাহিনীও অমিত তেজে পাকিস্তানিদের প্রতিহত করেছিল।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণের ফলে সারা দেশের পুলিশবাহিনীতে জিঘাংসা ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। সারা দেশের পুলিশবাহিনীর সদস্যরা স্ব স্ব স্থানে স্থানীয় জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। পুলিশবাহিনীকে সাথে পেয়ে জনগণের মনোবল, সাহস ও উদ্দীপনা বেড়ে যায় লাখো গুণে। যে জনগণ সারা জীবন পুলিশকে তাদের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে দেখেছে, সে জনগণই যখন পুলিশকে সাথে পেল সহযোদ্ধা হিসেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জনগেণর আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায় হাজার গুণ। এভাবেই ২৫ মার্চের কালরাতের পর পুলিশবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সারা দেশে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস পুলিশবাহিনী শৃঙ্খলা, সর্বশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস আর বীরত্বের সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ফলে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের

মধ্য দিয়ে পুলিশের চারিত্র্যিক এবং বৈষয়িক অবকাঠামো ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভেঙে যায়। যদিও মুজিবনগর সরকারের একজন পুলিশের আইজি ছিল– তাঁর পক্ষে সারা দেশে মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলেমিশে যুদ্ধরত পুলিশবাহিনীর সদস্যদের কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে রাখা সম্ভব ছিল না। এছাড়া পুলিশবাহিনীর যেসব সদস্য মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি প্রশাসনকে মদদ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের অনেকেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে অথবা কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়েছে। আর যারা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সরকারের তাবেদারি করেছে, তারা ১৬ ডিসেম্বর হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা পড়েছে, না হয় স্ব-স্ব কর্মস্থল ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সব মিলিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পুলিশবাহিনীর ত্রিশঙ্কু অবস্থা। জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। অনেকেই যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছেন কিংবা পঙ্গু হয়েছেন। মোটামুটি একটা অবিন্যস্ত অবস্থা পুলিশ বাহিনীর মাঝে বিরাজমান। সব মিলিয়ে পুলিশবাহিনী একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত।

বিধ্বস্তপ্রায় পুলিশবাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্য ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনী সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধু সারদার পাশাপাশি আরও চারটি ট্রেনিং সেন্টার খোলার নির্দেশ দেন। এছাড়া দেশের সর্বত্র পুলিশ লাইনগুলোতে একই সাথে রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং শুরু হয়। এসব ট্রেনিং অবকাঠামো সৃষ্টিসহ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য অতি জরুরি ভিত্তিতে টাঙ্গাইলের মহেড়া জমিদার বাড়িতে, খুলনার খালিশপুরে, রংপুরে এবং নোয়াখালীর মাইজদীতে নতুন ট্রেনিং স্কুল খোলার কাজ শুরু হয়। ঢাকার উত্তরা ও মিরপুরে এ উদ্দেশ্যে কয়েক শত একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। টাঙ্গাইলের মহেড়া জমিদার বাড়ি হুকুম-দখল করা হয় এবং পাশাপাশি খুলনা, রংপুর ও মাইজদীতে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু পুলিশের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম দাঙ্গা পুলিশের সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্দেশিত পথেই পঁচাত্তরের অক্টোবর বর্তমান আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন তৈরি হয়। নদীতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি রোধকল্পে নৌ-পুলিশ সৃষ্টি করেন বঙ্গবন্ধু। চিরাচরিত সাব-ইন্সপেক্টরের পরিবর্তে ইন্সপেক্টরদের থানার ওসি নিয়োগের নির্দেশনামা জারি করেন বঙ্গবন্ধু এবং প্রতি সার্কেলে ইন্সপেক্টরের পরিবর্তে এএসপি/ডিএসপি নিয়োগ করার আদেশ দেন তিনি এবং দেশ বিভাগের পূর্বের ১৯ জেলাকে ভেঙে প্রতি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করেন তিনি। ফলে প্রতিটি উন্নীত জেলায় একজন করে এসপি নিয়োগ লাভ করে।

পাশাপাশি প্রতিটি উন্নীত জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক নিয়োগ করে তিনি সার্বিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার ওপর জোর দেন। সর্বোপরি, পুলিশবাহিনীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সার্বিক সুফল লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের ৪ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করেন এবং একই বছর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সারদাতে পুলিশ একাডেমীকে নতুনভাবে সংগঠিত এবং আধুনিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসারদের পাসিং-আউট প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালেই নির্ধারিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসনব্যবস্থা চালু করার অভিপ্রায়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গভর্নর নিয়োগ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রথম পদক্ষেপে জেলা গভর্নর নিয়োজিত করবেন, কিন্তু পরবর্তীতে তারা সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাঁর জীবদ্দশায় এ প্রথা চালু হওয়ার কথা ছিল সারা দেশে একই দিনে। নির্ধারিত দিনটি ছিল ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সালে। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁর এ পদক্ষেপে ভীত হয়ে পড়ে। তারা বুঝেছিল যদি এ ব্যবস্থা চালু হয়ে এ দেশের মাটি ও মানুষের মনে মিশে যায়, তাহলে অসম্ভব জনপ্রিয় শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এতো বৃদ্ধি পাবে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভোটের মাধ্যমে তাঁকে কিছুতেই ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে না এবং এমতাবস্থায়, পাকিস্তান-প্রেমিকরা এ দেশে কোনোদিনই ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। তাই ১৬ আগস্টের আগেই তারা বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট দেশের ক্ষমতা দখল করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, 'বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পদক্ষেপগুলো সঠিক ছিল না'—বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশদ্রোহীরা এ কথা বহুবার বহুভাবে প্রচার করে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত তারা একের পর এক সরকার গঠন করেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পদক্ষেপের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে মৌলিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। প্রমাণস্বরূপ, তাঁর নির্দেশিত গভর্নর স্কিমের কথাই ধরা যাক। জিয়া, এরশাদ, খালেদা এঁরা সবাই এ স্কিমের বিরোধিতা করেছেন। একে 'স্বৈরচারী পদক্ষেপ' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেউই এ স্কিমের বাইরে নতুন কোনো দিক-নির্দেশনা দিতে পারেননি। এরশাদের উপজেলা, জিয়ার যুব-কমপ্লেক্স এবং বিগত সরকারের আমলের উদ্যোগসমূহ উপজেলা ও গভর্নর স্কিমের নামান্তর মাত্র।

বঙ্গবন্ধুর-নির্দেশিত মেট্রোপলিটন পুলিশ স্কিম আজও বহাল তবিয়তে আছে—ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়। পুলিশের ওসিকে কেউ আর পেছনে টানতে পারেনি। জেলা পর্যায়ে স্বাধীনতার পূর্বে এসপিদের এসিআর লিখতো ডিসি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ প্রথার পরিবর্তে এসপির এসিআর লেখার দায়িত্ব দেন ডিআইজিকে। ফলে, এসপি, ডিসির সাথে কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মারামারির একটা পর্যায় সমূলে উৎপাটিত হয় এবং পুলিশবাহিনীর মধ্যে প্রকৃতভাবেই শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এহেন বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপের কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে একেবারেই ছিন্ন-বিছিন্ন অবস্থা থেকে গড়ে ওঠা পুলিশবাহিনী মাত্র তিন বছরের মাথায়, অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় হয়েও, চুয়াত্তরের গোঁড়ার দিক থেকে দেশের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। পুলিশ যাতে সোৎসাহে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য তিনি পুলিশের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন—এসপির র‍্যাঙ্ক ও স্ট্যাটাস আগের মেজরের অবস্থান থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সমমানে উন্নীত করেন এবং একইভাবে ডিআইজির অবস্থান ও মর্যাদার উন্নতি সাধন করেন। আইজির অবস্থান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সমতুল্য করে সরকারের সেক্রেটারির সমমর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে উন্নীত করেন। রেশনের আওতা ও পরিমাণ বাড়িয়ে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সচেষ্ট হন। পুলিশসহ সার্বিক প্রশাসনিক অব্যবস্থাকে একই শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার কয়েক হাজার এলোমেলো বেতন স্কেলকে মাত্র ১০টি স্কেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ব্রিটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিকতার হাত থেকে সরকারের বেতন কাঠামোকে বের করে আনেন এবং এ পর্যায়ে তাঁর প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির কার্যক্রম শুরু করিয়ে সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই এ কমিটির দেয়া সুপরিশমালা কার্যকর করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন।

বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করে এ দেশে ঘি আর মাখনের নহর বইয়ে দিতে চেয়েছিল, তারাই ১৯৭৬ সালের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচ লাখ উপজাতিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বিদ্রোহ দমনের নামে পুলিশের স্থলে সরাসরি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিল। অথচ মুক্তিযুদ্ধ শেষে সারা দেশব্যাপী অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের দমন করে জনপদে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধু সরকার যে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছিলেন, স্বাধীনতার বিপক্ষের শত্রুরা তাঁর সরকারের এ প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী সৃষ্টিকে অত্যন্ত জঘন্য ও কঠোর ভাষায়

কতই না সমালোচনা করেছে। কিন্তু আজকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যারা রক্ষীবাহিনীর বিরোধিতা করতে আনন্দ পায়, তারাই রক্ষীবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রধারী সেনাবাহিনী দিয়ে এবং মার্শাল ল-এর মতো বুনো আইন দিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর এ দেশ শাসন করেছে। এহেন শাসন তাদের কাছে একদিনও স্বেচ্ছাচারী মনে হয় না।

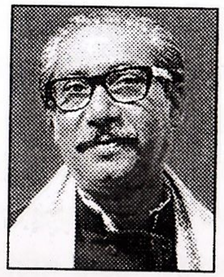
প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭২-৭৩ সালের গোড়ার দিকে বামপন্থী, চীনপন্থী, সর্বহারাপন্থী, জাসদপন্থী, পাকিস্তানপন্থী, মুসলিম লীগপন্থী সশস্ত্র বেআইনি অস্ত্রধারীদের অপতৎপরতা রোধ করার জন্য রক্ষীবাহিনী নামক আধা-সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করা ছিল একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং রক্ষীবাহিনীর আইনি তৎপরতার কারণেই এসব সমাজবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীসহ বেসামরিক প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সেদিন দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সফলতা লাভ করেছিল বলেই পরবর্তী কালের সরকারগুলো তার সুফল ভোগ করেছে।

একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশাসন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার শুভ সূচনা করেছিলেন। এ দেশের মানুষের মুখে দু'বেলা অন্ন জোগান দিয়ে তাদের সুখের নিদ্রায় রাত যাপন করতে দেয়া—এ চিন্তা তাঁর জনগণের মঙ্গল, তাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আইনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অঙ্গীকার এবং আইনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থেকেই উৎসারিত। আইনের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে প্রয়োগ হয়, তজ্জন্য যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আপন প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সীমাহীন রাজনৈতিক উপলব্ধি এবং দেশজ মাটি-মানুষের সাথে সম্পৃক্ত রসগন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে, এ দেশের মাটি ও মানুষের মঙ্গলের জন্য সে সংকটকালীন সময়েও যা সঠিক মনে করেছেন, তাই সরকারি প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা তার সুফল পেয়েছি এবং দীর্ঘ বাইশ বছর বঙ্গবন্ধু নেই—এ সময়ে অনেক সরকার এসেছে—আর গেছে—কিন্তু তাঁর নির্ধারিত, সুচিন্তিত প্রশাসনিক পদক্ষেপের বাইরে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ আজও কেউ নিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু যে কত বড় মাপের প্রশাসক ছিলেন, এ থেকেই তাঁর পরিচয় মেলে।

শেষ করার আগে দু-একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে চাই। বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম স্নেহ কিন্তু সরকারি দায়িত্ব দিয়ে তিনি আমার কর্তব্যনিষ্ঠাকে অপত্য স্নেহের ভারে দূরে ঠেলে দিতে কোনো সুযোগ দেননি। আমার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ও কর্তব্যনিষ্ঠার বলে আমি অনেক দুরূহ কাজ অত্যন্ত সহজেই সম্পাদন করতে পেরেছি।

অনেকের ধারণা যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, এমপিরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সদাসর্বদা পুলিশকে নানারকম তদবির তদারকিতে ব্যস্ত রেখেছেন। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ইপ্সিত উন্নতি ঘটেনি। এ ধারণা আদৌ সত্যি নয়। আমি ২৯ মাস ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেছি। এর মধ্যে প্রথম দিকে দু-একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমার কাছে দু-একবার তদবির করেছেন।

তবে, এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আমার ঊনত্রিশ মাসের এসপি থাকাকালীন সময়ে কোনো আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্মী আমার কাছে বেআইনি কোনো তদবির করেননি। বিশেষত, বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এমন কোনো আদেশ আমার কাছে আসেনি, যে আদেশ পালন করতে আমাকে আইন লঙ্ঘন করতে হয়েছে। দেশের আইন-কানুনের প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকলে, একজন মহান নেতা, যার অঙ্গুলি হেলনে সব কিছুই হতো—তাঁর পক্ষে সকল পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থাকা সম্ভব ছিল—তা সহজেই অনুমেয়।



মুনতাসীর মামুন

বাঙালির মন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত ২০ জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকা প্রকাশ করেছে। বিশ দিনের কাউন্ট ডাউনে প্রথমে মানুষজন তেমন আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে খবরের কাগজের পাঠক ও বিবিসির শ্রোতারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। দশ নম্বর পেরুতেই এরপর কার নাম আসবে সে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। নববর্ষের একদিন আগে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'নম্বরে আছেন। তখন আর কারো মনে সন্দেহ থাকেনি যে, বাঙালির প্রিয় উৎসব, পহেলা বৈশাখে, নববর্ষের দিন প্রচারিত হবে, 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বা রাজনীতির কবি, বাংলাদেশের স্রষ্টা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এবং তাই হলো বুধবার।

২০ জন সেরা বাঙালির তালিকাটি দেখে আমি কেন, অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। অধিকাংশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করেনি ভোটাররা। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কেন এ প্রশ্ন, তা আলোচনা করছি।

আজকের বাংলাদেশের, যেখানে ঘোর অমাবস্যা ডেকে এনেছে যুদ্ধাপরাধী জামায়াতি এবং বিএনপি সরকার সেখানে এ ধরেনের শুদ্ধ তালিকা বিস্ময়কর। গত নির্বাচনের প্রদত্ত ভোটের প্রায় অর্ধেক 'ভোট' পেয়ে জামায়াতি-বিএনপিরা সরকার গঠন করেছে। এদের ধ্যান-ধারণা মধ্যযুগীয়, এক ধরনের অসহিষ্ণু ইসলামের তারা প্রবক্তা এবং ধর্মকে ব্যবসা হিসেবে দেখতে উৎসাহী; এরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে চরম ভারতবিদ্বেষী কিন্তু ভারতকে দেশের স্বার্থের বিনিময়ে সব ধরনের সুযোগ দিয়েছে। এরা প্রবলভাবে পাকিস্তানি, তার উদাহরণ যুদ্ধাপরাধী একজনকে ইসলামী সংস্থার মহাসচিব

পদে মনোনয়ন দান। শুধু তাই নয়, অনুমিত যে, ধর্মান্ধ, সুবিধাবাদী প্রতারক, লুটেরা, সন্ত্রাসী, সাম্প্রাদয়িক, অস্ত্র চোরাকারবারি, ঋণখেলাপিরা এদের প্রধান শক্তি। ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী এ কারণে যে, গত তিন বছরে যেসব মৌলবাদী হামলা হয়েছে তার প্রতিটি জামাতের সাথে যুক্ত, সে কারণে কোনো অপরাধীর গ্রেপ্তার বা বিচার হয়নি। এরা বুদ্ধিজীবী হত্যার প্ররোচনা জোগায় ১৯৭১ সালের মতো। এবং এই প্রথম বাংলাদেশ পৃথিবীতে চিহ্নিত হয়েছে ভয়ঙ্কর মৌলবাদী এক দেশ হিসেবে। গত কয়েক বছরে ৪/৫টি বড় ধরনের অস্ত্র চোরাচালান হয়েছে এবং কেউ ধরা পড়েনি। এত দুর্নীতি আগে আর কেউ দেখেনি। মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র থেকে সাধারণ ক্যাডার পর্যন্ত চুরি-লুটের এক মহাউৎসবে মেতেছে। বাঙালির যা অহঙ্কার তারা তা গুঁড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত এখন কোনো জাতীয় ফাংশনে গাওয়া হয় না বরং ২৬ মার্চের সেনা প্যারেডে বাজে উর্দিধারীদের প্রিয় 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।' এ দেশের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যতো পারা যায় হেনস্থা করতে তারা ছাড়েনি। অশালীনভাবে তারা তাঁর ছবি নামিয়েছে, তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের নাম বদলেছে আর সেখানে উর্দিপরা লোকের জয়গান গেয়েছে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বদলে শুধু ইতিহাস বিকৃতিকারী নয়, ইতিহাস চোর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সর্বশেষ, এই বুধবার দেশজুড়ে পহেলা বৈশাখ নববর্ষ পালিত হলো, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' হিসেবে অভিহিতকারী বায়তুল মোকাররমের খতিব ফতোয়া দিয়েছিলেন পহেলা বৈশাখ পালন করা যাবে না, এটি নাজায়েজ।

দেশের এ অবস্থা সমর্থন করছে প্রায় অর্ধেক মানুষ যারা জামায়াত-বিএনপির অনুসারী। এদের মধ্যে স্যুটপরা 'ভদ্রলোক' ও সুবেশী 'ভদ্রমহিলা' থেকে বস্তিতে বসবাসকারী নিম্ন বর্ণের মানুষজনও আছে। এরা আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে ও সমর্থন করেছে। এরা প্রতিদিনের সন্ত্রাস ও ধর্ষণের সমর্থক। এবং বাকি ৫ ভাগ মানুষ অবলোকন করছে, প্রতিবাদ করেনি বা নিরপেক্ষ থেকেছে, যা ঐ পক্ষকে সমর্থন মাত্র। আপনাদের কি মনে পড়ে বিএনপি-জামায়াত ক্যাডাররা যখন দল বেঁধে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করতে যায় তখন তার মা হাতজোড় করে বলছিল, বাবারা আপনারা একজন একজন করে আসেন, আমার মেয়েটা ছোট।

এই বাঙালিদের নিয়ে আশাবাদের কী আছে, যারা নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে 'টাইম' পত্রিকা রায় দিয়েছে,

বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র ও লজ্জার স্থান। সেজন্য বলেছিলাম, বিবিসির এ তালিকা সবাইকে বিস্মিত করেছে। ওপরের যে আলোচনা যা বাস্তব তার সাথে এ তালিকা মেলানো যায় না। বাঙালির মন কি এরকম? অবশ্য এ বৈপরীত্য আবার তুলে ধরে বাঙালির মৌলিক চরিত্র, যার উল্লেখ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা করেছেন। এবং এটিও প্রমাণ করে বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসির জরিপ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন জাগে। তালিকাটি দেখে মনে হয়, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও প্রবাসী বাঙালিরা অংশ নিয়েছিলেন এবং এ ভূখণ্ডের মানুষের সংখ্যাই বেশি। বিবিসি যদি জানায়, যারা ভোট দিয়েছেন তাদের কত ভাগ বাংলাদেশের, কত ভাগ ভারত বা বাইরের তা হলে জরিপটি সম্পর্কে আরো স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। কারণ বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতারা এ ধরনের নির্বাচন করবে তা বিশ্বাস করা কঠিন, যেখানে রোল মডেল জেনারেল জিয়া বা ব্যা-না হুদা, সিএনজি, বা তারেক রহমান বা খালেদা জিয়া। কিন্তু বিবিসির জরিপও তো বাস্তব। তাহলে যে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা আমরা বলি তা অবিভাজ্য এবং এত শক্তিশালী যে, বাঙালির পক্ষে সেখান থেকে সরে আসা মুশকিল। বাঙালি থেকে বাংলাদেশ হওয়াটা কি ক্রান্তিকালীন ব্যাপার মাত্র বা নিছক ব্যক্তিস্বার্থের জন্য? ১৯৪৭-৭১ বাঙালির ইতিহাসের পূর্ব বা তার রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া বা ঐতিহ্য তা থেকেও বাঙালি কতটা সরে যেতে পারে?

বিবিসির তালিকা বিশ্লেষণ করে বাঙালি মন ও মননের হদিস পাওয়া যেতে পারে। তালিকার বিশজনের মধ্যে তিতুমীরকে ধরলে ৭ জন রাজনীতিবিদ—এরা হলেন, সোহরাওয়ার্দী, জিয়া, ভাসানী, সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক, শেখ মুজিব। ধর্মের সাথে যুক্ত দুজন—অতীশ দীপঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ। বাকি ১১ জন যুক্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি, মননচর্চার সাথে। এতে প্রমাণিত হয় যে, একটি জাতিকে তুলে ধরে জ্ঞান বা জ্ঞানের চর্চা এবং যারা এর সাথে জড়িত তারা বিশেষভাবে সমাদৃত বাঙালি মানসে। শুধু তাই নয়, আমরা যা পড়ি বাল্যকালে তা আমাদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের অধিকাংশের কথা পড়েছি আমরা পাঠ্য বইয়ে। পরে হয়তো ইতিহাসে নাম পেয়েছি। বর্তমানে গণমাধ্যমের কারণেও অনেকের নাম আদৃত। তালিকায় তা প্রতিফলনও দেখেছি।

ষোড়শতম স্থানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম আমাকে চমকে দিয়েছে। বাঙালি তাহলে ছোটখাটো এই ধার্মিক মানুষটিকে ভোলেনি? পাঠ্য বইয়ে তার

পরিচিতি বহু ভাষাবিদ। কিন্তু তার অন্যতম অবদান মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম পরম ধার্মিক ড. শহীদুল্লাহ মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছিলেন। টিকি, পৈতা বা টুপি, দাড়ি দেখে নয়। চতুর্দশতম স্থানে আছেন অমর্ত্য সেন। বিশ্বে যখন বাঙালির প্রতিনিধি কেউ নেই তখন অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পেলেন, যেন বাঙালির গর্ব ফিরিয়ে দিলেন। মিডিয়ায় তিনি এবং সত্যজিৎ রায় (ত্রয়োদশ) যেভাবে আলোচিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন তাও মানুষের মনে রেখাপাত করেছে এবং দুজনই বহির্বিশ্বে বাঙালিও যে কিছু করতে পারে তার প্রমাণ রেখেছেন, যা বাঙালির বুক স্ফীত করেছে। দ্বাদশতম স্থানে লালন আসবে কেউ কি ভেবেছে? মরমিয়াবাদের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ তা হলে মরে যায়নি। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সাথে আমাদের ছোটবেলায়ও পরিচিত হতে হয়েছে। তার মাপের অনেক বাঙালি ছিলেন। কিন্তু আমরা এক সময় জেনেছি তিতুমীর সংগ্রামের প্রতীক। রাজা রামমোহন রায় (দশম) ও বিদ্যাসাগর (অষ্টম) আজীবন হিন্দু ধর্মের কলুষের বিরুদ্ধে লড়েছেন। রামমোহন বাংলা গদ্যের জনক, যে গদ্যকে বিকশিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এক শতক বাংলার শিশুরা 'বোধোদয়' পড়ে বড় হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ঐ সময়ে নারীকে মর্যাদার আসন দিতে তাদের চেয়ে বেশি সংগ্রাম আর কেউ করেনি। জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম বাঙালি যিনি বহির্বিশ্বের বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুর নামও যে তালিকায় আসতে পারে কেউ ভাবেননি। তালিকায় একমাত্র মহিলা ষষ্ঠ স্থানে বেগম রোকেয়া, যিনি বাঙালি নারীকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। এ ভূখণ্ডে বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির প্রতীক। তিনি তালিকায় থাকবেন তা যেন ছিল অবধারিত।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা অসম্ভব। সবাই জানতেন তালিকায় তারা থাকবেন, আগে-পিছে। সেই চল্লিশের দশকে নজরুল বাঙালি ও বাংলাদেশের কথা লিখেছেন। তার নামের আগে বিদ্রোহী কবি এই অভিধা না তাকলে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যেসব রাজনীতিবিদদের কথা এসেছে তাদের সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, যারা তাদের সময় তালিকায় আছেন তাদের চেয়ে কম খ্যাতিমান ছিলেন না। এ মুহূর্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা মনে আসছে। তালিকা আরো বিস্তৃত হলে হয়তো তাদের নামও আসবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকি সবাই এ ভূখণ্ডের। ফজলুল হক বা শেরে বাংলার স্মৃতি বাংলাদেশের কৃষকদের সন্ত

ানদের স্মৃতিতে থাকবেই। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত করেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তির প্রস্তাব করে। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও তার অবদান অসীম। তিনি কত অসামান্য ছিলেন তা বোঝা যাবে বরিশালের এক গণ্ডগ্রাম থেকে এসে, মুসলমান সম্প্রদায়ের হয়েও তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বাঙালির ভালোবাসা অন্যরকম, রোমান্টিক, বীর হিসেবে তিনি পূজ্য। গরিবরা মওলানা ভাসানীকে (নবম) ভুলবে কীভাবে? তার নামই তো মজলুম জননেতা। তালিকায় উল্লিখিত রাজনীতিবিদদের মধ্যে দুজনকে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। একজন সোহরাওয়ার্দী ও অন্যজন জিয়াউর রহমান। সোহরাওয়ার্দী বাঙালি নন যদিও এক সময় আলাদা বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু তাকে গুরু মানতেন, যে জন্যই হয়তো অনেকের ধারণা তিনি বাঙালি। জেনালের জিয়া যখন বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন তখন নিজেকে বাঙালি বলতেন, বঙ্গবন্ধু চলে যাবার পর নিজেকে বাংলাদেশী হিসেবে চিহ্নিত করেন। যিনি নিজেকে বাঙালি বলতে লজ্জিত হতেন তাকে জোর করে বিবিসি তালিকায় কেন আনলো সেটি একটি প্রশ্ন থেকে যাবে। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র তার আমলে থেকেই শুরু এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে হয় তার আবির্ভাব। গত তিন দশক পাঠ্য বই, প্রচারযন্ত্রে এ কথাই প্রচার করা হয়েছে। দু'বছর আগে এ কারণে পাঠ্য বইয়ের বদল হয়েছে। তাই গত তিন দশকে যারা বড় হয়েছেন তাদের কাছে জিয়াউর রহমান সেভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। হয়তো তার নাম তালিকায় আনার জন্য অর্গানাইজড ভোটিং হয়েছে। কে জানে? কিন্তু নববর্ষের ঘোষণায় তো পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটি কত বড় প্রতারণা। জিয়াউর রহমান যেভাবে ছিলেন সেভাবে থাকলে আজ আরো সম্মানিত হতেন। বিবিসির এই তালিকা এই শিক্ষাই দেয় ইতিহাসে মস্তানি চলে না, ইতিহাসে নাম উঠানের জন্য শর্টকাট কোনো রাস্তা নেই। তালিকায় যাদের নাম এসেছে তাদের জীবন বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট চোখে পড়বে। হয়তো এটিই বাঙালিত্বের নির্যাস। সেগুলো হলো—

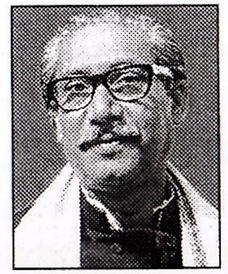
১. এরা প্রায় সবাই মনেপ্রাণে জীবনযাপনে ছিলেন বাঙালি।
২. তারা বাংলা ভাষার আজীবন শুধুচর্চা করেনি, এর প্রসারে কাজও করেছেন এবং বিজাতীয় ভাষা চাপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন, মৃত্যুবরণও করেছেন। যে জন্য পঞ্চম স্থানে নাম এসেছে যৌথভাবে শহীদদের, যা অভূতপূর্ব।

৩. এদের প্রত্যেকে বিদ্যমান সমাজ, ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।
৪. এরা প্রায় সবাই নিপীড়িত কল্যাণে কাজ করছেন। নিয়ত তাদের কথা মনে রেখেছেন।
৫. এরা কেউ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি বরং ধর্মের কলুষ, বাড়াবাড়ি দূর করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ বা অতীশ দীপঙ্কর প্রচারক ছিলেন, কিন্তু মানবতার কথা বলেছেন। জিয়াউর রহমান ছাড়া এরা কেউ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেননি এবং আশ্চর্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে কোনো মুসলমান ধর্মগুরু ভোট পাননি, পেয়েছেন মরমিয়া সাধক লালন।
৬. এদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন করতে চেয়েছেন এবং ধর্মের আগে মানুষকে বিচার করেছেন।
৭. এরা সবাই ছিলেন সাহসী।
৮. এদের অধিকাংশ যুক্ত শিক্ষা, সংস্কৃতির সাথে। এদের অধিকাংশ এ বঙ্গের কিন্তু জীবন ও কর্মের শুরু অবিভক্ত বাংলায়। এটি বাঙালির জীবন সংস্কৃতির অবিভাজ্যতা তুলে ধরে এবং আরো তুলে ধরে বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং লালন করে।
৯. এদের অধিকাংশ বাঙালির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য যাদের আছে বাঙালি তাদের ভালোবাসে, তাদেরই মনে রেখেছে এবং তাদেরই রোল মডেল মনে করে। অবশ্যই এ কথাও বলা চলে বাঙালি মৃতদেরই শ্রদ্ধা করে বেশি। জীবিত থাকাকালীন এদের অধিকাংশই পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। তবে বাঙালির মনে তিনিই আসন গেড়ে আছেন যিনি সাহসী, লক্ষ্যে স্থির, মানবতাবাদী, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। এখন প্রশ্ন, সে বাঙালি কেন আজ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সহ্য করছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে কেন ফেলেছে, বঙ্গবন্ধুকে পদদলন বা জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ? এ প্রশ্ন দিয়ে এ প্রতিবেদন শুরু করেছিলাম।

হ্যাঁ, আজ এ দেশের মানুষের একটা বড় অংশ বাঙালিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিএনপি আর জামায়াতকে প্রতিভূ করে। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য সমগ্র বাঙালি জাতি (বিশ্বের) কতকগুলো মৌলিক গুণাবলী শ্রদ্ধাও

করছে। তাদের রক্তে জেনারেশনের পর জেনারেশন সেই ইতিহাস-ঐতিহ্য খেলা করছে, এমনকি বিএনপি-জামায়াত করলেও মাঝে মাঝে হয়তো সেই দোলা সে অনুভব করে।

আগেও বলেছি, আজো বলছি, বর্তমানে জোট ও জোট সমর্থকদের মনে হতে পারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে 'অপরাধ' করেছিলেন। এজন্য তাকে যত হেনস্থা করা দরকার করতে পারে। এ প্রজন্ম জানে না, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রথম সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখেনি, কিন্তু আপনাকে দেখেছি।' হাসনান হেইকেল লিখেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, তিনি সব বাঙালির স্বাধীনতার স্বাপ্নিক।' বাঙালি জাতির একটা বড় অংশ শুধু তাই মনে করে না, এ জন্য সে গর্বিত এবং ভবিষ্যতেও গর্ববোধ করবে। আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয় কবি নন, তার জাতীয় সঙ্গীত আজ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় না এবং বাংলা ভাষাকে দমনের জন্য অনেকেই প্রস্তুত। কিন্তু বাঙালি, শুধু বাঙালি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক দু'জন বাঙালির নাম জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন বাংলা ভাষার, সংস্কৃতির আধুনিক রূপ দিয়েছেন যার গান শুধু আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেই নয়, সুখ-দুঃখের সাথী; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। আমাদের দিয়েছিলেন একটি ঠিকানা। বিবিসির জরিপ সেই শুদ্ধ বাঙালির মনকেই তুলে ধরেছে মাত্র।



মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

স্বাধীনতা আমার সেই স্বাধীনতা

বিবেচনায় আনছি, প্রসঙ্গ এখানে কালের পটভূমিতে 'আমার সেই স্বাধীনতা'র স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস। বর্তমান পরিসরে অন্তত যতটা সম্ভব। যথার্থ বটে কাল বহমান নিরবধি; আর তাই বলে কাল পটভূমিতে ধারণ করে রাখে ইতিহাস তাবৎ কর্মকাণ্ড। সাথে আরো যে, জড়বুদ্ধি, মধ্যযুগিতায় আচ্ছন্ন আর মতলববাজ ছাড়া সুস্থ, সচেতন মাত্রেই এই সত্যে বিশ্বাসী।

আজ সন ২০০৪-এর ছাব্বিশে মার্চ, স্বদেশের কোটি মানুষের ইতিহাসের মহত্তম অর্জনের 'প্রতীকী' দিবসটি আবার এসেছে ফিরে। তবে কেবল তাই মাত্র নয়, বিশেষ করেই নির্দেশিত করার যে, আরেক বাস্তবতায় এবং নতুনতর নানাবিধ মাত্রিকতায়। আমরা যেন চিনে নিই বর্তমানের, ভবিষ্যতের স্বার্থে। এইটে জরুরি।

একদা ১৯৭১-এ এসেছিল ছাব্বিশে মার্চ। একার্থে যেন প্রকৃতির নিয়মেই। তার পরের থেকে আজ অবধি গড়িয়ে গেছে সাড়ে তিন দশকের কাছাকাছি সময়। আমরা অবশ্য গণনার হিসাবেই ওপরে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি না। কেননা তা মোটা দাগের ব্যাপারের বেশি নয়। ইতিপূর্বে বলাই ত' গেছে 'প্রতীকী' অভিধায় ব্যঞ্জিত সত্য। প্রশ্ন তবে প্রতীকের ব্যঞ্জনায় কী সেই সত্য। সদামহাজন নির্দেশ যে, কল্যাণ শুভ-সুন্দর জীবনে বাঁচার তাগিদেই বারংবার সত্যের মুখোমুখি হতে হয় এবং সচেতন বাঙালি সন্তানের অবশ্য জানা—ছাব্বিশ মার্চ তো গতানুগতিক কোনো এক তারিখ বিশেষ নয়, পাকিস্তানিত্বের ঔপনিবেশিক দুঃশাসনে বন্দি কোটি মানুষের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ডাক এই দিনে। সহস্রাব্দের মহত্তম সেই

পুরুষের কণ্ঠে চূড়ান্ত করেই ধ্বনিত হয়েছিল : 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তারপর? তারপর অনিবার্য নিয়তি ইতিহাসের সড়ক বয়ে যাত্রা শুরু হলো। পেছনে তাকিয়ে দেখছি, যেন 'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি/আগে কেবা প্রাণ করিবেন দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি'। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে লড়াকু কোটি বাঙালির জীবনবাজি পবিত্র উৎসর্গের সেই সব ছবি। আমরা তখন একাত্ম হয়ে যাই সময়ের আপন ইতিহাসের সাথে। মনে করি যে, স্বাদেশিকতার বিশেষ তাগিদেই বারংবার এই ছাব্বিশে মার্চ। সঙ্গত হেতুতেই এই মতো জিজ্ঞাসা আসবে : ক. সেই দিন ১৯৭১-এ, অমন 'ছাব্বিশ মার্চ' কেন? কেমন করে? খ. অতঃপর কালব্যবধানে কোথায় আজকের 'ছাব্বিশে মার্চ'র অবস্থান; গ. এই দুয়ে কি তেমন ফারাক রয়েছে? অথবা একই ধারাবাহিকতায় উত্তরণ। ধারণা করি, জবাব সহজ-সরল একরৈখিক মোটে নয়। সবটা মিলিয়ে তা বহুবিধ বিস্তারের এবং গভীরে তাৎপর্যবাহী সে আলোচনা। পুনরায় নিশ্চিত করেই বিশ্বাস যে, সম্পূর্ণ জাতীয় স্বার্থের দাবিতেই রয়েছে সেই প্রয়োজন। অবকাশ পাওয়া গেল, প্রাসঙ্গিক কিছুটা অবতারণা করে নেয়া যাচ্ছে। অতঃপর ইতিহাসবিদমণ্ডলীর কাছে প্রত্যাশা, বর্ণিত প্রয়োজনের দাবি তারা মেটাবেন।

দুই

'স্বাধীনতা/আমার সেই স্বাধীনতা' এই উচ্চারণেই কি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে না চাপা ক্ষোভের বেদনার্ত সুর? সেই '৭১-এর ছাব্বিশে মার্চ থেকে আজকের ছাব্বিশে মার্চ; কালব্যবধানের কোথায় এসে উত্তরিত হয়েছি আমরা। তথাকথিত এই স্বাধীনতার জন্যই কি সেদিনকার নারী-পুরুষ-বালক-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোটি বাঙালির সাধারণ্যের রক্তক্ষয়ী অমন লড়াই? নিত্যকার কী বিষয় ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমাদের জোট রাজাকার আর কুইসলিংদের প্রচণ্ড দাপট। তবে বুঝ এ রাখতেই হবে যে, শুধু কেবল নির্বীর্য আস্ফালনে ফায়দা কিছুই নেই। বড়জোর সেটি ডন কুইকজোটতুল্য হাওয়াই আসমানে ভোঁতা তরবারির আন্দোলন। হাঁকডাক এবং তাতেই ইতি।

কী জানি, '৭১ ছাব্বিশে মার্চের, '৭১ ন' মাসের লড়াকু আমরা কি হারিয়ে গেছি? আত্মনির্বাসিত আমরা ২০০৪-এ পৌঁছে নিজেকেই নিজের সম্মান আজ মস্ত হয়ে আসছে। প্রার্থনা যে, আপন কীর্তির অর্জন কথা যেন ভুলে না যাই। এখন, তাৎপর্য ব্যঞ্জিত অপর বিশেষ প্রসঙ্গ। ক্ষোভ আক্ষেপ নয়; 'স্বাধীনতা আমার সেই স্বাধীনতা' প্রত্যয়টিকে যুগান্তকারী সেই ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডটিকে

তাবৎ মাত্রিকায় বুঝে ছাব্বিশে মার্চ বলতে গভীরের সেই গুরুত্ব বহন করে আনে। আমরা যেন চেতন থাকি।

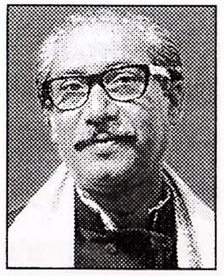
অবশ্য মেনে নিতেই হবে, ইতোমধ্যে গাফিলতি আমাদের অনেক হয়েছে। সঙ্কট উদ্যত জেনে-বুঝেও আমরা চোখ মুদে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছি এবং কখনো কখনো বা নিজেরাই কেউ কেউ অসততায় নিমজ্জিত হয়েছি। স্থূল লোভে অন্ধ আকর্ষিত হয়েছি এবং আসন্ন পাপকে ঠেকাতে পাপের মূলোৎপাটনে নির্মোহ কঠোর উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। তালিকা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন দেখি না। আয়নাতে নিজ নিজ মুখ দর্শন করলেই হয়।

এবং এরপরেও বলার যে, বেশ কিছুকাল যাবৎই অশনি সংকেত ঘনিয়ে এসেছে। এখন বেজায় দুঃসময়। তবু ইতিবাচক ভাবছি যে, উঠে দাঁড়ানোর, দুশমনকে প্রত্যাঘাত করার সময় এখনো রয়েছে। কেন দেখি এমন আশার ইশারা? হেতু, সৃজনের ভুবনে যে শ্রেষ্ঠ 'আশরাফুল মাখলুকাত', সেই মানুষের ক্ষেত্রে কদাপি আশার মৃত্যু নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য, আটিলা হালাকু-তৈমুর লং থেকে ফ্যাসিস্ট হিটলার-মুসোলিনির গণধ্বংসযজ্ঞ; 'মানুষ', কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার খায়নি। জুলুমশাহী হটে গেছে এবং মানুষেরই জয়। প্রসঙ্গত, আপন কালে আপন দেশে আমাদেরই তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ১৯৪৭-৭১-এর ইতিহাস। শুরু থেকেই পাকিস্তানি দুঃশাসনের আছর, আর তা চরমে উঠেছিল আইয়ুব-ইয়াহিয়া জোটের তাণ্ডবে। কিন্তু টেকেনি। তারপর হাজার বছরের বাঙালির মহত্তম অর্জন; ডাক দিয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ।

অবশ্য এমততুল্য নজির রয়েছে কালে কালে, দেশে দেশে। স্মরণ করব—জাতির জীবনে ব্যতিক্রমী বিশেষ ব্যঞ্জনাতেই একে দবিস আসে ইতিহাসের প্রতীক হয়ে, নতুন করে প্রেরণার উৎস হয়ে। এখন মিলিয়ে নেব। পুনরায় উদ্ধৃত করি '৭১-এর ছাব্বিশে মার্চ ইতিহাসের অমোঘ দুর্বার সেই কণ্ঠ : 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। ...বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায়। জয়বাংলা।' ২শ' বছরের মতো, অমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৭৬-এর ৪ জুলাইতে Declaration of Independence. তাতে ঘোষিত হয়েছিল : That all men are created equal, that they are created equal, that are endowed by their creator with cretain unalienable rights, that among these are life, liberty and persuit of happiness. বলাবাহুল্য, ঐ একই সত্যের উচ্চারণ মানুষের কল্যাণে মানুষের জয়ের লক্ষ্যে। আব্রাহম লিংকনের যে ইতিহাসোজ্জ্বল

Gettysburg Address তাতে রয়েছে কী?... That this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

পরের শতাব্দীর উপান্ত পর্বে আমার বাংলাতে ছাব্বিশে মার্চ এবং অবশ্য অকস্মাৎ নয় তো' বিশেষ দিবসের ডাক। পটভূমির গভীরে বিস্তারে রয়েছে কত। দিনে দিনে সঞ্চিত হয়েছে, প্রস্তুত করে তুলেছে ঘরে ঘরে। সমকালীন তখনকার আমরা ভুলিনি। বিশ্বাস ধারণ করি, শুদ্ধতম দায়িত্ব প্রবীণ আমাদের সেই স্বাধীনতার আহ্বান সঞ্চারিত করে দেবে বংশধর তরুণ প্রজন্মের কাছে: 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা।' এখন তবে ইমানে বুঝে নিতে চাইছি—মহাকাল ইতিহাসের বিশেষ এক 'সাতই মার্চ' এসে কেমন উত্তরিত হয়ে যাচ্ছে ছাব্বিশে মার্চে। সেইখানে বছরে বছরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—'স্বাধীনতা, আমার সেই স্বাধীনতা।'



মোঃ ইসরাফিল আলম

বিজয়ের প্রাণপুরুষ

বাংলার বিজয় সত্যিকার অর্থে হাজার বছরের সাধনার ফসল যার মহানায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিজয় ছিনিয়ে আনার পর এর প্রজ্বলিত শিখায় যার নাম ফুটে ওঠে, বিজয়ের প্রাণপুরুষ তারই হওয়া স্বাভাবিক। কালের পরিক্রমায় পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তির গান শোনাতে, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে যিনি ছুটেছেন দেশের ধনী-দরিদ্র, বুদ্ধিজীবী, লেখক-প্রাবন্ধিক-গবেষক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজকে সাথে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পথে, ঘাটে, গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে, জেলায়, উপজেলায়, শহরে-বন্দরে পরিভ্রমণ করেছেন আর ঘুমন্ত মানুষের মনে মুক্তির স্বপ্ন বীজ বোপণ করেছেন—আলোচনা, বিবৃতি, প্রতিবাদ ও বক্তৃতার মাধ্যমে। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের যিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ সেই মহা মানব সম্পর্কে কিছু কথা আলোচিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম হঠাৎ করে জেগে উঠার কোনো ঘটনা নয়। সত্যিকার অর্থে এটা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার গতিপথে দীর্ঘদিন থেকে ধাপে ধাপে তিল তিল করে গড়েওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের এক চূড়ান্ত রূপায়ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অধিকার থেকে স্বাধিকার, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে, সেই সংগ্রামই মুক্তিসংগ্রাম তথা স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। একজন অজ্ঞাত অখ্যাত মানুষের মুখে উচ্চারিত ঘোষণা শুনে একটি ভূ-খণ্ডের সমগ্র

জাতি স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এ ধরনের আজব ইতিহাস বিশ্বের কোথাও নেই। শুধুমাত্র বাংলাদেশের কতিপয় চিহ্নিত মানুষ তাদের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থে এ ধরনের একটি গাঁজাখুরো ইতিহাস সৃষ্টির জন্য, বিগত বহু বছর ধরে অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ কারণেই আমার বিনীত অভিমত হলো—এক শ্রেণির জ্ঞানপাপী একজন সেক্টর কমান্ডারকে মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে গিয়ে, আমাদের মহান মুক্তি ও স্বাধীনতার দীর্ঘ গৌরবগাথা ইতিহাসকে শুধুমাত্র ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। বিজয়ের ২৫তম বর্ষ বা রজত জয়ন্তীকে স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের রজত নামে আখ্যায়িত করে, ন্যায় ও নীতি ভ্রষ্টদের দিয়ে নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করে। কিছু মুখোরোচক শব্দমালা দিয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বিভ্রান্তির অধ্যায় সূচনা করার অপচেষ্টা হচ্ছে। কারণ '৪৮ সাল, '৫২ সাল, '৫৪ সাল, '৬২, '৬৪ সাল, ৬ দফা, আগরতলা মামলা, '৬৯-এর ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু অবিস্মরণীয় ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা বাঙালি জাতির চেতনা ও মূল্যবোধকে শাণিত করতে করতে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছিল চূড়ান্তভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এসব আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অন্তর্গত মৌলিক উপাদান—যা বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ বয়ে যায়। তাই যারা অর্বাচিন, তারাই কেবল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হিরো বানানোর জন্য, স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ইতিহাসকে ৯ মাসের মধ্যে সংকুচিত করতে চান, তাদের সাথে বিনয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলা যায়—দ্বিজাতিতত্ত্বের মতো একটি ভ্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামের অবাস্তব রাষ্ট্র জন্মলাভের পর থেকেই মূলত শুরু হয়েছিল আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রাম। এক কথায় পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রাম যেখানে শেষ—বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহৎ স্বপ্নের সেখানেই শুরু। আর এই সুদীর্ঘ নিরন্তর প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু তথা প্রাণপুরুষ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার হাতিয়ার ছিল তারই নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তার বিশাল কর্মী বাহিনী। বাঙালি জাতির মুক্তি তথা স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, কর্নেল এমএজি ওসমানী, ছাত্রলীগ তথা তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারগণ ও প্রবাসী সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। সর্বোপরি যুদ্ধকালীন সময় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের

জনগণের অবদানের কথা স্বীকার না করলে জাতি হিসেবে আমরা অকৃতজ্ঞতার নোংরা অভিযোগে অভিযুক্ত হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, সেদিন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অনুপস্থিতির কারণে পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম সেনা কর্মকর্তা হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমান স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্বে আয়োজিত, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান সাহেবের অনুরূপ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে (On behalf of our Great Nationalist Leader) ২৭ মার্চ '৭১ যে স্বাধীনতার ঘোষণা জাতির সামনে পাঠ করেছিলেন—সেই ঘটনা অবশ্যই মুক্তিকামী বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক বীর জনতাকে অধিকতর উৎসাহ জুগিয়েছিল। পাশাপাশি বাঙালি জাতিকে নিস্তব্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র 'সোয়াত' জাহাজযোগে পাঠানোর পর জনগণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্যেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে মেজর জিয়াকে যখন দেখা গেল সেসব অস্ত্র খালাস করতে যাচ্ছেন। তখন স্বাধীনতা সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা তথা প্রতিশ্রুতির গভীরতা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। তারপরেও একটি পর্যায়ে এসে যেসব বাঙালি সন্তান নিজের জীবন ও পরিবার পরিজনদের মোহমায়া পরিত্যাগ করে, মুক্তির সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করেননি। তারা নিশ্চয় এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানে ভূষিত হবার অধিকার রাখেন। মুক্তি বা স্বাধীনতার যুদ্ধ আমাদের জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন, সর্বোচ্চ অহংকার ও বৃহত্তর ঘটনা। এখানে যার যতটুকু অবদান তা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে স্বীকার না করলে জাতি হিসেবে আমরা মহত্বের পরিচয় দিতে পারব না। এই ইতিহাস বিকৃতির নামে সত্য-মিথ্যার হোলিখেলায় বিগত দিনগুলোতে পরাজিত শক্তিসর্বত্র লাভবান হয়েছে, আর মাতৃভূমি হয়েছে রক্তাক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। বিজয়ের সোনালি আলোয় দেশ মাতৃকাকে আলোকিত করতে চাইলে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যাপক ঐক্য এবং যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য। এ কাজটি হয়তো হতে পারে কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ মহান স্বাধীনতার সুকঠিন যুদ্ধে যে জাতি বিজয় অর্জন করেছে তাদের কাছে দেশ ও জাতি গঠনের কাজ অসম্ভব হতে পারে না। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় এবং মুক্তিসংগ্রামকে নসাৎ করার জন্য শুরু থেকেই এক শ্রেণির মানুষ তৎপর ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু বাঙালি জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে

কোনো অপশক্তি কখনো সফল হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না। প্রয়োজন শুধু বঙ্গবন্ধুর মতো নির্মোহ, সংগ্রামী, আপসহীন ও দূরদর্শী নেতৃত্বের উপস্থিতি, যা তার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার মধ্যে বার-বার প্রতিফলিত হয়েছে। যে কারণে অভিজ্ঞজনরা বলেন—পিতার সৃষ্টিকে কন্যা গড়ছেন ও বিকশিত করে চলছেন।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের শরণাপন্ন হলে দেখা যাবে, শেরে বাংলার মতো নেতাও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির স্বার্থ সংরক্ষণের অগ্নিপরীক্ষায় সব সময় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। মওলানা ভাসানীও সামরিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে চীন সফর শেষে দেশে ফিরে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' এই ভাষায় নসিহত করে, আইয়ুবী শাসনকে দীর্ঘ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আইয়ুববিরোধী অগ্নিঝড়া আন্দোলনকে শীতল করতে চেয়েছেন। তিনি '৭০ সালে জাতির যুগান্তকারী নির্বাচনের প্রশ্নে 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান দিয়ে নির্বাচনকে বয়কট করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মুক্তিকামী বাঙালি জাতির মুক্তির চূড়ান্ত ম্যান্ডেট দেবার সূবর্ণ সুযোগ ঐ নির্বাচনের মধ্যেই লুকায়িত ছিল। সবকিছুর পরেও সেই নির্বাচন হলো, সফল নির্বাচন; রাষ্ট্র প্রসবিনী নির্বাচন। তারপর নির্বাচনকে বানচাল করতে না পেরে শুরু হলো নির্বাচনী রায় নস্যাৎ এর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র অপরাপর দলের সীমানা অতিক্রম করে অনুপ্রবেশ করেছিল বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভেতরে। সেই ষড়যন্ত্রের অপছায়াময় পথ অতিক্রম করে বাঙালি জাতি আজও আলোকিত পথে আসতে পারেনি। তাই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও খন্দকার মোশতাক, চাষী, ঠাকুর, জিয়া, শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিচ্ছিন্ন অংশ পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। যে কারণে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন সাহেব ষড়যন্ত্রকারী মোশতাককে লাহোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগদান করতে না দিয়ে জাতিকে মহাবিপর্যয় হতে রক্ষা করেছিলেন। ওদিকে প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানী সাহেব রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সেক্টর কমান্ডারদের অন্যতম মেজর জিয়ার সন্দেহজনক গতিবিধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে এবং এক পর্যায়ে তাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের আড়ালেও যুদ্ধ হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করার জন্য, সব কিছুকে পরাস্ত করে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়েছিল, দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের কি সমাপ্তি হয়েছিল। না সমাপ্তি নয়, ক্ষণিকের জন্য

ষড়যন্ত্র হোঁচট খেয়েছিল এবং আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল অর্জিত স্বাধীনতা ব্যর্থ করার জন্য। যে কারণে খন্দকার মোশতাকদের মতো ষড়যন্ত্রকারীরা বহাল থাকলেও শহীদ তাজউদ্দীনের মতো দেশপ্রেমিক পরীক্ষিত নেতাকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। চরমপন্থী বাম দলগুলোর নীতি ও লাইনের মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকার কারণে, তাদের কথা বাদ দিলেও জাসদের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ইন্ধনদাতারা তো বঙ্গবন্ধুর আশপাশে নিবিড়ভাবে মিশেছিল। সেই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে চিহ্নিত করতে না পারার ব্যর্থতার ঋণ পরবর্তীতে জাতির জনক ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং কারাগারে বন্দী ৪ জাতীয় নেতার জীবনের বিনিময়ে শোধ করতে হয়েছিল। আর শহীদ তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর ও কামরুজ্জামান সাহেবরা জীবন দিয়ে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিল। অন্যদিকে মোশতাক-জিয়া চক্র তথা '৭১-এর পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতির সরাসরি বেনিফিসিয়ারি হয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলো '৭১-এ স্বাধীনতার বদলে কনফেডারেশন গঠনের যে স্বপ্ন তারা দেখেছিল তা তখন বাস্তবায়ন না হলেও সেই অভিন্ন লক্ষ্যকেই সামনে রেখে আজীবন তারা কাজ করেছে। তার পর আরো বিপন্ন বিস্ময়ে জাতি প্রত্যক্ষ করলো, ষড়যন্ত্রকারীদের অসাধারণ সাফল্যের কাছে '৭১-এর বিজয়ী শক্তি '৯৬ সাল পর্যন্ত বার বার শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও পরাভূত হয়েছে। সেই অধ্যায় বড়ই নির্মম—কর্নেল তাহেরের দ্বারা খালেদ মোশাররফ, জিয়ার দ্বারা কর্নেল তাহের, মঞ্জুর দ্বারা জিয়া, এরশাদের দ্বারা মঞ্জু (এরশাদ নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না কিন্তু তার শক্তির মূলস্তম্ভ ছিল মুক্তিযোদ্ধারা) এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতি খেলার সমুদয় প্লাস পয়েন্ট গিয়ে জমা হলো মুক্তিযুদ্ধবিরোধী '৭১-এর পরাজিত শক্তির একাউন্টে। ২১ বছরে অনেক জীবন বিয়োগ আর স্বজন হারানোর বেদনায় সিক্ত হয়ে '৯৬ সালে বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি আবার জেগে ওঠে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পুনর্জাগরণ যেন আর কোনো দিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পরাস্ত না হয়—সেই দূরদর্শীতা বাঙালি জাতি শেখ হাসিনার কাছে নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে, কারণ এই বীরের জাতি ও এই রাষ্ট্রের স্থপতি তাঁরই পিতা বঙ্গবন্ধু। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুকন্যা এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সতর্ক হতে হবে দলের ও সরকারের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। কেননা তাদের এ সতর্কতার উপর দল ও দলের দীর্ঘ নির্যাতন ভোগকারী ত্যাগী নেতাকর্মী এবং

জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে, নির্ভর করছে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতা ও প্রাণপ্রিয় সার্বভৌমত্ব। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাঙালি জাতি তাদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বপ্ন সাধের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিজয় অর্জন করলেও সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বীর বাঙালির মুখে সেদিন বিষাদের প্রতিচ্ছবি এবং অতৃপ্তির কালো ছায়া ছিল স্পষ্ট। কারণ স্বাধীনতার যুদ্ধে অর্জিত বিজয় তখন তাদের নাগালের মধ্যে থাকলেও বিজয়ের মহানায়ক এবং প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু ছিল পরাজিত পশুশক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের জিন্দান খানায়। ইতিহাসের মহানয়ক, এই শস্য শ্যামল বাংলার রাখালরাজা বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তার প্রাণপ্রিয় স্বাধীন স্বদেশভূমিতে পদার্পণ করে যখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।

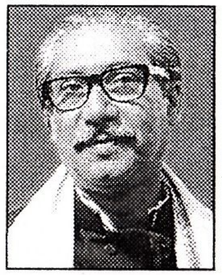
তখনই বাঙালি জাতি মূলত তাদের বিজয়ের পরিপূর্ণ সাধ প্রথমবারের মতো উপভোগ করতে পেরেছিল। এখানে যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার, তাহলো বঙ্গবন্ধু যেমন এই পরাধীন বাংলার মাটি ও মানুষকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসে তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতিও তাদের মুক্তির দিশারী, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিবর্জিত স্বাধীনতা কখনো কামনা করেনি। যার স্বাক্ষর বাঙালি জাতি তাদের ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষার সময় বার বার স্পষ্ট করে রেখে গেছে। বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনে তারা সদাসর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মতো সাড়া দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর উপর যখনই পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নির্যাতনের স্টীম রোলার কিংবা ষড়যন্ত্রের হিংস্র থাবা নেমে এসেছে তখনই বাঙালি জাতি প্রতিবাদের আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে সকল অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের জাল পুড়ে ছাড়খার করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে হয় মোশতাক চক্ররা '৭১-এ যুদ্ধ চলাকালীন সময় বাঙালি জাতিকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার জন্য এক মারাত্মক স্পর্শকাতর প্রশ্নের অবতারণা করে বলেছিলেন—'তোমরা বঙ্গবন্ধুকে চাও? না বাংলাদেশ চাও?' সেদিন তারা সমস্বরে বলেছিল—'দুটোই চাই।' কারণ বঙ্গবন্ধুর মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে তাদের কাছে কোনো অংশে কম ছিল না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শব্দ দুটো তাদের কাছে এক এবং অভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়—বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জাতি এই দুটো আলাদা সত্তা সে সময় অভিন্ন শক্তিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল বলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তার কণ্ঠেই সেদিন কোটি

কোটি বাঙালির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তাই এক মুজিবকে বন্দী করলেও তাঁর অতুল স্পর্শে সৃষ্ট লক্ষ কোটি মুক্ত মুজিব বাংলার শ্যামল প্রান্তরে দখলদার পাক সেনাদের রক্তাক্ত বন্যায় পরাজিত ও পরাস্ত করেছিল এবং তাদের চির চাওয়া স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল।

ইতিহাসের পাতা থেকে পাওয়া যায় যে, 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'বাঙালি জাতি' এই দুটো সত্তার সফল মহামিলনের ফলশ্রুতিই হলো আজকের স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'। তাই বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং বাংলাদেশ এই শব্দগুলো যেমন সমার্থক তেমনি বাঙালি জাতির দীর্ঘ ও নিরন্তর মুক্তিসংগ্রামের সফল গতিপথের নির্ধারক এবং নেতৃত্ব দানকারী মহান নেতা হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যে অর্জিত বিজয় তার প্রাণপুরুষ আর কেউ নয়, তিনি বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা—স্বাধীনতার মহান স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান।

তথ্যসূত্র

১. ড. এ এইচ খান সম্পাদিত মুজিবের রচনাসংগ্রহ
২. এইচ.টি. ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-৭৫
৩. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী।
৪. মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১
৫. মফিদুল ইসলাম, মূলধারা '৭১
৬. ড. এ এইচ খান সম্পাদিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
৭. মোঃ শাহজাহান, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, মুজিব মানেই মুক্তি
৮. আবদুল ওয়াহাব, ফোকলোর মানবতাবাদ ও বঙ্গবন্ধু
৯. মোঃ ফখর উদ্দিন মণ্ডল, মুজিব : বাংলার আর একনাম
১০. ড. ওয়াজেদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ
১১. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি
১২. মেজর রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
১৩. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নুরুল কাদির, তিনশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা
১৪. মোঃ ওমর ফারুক চৌধুরী ও অন্যান্য, শেখ হাসিনা : জীবন ও সংগ্রাম
১৫. ড. শাহাদাত হোসেন সম্পাদিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ড. মো. মাহবুবর রহমান

মুক্তিদাতা শেখ মুজিব

যে কোনো একটি দেশ তথা জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত অর্জন বা অধ্যায় যদি হয় তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, তাহলে বাঙালি জাতির জীবনে সেই অধ্যায়ের সৃজক, প্রাণপুরুষ, শক্তি, সংগঠক ও মহানায়ক হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু, কারিগর এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আর এর মালিক সর্বস্তরের জনগণ। তিনি মুক্তি এনে দিয়েছিলেন একটি জাতির। মুক্তির প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার বেড়াজাল ও শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন বাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের অনুসারী এ দেশীয় ঘাতক-দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর ইতিহাসের বব্বরতম হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন চালিয়েছে; যুদ্ধাপরাধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করেছে। এসব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করেন বঙ্গবন্ধু। অতঃপর তিনি যখন গোটা জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে স্বাধীনতার বিপক্ষের কুচক্রী মহল ও কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এজন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায়। এদিন ইতিহাস হারিয়েছে তার মূল

রচনাকারীকে, দেশ হারিয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতাকে আর জাতি হারিয়েছে তার প্রাণপ্রিয় পিতাকে।

ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত সমগ্র বাঙালি জাতির গর্বের ধন মহান স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ধূলিসাৎ করাই ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রধান উদ্দেশ্য, যা ছিল এক চরম ভ্রান্ত ধারণা। এ কারণে আহমেদ ছফা লিখেছেন, 'একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক মিশনকে হত্যা করা যায় না। কারণ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে কিন্তু আদর্শের মৃত্যু নাই।' অন্নদাশঙ্কর রায় কোনো এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'বাঙালি বেঈমান, তারা জাতির পিতাকে হত্যা করেছে—পিতৃহত্যাকারী।' জাতির পিতার হত্যাকারীদের ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে যে এক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, সে জাগরণকে ধরে রাখতে হবে। লাখো কোটি মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভেজা এ মাটিকে মানুষের কল্যাণে একটি সার্থক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিতে হবে। আগস্টের শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শাহাদতবরণ করার এত বছর পরও এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শুধু ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি। এর নেপথ্যে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে চিরতরে মুছে ফেলা। চক্রান্তকারীদের ধারণা ছিল, সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে অনেক ভালোবাসে আর বঙ্গবন্ধুর ডাকে গোটা জাতি একতাবদ্ধ হলে তাদের মধ্যে আরও বেশি রাজনৈতিক সচেতনতা কাজ করবে। এ কারণে ঘাতকরা '৫৪ সালের বিজয়কে স্তব্ধ এবং '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০-এর আন্দোলন-সংগ্রামের বিজয়কে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে গণজোয়ার, একতা এবং আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল, সে কারণে একাত্তরে ওই সাম্প্রদায়িক কুচক্রী মহল সফল হতে পারেনি। আর তাই কাপুরুষোচিত পথে সে প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল পঁচাত্তরে।

১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এর প্রধান সুবিধাভোগকারী জিয়াউর রহমান তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ও যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসনে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতেই বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়। জিয়াউর রহমান এ দেশের

সংবিধানের ভিত্তি পরিবর্তন করে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে ধর্মকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী সময়ে তারই হুকুমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার থেকে রেহাই দিয়ে জারি করা হয় কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। খুন, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত দুষ্কৃতকারীরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় এবং এসব খুনি-অপরাধীকে সরকারি উচ্চপদস্থ বিভিন্ন পদে আসীন করা হয়। দেশত্যাগী রাজাকাররা দেশে আবার পুনর্বাসিত হয়। বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে একটি জাতিকে মুক্তির আলোকবর্তিকা দেখিয়েছেন, আর তার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের স্বাগত জানিয়ে স্বাধীনতার বিজয়কে মলিন করা হয়। এভাবে ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করার নানা কৌশল প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের আতংকের সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির অপচেষ্টাও চালানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার কর্মের মধ্য দিয়েই এ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরঞ্জীব, চির অম্লান হয়ে আছেন।

স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকলে বিশ্বের বুকে আজ বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় থাকত? বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও রূপ আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? ১৯৭২ থেকে '৭৫—এই সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ যেভাবে প্রতিটি সেক্টরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছিল, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তা আর ধরে রাখা যায়নি। বরং তৎপরবর্তী বঙ্গবন্ধুর খুনিদের এবং যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করে এ দেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় ১৫ আগস্ট এক নির্মম কালো অধ্যায় হয়ে আছে। বাংলাদেশ নামের একটি দেশ যতদিন বিশ্বের মানচিত্রে থাকবে, বাঙালি জাতির ইতিহাস ও পরিচয় যতদিন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের পাতা থেকে ১৫ আগস্টের কলংক ও ক্রন্দন মুছে ফেলা যাবে না। বাঙালি জাতি কিছুটা সৌভাগ্যবান যে, ১৫ আগস্টের নির্মমতা থেকে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু থেকে পাওয়া প্রজ্ঞা, সাহস, নৈপুণ্য, ও কার্যক্রমে মৃতপ্রায় জাতি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদালাভের জন্য দেশ দ্রুত অগ্রসরমান। সমুদ্র বিজয় হয়েছে, দীর্ঘ সময়ের ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। তবে মনে রাখতে হবে,

ষড়যন্ত্রকারীরা বসে নেই। এরই মধ্যে তারা অনেক চক্রান্ত করেছে, দেশি-বিদেশি দোসরদের দ্বারা নানা কূটকৌশলের জাল বুনেছে, জঘন্য কায়দায় মানুষ হত্যাসহ অনেক পৈশাচিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, অনেক গোপন চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার নানা পদক্ষেপ নিয়ে তারা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, কুচক্রীরা সুযোগ পেলেই আবারও একটি ১৫ আগস্ট ঘটাতে পারে। তাই আমাদের বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'ডাকিছে তোমারে' কবিতায় যথার্থই বলেছেন—'এই বাংলায় আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরী ও নদী/ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি।' জানি বঙ্গবন্ধু আর সেভাবে ফিরে আসবেন না, তবে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ, উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মাঝেই আমরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব—এই হোক আমাদের প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি।



মোনায়েম সরকার

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলার মানুষ যে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু মাত্র পঁচিশ দিনের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একটা জাতির স্বাধীনতার দাবিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করার মতো ঘটনা ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধুর নামে সৃষ্টি হয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও জনগণের সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের বিরামহীন রাজনৈতিক সংগ্রাম। মূলত বঙ্গবন্ধুর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বেই এ দেশের মানুষ এগিয়ে গেছে গণতন্ত্রের পথে, অসাম্প্রাদয়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার দিকে, জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ধাপে ধাপে আন্দোলনের ফলাফলকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে, ছাত্র-জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির মহান নেতা। তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন জাতির জনক রূপে।

পাকিস্তানি সামরিক আমলাতন্ত্রবিরোধী বাঙালি জাতির সংগ্রামের মাইলফলক ছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়,

ষাষট্টির ছাত্র-জনতার আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিতে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত সেই অভ্যুত্থানের পটভূমিতে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকলে এবং বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। সংগ্রামের এ রক্তাক্ত পর্যায়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন, যাতে বঙ্গবন্ধুই কার্যত সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যান। দেশ চলতে থাকে তাঁর নির্দেশে। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েই আন্দোলন-সংগ্রামের কাফেলায়। হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাইভেট কোম্পানির কর্তাব্যক্তিসহ শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, জনতা তথা সকল শ্রেণী-পেশার ও সর্বস্তরের মানুষই সামিল হয়ে পড়েন এই গণসংগ্রামে। বাংলার অঘোষিত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে সবকিছু। সর্বকালের সর্বব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছিল একটি জাতির মুক্তি ও একটি দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ধারায়।

এবার আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দালনের ঘটনা প্রবাহের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল ১৯৭১-এর ৩ মার্চ। জনগণ আশা করেছিল যে, তার আগে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে। এ পটভূমিতে ১ মার্চ ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সভা চলছিল। বেলা ১:০৫ মিনিটে বেতারে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। খবর শুনেই ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্বাণী হোটেলের সামনে সর্বস্তরের জনতার ঢল নামে। সেখানে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেন। ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে, কার্যত ১ মার্চ থেকেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশ পরিচালিত হতে থাকে।

জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণায় শুধু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশই দেয়া হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-এডমিরাল এসএম আহসানকে বরখাস্ত করে লে. জেনারেল সাহেবজাদাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ঘটনাক্রম পরিচালিত করা হয় সামরিক সংঘাতের দিকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাত্রনেতাদের ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি এক বিবৃতিতে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল অবধি অর্ধদিবস হরতাল পালনের নির্দেশ দেন। ২ মার্চ ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন।

২ মার্চ রাতে কারফিউ জারি করা হয়। ছাত্র-জনতা কারফিউ ভঙ্গ করলে সেনাবাহিনী গুলি চালায়। কারফিউ ভঙ্গকারী ছাত্র-জনতা-শ্রমিক-কৃষক স্লোগান দেয়—'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' বাংলাদেশের সর্বত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি শাসকরা অবাঙালিদের উস্কানি দিলে তারা বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর হামলা চালায় ও অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ চলে। ঐ রাতে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৮ জন বাঙালি নিহত হয়। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। উক্ত ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

৩ মার্চ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপক রূপরেখা দেন। তিনি দশ দফা কর্মসূচিতে তা উল্লেখ করেন। এই কর্মসূচির দশ নম্বর দফায় ইউনিয়ন থেকে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে তিনি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান জানালেন। এই দিনেই লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রতিরোধী শ্রমিক-ছাত্র-জনতার ওপর সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। প্রতিদিন শত শত লোক হতাহত হয়। পাকিস্তানিরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় উস্কানি দেয়। সৈয়দপুর, পাহাড়তলীতে অবাঙালিদের হাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্র

তুলে দেয়। জনগণের দাবির মুখে ৮ মার্চ বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে স্লোগান দেয়। সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ অনুরূপভাবে এগিয়ে আসে। মধ্যপন্থী, জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী নির্বিশেষে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তোলে। ১৪ মার্চ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলো এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন জানান এবং প্রেসিডেন্টকে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান সাপেক্ষে কেন্দ্রে ও প্রদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দাবি জানান। সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি তারা সমর্থন দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দান করেন। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচি শুরু হয় তা ৩৫টি বিশদ নির্দেশের আকারে প্রদত্ত হয়েছিল। এ নির্দেশগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যদিও ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে দেশ পরিচালিত হচ্ছিল, ১৫ মার্চ থেকে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের হাতেই ন্যস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তখন থেকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করে। শুধু প্রাদেশিক সরকারি দপ্তর নয়, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরসমূহও বঙ্গবন্ধুকেই আইনসঙ্গত নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানরূপে গণ্য করে তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতে থাকে। বস্তুত, একটি সরকার দেশের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যে যে দায়িত্ব পালন করে, বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশনায় ঐসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়।

যেমন ১নং নির্দেশে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের সমস্ত কোর্ট-কাচারি বন্ধ থাকবে। এর দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপ পরিপূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

৩নং নির্দেশে—জেলা ও মহকুমা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসনকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা ও

সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং এসব নির্দেশ আন্তরিকভাবে পালিত হয়েছিল।

২৫নং নির্দেশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে, কিন্তু স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো যাবে না।

বস্তুত ৩৫টি নির্দেশনামায় বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এমন সুচিন্তিতভাবে উল্লিখিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এবং অধিকার বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে আসে। এ নির্দেশগুলো প্রকৃতপক্ষে ছিল বঙ্গবন্ধু প্রণীত ছয় দফারই বাস্তবায়ন।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত নির্দেশাবলী সারা পূর্ববাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। বস্তুত, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলার সব প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদির কাজ চলছিল। পাকিস্তান সরকারের কোনো অস্তিত্বই তখন ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সমান্তরাল সরকার।

১৫ মার্চ কঠোর সামরিক প্রহরায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। তার সাথে এলেন জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল খোদাদাদ খান, জেনারেল মিঠঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, এমএম আহমেদ, জিডব্লিউ চৌধুরী প্রমুখ সামরিক আমলাচক্রের প্রধান কর্মকর্তা। পিপিপি নেতা জেড এ ভুট্টো পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধানের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের প্রশ্ন বিবেচ্য নয় বলে বিবৃতি দিলেন।

বস্তুত এই বিবৃতির মাধ্যমে ভুট্টো স্পষ্টতই আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন। পিডিপি নেতা নূরুল আমিন ভুট্টোর এই বিবৃতি অবান্তর ও নৈরাশ্যজনক বলে মন্তব্য করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ ভুট্টোর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ইয়াহিয়া খান তার কথামতো চললে পাকিস্তানের বিভক্তি অনিবার্য। এদিকে পিআইএ বিমানে পূর্ব বাংলায় সৈন্য আনা চলতে থাকে। বিমানবন্দরের দায়িত্ব ১ মার্চ থেকে সামরিক বাহিনী গ্রহণ করেছিল, এই দিন স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহূত জনসভায় ছাত্রনেতারা ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের জনগণ একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে চলবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের আগে প্রেসিডেন্ট ভবনে সামরিক অফিসারদের সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনা করেন। ১৬ মার্চ

ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব একান্ত বৈঠক হয়। বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া বৈঠকে উভয় দলের কোনো সাহায্যকারী উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিরে এসে বললেন, আন্দোলন চলবে, অসহযোগ চলবে।

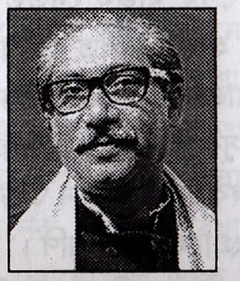
১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বৈঠকের পরই পাকিস্তানি সামরিক চক্র তাদের পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ পায় ইয়াহিয়া খানের নিকট থেকে। এই দিনের আলোচনায় উভয়পক্ষই স্ব স্ব উপদেষ্টা তথা সহকর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন। মূলত ঐদিনই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বৈঠকের পর। প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল টিক্কা খান প্রবেশ করলে ইয়াহিয়া খান তাকে বললেন, 'প্রস্তুত হও'। সশস্ত্র প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে বাঙালিদের জন্য। জনগণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের নির্দেশাবলী কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস বাংলাদেশে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ভবন ব্যতীত সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ছাত্রনেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেয় এবং তিনিই সেই পতাকা উত্তোলন করেন।

২৪ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সাথে দু ঘণ্টা স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও ছাত্র-জনতা অবরোধ গড়ে তোলেন। সৈয়দপুরসহ বিভিন্ন স্থানে অবাঙালিরা সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাঙালি হত্যা শুরু করে। তাজউদ্দিন আহমদ সৈয়দপুরে ও অন্যান্য স্থানে বাঙালি হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানান। জয়দেবপুরে ইপিআর ব্যাটেলিয়ন ১৯ মার্চ গুলি চালাতে অস্বীকার করলে পাকিস্তান সামরিক জান্তা বিভিন্ন স্থানে ইপিআরের বাঙালি জওয়ান ও অফিসারদের নিরস্ত্র করার জন্য গোপন নির্দেশ দেয়। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসারদের ওপর কড়া নজর রাখা হলো। তাদের ঐ মুহূর্তে নিরস্ত্র করা হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে ক্ষুণ্ন হবে এ কথা ভেবে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কৌশল অবলম্বন করে। চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা বিভিন্ন স্থানে সেনা ব্যারাকে বাঙালি অফিসারদের গিয়ে সশরীরে জানানোর ব্যবস্থা হয়। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী দুটি হেলিকপ্টারে করে সবকটি ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে ব্রিগেড কমান্ডারদের 'অপারেশন সার্চলাইট' কার্যকরী করার দিনক্ষণ জানিয়ে দেন।

২৫ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ২৪তম দিন। দুপুরের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের যার যার এলাকায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সারাদিন একধরনের থমথমে ভাব ঢাকায় বিরাজ করছিল। এদিকে আগের দিনই পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যরা ঢাকা ত্যাগ করেন। ভুট্টো থেকে যান। ২৫ মার্চ তারিখ ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, 'পরিস্থিতি সংকটজনক'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে খবরটি বেশিক্ষণ গোপন থাকেনি। সন্ধ্যা ৭টায় বিমানে আরোহণের পরই উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার বঙ্গবন্ধুকে খবরটা পাঠিয়ে দেন।

বঙ্গবন্ধু তার অভীষ্ট লক্ষ্যে ছিলেন অবিচল। অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি পাকিস্তানি শাসক ও রাজনীতিকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণকে ও বিশ্ববাসীকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আর কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের জবাবেই আন্দোলনের সশস্ত্র পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল, যা বিজয় অর্জন করেছিল মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।



মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রশাসক মুজিব

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসন সম্পর্কে জানার আগ্রহ দীর্ঘ একুশ বছর পর নতুন করে দেখা দিয়েছে। তবে, একটি চিহ্নিত মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কৌশল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনে নানা ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। আবার বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে অতি মানবের আসনে বসিয়ে দেয়ার যে প্রয়াস পাচ্ছে, তাও সবক্ষেত্রে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর নয়। ফলে সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে শেখ মুজিব কতটুকু অর্জন করতে পেরেছিলেন তার সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে। আমার পক্ষে কাজটি সহজ নয় এ কারণে যে, জাতির জনকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়, তার ফলশ্রুতিতে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তিনির্ভর হওয়া আমার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে আমার একটা বাড়তি সুবিধা এই যে, আমি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি, কোনো দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নই এবং ছিলামও না। তাছাড়া তথ্যনির্ভরতায় আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে কারণে এবং সঠিক চিত্র অনুসন্ধানে স্মৃতিনির্ভর না হয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কেন করে, বর্তমান নিবন্ধনটিতে তা বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করা হবে। মূল্যায়নের ভারটি থাকবে পাঠকবর্গের বিচার-বিশ্লেষণের উপর।

স্বাধীনতার পটভূমি

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশটির অভ্যুদয় একাত্তরের

ষোলই ডিসেম্বর তারিখে হঠাৎ করে ঘটে যায়নি। নিরলস সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়, বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে এবং অপমান, বঞ্চনা, অত্যাচার ও গণহত্যার প্রেক্ষপটে বাঙালি জাতির প্রিয় স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেন। উনিশশ' চল্লিশ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' বা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ এবং বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মধ্যে একটি অভিন্ন সুর খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কি, বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অর্জনে আটচল্লিশ সাল থেকে শেখ মুজিব ছিলেন সব আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যমণি। চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে অভিন্ন বাঙালিসত্তার ভিত্তি রচনায় যুক্তনির্বাচনের অঙ্গীকারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নে বাঙালির স্বার্থ বিপন্নতার বিরুদ্ধে ও ছাপ্পান্নর শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন সোচ্চার। সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পাকিস্তানি নব্যঔপনিবেশিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনকালে যখন বাঙালি ছাত্রসমাজ তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ধ্যান-ধারণাবিরোধী একটি ঔপনিবেশিক পশ্চাৎমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলন গড়ে তোলে, তখনও শেখ মুজিবকেই তাদের পাশে দেখা যায়। ছেষট্টির ছয় দফার প্রেক্ষপটে শেখ মুজিবের উপর আরও ভয়ঙ্কর জুলুম নেমে আসে এবং তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি খুনিচক্রটি ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা শুরু করে। বাঙালির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, গর্জে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। টলটলায়মান হয়ে গেল স্বৈরশাসকদের মসনদ। ছয় দফা ও এগারো দফার দুর্বার যৌথশক্তি এবং সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের চমৎকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফসল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। শেখ মুজিবকে নিয়ে এলো স্বাধীনতার আন্দোলনের শিরোমণি অবস্থানে। ডাকসুর সহ-সভাপতি তেজস্বী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সমগ্র বাঙালি জাতির মনের কথা প্রাণের দাবির প্রতিধ্বনি করলেন তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে স্বাধিকারের কথা বললেও মূলত স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই শুরু করার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন। সত্তরের নির্বাচন সুযোগ করে দিল, কারণ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের পেছনে

ঐক্যবদ্ধ হলো। নভেম্বরে সত্তরের প্রলয়ঙ্করী ও সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে যখন কয়েক লাখ বাঙালি মৃত্যুবরণ করে, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিদেশ ভ্রমণে। আর্তপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি শাসককুল। এতোদিনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। তারা বুঝতে পারে যে, বাংলাদেশকে শোষণ করাটা পাকিস্তানিদের একমাত্র কাজ। ইসলামের ফাঁকা বুলি অসাড় প্রতিপন্ন হয়, কারণ পাকিস্তানিরা মোটেও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করেনি এবং বাঙালিদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করেনি। সত্তরের নির্বাচনের একটি সুবিধা এই ছিল যে, সরাসরি সেনাপতি শাসকের সমর্থনপুষ্ট কোনো দল এতে অবতীর্ণ হয়নি। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের গণপরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সামরিক শাসককুলের হিসাব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্র জনসাধারণের রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে ক্ষমতা পাকিস্তানিদের হাতে অবৈধভাবে কুক্ষিগত রাখার চক্রান্ত করে। ৩ মার্চে ঢাকায় প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করা হয়। গর্জে ওঠে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অসহযোগ আন্দোলনে পাকিস্তানের চাকা অচল করে দেয়া হলো। একাত্তরের ৩ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনের জনসভায় ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। ৫ মার্চ তারিখে বাংলার ঘরে ঘরে উঠানো হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কুখ্যাত টিক্কা খানকে গভর্নরের শপথ পড়াতে অস্বীকার করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী। তারপর এলো সেই বহু প্রত্যাশিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'—এ মর্মে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। নতুন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সংলাপের নামে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৫ মার্চ ভয়াল রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালিদের উপর লেলিয়ে দেয়া হলো পাকিস্তানি হায়েনাদের। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঙালিরা। শুরু হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র ও চূড়ান্ত অধ্যায়। ত্রিশ লাখ শহীদানের চরম আত্মত্যাগ ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের মূল্যে অর্জিত হলো রক্তাক্ত স্বাধীনতা। ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে পাকিস্তানের কারাগার থেকে বিজয়ীর বেশে বঙ্গবন্ধু ফিরলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বার্থক হলো 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তোমার আমার

ঠিকানা/জয়বাংলা' স্লোগান। বঙ্গবন্ধু জাতির জনকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন।

সরকার গঠন ও নীতিমালা নির্ধারণ

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ওয়েস্টমিনস্টার ধরনের পদ্ধতিতে আস্থাশীল জাতির জনক ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন একটি ব্রিটিশ প্লেনে করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাঁরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে যদিও তিনি পাকিস্তানি কারাগারে নয় মাস ধরে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই পদে কার্যভার গ্রহণ করে যে সিদ্ধান্তটি তিনি প্রথমেই নিলেন তা হলো, রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে সংসদ ও জনগণের কাছে অধিকতর জবাবদিহিতামূলক প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ।

সে অনুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অকুতোভয় সৈনিক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দেশের রাষ্ট্রপতি করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৎ, যোগ্য, প্রবীণ, বিশ্বস্ত ও জনগণের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত ২৩ সদস্যবিশিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির জনকের হাতে থাকে ক্যাবিনেট ও প্রতিরক্ষা বিষয়। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যবৃন্দ ছিলেন—সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্প), তাজউদ্দীন আহমদ (অর্থ ও পরিকল্পনা), খোন্দকার মোশতাক আহমদ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ), মনসুর আলী (যোগাযোগ), আবদুস সামাদ আজাদ (পররাষ্ট্র), এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন), শেখ আবদুল আজিজ (কৃষি), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া), জহুর আহমদ চৌধুরী (শ্রম ও সমাজকল্যাণ), ফণীভূষণ মজুমদার (খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ), ডা. কামাল হোসেন (আইন ও পরিষদ), এম আর সিদ্দিকী (বাণিজ্য), শামসুল হক (স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়), মতিউর রহমান (পূর্ত ও পৌর উন্নয়ন), আবদুল মালেক উকিল (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা), মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ (ডাক ও তার), সোহরাব হোসেন (বন, মৎস্য ও গবাদিপশু), মিজানুর রহমান চৌধুরী (তথ্য ও বেতার), আবদুল মান্নান (স্বরাষ্ট্র), আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (ভূমি শাসন, ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব), জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী (জাহাজ, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও বিমান চলাচল) এবং ডা. মফিজ চৌধুরী (বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কারিগরি গবেষণা)।

বঙ্গবন্ধুর প্রশাসন যে কয়টি বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংবিধান প্রণয়ন; বৈরি শক্তির অপপ্রচারের মুখে সদ্যস্বাধীন দেশের প্রতি বিশ্বের দেশসমূহের স্বীকৃতি আদায়; সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, সংস্কার ও দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন; স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন; আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; নৈরাজ্য ও নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্যাডার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পুনর্জাগরণ, ভূমি সংস্কারসহ একটি আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করার আগে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে, সদ্যস্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ঘরে ঘরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তির আলোক পৌঁছে দেয়া। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা রেখে একের পর এক দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে থাকে। দেশের মাটিতে পা ফেলার আগেই তিনি নিশ্চিত করেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে সহায়তাদানকারী ভারতীয় সেনাবাহিনী অবিলম্বে দেশে ফিরে যাবে এবং সে অনুসারে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীর আগেই ভারতীয় বাহিনীর ফেরত-পর্ব সম্পন্ন করা হয়। পাকিস্তানের কাছে ভিন্নতর ঋণের কারণে এবং এ দেশীয় মিত্রদের ভুল ব্যাখা, বিশ্লেষণ ও পরামর্শের ফলশ্রুতিতে গণচীন ২৬/৮/৭২ তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করলে এক্ষেত্রে দুই বছরের বিলম্ব ঘটে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে ১৮/৪/৭২ তারিখে কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনকে সম্মুখে রেখে বঙ্গবন্ধু বেঁকে বসলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে না। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ভুট্টো সরকার মেনে নিল স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। খুলে গেল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের পথ। জাতির জনক ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বশান্তি, ক্ষুধা, ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং একটি শোষণমুক্ত সম্প্রীতিময় নিরাপদ বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে ভাষণ দিলেন। ২৪ মে ১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন বঙ্গবন্ধু। ২৬/৯/৭২ তারিখে ধর্মপ্রাণ বাঙালি

মুসলমানদের হজ্ব করার সুযোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু সৌদি বাদশাহ ফয়সালের নিকট জরুরি তার বার্তা পাঠান।

বাংলাদেশের সংবিধান : বাঙালির রক্ষাকবচ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ গঠিত হয় তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদে নির্বাচিত বাঙালি সদস্যবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে। এর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু গণপরিষদ সদস্য তাদের বিদেশী প্রভুদের খুশি করার জন্যই হোক অথবা নিজস্ব কোনো বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই হোক, দেশ ছেড়ে চলে যান। দুর্নীতির প্রতি আপোষহীন সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু ৭/৪/৭২ তারিখে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে ১৬ জন আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। উৎসাহী ও উদগ্রীব পাঠক সেই বহিষ্কৃত সদস্যবৃন্দের তালিকা পড়ে দেখতে পারেন (পরবর্তীতে অবশ্য তিনজনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়)।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১০/৪/৭২ তারিখে। একই দিনে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন রংপুরের জনাব শাহ আব্দুল হামিদ আর ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন নোয়াখালীর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ কয়েক মাসের মধ্যে ইন্তে কাল করেন এবং জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ স্পিকার এবং নওগাঁর জনাব মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও পাঁচ সদস্যের একটি চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত হয়।

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটি সুন্দর সংবিধান আশু প্রয়োজন, যার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ বা মন্ত্রিসভায় প্রবীণতার মাপকাঠিতে সংবিধান রচয়িতাদের তালিকা নির্ধারণ করা ভুল হবে। এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ড. কামাল হোসেনকে তাই তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত করেন, যা গণপরিষদে অনুমোদিত হয়। কমিটির অন্য যারা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন, তারা হলেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, আবদুর রহিম, আব্দুর রউফ, লুৎফর রহমান, আব্দুল

মোমিন তালুকদার, আবু সাঈদ, বায়তুল্লাহ, আমিরুল ইসলাম, বাদল রশীদ, খোন্দকার আব্দুল হামিদ, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, শওকত আলী খান, হুমায়ুন খালিদ, আসাদুজ্জামন খান, মোশাররফ হোসেন আখন্দ, আব্দুল মমিন, শামসুদ্দিন মোল্লা, আবদুর রহমান, এম রহমান, ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ, আব্দুল মোন্তাকিম চৌধুরী, খোরশেদ আলম, সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আব্বাস, হাফেজ হাবিবুর রহমান, আব্দুর রশীদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ, রাজিয়া বানু ও ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল।

উক্ত সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, জনমত যাচাই, অন্য কয়েকটি দেশের সংবিধানের মূলনীতি পরীক্ষা এবং নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক দিক-নির্দেশনায় যে সংবিধানটি রচনা করে, গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে তা অনুমোদন করে। প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে কার্যকর এই সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক, সুষম, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলিল হিসেবে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়। এই সংবিধানে মানুষের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জানমালের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলায় এর একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে একটি অনুমোদিত পাঠ রয়েছে। এখানে স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট অভিপ্রায় অনুসারে সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "তবে শর্ত যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।" বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি— গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংজ্ঞায়িত ও যথাযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুজিব প্রশাসনের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ মূলনীতি চতুষ্টয়ের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে সমাজতন্ত্রের রূপ ও পরিধি সম্পর্কে ব্যাখা দেয়া হতো এরূপ: 'সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত' (অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, টঙ্গী কলেজ ১৬/৮/৭২) এবং 'মৌলিক অধিকার খর্বকারী সমাজতন্ত্র চাই না।' (শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৮/৮/৭২)। সংবিধানে স্বীকৃত হয় জনগণের প্রাধান্য; বলা হয়, জনসাধারণই সকল ক্ষমতার উৎস।

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ চিন্তা

একটি ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে পুনঃসংযোগ করতে থাকেন। বিশেষ করে পলায়নপর বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক নীতির কর্মকাণ্ডে ব্রিজ, রেলসেতু, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বন্দর ও অন্যান্য অর্থনৈতিক টার্গেটকে যেভাবে পঙ্গু করে যায় তা দ্রুতগতিতে মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও ফের চালু করে স্বল্পতম সময়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। শূন্য রাজকোষের এবং ঋণাত্মক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রেক্ষিতে বন্ধুদেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে জরুরিভিত্তিতে সাহায্য নেয়া হয়। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, যেন বৈদেশিক সাহায্য নব্যস্বাধীন দেশের মূলনীতিতে আপোষমূলক শর্তাধীনের বিনিময়ে না আনতে হয়। বৈদেশিক সম্পদ আহরণে যেন মঞ্জুরি এবং সহজ শর্ত ঋণের আধিক্য থাকে। স্বল্পমেয়াদি উচ্চ সুদের ঋণ যেন কম থাকে, সেদিকে মুজিব সরকারের প্রাথমিক নীতি অনুসরণের ফলে আজও বাংলাদেশের ঋণসেবা অনুপাত (Debt Service Ratio—DSR) দৃষ্টান্ত মূলকভাবে কম। বিশ্বসভায় ঋণ ফেরতের সুবোধ ব্যবহারের যে খ্যাতি বাংলাদেশ আজও ধরে রেখেছে, তারও গোড়াপত্তন হয় সেই প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আচরণের ফলে জনমানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি। তাই সদ্যস্বাধীন দেশে মুজিব প্রশাসনের কাছে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা বড় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। মুজিব সরকারের সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ পল্লী এলাকায় ব্যয় করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত অনুরোধে কোনো নতুন কর আরোপ ছাড়াই প্রথম জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয় ১ জুলাই ১৯৭২ তারিখে।

প্রশাসক মুজিব উপলব্ধি করেন যে, দেশে বিরাজমান হতাশা, অভাব-অনটন ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদগণের সক্রিয় সহায়তা নেয়ার আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত বলে মেনে নিয়ে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলামকে মন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কৃষি অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, একটি স্বাবলম্বী অর্থনীতির জোরদার প্রবক্তা রেহমান সোবহান এবং প্রফেসর আনিসুর রহমানকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। এখানে স্মর্তব্য যে, উপরিউক্ত নির্ধারণের প্রথম পর্যায়েই মুজিব প্রশাসনকে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলো এই যে, বহুসংখ্যক শিল্প-কারখানার পাকিস্তানি মালিক তাদের ইউনিটগুলো পরিত্যাগ করে চলে যায়। বাধ্য হয়ে সরকারকে এসব শিল্প ইউনিটগুলো অধিগ্রহণ ও চালু করতে হয়। তাছাড়া ব্যাংক ও বীমাসেবা অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো রাষ্ট্রখাতের অধীনে আনা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। উপরে বর্ণিত নীতিমালার অধিকাংশই সরকারকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধা ও জনপ্রিয়তার বিবেচনা প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য ছাড়া দেশের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও উচ্চশিক্ষিত আমলার কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ প্রণয়ন সম্ভব হয়। জাতির জনক পরিকল্পনাটির মুখবন্ধে একে 'A plan for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh' বলে অভিহিত করেন। দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী তথা পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সুন্দর দলিলটির বাস্তবায়নে বাধা-বিপত্তি আসবে, তাই সতর্ক উচ্চারণ করলেন, 'No plan however well formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices.'

বিস্তারিত উল্লেখ বা আলোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলো (objectives) উল্লেখ করা হলো। কর্মহীন বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার নিশ্চিত করা; জাতীয় আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিবারণ;

জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা; বার্ষিক ন্যূনতম সাড়ে পাঁচ ভাগ হারে গ্রোস ডোমিস্টক প্রোডাক্ট বৃদ্ধি; জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলাতে সক্ষম এমনি হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বর্ধন; সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখা; ফি বছর ন্যূনতম ২.৫ ভাগ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা; সমাজতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখা; বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো; কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; শহরগামী স্রোত বন্ধ করা ও খাদ্য স্বয়ম্ভরতা অর্জন; দ্রুত উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও পরিকল্পিত জনসংখ্যা নীতির প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ও সামাজিক অঙ্গীকার আনা; অবহেলিত মানবসম্পদ ও মানবকল্যাণে উন্নয়ন ব্যয়ের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং শ্রমের যথোপযুক্ত ও দক্ষ বিনিয়োগ তথা শ্রমের চলমানতা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুষম বণ্টন করা।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শোষণের দুই শতাব্দীরও অধিক সময় পরে নতুন স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ সহজ হবে সে আশা কেউই করেননি। ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুল ইসলাম তার মুখবন্ধে যথার্থই বলেছিলেন, 'Development is a slow and painful process. It means present sacrifice for future gains. It is specially painful a country at a very low level of living such as Bangladesh where an increasing and significant reliance us to be placed, which is so essential for development, socially tolerable only if it is equitably shared by all. The room for flexibility is so small, the ability of the socio-economic system to withstand the effects of mistakes as well as in experimenting with new institutions, great caution and extreme care need to be exercised.'

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা সমসাময়িক উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি উৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য দলিল, যা বাঙালির মুক্তিসনদ হতে পারতো। কিন্তু এর পেছনে রাজনৈতিক এমনকি প্রশাসনিক সমর্থন আদায়ের ব্যর্থতার ফলে এ সুন্দর দলিলটি কেবল তত্ত্বগত উৎকৃষ্টতার সাক্ষীই হয়ে রইলো। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের বিশ্বাস ছিল, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে

না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না।' তাই সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির বাস্তাবায়নে যে অসম্পূর্ণতা থেকে গেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার নিরিখে তা পুষিয়ে দেশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় নিয়ে এসে এর সুফল আপামর জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব বর্তমান সরকার ও জনগণের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

জাতীয় বেতন কমিশন

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন জাতির জনক। তাই গঠন করেছিলেন একটি প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি। কিন্তু সরকারি ও আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উপর প্রথম অসহনীয় চাপের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে ১৪/৭/৭২ তারিখে ১০ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হলো। দক্ষ প্রশাসক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাবেক পাকিস্তানের বাণিজ্য সচিব এম এ রবের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে সদস্য নিয়োগ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেক আইজি ও সমাজসেবক আলমগীর কবির, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ডিভিশন চিফ ডা. আজিজুর রহমান খান, শিল্পব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহুরুল হক, তদানীন্তন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এম এ রশীদ, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আনোয়ারুল মামুন, সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল জিয়াউর রহমান, বেসরকারি খাত থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাইফুর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কিউ এম এ রহীম ও সরকারের সচিব এ বি এম গোলাম মোস্তাফা। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধার অনুসন্ধান করেই বঙ্গবন্ধু এ কমিশন গঠন করেছিলেন প্রশাসনের চলমান হতাশা দূর করে আমলাতন্ত্রকে একটি গতিময় সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে।

প্রথম জাতীয় বেতন কমিশনকে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে বলা হয়, তার মধ্যে ছিল জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারের সামর্থ্য; সমাজে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের বৈষম্য হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা; সরকারি খাতে অত্যন্ত মেধাবী এবং কারিগরি ও পেশাগত দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষতা, সুবিচার এবং উৎসাহদান নিশ্চিত করে

সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্মসম্পাদন এবং বিভিন্ন পেশা-চাকরির ক্ষেত্রে চাহিদা সরবরাহের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় আনা। প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটির কাজের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে জাতীয় বেতন কমিশনকে অগ্রসর হওয়ার সময়োপযোগী দিক-নির্দেশও দিয়েছিলেন জাতির জনক। জাতীয় বেতন কমিশন একটি দুরূহ সমস্যা সমাধানকল্পে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ, আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময়, জনমত সংগ্রহ এবং সমসাময়িক বিশ্বের কয়েকটি দেশের বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে। কমিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এমনকি যুগান্তকারী সুপারিশ ছিল—পাকিস্তান আমলের ২২৫০টি বেতন স্কেলকে সমন্বিত ও একীভূত করে মাত্র দশটি স্কেলের অধীনে নিয়ে আসা। এগুলো ছিল :

১. উচ্চতর প্রশাসনিক/উচ্চতর বিশেষজ্ঞ;
২. প্রশাসনিক/ বিশেষজ্ঞ/প্রধান নির্বাহী;
৩. প্রবীণ নির্বাহী/উচ্চতর পেশাজীবী
৪. নির্বাহী/পেশাজীবী;
৫. নবীন নির্বাহী;
৬. উচ্চতর মিনিস্টারিয়াল/উচ্চতর টেকনিশিয়ান;
৭. মিনিস্টারিয়াল/টেকনিশিয়ান;
৮. সহজ দক্ষতার কাজ;
৯. কাস্টোডিয়াল এবং
১০. বিবিধ/অন্যান্য।

এ কমিশন স্থাপিত না হলে চাকরি ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি, অসহযোগ ও হাতাশা আরও বেড়ে যেত। এর সুষ্ঠু ও সার্বিক বাস্তবায়ন যদি পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারসমূহ করে যেত তাহলে পরবর্তীতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা দেখা দেয়, তা হয়তো থাকতো না।

শিক্ষাই বল : কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন

মুজিব প্রশাসন জন্মলগ্নেই উপলব্ধি করে যে ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত ও পাকাপোক্ত করার তাগিদে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়, একটি স্বাধীন দেশের মানবসম্পদ সৃষ্টিতে তা উপযোগী হতে পারে না। সমসাময়িক শিক্ষা নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশদান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ-নির্দেশের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালের ২৬

জুলাই একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। দেশের কৃতী সন্তান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডা. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের ১৮ জন সদস্যও ছিলেন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক। শিক্ষা কমিশন উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব খুদা কমিশনকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে সুচিন্তিত পরামর্শদানের আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে তিনি আরও বলেন যে, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে খুদা কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করবে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে। খুদা কমিশন প্রায় দুই বছর বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, জনমত যাচাই ও অন্য কয়েকটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ মে এক যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করে। খুদা কমিশনের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে দেশপ্রেম ও সুনাগরিক গড়ে তোলা; জাতীয় চার নীতি সম্পর্কে জ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি; মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ববোধ সৃষ্টি; নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো; সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার লাভ করা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রয়োগমুখী অবদান রাখার মতো মানবসম্পদ সৃষ্টি একান্তভাবে কাম্য। তাছাড়া স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী এবং সৃজনশীলতা ও গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হতে হবে। সর্বতোভাবে শিক্ষানীতিকে গতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির কারণে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণও সম্ভব হবে। খুদা কমিশন শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিক সম্পর্কে যে প্রগতিশীল, বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুদা কমিশন বলে, 'সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজজীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।'

শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে খুদা কমিশন চিহ্নিত করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অর্জিত মৌলিক শিক্ষাকে

সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুসারে উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে তোলা। এ স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষাসহ অন্যান্য শাখায় বিভক্ত হয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছরের শিক্ষাক্রম সুপারিশ করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে খুদা কমিশন আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের সুপারিশ করে এবং বিশেষ করে দেশের মানবসম্পদের চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষা সীমিত সুযোগ সদ্ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

দীর্ঘ একুশ বছরের অবহেলা ও অযত্নের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যস্থায় বিরাজ করে চরম নৈরাজ্য, সংকট, বিশৃঙ্খলা, উদ্দেশ্যহীনতা ও নিম্নমুখী নৈতিকতা। মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সন্ত্রাস শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারতো।

প্রশাসক মুজিবের আরও কয়েকটি পদক্ষেপ

স্বৈরশাসনের যথেচ্ছাচার টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে জারিকৃত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৬০' বাতিল করে ছাত্র-শিক্ষকের দীর্ঘ দাবি অনুসারে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ১৯৭৩' প্রচলন করা হয়।

উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থপূর্ণ, গতিশীল, সুসমন্বিত এবং দেশ, জাতি ও কালের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্রপতির ১০নং অধ্যাদেশ, ১৯৭৪-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্থাপন করা হয়। এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ (ডাকসু)-এর নির্বাচন সম্পন্ন করা হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে। এতে দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রলীগকে হারিয়ে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন ছাত্র ইউনিয়নের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহবুব জামান। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিপক্ষ সংগঠনগুলোকে তাদের গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানান।

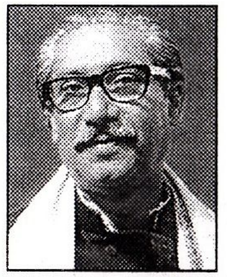
বঙ্গবন্ধু মুজিবের সরকারকে অকেজো, দেশকে অস্থিতিশীল এবং সমাজকে অস্থির করে তোলার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংবাদপত্র-রিপোর্টে মিলে। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ২০/৮/৭২ তারিখে এক বিবৃতিতে বলেন, "দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আমলা ও রাজনৈতিক টাউটরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।" ১/৪/৭২ তারিখে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, "সমাজবিরোধীদের দমনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।" ২/৪/৭২ তারিখে যশোরে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "শক্তি প্রয়োগ করিয়া হইলেও শান্তি বজায় রাখা হইবে।"

কৃষি বিপ্লব ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কার আইনের মাধ্যমে গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন প্রশাসক মুজিব। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের প্ল্যান—এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। এ কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার কর্মক্ষম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে। টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের আওতাধীনে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেয়া হবে—তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। আর মহকুমা থাকবে না। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হবে। নতুন জেলায় একটি করে প্রশাসনিক কাউন্সিল থাকবে। তার একজন চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সাথে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে।"

সোনার বাংলা ও সোনার মানুষের সন্ধানে

আজীবন শয়নে, স্বপনে, চিন্তায়, সাধনায়, কর্মে এবং আচরণে শেখ মুজিব বাংলার মেহনতি মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন। সোনার বাংলা গড়ে এর প্রতিটি

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জীবনপণ সংগ্রাম তিনি করে গেছেন। সেজন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা। খুব বেশি যে কথাটি তাঁর মুখে শুনেছি তা হলো 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' জাতিকে স্বাধীন করে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও সম্মানের জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গেলেন। আমরা কিভাবে রক্তের ঋণ শোধ করবো। সোনার বাংলার স্বপ্ন যেদিন বাস্তবে রূপ নেবে শুধু সেদিনই হবে মুজিবের প্রতি জাতির সকৃতজ্ঞ ভালোবাসা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা যেন সোনার মানুষ হওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং কর্মে, চিন্তায়, চরিত্রে ও আচরণের এ আদর্শ অনুসরণ করে চলি।



মোহাম্মদ শাহজাহান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বিবিসি বাংলা বিভাগের শ্রোতাদের ভোটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ জন বাঙালির তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ১৪ এপ্রিল শীর্ষ ২০ জন বাঙালির প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম প্রচারিত হয়। ২৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই শীর্ষ ২০ বাঙালির ওপর বিবিসি অনুষ্ঠান প্রচার করে। ২৬ মার্চ ২০তম স্থান লাভকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম প্রথম প্রচারিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ২০ বাঙালি সন্তান হচ্ছেন : প্রথম—শেখ মুজিবুর রহমান, ২য়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩য়—কাজী নজরুল ইসলাম, ৪র্থ—এ কে ফজলুল হক, ৫ম—সুভাষচন্দ্র বোস, ৬ষ্ঠ—বেগম রোকেয়া, ৭ম—জগদ্বীশচন্দ্র বসু, ৮ম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৯ম—মওলানা ভাসানী, ১০ম—রাজা রামমোহন রায়, ১১তম—শহীদ তীতুমীর, ১২তম—লালন শাহ, ১৩তম—সত্যজিৎ রায়, ১৪তম—অমর্ত্য সেন, ১৫তম—ভাষা শহীদগণ, ১৬তম—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৭তম—স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮তম—অতীশ দীপঙ্কর, ১৯তম—জিয়াউর রহমান এবং ২০তম—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পহেলা বৈশাখ বিবিসি'র প্রভাতী অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রচারিত হওয়ার পর বাংলার মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে। পহেলা বৈশাখ বা ১৪ এপ্রিল এটাই ছিল সবচেয়ে আনন্দময় খবর।

বিবিসি'র শ্রোতাদের ভোটে শীর্ষ ২০ জন বাঙালির মধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম এক নম্বরে থাকায় আবার প্রমাণিত হলো ক্ষমতার জোরে সত্যকে মিথ্যা

বানানো যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

কেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ?

১. ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পায়। প্রাদেশিক পরিষদ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগ পায়। কোনো বাঙালি নেতা তাঁর দেশের কোনো নির্বাচনে এতো বিপুল সমর্থন পেয়েছে কি?

২. ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শুরু হয় শেখ মুজিবের নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা স্মরণকালের বা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতা। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল তিনি যেন ঐদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় রেসকোর্সের ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জনসভায় রক্তগঙ্গা বয়ে দেয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সরাসরি যেমন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি—আবার স্বাধীনতা ঘোষণার বাকিও রাখেননি।

৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর লেখা *'ফেরারী ডায়েরী'* গ্রন্থে লিখেছেন: "মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল, লিংকনের গৃহযুদ্ধ ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এবং শুধু ভাষণ হিসেবেও—এমনি অনবদ্য যে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের দশটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণের অন্যতম। এই ভাষণ শুধু যেন ভাষণ নয়— এক বীজমন্ত্র, যা কোটি কোটি মানুষকে শুধু উদ্দীপ্ত করেনি, এক কঠিন সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছে। যেন কোনো ব্যক্তি নয়, একটা আলোড়িত জাতির মর্মমূল থেকে এই ভাষণের উৎপত্তি— প্রাকৃতিক ঘটনার মতো।"...

৩. একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর সশস্ত্র হামলা করলে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পহেলা মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক শাসন কার্যত অচল হয়ে যায়।

এই ২৫ দিন প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিব। গভর্নর হাউজ নয়, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবনই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানি নেতা খান মোঃ ওয়ালী খান বলেছেন, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এবারের অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও শক্তিশালী।" ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক তার লেখা *'Witness to Surrender'* গ্রন্থে লিখেছেন : 'অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুজিবের শাসন সারা পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে।' পাকিস্তানি নেতা আসগর খান ১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফরের পর বলেছিলেন, 'ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউজ ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়তে তিনি দেখেননি।' তখন পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেছেন। যেমন– ৭ মার্চ, ১৯৭১ টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। কিন্তু হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাননি। আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ৭ মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ সরাসরি প্রচার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার সেই ভাষণ প্রচার করতে না দেয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পরদিন ৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করার অনুমতি দেয়ার পর সেই ভাষণ প্রচারের মাধ্যমে বেতার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১-এর ৫ মার্চ লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বলা হয়—'শেখ মুজিবই হচ্ছেন বিদ্রোহী পূর্ব বাংলার শাসক।' ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ *'ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড'* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় : 'জনগণের আস্থাভাজন শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শাসনকর্তা বলে মনে হয়। ইতোমধ্যে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রাস্তায় অবস্থিত বাড়িকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানের অনুকরণে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'

৪. আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশ নামকরণও বঙ্গবন্ধুই করেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণ করেন যে, 'আজ হতে এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ।'

৫. ১৯৭১ সালে নয় মাস যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানি কারাগারে

বন্দী। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়।

তার কারণ হলো, শত্রুর কারাগারে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও সে সময় মুজিবের মতো জনপ্রিয় অন্য কোনো নেতা আওয়ামী লীগে বা বাংলাদেশে ছিল না। আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত বর্তমান আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তার লেখা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "নেতৃবৃন্দ জানতেন যে একমাত্র শেখ মুজিবের নামে সংগ্রাম পরিচালনা করলেই জনগণের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব। এটা ছিল বাস্তবিক অর্থে বিস্ময়কর যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলেও এবং নিজে গ্রেপ্তারবরণ করলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ছিল অটুট। এভাবে এমন একজনের নামে নয় মাসব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করা হয় যিনি স্বয়ং সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন না এবং কোনোদিন নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসবেন এমন নিশ্চয়তা ছিল না। মুজিবের জীবনে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সাফল্য।"

৬. এ কথা ঠিক একাত্তরে নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী থাকলেও বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেশের বিবেক বলে পরিচিত আবুল ফজল লিখেছেন : "আজ আমরা যে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সাহস পাচ্ছি এও শেখ মুজিবেরই অবদান। তাঁর দুঃসাহসী কণ্ঠই আমাদের কণ্ঠে এ দাবি তুলে দিয়েছে। আমরা আজ বন্ধনমুক্ত। আজ এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টোর কারাগারে বন্দী শেখ মুজিব মুক্ত শেখ মুজিব থেকে কিছুমাত্র কম শক্তিশালী নয়। দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী জিন্দানখানা থেকে তিনি অর্থাৎ তাঁর নাম, তাঁর আদর্শ আর তাঁর আত্মা-পুরুষই যেন ন'মাস ধরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জুগিয়েছে মরণপণ সংগ্রামের প্রেরণা। যে প্রেরণা অজেয় শক্তি হয়ে আমাদের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে স্বাধীনতাকে—পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের নির্মম কবল থেকে। অনুপস্থিত সেনাপতির এমন সেনাপতিত্ব সত্যিই অভিনব, ইতিহাসে এমন নজির বিরল।"

৭. বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসম সাহসী নেতা। তাঁকে হত্যা করতে পারে এটা প্রায় নিশ্চিত জেনেও তিনি আত্মগোপন না করে '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার পর শত্রুর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, তিনি পালিয়ে থাকলে পাকিস্তান হানাদার

বাহিনী তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে ঢাকায় শত শত লোককে হত্যা করতো। তাছাড়া '৭১ সালে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি আদায় করতে পারেনি। জেলখানায় সেলের সামনে কবর খুঁড়লেও বঙ্গবন্ধু ভীত হননি। তিনি ওদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আমার লাশটা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিও।'

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেও বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সশস্ত্র হামলা চালানোর পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যেত না। উল্লেখ্য, তৎকালীন মার্কিন ও চীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও সঠিক সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার কারণে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই মাত্র নয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

৯. বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাধারণ নেতৃত্বের জন্য ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন *'নিউজ উইক'* তাঁকে 'রাজনীতির কবি' বলে উল্লেখ করেন। একজন কূটনীতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত ম্যাগাজিনে লেখা হয় : "একাকী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময়েও মনে হয় তিনি যেন ৬০ হাজার লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি—পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় বঙ্গবন্ধুর পটুত্ব আছে। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কবি—প্রকৌশলী নন, তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে শৈল্পিক বেশি। কাজেই, এ অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর রীতিতে হয়তো ঠিক তাই আছে।"

১০. সততার দিক দিয়েও বঙ্গবন্ধুর সাথে কারও তুলনা হয় না। অনুন্নত দেশে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী বা ক্ষমতার সাথে জড়িতরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নিহত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার-পরিজন কারও নামে কোনো অর্থ সম্পদ পাওয়া যায়নি।

১১. বঙ্গবন্ধু ছিলেন সমগ্র বিশ্বের দু'চার পাঁচজন জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম।

'৭০-এর নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব বাংলার শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মানুষ শেখ মুজিবের নৌকায় ভোট দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের মতো জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই অসামান্য জনপ্রিয়তা এমনিতেই আমলকির মতো এসে যায়নি তাঁর হাতের তালুতে। যদি আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব কী করে তিনি নিজেকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে গেছেন। এসব কিছুর পেছনেই ছিল ঐকান্তিক দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা।"...

১২. বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বিরোধী বলে পরিচিত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ লিখেছেন, "শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।"

১৩. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ বের হয়েছে। বাঙালি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন :

"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ রক্তগঙ্গা
অশ্রুগঙ্গা বহমান
তবু নাহি ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।"

একজন বিদেশী লেখক রঞ্জন তার গ্রন্থে লিখেছেন : "দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পঙ্‌ক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের পলি মাটিতে তাঁর জন্ম। ধ্বংস, বিভীষিকা ও বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেই পলি মাটিতে সাড়ে সাত কোটি মানুষের চেতনায় শক্ত ও জমাট করে

একটি ভূখণ্ডকে শুধু তাদের মানসে নয়, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা এক মহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মুজিব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয় নেতার মতো এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের সন্তান ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা।"

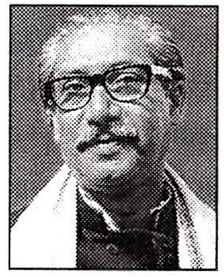
তিনি আরও লিখেছেন : "কোনো নেতার জীবনকালে তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গুণের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়—বলেছেন অনেক খ্যাতনামা জীবনীকার। তবু নিজের জীবনকালেই কেউ কেউ অত্যাশ্চর্যভাবে কোনো দেশ বা তার ইতিহাসের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন ভবিষ্যতের সমালোচনা ও মূল্যায়নের পরোয়া না করেই। যেমন—ভারতের গান্ধী, মিশরের নাসের, ভিয়েতনামের হো চি মিন, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, চীনের মাও সেতুং, রাশিয়ার লেনিন এবং আরও কেউ কেউ। আজ বাংলাদেশে মুজিবও তাই।"

১৫. বঙ্গবন্ধু মুজিবই যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা একটি বিদেশী পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে সহজে তা অনুমান করা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরদিন লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় লেখা হয় : 'সবকিছু সত্ত্বেও শেখ মুজিব স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—এ জন্য যে, তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশ কখনও বাস্তবে পরিণত হতো না। *(টাইমস, ১৬.৮.৭৫)*

১৬. নিহত হওয়ার পর গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে একটি মুজিবের পক্ষ, অপরটি মুজিবের বিপক্ষ—এই দু'পক্ষই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এতেই কি প্রমাণিত হয় না 'মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী'।

দোষে-গুণেই মানুষ। বঙ্গবন্ধুও মানুষ ছিলেন। কাজেই তাঁরও নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান, তাঁর নেতৃত্ব গুণ নিয়ে ইতোমধ্যে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল মাপের মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এ কথাও ঠিক, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অসংখ্য বাঙালি নামি-দামি শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে একটা স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠায় একক কৃতিত্ব না হলেও সিংহভাগ কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু মুজিবের। বঙ্গবন্ধুর সহজ সরল জীবন, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা, অসম সাহসী নেতৃত্ব,

দূরদর্শিতা, সর্বোপরি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাসে তিনি অনন্য হয়ে থাকবেন। তাই অন্য বাঙালি সূর্য সন্তানদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু মুজিবই হচ্ছেন—'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি'। প্রয়াত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের একটি উদ্ধৃতি দিয়েই আজকের আলোচনার ইতি টানতে চাই। ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এক স্মরণসভায় বিচারপতি হোসেন বলেন : "...যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, যতদিন বাংলা থাকবে, বাঙালি থাকবে, গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, করতোয়া, কীর্তনখোলা নদীর দুই তীরের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন এদেশের মানুষের হৃদয়ে উত্তাপ থাকবে, ততদিন অন্তরের মণিকোঠায় একটি নাম চির জাগরুক থাকবে—শেখ মুজিবুর রহমান।"



রফিকউল্লাহ খান

অস্তিত্ব সত্তার অমলিন দিকপাল বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির সংগ্রাম, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সমান্তরাল একটি নাম—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি দুঃশাসনের দীর্ঘ ২৩ বছর তিনি এ দেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। তিনি হয়ে ওঠেন জাতির বিজয় চেতনার প্রতীক, স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির জনক। সংগ্রামে এবং বিজয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমান্তরাল তাঁর অবস্থান। অর্থাৎ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ আর বঙ্গবন্ধু অভিন্ন অস্তিত্ব সত্তার প্রতিচ্ছবি। আবার ১৯৭৫-এর কলঙ্কিত ১৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুকে হারানোর সাথে সাথে জাতীয় জীবনের সব আলো একে একে নিভে যেতে থাকে। সংবিধানের মূল স্তম্ভকে বুলেটের আঘাতে উড়িয়ে দেয়া হয়, শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতার মূল্যবোধের অপব্যাখ্যা। লক্ষ লক্ষ জনতার আত্মদান, মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্রের স্থলে সেনাতন্ত্র ও স্বৈরাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। জনজীবনে আবার নেমে আসে শোষণ, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের কালো অন্ধকার। বাঙালি সংস্কৃতির বলশালী প্রতিষ্ঠার পথকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলতে থাকে।

বাঙালি জাতির সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য এই যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মাটিতেই নির্মমভাবে সপরিবারে বাঙালি ঘাতকের বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছেন। জাতি হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্কট, সম্ভাবনা ও পরিণতির দিক-নির্দেশনা এ ঘটনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাধারা থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে। ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক

সংগ্রামের প্রতিবাদী কিশোরকণ্ঠ হিসেবে যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত, উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের যুগান্তকারী সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ততা এবং ক্রমান্বয়ে নেতৃত্ব অর্জন করে একটি বিশ্লিষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তিতে পরিণত করে এক স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার নায়ক-পুরুষে পরিণত হন তিনি। এ দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বঙ্গবন্ধুর কৃতি ও কীর্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বহুমুখী বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর হয়ে ওঠার সংগ্রামশীল রক্ত রঙিন পথও আমাদের সকলের জানা। কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয় যে, বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কোনো পারিবারিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। অজপাড়াগাঁয়ে সাধারণ এক বাঙালি পরিবারের সাধারণ সন্তানের মতোই তাঁর জন্ম। এ দেশের মাটি ও মানুষের সাহচর্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, আবেগ, অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, মমতাবোধ প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে এবং তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন অতিবাহিত হয়েছে ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের উত্তঙ্গ সময়খণ্ডে। ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরাশক্তিসমূহের রাজনৈতিক ভাগবাটোয়ারার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত হয়, তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নতুন মাত্রা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের আদর্শরূপ হিসেবে যাঁদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক নিয়তি তাঁকে সেই পূর্বসূরিদের থেকে স্বতন্ত্র ধারায় পরিচালিত করেছে। প্রথম পর্যায়ে তিনি ইতিহাসের গতি, জাতীয় জীবনের অব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ— এগুলোকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ ছয় দফা নিয়ে স্বতন্ত্ররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬৬ সালে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘটনা প্রবাহের নিয়ন্তা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শীর্ষস্থান দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর অভিনবত্ব এই যে, এ সময়ে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা অনুধাবন, তার সাথে সম্পৃক্ততা, কখনো সক্রিয় অবস্থান প্রভৃতি তাঁকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভিন্ন অংশে পরিণত করেছিল। ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু সমষ্টির চৈতন্যকে ধারণ করেছিলেন নিজের মধ্যে। ছয় দফা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সেই সমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার

প্রতিফলন ঘটে। ১৯৬৬ সালের পরের কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহ বঙ্গবন্ধুকে কেবল একজন সফল জননেতা বা দেশনায়কেই পরিণত করেনি, তাঁকে অবিসংবাদিতভাবে জনগণমন অধিনায়কে পরিণত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেশনায়ক, রাষ্ট্রনায়ক ও সংগ্রামী বীরপুরুষের কথা আরো জানি, যাঁরা কোনো দেশ বা জাতির প্রতীক পুরুষে পরিণত হয়েছে। তাঁদের জীবন-ইতিহাসের সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির সাদৃশ্য খুবই কম। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর আপাতদৃষ্টিতে বাঙালি জাতিসত্তা তথা রাষ্ট্রসত্তা গঠনের সম্ভাবনার পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য, বেদনা ও সংগ্রামকে অঙ্গীকার করে সেই অবরুদ্ধ, অসম্ভবের ভূখণ্ডে নতুন করে শুরু হয় বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম ও প্রত্যাশার কেন্দ্রীয় পুরুষে পরিণত হয়ে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রথম রাষ্ট্রসত্তার স্থপতি। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সমষ্টি জীবনসংলগ্ন হয়ে ক্রমবিকশিত এবং পরিণত রূপ লাভ করেছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণের ঐতিহাসিকতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বহু আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ও কর্মে এই ঘোষণার বীজ, প্রাণশক্তি ও প্রস্তুতি অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৭৫ সালের বাঙালি জাতির চরম দুর্ভাগ্য এই যে, বঙ্গবন্ধুকে তারা হারিয়েছে। এবং ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে অতীতের অন্ধকারকে নতুন করে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে সাথে নিয়ে যেসব অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাদেরই একটা অংশ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং অন্য অপশক্তিগুলো ক্রমান্বয়ে বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, মানুষ ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর এ দেশের সেনাতন্ত্র, স্বৈরাচার ও ধর্মান্ধতার সংমিশ্রণে যে পাকিস্তানি রাজনৈতিক অপচ্ছায়ার জন্ম দেয়া হয়, এ দেশের জনগণ, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মীরা কোনোদিন তা মেনে নেয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৯৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দীর্ঘকাল এ দেশের শাসন ক্ষমতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তার বিরোধী শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর অনুরাগীদের হত্যা করেছে, তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অপব্যাখ্যা করেছে।

ইতিহাসে তাঁর অবস্থানকে গৌণ করে নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ দেশের জনগণের স্মৃতি থেকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি।

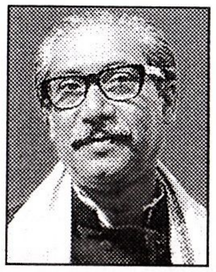
ইতিহাসের চলমানতাকে আমরা দুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। একটি হচ্ছে তার প্রকাশ্য রূপ, আরেকটি হচ্ছে জাতির অবচেতনার মধ্যে তার গভীর সূক্ষ্ম বিদ্যমানতা। আমরা যদি রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রাসঙ্গিকতাকে অপরিহার্য মনে করি, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, তাহলে বঙ্গবন্ধুর নাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতি প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর গড়া সংগঠন এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫-এর অভাবিত দুর্ঘটনায় হতচকিত, হতাশাগ্রস্ত, অবসন্ন ও ভীতসন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠী ইতিহাসের এই নতুন মেরুকরণ হয়তো কল্পনাও করেনি। কিন্তু ইতিহাসের এটাই নিয়ম। আমি বলেছি খুব বাস্তব অর্থে কোনো ভাবময় তত্ত্ব দিয়ে নয়, বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থেই জনগণমন অধিনায়ক। সে কারণেই তাঁর নাম পুনরায় সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তাঁর ছবি সরকারপ্রধানের পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। এবং তাঁর ভাষণ বাংলার আকাশ-বাতাসকে অনুরণিত করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে অনেক রাজনৈতিক নেতার স্মরণে কবিতা, গান রচনার দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং ভাস্কর্যের অবয়বেও বিভিন্ন দেশ তাদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রিয় নেতাদেরকে স্থাপন করেছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য কিংবা ছবি স্থাপন তো দূরের কথা বঙ্গবন্ধুর নাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলধ্বনি 'জয়বাংলা' উচ্চারণ পর্যন্ত এ দেশে নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধু যদি সাধারণ হতেন তৎকালীন রাষ্ট্র পরিচালকদের সেই ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা ভিন্ন। আমাদের কবি যখন বাঙালি শব্দ উচ্চরণ করেছে তার পেছনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে একটি নাম— বঙ্গবন্ধু; যখন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত মিছিলের মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হয়েছে, তখন বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনচেতনাই প্রেরণাদায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫-এর পর দীর্ঘ স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং এ দেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে আয়োজন বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পালিত হয়েছে আসছে, তা থেকেই বাঙালি অস্তিত্বে সত্তায় বঙ্গবন্ধুর অমলিন প্রভাবের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আমাদের চারুশিল্পীরা যেসব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তা সমগ্র

জাতিসত্তারই যেন প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে কেবল ব্যক্তি হিসেবেই নয়, বাঙালি জাতির মুক্তিদূত হিসেবে কিংবা জাতির জনক হিসেবেই নয়—তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে বাঙালির জাতিসত্তা, সংগ্রামী ইতিহাস, রক্তরঞ্জিত রাজপথ, নিরন্ন দারিদ্র্যপীড়িত জনতার মুখাবয়ব, ক্রন্দন-ভারাক্রান্ত নিসর্গলোক অর্থাৎ বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংগ্রামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অভিন্ন বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে এখনো অস্তিত্বময়, তার কারণ তিনি এ দেশের গণমানুষের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। গণমানুষের ভালোবাসা ও স্মৃতিঋণ বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হঠকারিতাকেও আঘাত করেছে। পাকিস্তানি অপশক্তির এ দেশীয় দোসররা বঙ্গবন্ধুর ছবিকে স্থানান্তরিত করেছে। কিন্তু কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে যে বঙ্গবন্ধুর অধিষ্ঠান, দেয়ালের কয়েকটি ছবির স্থানান্তর কি সেই হৃদয়ের মন্দিরে স্থাপিত বিপুল, ব্যাপক, গভীর বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে পারবে?

২৫ আগস্ট, ২০০৩



রামেন্দু মজুমদার

বঙ্গবন্ধু

পৃথিবীতে অনেক স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক জীবদ্দশায় তাদের সংগ্রামের বিজয় দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু তার প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি আর নৈতিক মনোবলের ওপর ভর করে জাতিকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। বাঙালি প্রথমবারের মতো লাভ করেছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র। সে কারণেই বিবিসি তাদের শ্রোতাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে বঙ্গবন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শিরোপা দিয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান একদিনে বা একটি সংগ্রামের কারণে বঙ্গবন্ধু হয়ে যাননি। ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে গেছেন তার লক্ষ্যের দিকে। যৌবনে সংগ্রাম করেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে, তারপর অবিরাম লড়াই করে গেছেন পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের জন্য। ভাষা-সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে তা এগিয়ে যায় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকারের দিকে। ছয় দফার ভেতরে মূল সুর ছিল এক দফাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে ধাপে ধাপে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন করেননি বলে অনেকে তার সমালোচনা করেন। পাকিস্তানিরা যে এ ধরনের নির্বিচার গণহত্যা শুরু করবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন তিনি আত্মগোপন করলে তার সন্ধানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করবে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তাই তিনি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতেই থেকে গেলেন।

বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন না করাতে কি মুক্তিযুদ্ধ থেমে গিয়েছিল? তিনি তো ৭ মার্চের ভাষণে বলেই দিয়েছিলেন : "আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।" পুরো মার্চজুড়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালি রাজপথ উত্তাল করেছে, বঙ্গবন্ধু সাংবিধানিক পথে তার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কেবল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নন, বাংলার সচেতন মানুষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলার জয়ধ্বনি 'জয় বাংলা'র সাথে অবধারিতভাবে লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'জয় বঙ্গবন্ধু'। কী আবেগ যে তখন বঙ্গবন্ধুর জন্য কাজ করেছে মানুষের হৃদয়ে, তা স্মরণ করলে আজো মনে শিহরণ জাগে।

ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। শত চেষ্টা করলেও ইতিহাসে তাঁর আসন টলানো যাবে না। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরাজিত শক্তি নতুন মিত্রদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ২৬ মার্চের ঘোষণা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আসলে এক অর্থে স্বাধীনতার ঘোষণা তো ৭ মার্চেই দেয়া হয়ে গেছে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল : "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" অথচ সম্প্রতি স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তৎকালীন মেজর জেনারেল (পরে রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবেই উদ্ভট সব কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৭ মার্চ— এটাই সর্বজন স্বীকৃত সত্য। যারা সেদিন তাকে ঘোষণা পাঠ করার জন্য বেতারে নিয়ে এসেছিলেন তারা যেমন বিভিন্ন স্মৃতিচারণে সে কথা বলেছেন, জিয়াউর রহমানও তার নিজের সাক্ষাৎকারে সেটা স্বীকার করেছেন। প্রথম দিন তিনি নিজেকে বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন, পরে ভুল বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণা প্রচার করেন। বিএনপি এবার ক্ষমতায় আসার পর তাদের তল্পিবাহক কয়েক বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় ২৭ মার্চের ঘোষণার তারিখ বদলে করল ২৬ মার্চ এবং পাঠ্যপুস্তকে তা সংযোজন করে নতুন প্রজন্মকে

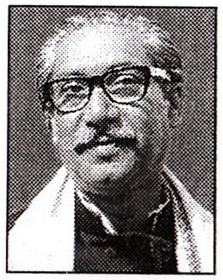
মিথ্যা ইতিহাস শিখতে বাধ্য করে। এখন আবার তা আরো একদিন এগিয়ে এনে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে করা হয়েছে। জিয়া বলেছিলেন, 'আমরা বিদ্রোহ করলাম।' এমন বিদ্রোহ তো বিভিন্ন স্থানে হয়েছে। সব সেনা, ইপিআর, পুলিশবাহিনীর বাঙালিরা বিদ্রোহ করেছে। 'বিদ্রোহ করা' আর 'স্বাধীনতা ঘোষণা করা' এক কথা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সাংবিধানিক অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরই ছিল। কারণ তিনি ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত মুখপাত্র। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন। কার নির্দেশে ১৯৭১-এর ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শাসন চলেছিল? এমন একগুচ্ছ নেতৃত্ব বাঙালির ইতিহাসে আগে কেউ দেখেনি, আর কোনোদিন হয়তো দেখবেও না। ভেবে শঙ্কিত হতে হয় কোনদিন হয়তো শুনব, ৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধু নন, জিয়াউর রহমানই দিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই, ২৭ মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ শুনে সেদিন বাঙালিরা উজ্জীবিত হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল, তাদের মুক্তির সংগ্রাম পাকিস্তানি বর্বরতার মুখে শেষ হয়ে যায়নি। এ ভূমিকার জন্য জিয়াউর রহমানের স্থানও ইতিহাসে নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু এখন যারা জিয়াউর রহমানের উপর কল্পিত গৌরব আরোপ করতে চাইছেন, তারা আসলে জিয়াউর রহমানকে খাটো করছেন, অহেতুক বির্তকের মধ্যে ফেলে তাঁর প্রাপ্য সম্মানে কালিমা লেপন করছেন।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর থেকে ২০০১-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নির্বাসিত। না গণমাধ্যমে, না পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কথা উল্লেখ করা হতো। কী না চেষ্টা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার! কিন্তু ফলটা কি হয়েছে? বঙ্গবন্ধুর আসন বাঙালির হৃদয়ে আরো মজবুত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারকেরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেতার-টেলিভিশনে এমন অতি প্রচার করলেন যে, শ্রোতা-দর্শকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। ঢাকা টেলিভিশন ভবনে ঢোকার মুখে সারা দেয়ালজুড়ে বঙ্গবন্ধুর বিশাল এক প্রতিকৃতি টানানো হলো। যেন ওটা সামনে না থাকলে বঙ্গবন্ধুর কথা সবাই ভুলে যাবে। আসলে এসব কাজে আন্তরিকতার বদলে ছিল স্তাবকতা ও অতি উৎসাহ। সরকার বদলের পর বঙ্গবন্ধুর সেই প্রতিকৃতি অপসারিত হয়েছে। সেটা কি খুব গৌরবের

হয়েছে? বঙ্গবন্ধুর সম্মান কি তাতে বেড়েছে? ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রসঙ্গটি নিয়ে সে সময়ে অনেক আলোচনা করেছি। কোনো ফল হয়নি, অনেকের বিরাগভাজনই কেবল হয়েছি স্রোতের বিপরীতে হেঁটেছি বলে।

এখন আবার গণমাধ্যমে নির্বাসিত। তাতে কি হয়েছে? তাঁর জন্য আবেগ কি আমাদের হৃদয়ে আরো বাড়ছে না? কার সাধ্য আছে তাঁর স্মৃতিকে মুছে দেবে বাঙালির হৃদয় থেকে? তিনি আমাদের রাষ্ট্রের স্থপতি। তিনিই আমাদের জাতির জনক।



রাহাত খান

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখি ১৯৬৩ সালে। ময়মনসিংহ শহরের রেলস্টেশন ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে বেকার সময়ে আমার গল্প-উপন্যাসের মানুষদের খুঁজছিলাম, ওরকম আমি মাঝে মাঝে করতাম। একটা সময় তাকিয়ে দেখি দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক ব্যক্তি তার সাথীকে নিয়ে ওভারব্রিজে উঠছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। উন্নত শির। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস ছিল, কাজেই তাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। একটু সবিস্ময়ে দেখলাম ১নং প্লাটফরম থেকে ওভারব্রিজে উঠে ব্রিজের খানিকটা সমতল পেরিয়ে ৩নং প্লাটফরমের দিকে নেমে গেলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সাথে, তাকেও চিনতে পারলাম। মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। খুব সম্ভব রাজনৈতিক কাজে ময়মনসিংহ হয়ে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছিলেন তারা।

এই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশের কথা আমার বেশ মনে আছে। ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানের দুই অংশ জুড়ে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছিল। আইয়ুব খান রাজনীতিকদের খুব ঘৃণা করতেন। আর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করতেন মছলীখোর বাঙালিদের। রাজনীতিকরা যাতে সামরিক শাসনের জন্য কোনোদিন হুমকি হয়ে না দাঁড়ায় সে জন্য তিনি তার এবডো আইন জারি করেছিলেন। এই আইনের আওতায় মুচলেকা দিয়ে রাজনীতিকদরে রাজনীতি না করার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন আইয়ুব। পূর্ব পাকিস্তানের সব রাজনীতিক, দুই বছরের ওজারতি'র আতাউর রহমান খান পর্যন্ত মুচলেকা দিয়ে মাফ চেয়ে রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। অনেক রাজনীতিবিদ কসম কেটে আইয়ুব খানকে জানিয়েছিলেন

রাজনীতি করার গুনাখাতা মাফ করলে এই অপকর্ম তারা আর ভুলেও করবেন না। আইয়ুব খান মহাখুশি পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের এরকম বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ দেখে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ এবডো আইনে মুচলেকা সই করতে রাজি হননি। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে শায়েস্তা করার জন্য পেছনে গোয়েন্দা লাগালেন, খয়ের খাঁ আমলাদের দিয়ে একাধিক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মামলা দায়ের করলেন। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, তিনি ১৯৫৪-৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে নিজের চেনা-জানা লোক ও আত্মীয়-স্বজনদের শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমোদন দিয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে পয়সা কামিয়েছেন। মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন প্রাদেশিক শিল্প পরিদপ্তরের প্রধান, সিভিল সার্জেন্ট, রুহুল কুদ্দুস। তিনি বিচারকের কাছে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, মন্ত্রী থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান যে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও আত্মীয়তোষণ করেছেন তেমন কোনো প্রমাণ নেই বরং রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা অনুমোদনে মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সততার সাথে যোগ্য ব্যক্তিকেই বারবার কাজ দিয়েছেন। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা ডিসমিস।

শেখ মুজিব মামলা থেকে অব্যহতি পেলেন; কিন্তু পাকিস্তানে রাজনীতিকে সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট করে এর বিকাশ ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিলেন আইয়ুব খান। সদম্ভে ঘোষণা করলেন, রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের জন্য দুঃসাধ্য করে তবে ছাড়বেন তিনি। আইয়ুবের এই কথাটাই ১৯৭৬-৭৭ সালে খানিকটা ভাষান্তর করে বাংলাদেশের স্বৈরশাসক অনেকের মতে বাংলাদেশের ছোট আইয়ুব খান, জেনারেল জিয়াউর রহমান বেশ কঠিন সুরে বলেছিলেন : আই উইল মেক পলিটিক্স ইমপসিবল ফর পলিটিশিয়ান। রাজনীতি, আইয়ুবের শাসনদণ্ডের আঘাতে, বাস্তবিক স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। সে সময় ১৯৬৩ সালের দিকে, আমি ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজের অধ্যাপক, বেশ মনে আছে, সে সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল নিস্তব্ধ। অন্যথায় বলতে গেলে, কবরের স্তব্ধতা বিরাজ করেছিল রাজনীতিতে।

সময় ও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ সালে বঙ্গবন্ধুই রাজনীতিকদের মধ্যে সক্রিয় এবং সাংগঠনিক কাজে তৎপর ছিলেন। হওয়ার কথা। রাজনীতিই তো ছিল বঙ্গবন্ধুর সংসার। সেই ছোটবেলা থেকে মানুষের কাজে, মানুষের কল্যাণে রাজনীতিতে ব্যাপৃত

থেকেছেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের সেই কল্যাণের রাজনীতিতে ন্যস্ত ছিলেন।

এরপর পূর্ব বাংলায় রাজনীতির পর্দা ওঠে ১৯৬৬ সালে। বেশ কয়েক বছরের তৎপরতা ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। পাকিস্তানের রাজনীতির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা নানাভাবে সোচ্চার হতে থাকে, উন্মেষ ঘটে বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা।

১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে প্রথম দেখি মহামানবকে। মৌলানা তর্কবাগীশকে সাথে নিয়ে ওভারব্রিজ পার হচ্ছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, তখনকার সময় এবং রাজনীতিক পরিবেশের কথা। সারা দেশে রাজনীতিতে তখন মাফ চেয়ে রাজনীতিকদের সরে পড়ার দশা চলেছে। চারদিকে কবরের স্তব্ধতা। রাজনীতিসহ সর্বত্র জ্বী-হুজুরদের দাপট। রাজনীতিতে মাথা উঁচু করে তখন অবস্থান করছিল শুধু শেখ মুজিব এবং তার গুটিকয় সহকর্মী ও অনুগামী।

এরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখি ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ভোর সকালে, শহীদ মিনারে পাদদেশে। ঐ সময় আমি শিক্ষক হিসেবে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে যোগ দিয়েছি, আমি ও সহকর্মী শামসুজ্জামান খান বাস করি কলেজেরই ক্যাম্পাসে, ব্যাচেলর কোয়ার্টারের একটি কক্ষে। মনে আছে একুশের ভোর সকালে ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ নিয়ে বিভাগীয় প্রধান অজিত কুমার গুহের নেতৃত্বে আমরা বাংলা বিভাগের শিক্ষকরা গিয়েছিলাম শহীদ মিনারে। শেখ মুজিবুর রহমান, তখনও বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত হননি, শহীদ মিনারের সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন ধীর পায়ে, পেছনে তার কৈশোর উত্তীর্ণ কন্যা শেখ হাসিনা। তখনও জানি না সময় ও ইতিহাসের অনেক গুপ্তকথা। জানি না একুশের ভোর সকালে আমাদের চোখের সামনে যিনি শহীদ মিনারের সিঁড়ি ভেঙে বেদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তিনি স্বয়ং ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ একে অপরের অবিচ্ছিন্ন সত্তা।

বঙ্গবন্ধুর সাথে এরপর সামনা-সামানি দেখা ও কথাবার্তা হয় ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে। জগন্নাথ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একজন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী এবং সমর্থক। তার আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবার জগন্নাথ কলেজে গেছেন। প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান বঙ্গবন্ধুর সাথে বিশেষভাবে আমাকে এবং বন্ধু শামসুজ্জামন খানকে পরিচয়

করিয়ে দিয়েছিলেন। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র নেতৃত্বে তখন ছিল আল মুজাহিদী, নূরে আলম সিদ্দিকী, রাজিউদ্দিন রাজু, সাইফুদ্দিন এম এ রেজা, রাজা ফিরোজ রশীদ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। সে সময় ছ'দফা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, জগন্নাথ কলেজ। এ সময় আমি ছ'দফার প্রচ্ছন্ন সমর্থক এবং বহু গণসঙ্গীত লিখেছিলাম। প্রখ্যাত সুরকার ও গণসঙ্গীত শিল্পী সুখেন্দু চক্রবর্তীর সুরে গানগুলো সে সময় ঢাকায় বহু অনুষ্ঠানেই গীত হয়েছে। আমার ছাত্র মুরাদ আলী, শরাফত আলীদের কাছে এখনও কিছু গান হয়তো পাওয়া যাবে। মনে আছে, সে সময় ছ'দফা আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিকে বাঙালির স্বাধিকার , স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনে পরিণত করেছিল। রাজনীতিতে মহীরুহ হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি দাঁড়ায় স্ব-মহিমায় ভাস্বর রাজনীতির এক মহানায়কে। মহাপ্রতাপশালী বলে পরিচিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে রাজনীতি ও ক্ষমতার বামনে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি শিক্ষকতা ছেড়ে দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দিয়েছি। বঙ্গবন্ধু সে সময় বেশ কয়েকবার সদলবলে ইত্তেফাক অফিসে এসেছেন। ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং বঙ্গবন্ধুর বন্ধুত্ব বলতে গেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেরই অংশ। বঙ্গবন্ধু ইত্তেফাক অফিসে ঢুকে 'মানিক ভাই কই' বলতে বলতে এগোতেন, মানিক মিয়া সাহেবের সাথে জমে উঠত আড্ড। আমি দু'একবার সেই আড্ডার আশপাশে থাকার সুযোগ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমার মতো সামান্য মানুষকেও দেখে চিনতে পারতেন। জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন : এই যে, সাংবাদিক, কী খবর?

বঙ্গবন্ধু আমাকে নামে চেনেন, দেখা হলে নাম ধরে সস্নেহে ডাকেন এ নিয়ে আমার একটা গোপন গর্ব ছিল। শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নয়, ১৯৬৩ সালে প্রথম দেখার পর থেকে যতবার বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ততবার এবং প্রত্যেকবার আমার মনে হয়েছে ইতিহাসের মহানায়ক আমার সামনে। তাঁর সামনে আমি স্বচ্ছন্দে কখনোই কথা বলতে পারতাম না। তিনি কথা বলতেন। আমি শুনে যেতাম। এভাবে বহুবার তাঁর সাথে আমার সময়টা কেটেছে। ১৯৭৪ সালে আমরা বেশ কয়েক জন বঙ্গবন্ধু'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম সেটা আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে।

বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় এবং ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের আওতায় সেবারই

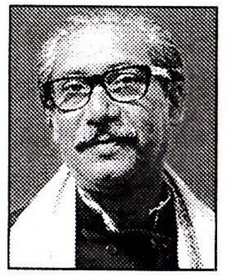
প্রথমবারের মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৯ দেশের লেখকদের বিপুল অংশগ্রহণে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেটাই বাংলাদেশে প্রথম এবং শেষ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। এই সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বাংলা একাডেমির তদানীন্তন মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম, শামসুজ্জামান খান, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এবং আমি বেশ কয়েকবার বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেছি, বঙ্গবন্ধুর বেশ পছন্দ ছিল আমাদের এই লেখক চতুষ্ঠয়কে। সামনে বসিয়ে নানা গল্প-গুজব করতেন। শুধু রাজনীতির কথা নয়, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য-শিল্প প্রসঙ্গে অনেক কথা বলতেন।

আমার জীবনের পরম সৌভাগ্যের কথাটা এখন বলি। ঠিক হয়েছিল, ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৪) বাংলা একাডেমী একুশের মঞ্চে বসবে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন এবং বঙ্গবন্ধু সেই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন। বঙ্গবন্ধু সম্মতি দিলেন এবং ড. মযহারুল ইসলামকে বললেন, ঐদিন আমি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বেলা ১২-৩০ পর্যন্ত থাকব, রাহাত খানকে পাঠিয়ে দিও আমাকে নিয়ে যেতে।

ড. মযহারুল ইসলাম যথারীতি এই সৌভাগ্যের কথা আমাকে জানালেন। সেদিন পদ্মায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং। বঙ্গবন্ধু তাকে বিদায় জানিয়ে আমার সাথে অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু'একটা কথা বলেন। তারপর সরকারি মার্সিডিজ গাড়িতে পাশে আমাকে বসিয়ে যথাসময় বাংলা একাডেমীতে পৌঁছলেন। আমি ভাবি, আমার জীবনের আর কোনো সৌভাগ্য না থাক, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহের ছায়ায় তাঁর গাড়িতে বসে, একান্ত সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য হলেও, এই সৌভাগ্যের তো অধিকারী আমি!

বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্যে ছিলাম বেশ কিছুদিন। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, রাহাত খান, শান্তি নিকেতন গেলে তুমি আমার সাথে যাবে। বঙ্গবন্ধু আমাকে শান্তি নিকেতনে নিয়ে যাওয়ার সময় পাননি, আগেই খুনিচক্রের বুলেটের আঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেশ কয়েক বছর পর, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই আমাকে, আরও অনেকেরও সাথে, কোলকাতার বইমেলা এবং শান্তি নিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের নিশ্বাস ও বিশ্বাসে মিলে আছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি শাহাদাত্বরণ করেছেন বাংলাদেশে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধানায় নিরত থাকার সময়। তাঁর আদর্শ ও অবদানের মৃত্যু নেই, তিনি চিরঞ্জীব।



রোকনউদ্দিন মাহমুদ

স্বাধীনতার স্থপতি হত্যার বিচার

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' কথাটির উদ্ভব ব্রিটিশ ভারতে। স্বাধীন দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার প্রশ্নেও এ কথা নির্মম সত্য হয়ে উঠবে এ কথা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে?

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার সম্পন্ন হলেও মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে না। আসামিদের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন করা হয়েছে। আইনগত জটিলতায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এ মামলার শেষ পর্যায়ের বিচার কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন হয়নি। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে আছে। আপিল বিভাগে মামলাটির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। কবে, কিভাবে শুনানির ব্যবস্থা হবে, কবে নাগাদ এ অবস্থার অবসান হবে এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মামলাটি শুনানির উপযুক্ত সংখ্যক বিচারপতি আপিল বিভাগে নেই। যারা আছেন তারা বিভিন্ন কারণে মামলাটি বিচারের জন্য আদালতে বসতে পারছেন না। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর এ বিলম্ব অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত।

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নিজের বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের হাত থেকে সেদিন নিষ্কৃতি পাননি বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী, তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ, ছোট ভাই। সমগ্র জাতির জন্য এ এক লজ্জার অধ্যায়। ক্ষণজন্মা যে পুরুষ বাঙালি জাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার উজ্জ্বল পতাকা, ঘাতকের বুলেটে তিনি পেয়েছেন নির্মম প্রতিদান।

আরও দুঃখজনক হচ্ছে, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ দিয়ে এ হত্যার বিচার বন্ধ ছিল। এর জন্য সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একটি কথিত সংরক্ষণ তৈরি করা হয়। এর আড়ালে দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এ জঘন্য অপরাধটি আইন-আদালতের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। অথচ অমর্যাদাকর অমানবিক আইনটিকে সংশোধনের সুযোগ ও ক্ষমতা থাকাকালেও কোনো সরকারই উদ্যোগ নেয়নি। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডকে বরাবর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা হয়েছে। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে ইতিহাসের এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে কেউ দেখতে সক্ষম হননি, অথবা চাননি। অথচ এটা এমন একটি মানুষকে হত্যার ঘটনা নিয়ে মামলা, যে মানুষটি ছাড়া এই দেশ, সরকার, ক্ষমতা, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, এই আদালতটি এবং তার বিচারপতির পদ কোনোটিরই সৃষ্টি হতো না।

এ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই ধারার রাজনীতির সাথে পরিচিত। ব্যাপক অর্থে এই দু'ধারায় বাংলাদেশের রাজনীতি বিভক্ত। দেশের রাজনীতি এই দুই ধারার মাঝেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কোনো রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনো কর্মসূচির সাথে দ্বিমত থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু দলটির বিরোধিতা করতে হবে সব মানবিক বিবেচনাবোধ, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে হবে এমন রীতি বোধ হয় কেবল এ দেশেই সম্ভব। এজন্যই বাংলাদেশে এমন একটি নৃশংস জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া বা না হওয়া নিয়ে চলে রাজনীতি।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশটির নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়ন করেন। প্রথম বিজয় দিবস অর্থাৎ সে বছরই ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতির যে রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক চেতনা বিকশিত ও মূর্ত হয়—সংবিধানের মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট হয়েছিল। সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে স্থান পেয়েছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রের ওপর জনগণের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্বের অধিকার, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সর্বস্তরে জনগণের শাসন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, সব নাগরিকের সুযোগের সমতার অধিকার, মানুষে মানুষে অধিকারের অসাম্য বিলোপ করে মৌলিক মানবিক অধিকার, নারীর

সমঅধিকারের পাশাপাশি ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার দিয়ে এ সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এতে আইনের শাসন, আইনের চোখে সবাই সমান, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারসহ মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষিত আছে।

অথচ এ সংবিধান যাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ঘাতকের বুলেটে নিহত হওয়ার পর সব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর দুই জীবিত সন্তান পিতৃহত্যার বিচার পাওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত। কিন্তু তারাও প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের মতোই এ দেশের নাগরিক। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে যে দেশটিতে, সেখানে তারা নিজের পিতামাতা, ভাই, ভ্রাতৃবধূদের হত্যার বিচার না পেলে ভবিষ্যতে কোনোদিন এ দেশটির সাংবিধানিক শাসনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এটা নিছক একটি হত্যা ঘটনা নয়। বিচারে প্রমাণ হয়েছে, এর নেপথ্যে ছিল একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা। ছিল রাজনীতি। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সংবিধানের লঙ্ঘন ঘটানো হয়। অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়া হয় এই হত্যার ধারাবাহিকতায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দিক-নির্দেশনা বিরোধী ধারার রাজনীতি। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানি ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হয়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে পুনর্বাসনের রীতি গ্রহণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দিক-নির্দেশনা বদলে দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়। এ ধারার অনুসারীরাই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিরোধী ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হয় গণতন্ত্রবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধপরাধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন। পুনর্বাসনের এ রাজনীতির সূচনা হয় ঘাতকদের প্রশ্রয় দিয়ে।

সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হত্যার রাজনীতিকে যদি কোথাও অপরিহার্য বিবেচনা করে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে, সেখানে প্রতিটি হত্যার ধারাবাহিকতা আরেকটি হত্যাকাণ্ডকেই ডেকে এনেছে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় একইভাবে এ জাতি পেয়েছে মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে ৩ নভেম্বর জেলের ভেতরে চার জাতীয় নেতার হত্যা, খালেদ মোশাররফ হত্যা। পরবর্তী সময়ে কর্নেল তাহেরসহ কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা সেনা-কর্মকর্তা নিধন, এমনকি এই মাটিতে রাষ্ট্রনায়ক হত্যার দ্বিতীয় নৃশংস ঘটনায় জীবন দিতে হয়েছে

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে এবং তাকে হত্যার দায়ে বিচার ছাড়াই হত্যার শিকার হয়েছে আরেক সেনানায়ক মঞ্জুর। এসব হত্যাকাণ্ডকে বিচারের কাঠগড়ায় নিতে বরাবরই চলেছে নানা টালবাহানা।

কোনো হত্যাই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের মতো ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং সেই হত্যাকে দীর্ঘ দু'দশক ধরে নীরবে সমর্থন করে জাতি হিসেবে আমরা যে পাপের বোঝা বহন করেছি—বোধ করি একের পর এক এসব হত্যার মধ্য দিয়ে আমরা এ দেশে তারই প্রায়শ্চিত্ত এখনও করছি।

এ হত্যার বিচার না করে ঘাতকদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রশ্রয় প্রদান সভ্য মানুষের বিশ্ব সমাজে এ জাতিকে একটি ঘাতক জাতি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশে চলেছে একের পর এক হত্যাকাণ্ড। রাজনৈতিক বলয় ছাড়িয়ে পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জগতেও হত্যাপ্রবণ এ মানসিকতাই সংক্রমিত হয়েছে। ইদানীং যেসব রক্তপিপাসু সন্ত্রাস কিংবা আইনের রক্ষকদের হেফাজতে নরহত্যার ঘটনা ঘটছে মানসিকতার প্রশ্নে এগুলোও বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

অপরাধ বিজ্ঞান বলে, আইনের শাসন এবং নিয়মনীতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধৃষ্টতা যদি প্রশ্রয় পায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে এই ধৃষ্টতা থেকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের বেপরোয়া পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস জন্ম নেয়। এ মানসিকতাই মানুষকে পরিণত করে ঘাতকে। এসব ঘাতকের বিস্তার রোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, অর্থাৎ সরকারের। জাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সরকারকে এ কাজে বাধ্য করা একটি জাতীয় দায়িত্ব।

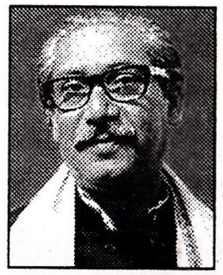
আধুনিক বিশ্বের দেশে দেশে এ সত্যকে অনুধাবন করেই বিশেষ করে রাষ্ট্রনায়কদের হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক হত্যা বলে বিবেচনার পরও বিনা বিচারে ছাড় দেয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে জন এফ কেনেডির হত্যাকারী লি-হার্ভে অসওয়ার্ল্ডকে খুন করায় জ্যাক রুবিকে প্রশংসা করেনি, প্রশ্রয়ও দেয়া হয়নি। তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিলম্বে হলেও মরণোত্তর বিচার করা হয়েছে আব্রাহাম লিংকনের হত্যাকারীর। মিশরে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদতের হত্যার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসেও রক্তের দাগ খুব কম নেই। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এ গণতান্ত্রিক দেশটিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, রাজীব গান্ধী হত্যার বিচার সম্পন্ন করতে তারা এতটুকু ইতস্তত করেনি। পাশাপাশি পাকিস্তানের রাজনীতিতে লিয়াকত আলী খানের হত্যাকারীকে

হত্যা করা হয় বিনা বিচারে। যদিও 'পিন্ডি মার্ডার কেস' নামে খ্যাত একটি মামলার বিচার শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এই মামলায় জেনারেল আকবরকে দীর্ঘদিন জেলে রাখা ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি হয়েছিল বলে জানা যায় না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দেশটির রাজনীতি থেকে কোনো দিনই অস্থিরতা কাটেনি।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে দীর্ঘ প্রায় দু'যুগ পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে। এ বিচার চূড়ান্ত করার পরবর্তী অধ্যায় এখন সংশয়াচ্ছন্ন। এ কথাও সত্য যে, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার ও আপিল নিষ্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন ঘটনায় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিছু লোকের ধারণা হয়েছে আমাদের বিচারকরা মামলাটির বিচার চান না। কিন্তু এই ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলাটির বিচার হয়েছে দেশের নিয়মিত আদালতেই। কোনো বিশেষ আদালতে নয়। এসব বিচার প্রক্রিয়ায় বাইরে থেকে কোনো বিচারক আনা হয়নি। এরা সবাই এ দেশেরই বিচারক। আবার এ কথাও ঠিক যে, এই মামলার আগে এত বিব্রত হওয়ার নজিরও কোনো একক মামলায় নেই। একের পর এক বিচারক বিব্রত হলেন কি করে এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে সব বিচারকই অযৌক্তিক কারণে বিব্রত হয়েছিলেন এ কথা বলা যাবে না। তারপরও আমার মতে, বড় ধরনের কোনো কারণ না থাকলে জনসাধারণের আগ্রহের কথা বিবেচনায় রেখে মামলাটির শুনানি করলে সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা বাড়তো ছাড়া কমতো না।

এখন যে টেকনিক্যাল কারণে মামলাটির নিষ্পত্তি হচ্ছে না তা নিরসনের সুযোগ একাধিকবার হাতছাড়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে হয়তো সে পথ তৈরি হয়নি। কিন্তু সরকার এ মামলার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব ঘটাচ্ছে, এমন ধারণা জনমতে যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতির জন্য এ কলঙ্কময় অধ্যায় যারা রচনা করেছে তাদের অপরাধ ক্ষমাহীন। রাজনৈতিক বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা থেকে যতই নিস্পৃহতা দেখানোর চেষ্টা সরকার করুন না কেন, মামলাটি একটি ফৌজদারি অপরাধের মামলা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলা। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য আইনানুগভাবে যা কিছু করার তা সরকারকেই করতে হবে। শুধু ফৌজদারি অপরাধের বিবেচনাই এখানে যথেষ্ট নয়। এর সাথে দেশের বিচারব্যবস্থার মর্যাদা এবং জাতীয় ভাবমূর্তির প্রশ্ন জড়িত। তাই সরকারের

নীতি-নির্ধারক মহলসহ সবারই আজ নিজের কাছে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে, সভ্যসমাজের বিচারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে কোনো সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির ঘৃণা ও ধিক্কার নিয়ে আমরা কতদিন বেঁচে থাকব। তাই আদালত গঠনের টেকনিক্যাল কারণে মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি থেমে গেলেও সরকারের উচিত ছিল হাইকোর্টের রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিদেশে অবস্থানরত অভিযুক্তদের দেশে ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত রাখা। একই সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে মামলাটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনারও এখনই সময়। মহিলা ও শিশুসহ সপরিবারে জাতির জনককে হত্যার অপরাধে শুধু ঘাতকের শাস্তিই যথেষ্ট কিনা ভেবে দেখারও প্রয়োজন আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চূড়ান্ত করার দাবিকে জাগ্রত রাখার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। সুপ্রিম কোর্টের ওপর অর্পিত হয়েছে তাদের সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে এই বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।



শওকত ওসমান

সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমি—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

১. ইতিহাসের স্বরূপ উপলব্ধি এ যুগে জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ, বর্তমানের স্থিতাবস্থা থেকে ফায়দা ওঠানেওয়ালা বহু ক্লাস বা শ্রেণী থাকে। রূহ্ (আত্মা) গুণে ফেরেস্তা। এ শ্রেণীর নিজস্ব ভাষ্যকার, তফসিরকার আছে। রাহা (রাস্তা) দেখানোর চেয়ে গুমরাহী (বিপথগামী) করার কাজটা যাদের ভালোভাবে রপ্ত।

সর্বযুগে এই কাণ্ড ঘটেছে।

অনেক সময় এ জ্ঞানপাপীদের ভণ্ডামি ধরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। বিজ্ঞানমথিত যুগে আরো দেরি হয়, সমাজের বাস্তব ছবি সহজে চেতনায় ধরা দেয় না। বেতার, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সংবাদপত্র-পত্রিকা-পুস্তিকা, ওয়াজ-মাহফিল, হ্যান্ডবিল, প্রচার-পুস্তিকা ইত্যাদিতে ঘোলাটে পানি আরো কর্দম-পঙ্কিল নয় শুধু, মানুষের রক্তে রক্তাক্ত করে ছাড়ে।

সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেয়া এ যুগে সহজ। একটা জ্যান্ত উদাহরণ। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতা পাকিস্তান আমলে এ ভূ-খণ্ডের কোনো ন্যায্য অধিকার, কি স্বার্থের কথা তুললে, তা তদানীন্তন পাকিস্তানির প্রভুদের কাছে হয়ে পড়তো—১. প্রাদেশিকতা, ২. ইসলামের বরখেলাপ, ৩. হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ৪. অন্যকিছু ছুতো না পেলে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো : হিন্দু সম্প্রদায় বা ভারতের উস্কানি, ফন্দি-ফিকির বা ঐ জাতীয় আর কিছু। এমন সব প্রচারের পেছনে মদদ দিতেন কারা? ইসলাম ধর্মের সাচ্চা পায়বন্দরূপে কথিত বহু আলেম-উলেমা, হাজার হাজার লাখ লাখ মুরীদশোভিত বুজুর্গ পীর কেবলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ডক্টর অগয়রহ।

১৯৪৭-১৯৭১। সুদীর্ঘকাল লেগে গেল সমাজের আসল বাস্তব রূপ খুঁজে পেতে।

বহু বছর পরে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গোক্ষুর ডক্টরগণ অধিকাংশ নির্বিষ ঢোড়া এবং মূলত ডক্টর নয় ডিজিজ (রোগ)।

এখানে লক্ষণীয়, ঐসব বিবেকহীন অথবা নির্বোধ আখের গোছানোওয়ালা পরহেজগার বা পণ্ডিতদের মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্য ইহজগৎ বা সমাজের মানুষ দরকার হয় না। অর্থাৎ মানুষের কী ঘটছে দৈনন্দিন জীবনে, কী তার বেঁচে থাকার সমস্যা, তার আত্মিক জীবনের বিকাশ বাধা (কুরআন, হাদিস পড়বে কী, অনেকে তো মক্তব-মাদ্রাসায় যেতেই পারে না—উচ্চশিক্ষা দূরের কথা) কোথায়—এসব নিয়ে ঐ পণ্ডিত এবং পরহেজগার আল্লাহর বান্দাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের একমাত্র কাজ ঈমানের চৌকিদারি করা। কিন্তু ঈমান প্রয়োজন হয় আদর্শকে কেন্দ্র করে। সেই আদর্শের বাস্তব রূপদান সমাজে ঘটছে কিনা বা অসুবিধা কোথায়—এসব দিকে এই ঈমানের আত্মনিয়োজিত প্রহরীদের চোখ আদৌ যায় না বা ধায় না। বাস্তব জীবন ছেড়ে তারা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলেন। মাথা নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। তারা মাথা ঘামান মাথাব্যাথা নিয়ে। কিন্তু মাথা ছাড়া যে মাথাব্যথা হয় না, এ সরল সত্যটা শত শত বছরেও ওদের চোখে পড়ে না। ভুঁই ছাড়া ওরা বাজি পোড়ায়। এই খাস বান্দারা যে পাক্কা আতশগীর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নচেৎ ওদের গুমরাহী নসিহৎ এবং মুনাফেকির মুখোশ খসে পড়তে চব্বিশ বছর লেগে গেল কেন?

ঐ উপলব্ধি বড় চড়া দামে কিনতে হয়েছে ভাগ্যাহত বাংলাদেশের অধিবাসীদের। অগণন নর-নারীর বেইজ্জতি, প্রাণ বিসর্জন, সম্পদ ধ্বংস এবং রক্ত সমুদ্রে সাঁতারের বিনিময়ে।

ইতিহাসের আসল স্বরূপ ধরা তাই এ যুগে বড় কঠিন। হুঁশিয়ার হওয়া অপরিহার্য। মানুষ ঠকতে পারে। কিন্তু নির্বোধ এবং মগা (হাবাগোবা) ছাড়া কেউ বারবার প্রতারিত হয় না। সতর্কতা তাই পদে পদে সকলের জন্য ফরজ। ধর্মের খোলসধারীকে যেন আমরা ধার্মিক বলে শনাক্ত করে না আসি।

২. আরেকটি হুঁশিয়ারি

আমার মনে হয় ভাষার দৈন্য থেকে এই জাতীয় তালগোল পাকানো আক্কেল ধ্বংসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এখনও এ দেশে ইতিহাস পড়ানো হয় ছাত্রদের। তারা জানে, সাতশ' বছর মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল অবিভক্ত ভাবতবর্ষে। হিন্দুরা রাজত্ব করেছিল গুপ্ত আমলে চারশ' বছর। এ জাতীয় আরো কাহিনী। মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল। কারণ, সম্রাট ছিল মুসলমান। কিন্তু চাষী-মজুর-কারিগর প্রভৃতি মুসলমানও কি রাজত্ব করতো? দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে কি এই সাধারণ মানুষরা শরিক হতে পারতো? ইতিহাসের জের আজো আছে। খুলনায় ধীবর শ্রেণীর মুসলমান—যাদের 'নিকিরী' বলা হয়, আছে পাবনার 'ধাওয়া' মুসলমান, আশরাফ, আতরাফ ইত্যাদি। তারা মুসলমান হয়েও অপাঙক্তেয় কেন? রাজত্ব তো দূরের কথা, নিজেদের শুধু প্রাণ ধারণের সমস্যায় তারা কতোখানি উচ্চবাক্য করতে পারে? অন্যদিকে দেখা যায়, সম্রাট মুসলমান। কিন্তু তার সেনাপতি হিন্দু। আকবর কেন রাজপুত সেনা এবং সেনাপতি রাখতেন বাহিনীতে? মারাঠা হিন্দু শিবাজীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন নূর খান। পাকিস্তানের একদা বিমান বাহিনীর মার্শাল নূর খানের নামে নাম। বলাবাহুল্য, মুসলমান। ব্যাপারটা স্ববিরোধী।

কিন্তু এই স্ববিরোধ নিরসন হয়, যদি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়। শিবাজী ও নূর খান, আকবর ও যশোবন্ত সিং—আসলে একই অর্থনৈতিক কাঠামো উদ্ভূত। হয়তো হিস্যা বেশি কম থাকতে পারে। ইরানের ভূতপূর্ব মরহুম শাহ (দোজখ না জান্নাতবাসী আল্লাহকে মালুম) এক সময় ক্যাবিনেটে ইহুদি অর্থমন্ত্রী রেখেছিলেন।

এসবই শ্রেণীস্বার্থের ফল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ইত্যাদি শব্দ ঐতিহাসিকরা ব্যবহার করেন, একটা কাল চিহ্নিত করতে। কিন্তু তা দিয়ে সমাজের আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সেই জন্য জানা দরকার, একটা দেশের ধন-সম্পদ কিভাবে উৎপাদিত হয়; কী তার বণ্টনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার আইন তৈরি করে কারা? সেক্ষেত্রে কাদের রায় কার্যকর। দেশের ক'জনইবা সেই সব আইন প্রণয়নে শরিক হতে পারে। এক কথায় দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছাড়া সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক পজিশন নির্ণয় কঠিন। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই আসল স্বরূপ ঢেকে রাখা হয়। কারণ, পেছনে থাকে ফায়দা ওঠানেওয়ালা কোনো শ্রেণী—যারা সমাজের বাস্তবরূপ ঢেকে রাখে এবং তারা জাহির করে, এ ব্যবস্থাই সমাজের সবচেয়ে উত্তম এবং যুগ যুগ তা চলে আসছে। এ ব্যবস্থা শাশ্বত, চিরন্তন। সমাজে তারা ধ্যানাদর্শ ছড়িয়ে রাখে যে পৃথিবীর সমাজের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সমাজের পরিবর্তন ঘটে এবং মানুষই তা ঘটায়—এ কথা তারা অস্বীকার করে।

৩. একটা দেশ বা সমাজের স্বরূপ নির্ণয়ে—অন্য কথায়, ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮০১ সাল থেকে হালফিল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা সুদীর্ঘ পৌনে ২শ' বছরের পাড়ি। তার বিবরণ মোটা মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়।

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে) বাঙালির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষ কব্জা করে নেয়। এসব কাণ্ড ঘটছিল কিন্তু বণিকতন্ত্রের সূত্র ধরে। তিন হাজার বছরে এ দেশের সমাজ আর কখনো এমন নাড়া খায়নি। রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটতো; কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থনীতির বুনিয়াদে তার তেমন কোনো আঘাত পৌঁছাতো না। কিন্তু বণিকের অর্থনৈতিক সূত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতীকের কায়দায় বলা যায় এভাবে। পূর্বে অর্থনীতির সূত্র ছিল :

পণ্য-টাকা-পণ্য

অর্থাৎ মানুষ পণ্য উৎপাদন করতো এবং তা বিক্রি করে টাকা পেত। তারপর ব্যবহার উপযোগী অন্য পণ্য কিনতো টাকা দিয়ে।

কিন্তু বণিক-অর্থনীতির সূত্র কালে কালে সব ওলট-পালট করে দিল। তখন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটলো এভাবে।

পুঁজি-পণ্য-পুঁজি

অর্থাৎ পুঁজি দিয়ে লোক পণ্য কেনে আর নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, বরং তা আবার পুঁজিতে পরিণত করতে।

ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র পুঁজিবাদে পরিণত হয়। সেই অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে প্রয়োজন বাজার, যা স্বদেশের সীমানায় আর কুলায় না। শুরু হলো দেশ-দেশান্তরে বাজারের সন্ধান, যার ফল, শেষ পর্যন্ত উপনিবেশ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। অর্থাৎ শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদ।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদও এক জায়গায় অনড় রইলো না। বর্তমানে কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশের আর উপনিবেশ প্রয়োজন হয় না। সরাসরি দেশ জয় এবং শাসনভার গ্রহণ আর ইউরোপীয় বা মার্কিন দস্যুবৃত্তির কেতাবে লেখা নেই। বর্তমান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বা বহুজাতিক কোম্পানি বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ পেলেই বর্তে যায় এবং সেভাবে প্রত্যেক দেশে তারা পথ করে নেয়। যার ফলশ্রুতি, অনুন্নত দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই তাদের তাঁবে চলে যায়। সরাসরি কোনো দেশের উপর রাজত্ব করার প্রয়োজন আর হয় না। উপনিবেশ আমল

থেকে এটুকু যা তফাৎ। কিন্তু মুনাফা লুণ্ঠন এবং অন্যান্য প্রকারের শোষণের কিছু কমতি ঘটেনি। আরো পঙ্কিত এবং রক্তাক্ত হয়ে ওঠে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সড়কের নানা অলিগলি। উনিশ শতকের শেষ অঙ্ক থেকে ইউরোপীয় দস্যুদের পাশাপাশি মার্কিন বোম্বেটেদের আবির্ভাব। দুনিয়ায় তারাই এখন বড় তরফ। ইউরোপ ছোট তরফে পরিণত।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি মনে রাখা দরকার। উপনিবেশ জয়ের কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ খুব সহজে এগোতে পারেনি। স্থানীয় প্রতিরোধ তখন থেকেই শুরু হয়। যার কালানুক্রমিক পরিমাণ, উপনিবেশ-দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম। অন্য কথায়, জাতীয়তাবাদের বিকাশ, যদিও পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর সেই পথ।

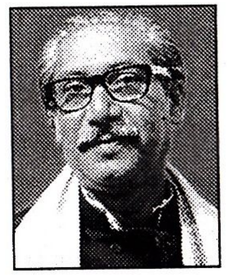
আরো লক্ষণীয়, সাম্রাজ্যবাদ গোড়া থেকেই উপনিবেশে দেশী এজেন্ট সৃষ্টি করে এবং তাদের লুণ্ঠনের শরিক করে নেয় কিছু উচ্ছিষ্ট হাড়গোড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা যেখানে মূল প্রলোভন ফাঁদ। এ দেশে ভূমিব্যবস্থার ওপর লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চরম আঘাত হানে জমিদারিপ্রথা প্রবর্তন মারফত। জমিদাররা হয়ে পড়লো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদরক্ষী বিরাট স্তম্ভ। এজেন্ট তৈরির একটা নমুনা দেয়া হলো। অর্থাৎ পন্থা একই, হয়তো ভেক নানা রকম হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে ইংরেজি 'কোলাবোরেটার' (সহযোগী) শব্দটি বেশ জোরে চালু হয়। কিন্তু ব্যাপারটা নতুন নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজের সহযোগী হয়ে পড়ে ঢাকার এক চামড়া ব্যবসায়ী, নাম আবদুল গণী। সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ চরম নৃশংসতায় দমন করে। তখন 'কোলাবোরেটার'দের পুরস্কার দিতে হয়। এ চামড়া ব্যবসায়ী রাতারাতি পেয়ে গেল 'নবাব' টাইটেল। চামড়া ব্যবসায়ী তখন নবাব আবদুল গণী। এমন কোলাবোরেটারদের বংশধরগণ অতীত বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার জমি-জিরাৎ, ধন-সম্পদ আজো ভোগ করে আসছে।

উনিশ শতকের সমাজ প্রবাহের জের বিংশ শতাব্দীতেও এসে লাগে। বণিকতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী স্তর এবং যখন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বখরা নিয়ে সংকট ঘনিয়ে এসেছে, যার পরিণাম প্রথম মহাযুদ্ধ—তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। উপনিবেশের সন্তান। তাঁর মানসলোক থেকে জাতীয়তাবাদের শিকড় আর কোনোদিন উৎপাটিত হয়ে যায়নি। মধ্যবিত্ত মুসলমান প্রায় সবই মুসলিম লীগের পতাকাতলে জমায়েত হয়েছিল

তিনের দশকে। ১৯৪০ সন তো তুঙ্গ পর্যায়। বঙ্গবন্ধুও আর দশজন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানের মতো মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু তখনো দেখা যায়, প্রভু ইংরেজের সৃষ্টি এবং এ দেশের কলঙ্ক 'হলওয়েল মনুমেন্ট' উচ্ছেদে সুভাষ বসুর (পরে নেতাজী) আহ্বানে শরিক হন। তখন শেখ মুজিব মাত্র কলেজের ছাত্র। দেশ বিভাগের পর তিনি দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফাঁপা চেহারা দেখতে পান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সোচ্চার প্রতিধ্বনি ভাষা আন্দোলনের শরিক বঙ্গবন্ধুই ন্যাশনাল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এখন স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কলাকৌশল অনুযায়ী তিনি 'মুসলিম' শব্দটি রাখেন। কিছুদিনের মধ্যে এই 'মুসলিম' শব্দ খসে গেল। জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এখানেই পরিষ্কার। ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপাত্ররূপেই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল।

বিশ্ব জীবনের প্রবাহ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা আত্মহত্যার সামিল। মুসলমান সম্প্রদায় শত শত বছর এই ভুল করে এসেছে, যার ফলে পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোনো ঠাঁই নেই। তারা ব্রিটিশ আমল থেকেও প্রথমে ইংরেজি শেখেনি, যেহেতু ইংরেজি নাসারার ভাষা। এমন অন্ধতার ফলেই বর্তমান পশ্চাৎপদ। বঙ্গবন্ধু তা উপলব্দি করেছিলেন বৈকি। নচেৎ 'সেক্যুলার' দৃষ্টিভঙ্গির দিকে উত্তরোত্তর তিনি ঝুঁকতেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তিনি 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। নতুনভাবে রাজনৈতিক জীবনধারার একটা পরীক্ষা হতো। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র জন্মভূমি ইউরোপেই অবজ্ঞেয় বর্তমানে। এ দেশে তার দুর্দশা কারো কাছে অজ্ঞাত নয়। নতুন রাজনৈতিক কাঠামো পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আন্তর্জাতিক দস্যুদল, যারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রতিভূ এবং তাদের দেশী সরীসৃপ এজেন্ট দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল। যথাসময়ে তারা ছোবল দিতে আর দেরি করেনি।

রক্তস্নাত আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পৃথিবী থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর আরব্ধ কর্তব্য আজ সকল সাচ্চা দেশপ্রেমিকের উপর ন্যস্ত। সাত শতাব্দীর গোলাম এ ভূ-খণ্ডের বাঙালিদের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গেছেন শেখ মুজিব। মানুষের মতো বাঁচার এই অনির্বাণ মন্ত্রঅগ্নি কার সাধ্য সহজে নিভিয়ে দিতে পারে?



শফিক সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধু ও স্যার টমাস উইলিয়ামস

লন্ডনে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬'র বিকেল, আমার বাসার ফোনটা বেজে উঠলো। ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে বয়স্ক ইংরেজ মহিলার কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো রং নম্বরে কল এসেছে। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম কান্না ভেজা কণ্ঠ বলছে, 'শফিক, টমাস আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠলো—'টমাস তোমাদেরকে খুব ভালোবাসতো। তোমাদের খোঁজ-খবর হসপিটালের বেডে থেকেও নিয়েছে।' তখন বুঝলাম, এটা লেডি উইলিয়ামসের কণ্ঠস্বর। আমি লেডি উইলিয়ামসকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে ফোন রাখলাম। স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো—

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের আরেকটি বিকেলে কথা। ঐদিন বিকেলে আমি বাসার দরজা খুলে প্রবেশ করা মাত্র রেহানা প্রায় চিৎকার করে বলল, 'স্যার টমাস উইলিয়ামস ফোন করেছেন, জলদি ধরো।' ফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে একটি গম্ভীর গলা ভেসে আসলো, 'তুমি বেশ কয়েকদিন আগে ফোন করে 'মেসেস' রেখেছিলে, কিন্তু যেহেতু আমি দেশের বাইরে ছিলাম, সেহেতু তোমার ফোনের উত্তর সময় মতো দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।' এরপর সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তার পর উনি রেহানা ও আমাকে একদিন 'হাউস অব কমন্সে' আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তারিখ ও সময় আমরা যেন তার সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করে নিই।

বেশ কয়েকদিন আগে সুলতান ভাই আমাকে স্যার টমাস উইলিয়ামসের হাউস অব কমন্সে তাঁর অফিসের ফোন নম্বর দেন। আমি কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে স্যার টমাস উইলিয়াসের নম্বরে ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেছিল তাঁর

সেক্রেটারি; সে জানিয়েছিল উনি লন্ডনের বাইরে আছেন। তারপর আমার নাম ও কি কাজে ফোন করেছি এবং টমাস উইলিয়ামসের জন্য কোনো মেসেজ রাখতে হবে কিনা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলো। আমি তাকে বলেছিলাম যে তিনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারতেন না, কারণ আমি তাঁর পূর্ব পরিচিত নই। আমি রেহানা ও আমার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যে, তিনি ফিরে আসলে যেন আমাকে দয়া করে ফোন করেন। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমরা মনে করেছি, উনি বোধ হয় ফোন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি বা ফোন করতে ভুলে গেছেন। সেজন্য সেদিন হঠাৎ তাঁর ফোন পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। রেহানার মুখ দেখেও মনে হলো ও খুব খুশি হয়েছে।

রেহানা ও আমি ঠিক করলাম, যেদিন আমরা স্যার টমাস উইলিয়ামসের সাথে দেখা করতে যাবো, সেদিন সেলিম ভাইকেও (ড. মোহাম্মদ সেলিম) সাথে নিয়ে যাবো। এর মধ্যে আমি টমাস উইলিয়ামসের সেক্রেটারির সাথে কথা বলে এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে আমরা তিনজন হাউস অব কমন্সের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রেহানা, আমি ও সেলিম ভাই হাউস অব কমন্সের সিকিউরিটি চেকের কাউন্টার পার হয়ে গেলাম বেশ বড় একটা হলে, যেখানে দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করছে। সুন্দর সিস্টেম, প্রথমে রিসেপশনে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে হবে এবং বলতে হবে কোন এমপির সাথে দেখা করতে চাই। তারপর রিসেপশনের লোক গিয়ে এমপিকে দর্শনার্থীর খবর দেবে।

আমার চিন্তা হলো, আমি তো স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আগে দেখিনি, তাই তাঁকে কিভাবে চিনবো। এ কথা সেলিম ভাইকে বলতেই উনি জানালেন যে উনিও একই কথা ভাবছেন। রেহানাকে আমাদের চিন্তার কথা বলতেই রেহানা বলল, 'আমি খুব ছোটবেলায় একবার কি দু'বার ঢাকায় তাঁকে দেখেছি। তাই আশা করি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবো!' রেহানার স্মরণশক্তি ওর বাবার মতোই প্রখর। একবার কাউকে দেখলে সহজে ভোলে না। বঙ্গবন্ধুর স্মরণশক্তি সম্বন্ধে নানা ঘটনা লোক মুখে শোনা যায়। আমরা রেহানার স্মরণশক্তির উপর আস্থা রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম স্যার টমাস উইলিয়ামসের জন্য। লক্ষ্য করলাম, এমপিরা যে দরজা দিয়ে হলে আসেন সেখানে বয়স্ক, সুন্দর এক ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে আসতেই রেহানা বলে উঠল ইনিই বোধ হয় স্যার টমাস উইলিয়ামস। মজা হলো, স্যার টমাস উইলিয়ামসও আমাদের চেনেন না। দেখলাম, উনি হলের চারদিক

দর্শনার্থীদের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় আমাদের খুঁজছেন। রেহানার কথামতো আমরা এগিয়ে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম। উনি খুব আন্তরিকতার সাথে জানতে চাইলেন, 'তোমাদের এখানে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' আমি বললাম, 'না, আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।' উনি বললেন, 'চল তোমাদের নিয়ে পাশের ক্যান্টিনে বসি, সেখানে বসে তোমাদের সাথে কথা বলা যাবে।' আমরা তাকে অনুসরণ করে ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে ঢাকায় তাঁর অবস্থানকালের বেশ কিছু স্মৃতিচারণ করলেন। এ স্মৃতিচারণের মাঝে তিনি বিশেষ করে স্মরণ করছিলেন বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতা, বেগম মুজিবের আতিথেয়তা ও শেখ কামালের কথা। তারপর উনি জানতে চাইলেন আমাদের কাছে, আগরতলা মামলায় তার অন্যতম সহযোগী ড. কামাল হোসেনের কথা। আমি উত্তরে জানালাম যে উনি অক্সফোর্ডে আছেন এবং খুব সম্ভব শীঘ্রই তার সাথে যোগাযোগ করবেন।

আরো কিছু কথাবার্তার পর আমরা আমাদের কাজের কথা শুরু করলাম। আমরা তাঁকে জানালাম যে, এখানে সম্প্রতি ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো বিদেশে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রচার করা। কয়েক বছর আগে দেশেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রচারের জন্য বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেখানে পেশাজীবী মানুষ যেমন—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি-সাহিত্যিকগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। কিছুদিন আগে এই নবগঠিত ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সম্মেলন লন্ডনে হয়েছে। এ সম্মেলনের পরিষদের সভাপতি পদের জন্য যে আমরা তাঁকে মনোনীত করেছি তাও তাঁকে জানালাম। আমরা স্যার টমাসকে বললাম, আমাদের এই মনোনয়নে সম্মতি দিলে আমরা বাধিত হবো। সেলিম ভাই তাঁকে আরো জানালেন যে, লর্ড ব্রকওয়ে এবং শেখ হাসিনা এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা পরিষদে ড. কামাল হোসেনসহ এখানকার বাঙালি সমাজের অনেক গুণীজন আছেন। সবশেষে সেলিম ভাই এও জানালেন, এ পরিষদে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্য আছেন। আরো বললেন, তিনি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং আমি কার্যকরী পরিষদের সদস্য। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, 'সেই কতকাল আগে ১৯৬৮ সালে আমি ঢাকা গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করতে। তারপর এলো ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। তখনো আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। সে তো প্রায় দশ বছর আগের কথা। তোমরা বাঙালিরা এখনো আমাকে মনে

রেখেছ!' একটু থেমে উনি বললেন, উনি নিজে একজন বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী এবং ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব উনি সানন্দে গ্রহণ করবেন। আমরা স্যার টমাস উইলিয়ামসের কথা শুনে সবাই খুব আনন্দিত হলাম এবং তাঁকে ইউরোপীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। সেলিম ভাই তাঁকে বললেন যে, সংগঠনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র, কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ এবং পৃষ্ঠপোষকগণের তালিকা উনাকে দিয়ে যাবেন। তিনি আরো বললেন, সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে পত্র দিবেন। রেহানা ও আমি আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যা-মামলা সম্পর্কে প্রথম সাক্ষাতে কিছুই বলবো না। বরং ঘনিষ্ঠতা বাড়লে পরে এক সময় এ সম্বন্ধে তাঁর সাথে আলোচনা করবো। আরো স্থির করেছিলাম যে, আমরা এ ব্যাপারে হাসিনা আপার সাথে পরামর্শ করা ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেব না। এবার আমাদের বিদায় নেয়ার পালা। ক্যান্টিন থেকে উঠে লবিতে স্যার টমাস উইলিয়ামসসহ আমরা অগ্রসর হওয়ার সময় দেখা হলো প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে। স্যার টমাস উইলিয়ামস রেহানাকে দেখিয়ে বললেন, 'তুমি একে চিনেছ? ও শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা।' হ্যারল্ড উইলসন বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন।' তারপর রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম।' স্যার টমাস উইলিয়ামস হাউস অব কমন্সের সদর দরজা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চে আলোচনা সভা করার ব্যাপারে হাউস অব কমন্সে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সাথে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন আলাপ করতেই উনি বললেন, ১৭ মার্চে আলোচনা সভা করার আইডিয়াটা চমৎকার। কারণ এখন হাউস অব কমন্সে অধিবেশন চলছে এবং এই অধিবেশনকালের মধ্যেই ১৭ মার্চ পড়ে। সেজন্য হাউস অব কমন্সের একটি কমিটি রুমে আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারলে বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠ এমপিরাও সভায় উপস্থিত থাকতে ও বক্তব্য রাখতে আগ্রহী হবে। উনি প্রস্তাব করলেন ১৭ মার্চের সন্ধ্যার দিকে হাউস অব কমন্সের কমিটি রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের কথা। কমিটি রুম পাওয়ার ব্যাপারে উনি দায়িত্ব নেবেন এবং উনার কয়েকজন এমপি বন্ধু, যারা ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্গবন্ধুকে জানতেন তাদেরও এ আলোচনা সভায় আসতে অনুরোধ করবেন। সেলিম ভাই ও আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যকরী কমিটির পরবর্তী সভায় স্যার টমাস

উইলিয়ামসের প্রস্তাবটা উত্থাপন করতেই সবাই খুব খুশি হলো। এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী হাউস অব কমন্সে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন। ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে উনাকে এ কথা জানাতেই তিনিও খুশি হলেন এবং জানালেন ঐ সভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ছেলে রাশেদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে আসবেন। কার্যকরী পরিষদের এ সভায় ঠিক হলো যে, আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খান, পরিষদের উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেন, সহ-সভাপতি মাইকেল বার্নস, নূরজাহান মুর্শেদ ও অনিল দাশগুপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখবেন। সভায় আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, পরিষদের সভাপতি স্যার টমাস উইলিয়ামস নিজেই ঠিক করবেন ব্রিটিশ এমপিদের মধ্যে কে কে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখবেন। এ আলোচনা সভা সাফল্যমণ্ডিত করতে কেবল বঙ্গবন্ধু পরিষদ কাজ করেনি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগসহ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী অন্যান্য দল যেমন—ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ বঙ্গবন্ধু অনুসারী এই নেতা ও কর্মীগণ সকলে অনুভব করছিলেন যে, বিলেতে হাউস অব কমন্সে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে এই মহান নেতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

১৭ মার্চ ১৯৮০ সন্ধ্যা ছয়টার সময় হাউস অব কমন্সের কমিটি রুমে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা শুরু হলো। হলটি বেশ বড় হওয়ায় দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল অনেক। দিনটি একটি কাজের দিন হওয়ায় অনেকে অফিস থেকে সরাসরি এই সভায় চলে এসেছে। দেখলাম বেশ ক'জন ব্রিটিশ এমপিও উপস্থিত হয়েছেন। এদের পক্ষ থেকে জুলিয়াস সিলভারম্যান বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির ভাষণে স্যার টমাস উইলিয়ামস বলেন, 'আমার মতো আপনারাও এটা অনুভব করেছেন যে, আজকের এই সভার মাধ্যমে একজন মহান ব্যক্তিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারায় এ সভাটি বাস্তবিক পক্ষেই সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাকে আপনাদের এ নতুন সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে আমি খুবই গর্ববোধ করছি। এ সমিতির সেবা করতে গিয়ে আমাকে যা কিছুই করতে হবে, তা আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ও গর্বের সাথেই করবো। আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি এবং আমি বিশ্বাসও করি যে, শেখ মুজিব আমার বন্ধু ছিলেন। আমি তাকে জানতে পেরে, বিশেষ করে তার জন্য এবং তার সাথে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার এই কথা ভাবতে ভালো লাগে যে, আমি

যখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম তখন অনেকের সাথেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, যারা সকলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আমার সাথী ছিল। শুধু তাই নয়, আজকের যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশের শুরু থেকেই তারা আমার সাথে ছিল। আজকের এ সন্ধ্যায় সভার কার্যক্রম শুরু করার সময় আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, শেখ মুজিবের সাথে আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তার আরাধ্য কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যাবেন, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার এ বিশ্বাস হয়তো পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি, কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে এবং যতদিন বাংলাদেশ বিশ্বের ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে, ততদিন তাঁর মৃত্যু নেই। তার দৈহিক মৃত্যু তার নিজ পরিবারের জন্য ছিল বেদনাদায়ক, তার বন্ধুদের জন্য ছিল দুঃখজনক, কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বেদনা ও দুঃখের ছিল বাংলাদেশের জন্য, যে বাংলাদেশ তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশা হলো একটি জাতির জাগরণের অংশ। এ কথা বঙ্গবন্ধুর বেলায় সত্য যে, তিনি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সে আন্দোলনের বীজ শহীদের রক্ত এবং আত্মত্যাগ দিয়ে সূচিত হয়েছিল। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু নেই, কেননা আজকের এ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও বাংলাদেশ আবার যখন জেগে উঠবে, জাতিসত্তার পূর্ণতা পাবে, তখন তাঁর আত্মা আমাদের মাঝে ফিরে এসে বলবে, 'তোমরা যদি আমার স্মৃতিচিহ্ন চাও তবে তোমাদের চারদিকে তাকাও।' একজন মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আগামী দিনগুলোতে তাঁর স্মৃতি আমাদের মধ্যে জাগরুক হয়ে থাকবে এবং তা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। আমি আশা করি, যে স্বাধীন ও শক্তিশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার মৃত্যু নেই। আমি এ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, অনেক স্বনামধন্য সংসদ সদস্য এ সভায় আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে তাঁরা আসতে পারেননি। তবে তারা সমিতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁরা হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, লিবারেল পার্টির চিফ হুইপ এলেন বিথ, লিবারেল পার্টির প্রাক্তন নেতা জো গ্রিম এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু জন হান্ট এমপি।'

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন স্যার টমাস উইলিয়ামস হাসিনা আপাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন যে, হাসিনা আপাকে পার্লামেন্ট বিল্ডিং ঘুরিয়ে দেখাবেন। হাসিনা আপা ও আমি নির্ধারিত দিনে

গেলাম স্যার টমাস উইলিয়ামসের সাথে দেখা করতে। পার্লামেন্ট বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতেই আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন স্যার টমাস উইলিয়ামস। ঘুরে দেখার পর আমরা ক্যান্টিনে প্রবেশ করলাম চা খাওয়ার জন্য। চা খেতে খেতে হাসিনা আপা বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করার দায়িত্ব নিতে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু দেশে খুনিদের দোসররা ক্ষমতাসীন এবং তারা অধ্যাদেশ জারি করেছে যে, ১৫ আগস্টে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার করা যাবে না। এ অমানবিক আইনের জন্য দেশে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাচ্ছে না। সেহেতু হাসিনা আপা চাচ্ছেন লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করে ১৫ আগস্ট ও পরবর্তীকালে ৩ নভেম্বর জাতীয় নেতাদের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। স্যার টমাস উইলিয়ামস এ প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'আমি মনে করি এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে। দেশে এ মুহূর্তে না পারলেও আমরা বিদেশে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এর বিচারের পক্ষে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে পারি। আমি নিশ্চয়ই এই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছি।' এরপর উনি তদন্ত কমিশন কীভাবে গঠন করা যায় সে বিষয়ে আলাপ করলেন। কথায় কথায় হাসিনা আপা বললেন যে, ড. কামাল হোসেনের সাথে এ ব্যাপারে হাসিনা আপার আলাপ হয়েছে। উনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন।

ঠিক হলো অল্প কিছুদিনের মধ্যে কামাল হোসেন স্যার টমাস উইলিয়ামসের সাথে বসে তদন্ত কমিশনের প্রাথমিক রূপরেখা নির্ধারণ করবেন। কিছুদিন পরে স্যার টমাস উইলিয়ামসের সাথে হাসিনা আপা এক বৈঠকে বসেন এবং সেখানে স্থির হয় যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় হাসিনা আপা আনুষ্ঠানিকভাবে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য অনুরোধ করবেন। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে হাসিনা আপার অনুরোধ রক্ষা করে স্যার টমাস উইলিয়ামস বক্তব্য রাখবেন। আরো স্থির করা হলো আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক উইকএন্ডে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত দিবসকে লক্ষ্য রেখেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। স্থির হয় যে, জনসভার স্থান, তারিখ ও সময় স্যার টমাস উইলিয়ামসকে পরে টেলিফোনে জানানো হবে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। কেবল যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের গুটিকয়েক নেতা ছাড়া আর কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি।

১৬ আগস্ট ১৯৮০ রবিবার বিকেলে মিটিংয়ে যাওয়ার জন্য খোকা চাচার গাড়িতে হাসিনা আপা ওঠেন। তার পেছনে সুলতান ভাই ও হাসেম সাহেবের গাড়ি। আমার বাসা থেকে মিটিংয়ের হলে পৌঁছাতে পৌনে এক ঘণ্টা সময় লাগে। সভাস্থলে পৌঁছে দেখলাম মিটিংয়ে প্রচুর লোক, তিলধারণের স্থান নেই। মিটিং শুরু হলো সুশৃঙ্খলভাবে। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা বক্তৃতা করলেন এবং দুজন বাংলাদেশ থেকে আগত আওয়ামী লীগের এমপিও বক্তব্য রাখলেন।

তারপর আসলো হাসিনা আপার পালা। এটা পঁচাত্তরোত্তর হাসিনা আপার প্রথম কোনো জনসভায় বক্তৃতা করা। হাসিনা আপা বাংলাদেশের সামরিক সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, ইতিহাস বিকৃতি, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করা এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলানো সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন। উনি বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছিল তার কথাও উল্লেখ করেন। হাসিনা আপা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। দেখলাম শ্রোতাদের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিশেষভাবে প্রবাসী বাঙালি নারীদের প্রায় সকলেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। বক্তৃতার শেষ অংশে হাসিনা আপা বলেলেন, 'আমি বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে, বিশ্বমানবতার কাছে বিচার চাই—কেন আমরা মা-বাবার স্নেহবঞ্চিত, কেন আজ আমি ভাইহারা? আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই, বিচার চাই বিশ্ববাসীর কাছে, এত খুনের বিচার হয়, তবে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার কেন হচ্ছে না? হত্যাকারীরা আজ প্রকাশ্য দিবালোকে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হত্যাকারীরা কেবল বাংলাদেশের জনগণের জন্যই যে হুমকিস্বরূপ তা নয়, সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিকদের প্রতিও হুমকিস্বরূপ। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান কৌঁসুলি স্যার টমাস উইলিয়ামসকে আমি অনুরোধ করবো ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য। আমি চাই খুনিদের বিচার হোক।'

তারপরই স্যার টমাস উইলিয়ামসের বক্তৃতা। প্রধান বক্তার ভাষণে স্যার টমাস উইলিয়ামস বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকারীদের আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন বলে শেখ হাসিনাকে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও অন্যান্য আইনজীবীদের নিয়ে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে

যেসব দলিলপত্র তাদের কাছে রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন। সমবেত শ্রোতাদের দীর্ঘস্থায়ী করতালির মধ্যে স্যার টমাস বলেন, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা কি করে শুরু করা যায় সে সম্পর্কে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। স্যার টমাস আরো বলেন, যাদের হাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের রক্তের দাগ রয়েছে তাদের বিচার করতেই হবে। শুধু বিচার করলেই চলবে না, বিচার করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়া প্রয়োজন। জাতির পিতার হত্যার ফলে বাংলাদেশের বহুলোক লজ্জাবোধ করে বলে তিনি সুনিশ্চিত। হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই লজ্জা দূর করা যাবে না। স্যার টমাস জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সম্মানহানি নাকচ করার জন্য হত্যাকারীদের উপযুক্ত বিচার অবশ্য প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৬৮ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জয়লাভ করে বঙ্গবন্ধুর কালিমালিপ্ত সম্মান পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যেই বাংলাদেশের অঙ্কুর নিহিত ছিল বলে তিনি মনে করেন।

মিটিং শেষ হতেই আমার মনে হলো যে, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও মহিলা লীগের এত দিনের কষ্টসাধ্য আয়োজন আজ এ সভার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করলো। হাসিনা আপা সভা শেষে টসাম উইলিয়ামস, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন। মিটিং শেষ হওয়ার পর পরই যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে হাসিনা আপা ও টমাস উইলিয়ামসের বক্তব্য এবং মিটিংয়ের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রেস রিলিজ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

১৫ আগস্ট উপলক্ষে মিটিংয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্যার টমাস উইলিয়ামস তদন্ত কমিশন গঠন করার কাজে হাত দেন। তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে উনি প্রথমেই মনোনীত করেন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিখ্যাত আইরিশ কৌঁসুলি সন ম্যাকব্রাইডকে। সন ম্যাকব্রাইড ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতা হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধা আছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও সন ম্যাকব্রাইডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৭৭ সালে সন ম্যাকব্রাইড নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্তে এসে আলোচনা করেন তৎকালীন বাংলাদেশের সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। সে সময়

জিয়াউর রহমান ম্যাকব্রাইডকে এ হত্যাকাণ্ডসমূহের বিচারের বিষয়ে এই বলে আশ্বাস দেন 'আইন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হবে।' এরপর বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচারের ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। বরং তৎকালীন সরকার জঘন্য এই হত্যাকাণ্ডগুলোর সাথে যারা সরাসরি জড়িত ছিল প্রায় তাদের সকলকে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে উচ্চপদে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করে। এদের বাংলাদেশ মিশনে নিয়োগ দেয়ার কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। স্যার টমাস উইলিয়ামস ভেবেছিলেন যে, সন ম্যাকব্রাইড যেহেতু এসব নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত আছেন সেহেতু উনাকে তদন্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত করলে এ তদন্ত কমিশন উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

কমিশনের অপর একজন সদস্য হিসেবে স্যার টমাস উইলিয়ামস মনোনীত করলেন জেফ্রি টমাস কিউসি এমপিকে। জেফ্রি টমাস ছিলেন লেবার পার্টির আইনবিষয়ক মুখপাত্র। ব্রিটেনে আইনমন্ত্রীরপদ না থাকায় সরকারের আইনবিষয়ক মুখপাত্রই আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। স্যার টমাস উইলিয়ামস এবং জেফ্রি টমাস কিউসি উভয়ে লেবার পার্টির এমপি। স্যার টমাস উইলিয়ামস জেফ্রি টমাসকে তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই ভেবে যে, জেফ্রি টমাস আইনবিষয়ক মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই কমিশনকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন।

১৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের হাউস অব কমন্সের নিকটবর্তী কুন্দন রেস্টুরেন্টে বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনে স্যার টমাস উইলিয়ামসকে সাহায্য করেন যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এ কমিশন গঠন ও তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেয়ার প্রস্তুতে এখানকার বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের মাঝে ভীষণ সাড়া জাগায়। হাসিনা আপা ও রেহানাকে দেখলাম প্রচণ্ড উৎসাহী। মনে হলো দু'জনের এতদিনের প্রাণের দাবি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচারের একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে এরা দু'জনেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য দিলেন স্যার টমাস উইলিয়ামস। উনি বললেন, 'কমিশনের প্রথম কাজ হলো আইনের অবস্থান নির্ধারণ এবং লন্ডন থেকে তা করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত দলিলপত্র ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করা হবে। কমিশনের একজন কিংবা দুজন সদস্য বাংলাদেশ সফরে যাবেন।' স্যার টমাস আরও বলেন, 'কমিশনের দুটি

মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—(১) আইন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হবে বলে জিয়া যে আশ্বাস দিয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি কেন এবং (২) বাংলাদেশে প্রচলিত ফৌজদারি আইনের আওতায় হত্যাকারীদের বিচার করা যায় কিনা, তা নির্ধারণ করা। তদন্তের পূর্বেই যদি মনে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলাদায়ের করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার জন্য আমরা আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেলকে রাজি করানোর চেষ্টা করবো।' স্যার টমাস আরো বললেন, 'অ্যাটর্নি জেনারেলকে মামলা দায়ের করাতে রাজি করানো সম্ভব না হলে কমিশন বিষয়টি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের নিকট পেশ করবে।'

তদন্ত কমিশনের সদস্যদের প্রথম শ্রেণীর দুটি বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করে ঢাকায় যাতায়াতের জন্য সলিসিটার অব্রে রোজকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভিসার জন্য আবেদন করতে বলা হলো। জানুয়ারি ১৯৮১'র দ্বিতীয় সপ্তাহের একদিন আগে রোজ নিজের ও জেফ্রি টমাস কিউসির জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনে ভিসার আবেদন করলেন। নিয়মমাফিক পরদিন উনাদের দুজনের ঢাকায় যাওয়ার জন্য ভিসা পেয়ে যাওয়ার কথা। দুদিন পর সুকৌশলে ভিসা না-মঞ্জুরের খবর অব্রে রোজকে দেয়া হয় সেদিন হাইকমিশন বন্ধ হওয়ার ঠিক কিছুক্ষণ আগে। অব্রে রোজ খবর পেয়ে আমাদের কাছে ছুটে আসেন। সেখানে অন্যদের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন জেফ্রি টমাস কিউসি ও স্যার টমাস উইলিয়ামস এবং যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। স্যার টমাস উইলিয়ামস আমাদের উদ্দেশ্যে করে বলে উঠলেন, 'আগে থেকেই এ ভিসা নাকচ হওয়ার আভাস আমি পেয়েছিলাম। আজ দুপুরের দিকে আমাকে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ফোন করে জানান যে, আমাকে বাংলাদেশ যাওয়ার ভিসা মঞ্জুর করা হবে না।' স্যার টমাস আরো জানালেন যে, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনার উনাকে বার বার অনুরোধ করেছেন কমিশনের কোনো সদস্য যেন ভিসা ব্যতিরেকে বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। কারণ এই তদন্ত কমিশনের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। স্যার টমাস উইলিয়ামসের এ কথা শোনার পর আমি বেশ অবাক হলাম এ জন্য যে, স্যার টমাস উইলিয়ামস তো ভিসার জন্য আবেদনই করেননি। এ কথাটি টমাস উইলিয়ামসকে বলতেই তিনি বলে উঠলেন, 'শফিক, বাংলাদেশ সরকার আমার ভিসা আবেদন মঞ্জুর করবে না এ কথা জানিয়ে পূর্বাহ্নেই আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে।' তিনি দুঃখ করে বললেন, বাংলাদেশ সরকার পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দেশ যে উনাকে

অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। উনি জানালেন প্রথম দেশটি হলো চিলি। উনি আরো দুঃখ করে বললেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উনার ভালোবাসা অনেক দিনের। সেজন্যই উনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ্য আইনজীবী হিসেবে ঢাকা আগমন করেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উনাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ উনাকে এখনো শ্রদ্ধা করে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অবদান স্বীকার করে।

১৯৮২ সালের প্রথম দিকে কোনো এক সময়ে স্যার টমাস উইলিয়ামস সেলিম ভাই ও আমাকে পার্লামেন্টে ডেকে বলেন যে, স্বাস্থ্যগত কারণে উনি আর এমপি থাকতে চান না। তাঁর এলাকা ওয়েলিংটন লন্ডন থেকে দূরে। প্রতি সপ্তায় দু'বার তাঁকে এলাকায় যেতে হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের এটাই নিয়ম। ব্রিটেনের সব এমপিদের মতো তাঁর এলাকায় একটি অফিস আছে। যেখানে তিনি জনগণের সকল অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্টের কথা শুনতে পান। কিন্তু স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতির কারণে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন জনসেবার ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে তিনি আর সক্ষম হচ্ছেন না। উনি শীঘ্রই এমপি পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। তিনি আরো জানালেন যে, বাকি জীবনটা বিচার বিভাগে জজ হিসেবেই কাটাতে চান। তিনি একজন নামকরা কিউসি থাকাতে বিচারক হিসেবে তাঁর নিয়োগটা সহজতর হয়। সাথে সাথে আমাদের তিনি এও জানালেন যেহেতু তিনি শীঘ্রই বিচারক হচ্ছেন তাই আর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হিসেবে থাকতে পারবেন না। যদি পরিষদের কোনো কাজ থাকে এমপি থাকাকালীন অবস্থায়ই তা তিনি করে দিতে চান। এ কথার জবাবে আমি ও সেলিম ভাই তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তার অবর্তমানে কাকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া যায়। তিনি তখন সন ম্যাকব্রাইডের কথা বললেন, যিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা তদন্তে আন্তর্জাতিক কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। সন ম্যাকব্রাইড একজন প্রবীণ আইরিশ কৌঁসুলি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টসের যথাক্রমে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার ও জুলিও কুরি পুরস্কার বিজয়ী। স্যার টমাস উইলিয়ামস আমাদের আশ্বস্ত করে আরো বললেন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির আসন থেকে সরে দাঁড়ালেও তাঁর আশীর্বাদ থাকবে এ পরিষদের জন্য সব সময়। আরো জানালেন, সাধ্যানুযায়ী সকল সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন। সত্যিই মনের দিক

থেকে এমন একজন বড় মাপের মানুষের সাহচর্য পেয়ে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি।

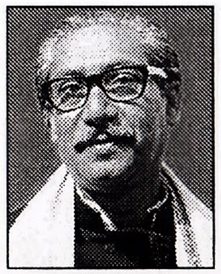
১৯৮২ সালে এরশাদের ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পরে হঠাৎ এক বিকেলে স্যার টমাস উইলিয়ামস আমাকে ফোন করেন। এ ফোন পেয়ে আমি একটু অবাক হলাম। কারণ স্যার টমাস বিচারপতি হওয়ার পর সাধারণত আমিই তাঁকে ফোন করতাম। সেসব ফোনের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ থাকতো পারিবারিক কথোপকথন নিয়ে। প্রায় সময়ই কথাবার্তার মধ্যে স্যার টমাস উইলিয়ামস জানতে চাইতেন হাসিনা আপা কেমন আছেন। স্যার টমাস উইলিয়ামস আমাকে বললেন, একটু আগে ঢাকা থেকে ফোনে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের স্ত্রীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, মওদুদকে সামরিক শাসক এরশাদ গ্রেপ্তার করেছে। মিসেস মওদুদ স্যার টমাস উইলিয়ামসকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন মওদুদের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করেন। আমি জানতাম, মওদুদের সঙ্গে স্যার টমাস উইলিয়ামসের ঘনিষ্ঠতা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে। এ ঘনিষ্ঠতা পরবর্তীকালে ম্লান হতে থাকে যখন মওদুদ সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

স্যার টমাস উইলিয়ামস বিচারক হিসেবে যোগদানের পর আমরা সাধারণত কোনো সভা সমিতিতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতাম না। কারণ ব্রিটিশ নিয়মানুযায়ী বিচারকরা যতদূর সম্ভব জনসাধারণের কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখেন। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

১৯৮৫ সালে পিএইচডি থিসিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় টমাস উইলিয়ামসের সঙ্গে যোগাযোগ কম হচ্ছিল। যোগাযোগটা মোটামুটি বার্থডে কার্ড, সিজনস গ্রিটিংস কার্ড বিনিময় এবং কোনো অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বছরের মধ্যেই আমাকে থিসিস সাবমিট করতে হবে। এজন্য সকালে উঠে লাইব্রেরিতে যাওয়া এবং রাত দশটা পর্যন্ত ওখানে থাকতে হতো। এরপর তো ছিলই সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার দায়িত্ব। মাঝে মাঝে আমাকে উইকএন্ডেও থিসিসের কাজ করতে হতো।

টমাস উইলিয়ামসের স্মৃতিচারণে এতই আচ্ছন্ন ছিলাম এর মধ্যে কখন যে রেহানা ঘরে এসে ঢুকেছে তা আমি টেরই পাইনি। রেহানা বলে উঠলো, 'তোমাকে এতো চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?' তারপর ওকে স্যার উইলিয়ামসের মৃত্যুসংবাদ জানালাম। রেহানার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দুজনে মিলে সারা বিকেল কেটে গেল স্যার টমাস উইলিয়ামসের স্মৃতিচারণে।

সুলতান শরীফ ভাই এবং আমি স্যার উইলিয়ামসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রওনা হলাম। যাওয়ার পথে গাড়ি থামিয়ে সুলতান শরীফ ভাই পথের ধার থেকে কিছু ফুল কিনে নিলেন। ফুলগুলো হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'টমাস উইলিয়ামস যেমন সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন, ফুলগুলোও পেয়েছি তেমনি সুন্দর।' সাধারণত মৃত ব্যক্তির বাসভবনের নিকটবর্তী কোনো চার্চে এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানেও সেটা হয়েছিল, তাঁর লন্ডনস্থ ডালুইচের বাসভবনের নিকটবর্তী চার্চে। চার্চে প্রার্থনার মাধ্যমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথম পর্ব শেষ হলো। দেখলাম বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে কাউন্সিলর জালাল সাহেব হাতে এক 'পুষ্পস্তবক' নিয়ে উপস্থিত। তাতে লেখা আছে 'বাংলাদেশ কমিশনের পক্ষ থেকে স্যার টমাস উইলিয়ামসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।' বাংলাদেশের সামরিক সরকার টমাস উইলিয়ামসের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো বলে অবাক হলাম। পরে জালাল সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করে আসল ঘটনা জানতে পারলাম। জালাল সাহেব স্যার টমাস উইলিয়ামসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিজ আগ্রহে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনার ফখরুদ্দিন সাহেবের কাছে অনুমতি চান এবং এও বলেন, বাংলাদেশের প্রতি স্যার টমাস উইলিয়ামসের যে অবদান তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। এই পুষ্পস্তবকটি জালাল সাহেব হাইকমিশনের পক্ষ থেকে প্রদান করতে চান। ফখরুদ্দীন সাহেব সামরিক সরকারের হাইকমিশনার হয়েও স্বাধীনচেতা, সাহসী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেজন্যই বোধ হয় ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই তিনি জালাল সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।



শামসুর রাহমান

পনেরোই আগস্টের ঘোর অমাবস্যা ছিঁড়ে

আজ এই আষাঢ়ের মেঘলা ভোরবেলা লেখার টেবিল ঘেঁষে প্রায় সিকি শতাব্দী আগেরকার একটি সকালের কথা ভাবছি। সেই সকালটি মেঘলা ছিল না, ছিল রৌদ্রস্নাত, কিন্তু আমার মন ছিল নিদারুণ মেঘলা। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ভোর। চোখ ফেটে কান্না আসছিল, কিন্তু কাঁদতে পারছিলাম না। কেউ যেন আমার অশ্রুধারাকে জমাট বরফ করে ফেলেছিল। ভীষণ উদ্ভ্রান্ত, বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল নিজেকে। বাড়ির সবাই হকচকানো, স্তম্ভিত, কেমন যেন ছায়া ছায়া। অবিশ্বাস্য ঠেকছিল সবকিছু। রেডিও সেট থেকে এ কী বার্তা, কী অশুভ, কী মর্মবেদনা ছড়িয়ে দেয়া হলো ইথারে। প্রথমে নিজের শ্রবণশক্তিকে প্রতারিত মনে হয়েছে, কেউ যেন চরম নিষ্ঠুর এক তামাশা করেছে আমার সাথে, বাড়ির সবার সাথে। কিন্তু পরক্ষণেই বিভ্রম কেটে গেল টেলিফোন পেয়ে। কে করেছিলেন, আজ আর মনে নেই। তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে জানালেন সেই ভয়ঙ্কর খবর—বঙ্গবন্ধু আর নেই, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এ ধরনের কথা শুনতে হবে বাংলাদেশের চরম দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না। শুধু তিনিই নিহত হননি, নিহত হয়েছেন তাঁর পরিবারের আরও অনেকে। এমনকি শিশু রাসেলও নিস্তার পায়নি নরঘাতকদের অস্ত্রের স্বৈরাচার থেকে। আমি নিজের চোখে রক্তপ্লাবিত সেই ট্রাজেডি দেখিনি, কিন্তু আমার মনের চোখে প্রত্যক্ষ করছি সবকিছু, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘৃণ্যতম, বর্বরতার শীর্ষস্পর্শী ঘটনা। সেদিন রেডিওতে কোনও কোনও ঘাতকের যে আস্ফালনময়, হঠকারী, পৈশাচিক উচ্চারণ শুনেছি তা কখনও ভোলার নয়।

সারাদিন কেটে গেল শোকের স্তব্ধতা বয়ে সত্তায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো কোনো কাজ আমার পছন্দ হয়নি। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা

অবিমিশ্র ছিল না। কিন্তু বাঙালির সবচেয়ে সাহসী নেতা এবং বড় মাপের অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তাঁকে ভক্তি করেছি, ভালোবেসেছি। তিনি নিহত হওয়ার পর এই ভক্তি ও ভালোবাসা গভীর হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর বন্ধু কায়সুল হক এবং আমি রিকশায় এলিফ্যান্ট রোড হয়ে পিজি হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুরের গাড়ি দ্রুত চলে গেল। উৎফুল্ল রিকশাওয়ালা বলল, শেখ মুজিব যাইতাছেন।

ওর হাস্যময় মুখ আর আনন্দিত কণ্ঠস্বর শুনে ভালো লাগলো। রিকশাওয়ালার গায়ে ছেঁড়া জামা। আমরা ওকে পরীক্ষা করার জন্য বললাম, তাতে কী হয়েছে? আপনার অবস্থা তো আগের মতোই আছে, পরে আছেন ছেঁড়া গেঞ্জি।

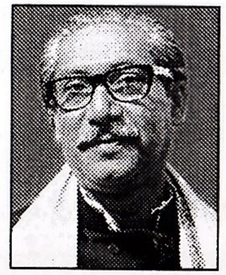
রিকশাওয়ালা হেসে বলল, "আমি ছেঁড়া কাপড় পরতাছি বইলা দুঃখ নাই। ইনি আগামো পাঞ্জাবিগো হাত থাইকা বাঁচাইছেন। আল্লাহ তারে বাঁচাইয়া রাখুক। আমি সারা বছর পাথর বাইন্দা থাকতে পারুম।"

সেই আধবুড়ো রিকশাওয়ালার কথা আজও কায়সুল হক এবং আমার কানে বাজে।

আমি তখন 'দৈনিক বাংলা'র সহকারী সম্পাদক। পনেরোই আগস্ট আমার অফিসে যাওয়ার কথা। শোকার্ত আমি মানসিক যন্ত্রণায় এমনই কাতর হয়ে পড়েছিলাম যে, সেদিন আর অফিসে যাইনি। যাব না যে, এ ব্যাপারে অফিসকে এত্তেলাও দিইনি। সারাদিন বিছানায় শুয়েছিলাম প্রায় নিঃসাড়, নিষ্প্রাণ। শুধু দুপুরে গৃহিণীর পীড়াপীড়িতে কোনো মতে কিছু খেয়ে উঠেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী , সেদিনের আমার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বেদনা এবং নিস্ফল এক ক্রোধ সারাক্ষণ দখল করে রেখেছিল আমাকে।

সেদিন সন্ধ্যা কিংবা রাতে কোথাও যাইনি। পরদিন এগারোটায় অফিসে গেলাম। মনের মেঘলা ভাব কাটেনি তখনো। বসেছিলাম নিজের চেয়ারে। ক'জন সহকর্মী এলেন আমার কাছে। কখনো অস্বস্তিকর নীরবতা, কখনো টুকরো টুকরো কথা। একেক জনের মুখে একেক ধরনের কথা। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে বললাম, "This man is going rise from his grave one day."

হ্যাঁ তিনি অনেকের মনের ভেতরে ছিলেন বরাবরই, তিনি ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন প্রবলভাবে বাংলাদেশের হৃদয়ে। তিনি ফিরে এসেছেন পনেরোই আগস্টের ঘোর অমাবস্যা ছিঁড়ে এক অসামান্য ইতিহাস স্রষ্টা বিজয়ী বীরের মতো।



শাহরিয়ার কবির

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণকারীদের ক্ষমা নেই

একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে এমন কতগুলো কর্মসূচির ভেতর রয়েছে : ১. সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, ২. আওয়ামী লীগসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন, ৩. ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী সাংবাদিক, লেখক, অধ্যাপক, পেশাজীবী, সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন, ৪. বিচার বিভাগ ও সিভিল প্রশাসনকে জমিদার বাড়ির কাছারি হিসেবে ব্যবহার, ৫. ইসলামের দোহাই দিয়ে ফতোয়া প্রদান, ফতোয়াকে গ্রহণযোগ্য এবং ফতোয়া প্রদানকারীদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা, ৬. বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করা এবং সর্বোপরি ৭. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার সমার্থক সবকিছু ধ্বংস করা।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা ধর্ষণের সূত্রপাত হয়েছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার আমলে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সংবিধানের মুখবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সীমাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর যে বলাৎকারের সূচনা হয়েছিল পরবর্তীকালে খালেদা জিয়ার বিএনপির রাজত্বে এবং হালে খালেদা-নিজামীর জামায়াত-বিএনপির রাজত্বে তা বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইতিহাসের

বিভিন্ন কালে আমরা দেখেছি ফ্যাসিস্ট ও মৌলবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর নানাবিধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখে আনুগত্যের প্রত্যাশায়। একই সাথে ফ্যাসিবাদকে গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী করার জন্য দেশ ও জাতির ইতিহাস থেকে মানবিকতা, সহনশীলতা, উদারনৈতিকতা বর্জন করে একদেশদর্শী ইতিহাস রচনা করে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী। এ উদ্দেশ্যেই খালেদা-নিজামীর জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সরকারিভাবে প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র নিজেদের মতো লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ৯ জুলাই (২০০৪) তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। খালেদা-নিজামীরা আবার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে রিমান্ডে নিয়ে বলিয়ে ছেড়েছেন বঙ্গবন্ধু নয়, জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন!!!

হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পদনায় ১৯৮২ সালের নভেম্বরে ১৫ খণ্ডে স্বাধীনতাযুদ্ধের যে দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ না হলেও এর কোনো তথ্য সম্পর্কে এতকাল কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কারণ এই পনেরো খণ্ড কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা লিখিত ইতিহাস নয়, এগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত দলিলপত্রের সংকলন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিএনপি প্রথম দাবি করে জেনারেল জিয়া যে ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন সেটা ২৭ নয় ২৬ মার্চ হবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার কোনো ঘোষণা দেননি। খালেদা জিয়া এবং তার স্তাবকদের তখনই বলা হয়েছিল তাদের এই বক্তব্য ইতিহাসের বিকৃত শুধু নয়, এই উক্তির দ্বারা বিএনপি স্বয়ং জিয়াউর রহমানকে মিথ্যাবাদী বানাতে দ্বিধাবোধ করেনি। কারণ জিয়া নিজের জীবদ্দশায় তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত বেতার ভাষণের তারিখ ২৭ মার্চ বলে উল্লেখ করেছেন, ২৬ মার্চ নয়। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক আখ্যায়িত করে জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণকেই স্বাধীনতার গ্রিন সিগন্যাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জেনারেল জিয়া যদি জানতেন তার সুযোগ্য সহধর্মিণী তাকেই মিথ্যাবাদী বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জোটীয়করণ করবেন তাহলে তিনি নিজেই তার ২৭ মার্চের ভাষণকে ২৫ মার্চ হিসেবেই চালাতেন।

জেনারেল জিয়া ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতা ঘোষণা' করেছেন এমন অসম্ভব মিথ্যাচারের কোনো রেকর্ড '৭১ এর মার্চ থেকে জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কোথাও কেউ নথিবদ্ধ করেনি। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানার কথা পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের কিংবা ব্রিটিশ, মার্কিন সোভিয়েত ও ভারতীয় গোয়েন্দা

বিভাগের, যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আইএসআই-এর কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক 'উইটনেস টু সারেন্ডার' নামে একাত্তরের নয় মাসের ওপর বই লিখেছেন, সেখানে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সরাসরি শেখ মুজিবকে দায়ী করেছেন।

একাত্তরে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধুর বিচার করার জন্য শ্বেতপত্রের নামে যে অভিযোগনামা প্রকাশ করেছিলেন সেখানেও কোথাও জেনারেল জিয়ার নাম নেই। জিয়ার বেতার ভাষণকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যদি 'স্বাধীনতা ঘোষণা' মনে করত তাহলে তাদের শ্বেতপত্রে অবশ্যই জিয়ার নাম থাকত, কারণ পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে বড় 'অপরাধ' আর কিছু হতে পারে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিদেশী গণমাধ্যমে তখন কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল—এ নিয়ে কয়েক ডজন লেখক-সাংবাদিক-গবেষক ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো পত্রিকায় ২৭ বা ২৮ বা ২৯ মার্চ এই মর্মে এক লাইন খবরও কোথাও ছাপা হয়নি যে, জেনারেল জিয়া (তৎকালীন মেজর জিয়া) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৭ মার্চ জিয়া তার প্রথম বেতার ভাষণে নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন বটে তবে পরের ভাষণেই এই ভুল শুধরে নিয়ে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলেছেন—যা পৃথিবীর বহু দেশের বেতার কেন্দ্রের আর্কাইভে নথিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি পর্ব সম্পর্কে আমি গত দশ বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করছি। এ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা কীভবে বহির্বিশ্বে প্রচারিত রয়েছে সে দলিলের অনুলিপি আমার সংগ্রহে রয়েছে। ২৭ মার্চ ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় খবর ছিল 'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' ২৬ মার্চ আগরতলা থেকে পিটিআই কর্তৃক পরিবেশিত এই খবর একই সাথে বিবিসি, এনডিপি ও টিএসএ প্রচার করেছে।

যেসব সাংবাদিক তখন বিভিন্ন দৈনিক ও সংবাদ সংস্থায় কাজ করতেন তাদের অনেকে এখনো বেঁচে আছেন। এঁদের একজন কোলকাতার

টেলিপ্রিন্টের কপিটি নিজের সংগ্রহে রেখে দিয়েছেন। তার সাথে আমার আলোচনা হয়েছে চার বছর আগে। তার দুর্লভ সংগ্রহের একটি অনুলিপি তিনি আমাকে দিয়েছেন।

ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (ইউএনআই) ২৬ মার্চ রাত আটটা একুশ মিনিটে শিলং থেকে প্রথম খবর পাঠায়—শেখ মুজিবুর রহমান আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘোষণা করছেন। (ইংরেজি পাঠ; শিলং মার্চ ২৬ (ইউএনআই) শেখ মুজিবুর রহমান, স্পিকিং ওভাল স্বাধীন বাংলা (ফ্রী বেঙ্গল) বেতার কেন্দ্র টুডে প্রোক্লেইমড দ্য বার্থ অব অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ)

এরপর থেকেই কয়েক মিনিট পরপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এ খবর প্রচার করে। ২৬ মার্চ রাত নয়টা সাত মিনিটে আগরতলা থেকে পিটিআই, এনডিপি, টিএসএ ও বিবিসি একসাথে খবর পাঠায়—ব্রডকাস্টিং টুনাইট ফ্রম এ ক্ল্যানডেস্টাইন রেডিও স্টেশন আইডেন্টিফাইড এ্যাজ 'ভয়েস অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ', 'দ্য অ্যানাউন্সার সেইড' দ্য শেখ হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড দ্য সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপল অব ইস্ট পাকিস্তান অ্যাজ সিটিজেন অব দ্য সভরেইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ।' ২৬ মার্চ রাত ন'টা থেকে ইউএনআই প্রতি মিনিটে ফ্লাশ করছিল 'মুজিবুর রহমান ডিক্লেয়ার্স বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট।' বিভিন্ন বার্তাসংস্থা কর্তৃক প্রেরিত এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংবাদ পরদিন ভারত ও পশ্চিম গোলার্ধের বহু পত্রিকায় চাপা হয়েছে। খালেদা-নিজামীর পোষ্য ইতিহাস রচয়িতা এমাজউদ্দীন, মনিরুজ্জামান মিঞা গং যখন বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো প্রামাণ্য তথ্য তারা খুঁজে পাননি তখন সন্দেহ জাগে তাদের মনুষ্য অবয়ব সম্পর্কে। তাঁরা প্রমাণ করেই ছেড়েছেন দুই পায়ে হাঁটলে যেমন মানুষ হওয়া যায় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেও শিক্ষিত হওয়া যায় না। খালেদা-নিজামীকে তুষ্ট করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণ করে এমাজ-মিঞারা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন প্রভুভক্ত সারমেয়কুলের পঙ্‌ক্তিতে।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই দেখছি খালেদা-নিজামীর সোনার ছেলেরা (সাকার সোনা নয়) নির্বিচারে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের ধর্ষণ করছে এবং প্রশাসনের সমর্থন ও আশ্রয় পেয়ে আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করছে। বিএনপি-জামায়াত ধর্ষকরা যেভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে, এমাজ-মিঞা গং যদি ভাবেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধর্ষণ করে সেভাবে পার পাবেন তাহলে বলতেই হবে তারা হিসেবে গণ্ডগোল করেছেন।

ইতিহাসের সত্য যেমন অমোঘ তেমনই নির্মম। আমরা বিশ্ব ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দেখছি, কিছু সময়ের জন্য ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিক্রমণ প্রতিহত করা যায়। কিছু সময়ের জন্য সভ্যতার ইতিহাসের চাকা ঠেলে পিছিয়ে দেয়ার অপচেষ্টাও আমরা দেখেছি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসনকাল এর একটি উদাহরণ। আমরা ইতিহাসের গতিরোধকারীদের ক্ষমতা যেমন দেখেছি নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালিতে, হিটলার ও মুসোলিনিদের মতো প্রবল ক্ষমতাধরদের পরিণতিও দেখেছি। ইয়াহিয়ার দাপট ও নৃশংসতা ইতিহাস ভুলে গেছে?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আজ যারা বিকৃত ও কলঙ্কিত করছে একদিন তাদের অবশ্যই ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং প্রাপ্য শাস্তিও তাদের মাথা পেতে নিতে হবে। এটাই ইতিহাসে অমোঘ রায়।



শেখ রেহানা

শোক হোক আমাদের শক্তি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎবরণ দিবস। সমগ্র জাতির কাছে এদিন আসে শোকাচ্ছন্ন ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে। আমার কাছে বড় অশ্রুসিক্ত এ দিন। এমন নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে নিহত হতে হয়েছে আমার স্নেহময়ী মা, কামাল ভাই, জামাল ভাই, খুকী ভাবী ও রোজীকে। বড় মর্মান্তিকভাবে হত্যা করেছে ১০ বছরের ছোট ভাই রাসেলকে। একটা শিশুকে হত্যা করতেও সেই পশুদের হাত কাঁপেনি? তারা কি এমনই হিংস্র হয়ে উঠেছিল? আমাদের চোখে রাসেল এখনো সেই ছোট্ট এক শিশু হিসেবেই রয়ে গেছে। আজ সে কত বড় হতে পারতো।

আমার পিতা রাজনীতি করতেন। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম-আন্দোলন করেছেন, জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্ত্রানদের প্রতি তাকানোর সুযোগ পাননি। একাত্তর সালে পাকহানাদার বাহিনী তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে চোখের সামনে গ্রামের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তাঁর পরিবার যে কোনো পরিস্থিতি সইতে পারত। তাঁর জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল।

১৯৭৫ সালে আমি ছিলাম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। জুলাই মাসে কামাল ভাই ও জামাল ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বাড়িতে নতুন বউ আসায় প্রচণ্ড হৈ চৈ লেগে থাকতো। হাসু আপা ৩০ জুলাই দুলাভাইয়ের সাথে জার্মানি যাচ্ছে। মা আমাকেও তার সঙ্গে যেতে বললো। জয় ও পুতুল ছোট্ট, হাসু আপার সঙ্গে থাকা, আমার নিরিবিলি পড়াশোনা, এসব চিন্তা করেই মা আমাকে সঙ্গে যেতে বলছেন। কিন্তু জার্মানিতে গিয়ে

আমার একটুও মন ভালো থাকলো না। পড়াশোনা হবে কি? ঢাকায় ফোন করে মাকে বলতাম, আমি তোমাদের কাছে ফিরে যেতে চাই। ১৪ আগস্ট আব্বার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি জেদ ধরলাম ঢাকায় ফিরে আসবো। আব্বা আমাকে সান্ত্বনা জানিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে তোমার আসার ব্যবস্থা করছি।'

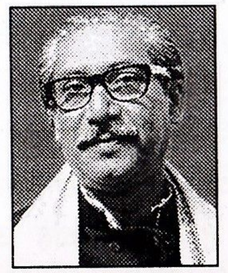
আসলে আমরা পারিবারিকভাবে এত বেশি একান্ত ছিলাম যে ঘর ছেড়ে, মা ও আব্বাকে ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে এটা ভাবতেই পারতাম না। আমাদের পরিবারে মা ছিলেন প্রধান কর্ত্রী। সবার দায়িত্ব ছিল তার। সবার আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-মমতা তিনিই মেটাতেন। সবার ভালো-মন্দ প্রয়োজন, লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া এবং অসুখ-বিসুখ সব দিকেই ছিল তার স্নেহময়ী দৃষ্টি। তিনি আমাদের কখনো শাসন করেছেন আবার কখনো ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এটা শুধু আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। আত্মীয়-স্বজন, আব্বার রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আমাদের বন্ধু-বান্ধব সবার জন্য তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা ছিল। প্রশান্তি ও মমত্ব এটাই যেন তার ধর্ম ছিল। এই আদর্শ তাকে এক মমতাময়ী জননী হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরে।

পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচার শাসকগোষ্ঠী আব্বাকে বারবার কারাগারে নিয়েছে। মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তাকে। আপস করার, রাজনীতি ত্যাগ করার, এমনকি অর্থ-সম্পদ ও সর্বশেষে '৭১-এর অসহযোগী আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রীত্বের টোপও দিয়েছে। আমার মায়ের প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন শক্তি, আব্বার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, আব্বা মায়ের কাছে সব কিছু খুলে বলতেন এবং মায়ের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। মা শৈশব থেকে শুধু আব্বার খেলার ও জীবন সঙ্গী ছিলেন না, তাঁর মন ও চিন্তা ধারার সঙ্গীও ছিলেন। দেশ ও মানুষের জন্য আব্বার যে উদার হৃদয়ের টান, সেটারও অংশদার তিনি ছিলেন। আব্বার যে লক্ষ্য ছিল বাঙালির মুক্তি অর্জন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা—সেই লক্ষ্য থেকে যেন এতটুকু তিনি পিছু না হটেন, সেদিকে তার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

আমার মায়ের স্বভাব ছিল শান্ত, তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। নিজের দুঃখ-কষ্ট, অভিযোগ ও অভিমান সব সময়ে তিনি বইয়ের পাতায়, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্নে, রাজবন্দী স্বামীর মামলার খোঁজ-খবর, কারাগারে খাবার পাঠানো, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সবকিছু তিনি সামলাতেন। আব্বা কারাগারের বাইরে থাকলেও কিংবা সভা-সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত

থাকলেও তিনি যখন ঘরে থাকতেন তখন যেন স্বর্গীয় আনন্দ নেমে আসতো। আব্বার মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টেরই পেতাম না। স্মৃতি তো সতত সুখের। স্মৃতি তো সতত বেদনারও।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এখনো উচ্চ আদালতে। ঘাতকের দলকে শাস্তি পেতেই হবে। ইতিহাস কখনো কাউকে ক্ষমা করে না। বঙ্গবন্ধুকে দলমত সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া উচিত। তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির। তিনি তো চলে গেছেন তারপরও কেন তাকে নিয়ে বিতর্ক। কেন সংকীর্ণতা থেকে সবাই বেরিয়ে আসতে পারি না? মানুষ তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তারপরও কেন আমাদের মধ্যে এত অশান্তি। আজ ১৫ আগস্টে দিন আসে শোকাতুর হয়েছে। বেদনার ভার, অশ্রু ক্ষরণ সব নিয়ে ২৭ বছর ধরে বেঁচে আছি। বেঁচে থাকার তো কথা নয়। এমন মৃত্যু, এমন শোক কেউ কি কখনো বহন করতে পেরেছে? না বহন করার মতো সহ্য ক্ষমতা থাকে? জানি না কতদিন বেঁচে থাকবো। এ দিনের ভার বয়ে নিয়ে থাকতেই হবে আমাদের দু'বোনকে। বাংলার মাটিতে, বাংলার মানুষের সঙ্গে থেকে বাঙালির জাতির পিতা, প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি হোক, তাঁর প্রিয় দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটুক। আজকের দিনে এ প্রার্থনা করি।



শেখ হাসিনা

ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড

আল্লাহু...
হা ইয়া আলাস্ সালাহ্
.....
হা ইয়া আলাল ফালাহ
নামাজের দিকে এসো...
কল্যাণের দিকে এসো...

মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে, প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে—সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য।

গর্জে উঠলো হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করলো স্বাধীনতারপ্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ নরপিশাচরা হত্যা করলো আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে। হত্যা করলো মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল। খুনিরা হত্যা করলো বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে। সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জামিল যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন। হত্যা করলো কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের।

আর সব শেষে হত্যা করলো শেখ রাসেলকে যার বয়স মাত্র দশ বছর। বার বার রাসেল কাঁদছিল, 'মায়ের কাছে যাবো' বলে। তাকে বাবা-ভাইয়ের

লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে এনে নির্মমভাবে হত্যা করলো। ওদের ভাষায় রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে—

ঐ ঘৃণ্য খুনিরা যে এখানেই হত্যাকাণ্ড শেষ করেছে তা নয়, এই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিকে ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিকে—হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তার তের বছরের কন্যা বেবীকে। রাসেলের খেলার সাথী তার কনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের আরিফকে। জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তার ভ্রাতৃপুষ্প সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও নান্টুসহ পরিচারিকা ও আশ্রিতজনকে। আবারো একবার বাংলার মাটিতে রচিত হলো বেঈমানীর ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল তারই সেনাপতি। ক্ষমতার লোভে, নবাব হওয়ার আশায়। ১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁরই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক, রাষ্ট্রপতি হওয়ার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দিন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে যেমন নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়—

১৯৭৫, এদিনও নীরব ছিল তারা, যারা বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের, যাদেরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন—যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল এতটুকু সক্রিয়তা বা ইচ্ছা অথবা নির্দেশ বাঁচাতে পারতো বঙ্গবন্ধুকে—খন্দকার মোশতাকের গোপন ইশারায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো তারা, এগিয়ে এলো না সাহায্য করতে। মীর জাফরের নবাবী কতদিন ছিল? তিনমাসও পুরো করতে পারেনি—খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ (যা সংবিধানের নব নীতিমালা লঙ্ঘন করে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জিত) তিন মাসও পুরো করতে পারেনি।

আসলে বেঈমানদের কেউই বিশ্বাস করে না। এমনকি যাদের প্ররোচনায় এরা ঘটনা ঘটায়, যাদের সুতোর টানে এরা নাচে তারাও শেষ অবধি বিশ্বাস করে না। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়। কিন্তু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়? যুগে যুগে এ ধরনের বেঈমান জন্ম নেয় যাদের ক্ষমতা লিপ্সা একেকটা জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। ধ্বংস ডেকে আনে। জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে বাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকেই খুনিরা হত্যা করেছে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যকে হত্যা করেছে। বাঙালি জাতির চরম সর্বনাশ করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয়নি। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে খুনিদের আইনের শাসনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেছে। আইনের শাসনকে আপন গতিতে চলতে দেয়নি। বরং অন্যায় অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে। লালিত করেছে। যার অশুভ ফল আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

এই খুনিদের বাংলার মানুষ ঘৃণা করে! বঙ্গবন্ধুকে এরা কেন হত্যা করেছে? কি অপরাধ ছিল তাঁর? স্বাধীনতা—বড় প্রিয় একটি শব্দ, যা মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত থেকে দম ফেটে কে মরতে চায়? একদিন পাকিস্তান কায়েমের জন্য সকলে লড়েছিল। লড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুও। কিন্তু পাকিস্তান জন্মলাভের পর বাঙালি কি পেল? না রাজনৈতিক স্বাধীনতা না অর্থনৈতিক মুক্তি। বাঙালির ভাগ্যে কিছুই জুটলো না, জুটলো শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন এবং মায়ের ভাষা মুখের ভাষাও পাকিস্তানি শাসকরা কেড়ে নিতে চাইলো। বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি তার মায়ের মর্যাদা রক্ষা করলো। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়ার নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো। দেশের সম্পদ পাচার করে বাঙালিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাইশটি পরিবার সৃষ্টি করে শোষণ অব্যাহত রাখলো।

আর বঙ্গবন্ধু মুজিব শোনালেন অমর বাণী স্বাধীনতা। দেখালেন মুক্তির পথ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' জয় বাংলা—ঘোষণা করলেন বাঙালির বিজয়, জয় বাংলা—সেই তো তাঁর অপরাধ।

যে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লীলাক্ষেত্র, জানোয়ারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে যেমন সে হিংস্র হয়ে ওঠে, তেমনি হিংস্র হয়ে উঠল পরাজিত শত্রুরা। কারণ ঐ অমরবাণী ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল সমগ্র বাঙালির শিরায়-উপশিরায়। প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানলো বাঙালির চেতনায়—১৯৭১-এর ৭ মার্চে বজ্রনিঘাত কণ্ঠের অমর সে বাণী যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো প্রতিটি বাঙালিকে। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঐ পরাজিত শত্রুদের দোসর নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করলো যেন! পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কি অবস্থা? বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারা জীবনের

সাধনা ছিল শোষণহীন সমাজ গঠন। ধনী-দরিদ্রের কোনো ব্যবধান থাকবে না। প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রযোজন আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ পাবে।

সারা বিশ্বে বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্ত্বাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে সারা জীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জেল-জুলুম অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছেন। ফাঁসির দড়িও তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে একচুল নড়াতে পারেনি। তাঁর এই আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ স্থানীয়।

কিন্তু আমরা কি দেখি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি—আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান খাটো করা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়া হলো। যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করে গণতন্ত্র কায়েম করেছিল বাঙালিরা, সেই গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন কায়েম করলো হত্যাকারীরা।

সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারালো। ভোট-ভাতের অধিকার বন্দি হলো সেনা ছাউনিতে। এদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী। অবাধ লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এদের দুঃশাসনে প্রশ্রয় পেয়েছে দুর্নীতি ও চোরাচালানী। সামাজিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভোগ-বিলাস, মাদকাসক্ত, উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি করে অবাধে শোষণ চালাচ্ছে। আর বৃহৎ জনগোষ্ঠীরা অর্থাৎ এদেশের ৯০% মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বাস করে। বঙ্গবন্ধুর আমলে যে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬% তা এখন দাঁড়িয়েছে ১৫%, ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৩৭% এখন প্রায় ৭০%! ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা দিতে হতো না—বর্তমানে খাজনা ও করের বোঝা অতিরিক্ত। ২২ পরিবারের পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে কয়েক শত পরিবার—অবাধ, লুটপাটের লীলাক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ২ ভাগেরও নিচে। আমদানি রপ্তানির ব্যবধান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী পণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে, দেশীপণ্য বাজারে বিকোচ্ছে না। অবাধ চোরাচালানীর ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে মদ, জুয়া, রেস ছিল নিষিদ্ধ, বর্তমানে ঘরে ঘরে

মিনি বার বসেছে, বাজারে তো কথাই নেই। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মাদক চোরাচালানীর সুগম পথ আজ বাংলাদেশ। যার বিষাক্ত প্রক্রিয়া সমাজের অশুভ প্রভাব ফেলে কত তাজা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়াচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আজ চরম অবনতি ঘটেছে। বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবকরা চাকরির অভাবে হতাশাগ্রস্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্ত্রবাজিতে ধ্বংস করা হচ্ছে। সরকারি মদদে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। বাজেটের সিংহভাগ চলে যায় অনুৎপাদনশীল খাতে, আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যায় সব থেকে কম বরাদ্দ। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবন দিশেহারা। অনাহার অপুষ্টিতে হাজার হাজার মানুষ ভুগছে। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তো বর্তমান বাংলাদেশের চেহারা! স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে শুধু একটি মানুষের অভাবে। বাংলার মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী এ খুনিরা, দায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা।

তাই এ হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করতে হবে। সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান না ঘটলে বাংলার মানুষের মুক্তি আসবে না। গণতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। আজ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবসে প্রতিটি বাঙালিকে শপথ নিতে হবে যে, বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবো। জনতার আদালতে খুনিদের বিচার করবো। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষকে বাঁচাবো।



সন্তোষ গুপ্ত

পনেরই আগস্টের কালরাতের অনুভূতি এবং কিছু আত্মজিজ্ঞাসা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছেন আজ থেকে এগার বছর আগে। ইতিহাসে এই বিশ শতকে দেশে রাষ্ট্রনায়কদের উৎখাত করা এবং হত্যা করা নতুন নয়। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় সর্বক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীচক্র তৃতীয় বিশ্বের সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের দোসরদের সহায়তায় রাষ্ট্রনেতাদের হত্যা করেছে কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করেছে। স্বার্থ বিপন্ন হলে কিংবা বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নতুন বোতলে মদ রাখার মতো অধীন মিত্রদের পর্যন্ত হত্যা করতেও সাম্রাজ্যবাদ কুণ্ঠিত হয় না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েমের হত্যা নেপথ্য কাহিনী 'পেন্টাগন পেপার্স' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, কঙ্গোর লুমুম্বার মতো উদাহরণ দেয়া যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের মনঃপূত সরকার না হলেই অভ্যুত্থান কিংবা চক্রান্ত করে বৈধ সরকারের উৎখাত করা হয়েছে, রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে একই পন্থা নেয়া হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করেই হত্যাকারীগণ নিবৃত্ত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর লাশ সিঁড়িতে পড়ে আছে, তখন কক্ষে কক্ষে গিয়ে হত্যাকারীগণ বেগম মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূ এবং আট বছরের রাসেলকেও হত্যা করা হয়েছে। নৃশংসতার সমকালীন ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই।

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘকালের পরিচিত এবং বন্ধু বলে দাবিদার অ্যান্থনি মাসকারেনহাস-এর সাম্প্রতিক গ্রন্থে (বাংলাদেশ এ লিগ্যাসি অব ব্লাড) বেশ

নাটকীয়ভাবে মেজর ফারুক খানের এ হত্যাকাণ্ডের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। মাসকারেনহাসের ভাষ্য অনুযায়ী একজন গোঁড়া মুজিব ভক্ত মেজর ফারুক দেশপ্রেমে অর্থাৎ দেশের মানুষের আশাভঙ্গের বেদনায় অন্ধ মুজিববিদ্বেষে পরিণত হন এবং তাঁকে হত্যার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকলকে উৎসাহিত করা, যুক্তি দিয়ে, আবেগ দিয়ে স্বমতে আনা এবং চমৎকারভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিতও করেন তিনি। এ বর্ণনায় ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং দেশের দুর্দশায় ক্রুদ্ধ এক মেজরের চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যেন সাম্রাজ্যবাদ এখানে নির্গুণ ব্রহ্মের ভূমিকায় এবং সেনাবাহিনীর যেসব অফিসারের নিকট মেজর ফারুক স্বীয় কর্মপন্থা নিয়ে গেছেন, তাদের আপাত নির্লিপ্ততা সত্যিই সরল পাঠককে চমৎকৃত করবে। লেখকের মনেও নৃশংসতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঁকি দেয়নি।

ভারতের কাছে দেশ বিকানোর কাহিনীর ইঙ্গিতও এ গ্রন্থে চাতুর্যের সাথে করা হয়েছে। সিপাহী-জনতা বিপ্লবের সহযোগী জাসদের ভূমিকা বর্ণনাস্থলে এবং মাসকারেনহাসের স্বীয় মন্তব্য লক্ষ্য করার মতো। বি কে নেহেরু যখন পাকিস্তান কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত মুজিবকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন 'Mujibs re-education had begun' বলে মাসকারেনহাস হঠাৎ সেখানে বিষয়টি সূত্র ছেড়ে দিলেন। মুজিববিরোধী তথা আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রচারণার স্বরূপ 'জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' নামক গ্রন্থে প্রবাসী সাংবাদিক আবদুল মতিন উদঘাটন করেছেন। এ কথা লক্ষ্য করতে হবে, বাংলাদেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী তার বক্তব্যকে খুব বেশি পাত্তা দেন না এবং তারাই মাসকারেনহাসের বক্তব্যে উৎসাহিত হন। তবে বামপন্থী বিলাসের জন্য বঙ্গসন্তানরা চরম কোনো পথে অর্থাৎ জামাতের পথে এবং সামতন্ত্রের পথে যেতে নারাজ তার এ কথাটার অবশ্য বিরোধিতা করেন। তাই বঙ্গবন্ধুর বাকশাল তাদের উদ্দীপ্ত করেনি, জাসদের বিপ্লবী বোলচালেও নাকি তাদের অনীহা সুতরাং জিয়াউর রহমান নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের পথ সহজেই করে নিতে পেরেছেন। বাকশাল সম্পর্কে অ্যান্থনির বক্তব্য এদের কাছে গ্রহণযোগ্য কিন্তু তথাকথিত বামপন্থী দলটির উপদেষ্টা হিসেবে জাসদকে পাত্তা না দেয়ায় অসন্তুষ্ট। এটাই তাদের কাছে অসঙ্গতি মনে হয়েছে, আর সবই সঙ্গতিপূর্ণ।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও রাজনৈতিক দল, নেতা এবং উপর্যুক্ত ধরনের বুদ্ধিজীবী আজও নিন্দা করতে নারাজ। বরং তারা এখনও শোকরিয়া আদায় করেন যেন এক জাহেলিয়াতের যুগ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু একবার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, 'তিন বছরে তোমাদের কিছু দিতে পারবো না'। এসব বুদ্ধিজীবী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, কিছু দিতে পারবেন না তিনি বলেছেন সত্যি কী তাই! তিন বছরে খাদ্য, বস্ত্র না দিতে পারলেও দুর্নীতি দিয়েছেন, হতাশা দিয়েছেন, ছিনতাই-ডাকাতি দিয়েছেন। কখন তারা এ কথা বলেছেন, যখন স্বাধীনতার ১৪ বছরে এসে সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এক বছর কাউকে চাকরি দেয়া যাবে না। যখন কৃষকের সারের ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়া হয়েছে, ঋণের দায়ে তার ঘটিবাটি ভিটে ক্রোক হয়, যখন পুঁজিপতিরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে পরিশোধের পরিবর্তে নতুন ব্যাংক খুলছে বেসরকারি খাতে। যখন নারী ধর্ষণ বেড়েছে। দিন-দুপুরে ছিনতাই-ডাকাতি হয়, তখনও মুজিব যুগের দুঃস্বপ্নে এরা কেঁপে ওঠেন। পেটি বুর্জোয়া আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরে এসব দেয়া-নেয়া হয়নি। মুজিব তিন বছরে কিছু দেননি, কিন্তু কৃষকের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করে দিয়েছেন। কিছুই তিনি দেননি, কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেছেন। শেখ মুজিব কিছুই দেননি, দেশান্তরী এক কোটি আশ্রম প্রার্থীকে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন যাদের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পুড়িয়ে দিয়েছে, সর্বস্ব লুট করেছে, দেশের ভেতরে এমন দু'কোটি লোককেও পুনর্বাসিত করেছেন।

আজ এই পেছনে ফিরে দেখার নামে আমি শেখ মুজিবের গুণকীর্তন করতে আসিনি। বরং তার দুর্বলতা–অর্থাৎ মানবিক গুণ, যা রাজনীতির কূটচক্রান্তের সাথে একান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তার কিছু কথা বলতে চাই। এটাও মুখ্য নয়। কেন তাঁর মৃত্যু সে সময়ে বিনা প্রতিবাদে, ভবিতব্য হিসেবে দেশবাসী গ্রহণ করেছিল, তার কার্যকারণ বলতে চাই। এটা একান্তভাবেই আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু বলব।

তার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দান, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার জন্য, যা কার্যত বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে জোরদার করে তার জন্য, শান্তির জন্য আন্তরিকভাবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একজন নেতা হিসেবে তার ভূমিকাকে একশ্রেণীর বামপন্থী স্বীকার করতে আজও নারাজ এবং একই সাথে দক্ষিণপন্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে চলতে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, বিপ্লবী নেতা হিসেবে আসন্ন বিপ্লবের জন্য সভায় সকলকে ডাক দেন। এ অসঙ্গতির পাশাপাশি তার দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠাবান যারা তারা কেউ আখের গোছাতে ব্যস্ত, কেউ

এমিসারি নিয়ে বিদেশ গমনে আজও লজ্জিত নন, অথচ একবারও ভাবেন না ১৫ আগস্টের কালো, যা ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের চেয়ে দুর্যোগপূর্ণ মনে হয়েছিল তাদের কাছে, না ভেবেছিলেন রাহু শুধু সূর্যগ্রাস করেছে আমাদের কোনো ভয় নেই। না কেউই সেদিন ভীত ছিলেন না, যারা রাজনীতি করেন। কারণ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলছে এটা তারা জানতেন, আর তারা আঘাত হানবে না এটা ভেবে যেমন নিশ্চিত ছিলেন যে, একজন শ্রেষ্ঠ নেতার সপরিবারে মৃত্যুকে যেন মধ্যযুগীয় রণাঙ্গনে সেনাপতির মৃত্যুতে পরাজয় জেনে সৈন্যদের রণে ছত্রভঙ্গ দেয়ার মতো কণ্ঠ নীরব করে দিয়েছিল। কেন এমন হলো, কী ছিল সেদিনের পরিবেশ, কেমনভাবে এসেছিল সেদিন, যেদিন সবাই আমরা অসহায়, শুধু পথে পথে উল্লসিত শত্রু কিংবা ব্যাপক নির্বাক জনসাধারণ। তারা নাকি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল যে, সত্যিকারের স্বাধীনতা আজ এলো। কেন একশ্রেণীর বামপন্থী নেতারা আওয়ামী লীগের কতিপয়ের চক্রান্ত ভালোভাবেই জেনেও এ হত্যা তাদের বিজয় বলে মনে করেছিলেন। যে কোনো রাজনৈতিক হত্যা নিন্দনীয় কিন্তু একমাত্র মুজিব হত্যা নয় বলে আজও কেন বিজ্ঞ অভিমত দেন তারা এবং তারপর জনসভায় গিয়ে মুজিব হত্যার রাজনীতির নিন্দা করেন এবং গণতন্ত্রের জন্য চড়াগলায় বক্তৃতা দেন? এ সবই কি বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, না সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত? ক্ষমতার আশপাশে চরম দক্ষিণপন্থী স্বাধীনতাবিরোধীদের সাথে তথাকথিত বামপন্থীদের গলাগলি কি কোনো সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ নয়, যা সাম্রাজ্যবাদের অভিসিঞ্চনে পল্লবিত হচ্ছে?

হ্যাঁ, শেখ মুজিবের সাথে আরেকজনের সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য মহানুভবতার, হৃদয়ের সংবেদনশীলতার। কিন্তু জয়ের মুহূর্তে দূরদর্শিতার জন্য নয়, বরং আরও ভালোবাসার জন্য দু'হাতে সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছেন তিনি। তিনি হলেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের মহীশূরের ব্যাঘ্র টিপু সুলতান। তিনি বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি না দিয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে গিয়ে তাদের নানাভাবে সাহায্য পর্যন্ত করেছেন। ভালোবাসা দিয়ে পুনরায় জয় করতে চেয়েছেন। তবুও টিপু সুলতানের সাথে একস্থানে শেখ মুজিবের পার্থক্য ছিল। মহীশূর সম্রাট টিপু সুলতান-এর এই রাজনৈতিক ঔদার্য, যা পরবর্তী সময়ে আরও ব্যাপক বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম দেয়, তার বিশ্বস্ত সহকর্মীরা, মন্ত্রীরা প্রতিবাদ করেছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন, উপদেশ দিয়ে তাকে এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নেয়ার থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আর শেখ মুজিবের চারপাশে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ভক্তির আতিশয্যে শুধু

সমর্থন করেননি, তার হৃদয়গত দর্বলতার সুযোগ নিয়ে এভাবে শত্রুকে, বিদেশী শক্তির দেশীয় চরকে প্রশ্রয় দিতে বরং বেশি করে উৎসাহিত করেছেন। তার সমর্থক দলগুলো শুধু নৈর্ব্যক্তিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের কথা বলেছেন, কার্যক্ষেত্রে শেখ মুজিবের মুখাপেক্ষী ছিলেন। শেখ মুজিবের মহানুভবতার সাথে যেসব মোসাহেবের চাটুকারিতা যুক্ত হয়েছিল আজ তার মৃত্যুর এগারো বছর পর দেখা যাবে তারা একে একে এখন অন্য শিবিরে অবস্থান নিয়েছেন এবং অন্য ভাষায় কথা বলছেন। ইতিহাসে আছে ১৭ জন অশ্বারোহী বাংলাদেশ জয় করেছিল। তারপর পলাশীর যুদ্ধে কার্যত বিপুল সশস্ত্র সৈন্যের উপস্থিতিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাতে তৃতীয়বার তারই অভিনয় হয়েছিল।

কেন এমন হলো? শেখ মুজিবের অনুসারী এবং 'ভক্ত' (পাঠক উদ্ধৃতির মধ্যে 'ভক্ত' শব্দটি লক্ষ্য করুন) আজও বলছেন যে, শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করেছিলেন, দ্বিতীয় বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, তাই সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় দোসরগণ তাঁকে হত্যা করেছে। তত্ত্বকথা তাই বলে। তথ্য কি বলে? এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, শেখ মুজিবকে হত্যার চেষ্টা বাকশাল করার বহু পূর্ব থেকে করা হয়। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর করা, চট্টগ্রামে সোভিয়েত নৌঘাঁটি স্থাপনের প্রচারণা, ভারতের সাথে গোপন চুক্তির কল্পকাহিনী বাকশাল গঠনের বহু পূর্বের ঘটনা। এসব নিছক মুজিব বিদ্বেষ থেকে করা হয়েছে, এর পিছনে রাজনীতি কী ছিল? চক্রান্ত কী ছিল? না শুধু গিন্নী-গয়নার পলিটিক্সের মতো নিছক পরিচর্চা তা?

প্রসঙ্গান্তর হয়েও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গ্রানাডার বামপন্থী প্রেসিডেন্ট মরিস বিশপ দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে নিহত হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার মার্কিন ছাত্রদের নিরাপত্তার অজুহাত তুলে সৈন্য পাঠায়। কিন্তু আজকে সবাই জানে যে, বিশপ হত্যার চারদিন আগে এক গোপন বৈঠকে গ্রানাডা অভিযান নিয়ে পরিকল্পনা হয়। তবে এ হত্যাকাণ্ড অভিযানের টাইম টেবিল এগিয়ে আনে। বাকশাল গঠনের অজুহাতে সমাজতন্ত্র-পরবর্তী দু'দশদিনে কায়েম হওয়ার আশঙ্কায় দিশেহারা চক্রান্তকারীদের তাড়াহুড়ায় তাই দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরই নাটকের যবনিকা পড়ে। কাজ এটি ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় ভাগ-বাটোয়ারার অসতর্ক ও বিহ্বল মুহূর্তে আঘাতহানা হয়েছিল। ভক্তদের মনস্তত্ত্ব সঠিক অনুধাবন করেই অভ্যুত্থান সীমিত ছিল। বাকশালের কোনো নেতার গায়ে হাত পড়েনি—কোনো সমাজতন্ত্রী দল বা বামপন্থী দলের কোনো নেতা গ্রেপ্তার হননি, কোনো দল বেআইনি ঘোষণা করা হয়নি—অথচ

একজন নেতাকে হত্যা করে সমাজতন্ত্রের উদ্যত থাবাকে সহজেই পিছিয়ে দেয়া গেল। এ কল্পকাহিনীর সকল সীমা কী ছাড়িয়ে যায়নি?

এ উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলের একটি আংটা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে মজবুত আংটা বলে গণ্য হতো। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেই আংটা ছিন্ন করে ফেলে। যত শীঘ্র সম্ভব তার মেরামত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ এটা মেরামত না করলে আজ হোক, কাল হোক প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শ হিসেবে শ্রমজীবী জনগণের ভূমিকাকে এই ভূখণ্ডে দৃঢ় করে তুলবে। তাই আঘাত হেনে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল মুখ্য লক্ষ্য। আজ জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিতর্কের পরও যদি এ সম্পর্কে আমাদের চৈতন্যোদয় না হয় এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য ছাড়া কাজে যার কোনো নজির রাখিনি, তা দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা বলে সামজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পূর্বশর্ত বিপন্ন জাতীয়তাবাদ উদ্ধারের কাজের গুরুত্ব লাঘব করার ক্ষতি উপলব্ধি না করা। মনে রাখা ভালো জাতীয়করণের পথ ধরে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর পথ সুগম হয়, কিন্তু এটা স্বয়ং কোনো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়।

বঙ্গবন্ধু যখন নিহত হলেন তখন চক্রান্তকারীদের হিসাব চূড়ান্ত মুহূর্তে (জিরো আওয়ার) এসে গিয়েছিল। কেন জাতির জনক, বাঙালি জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির মৃত্যুতে কার্যত কোনো প্রতিবাদ হয়নি? এ প্রশ্ন কি কেউ নিজেকে করেছেন? কিশোরগঞ্জে কাজী বারী এবং চট্টগ্রামে এম এ হান্নানের নেতৃত্বে ছোট দুটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছিল। আর কোথাও কোনো ঢেউ ওঠেনি। কেউ কেউ কিন্তু ভিন্ন পথের চিন্তা করে দেশান্তরি হলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের মতো দেশব্যাপী জনমতের ব্যাপকতা ছাড়া সেই পথ বিপজ্জনক ও সংগ্রামের শক্তিকে দুর্বল করতে পারে আন্তরিকতা, নির্ভীকতা ও ত্যাগী মনোভাব সত্ত্বেও। এ মুহূর্তে সে প্রশ্ন তুলছি না।

বাকশাল কয়েকটি দল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংগ্রামী আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। একটি দল গঠনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন হেতু কথিত দলটি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো দলের বৈধ অস্তিত্ব থাকবে না, এই যুক্তিতে কৌশল হিসেবে কেউ অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাকশালে যোগদান করে তা নিয়ে ভাবনা করা হয়নি। দায়িত্বটা নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর একার ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে কথা

চিন্তা করে বাকশাল গঠনে স্বেচ্ছায় যে সব দল এগিয়ে এসেছিল এবং যে ব্যাপক সমর্থন সংগঠিত হয়েছিল তা হঠাৎ এক আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল কেন? চক্রান্তাকারীদের পথ থেকে কোনোরূপ অভিযান শুরু হয়নি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর। অথচ এসব সংগঠন দিনের আলোয় যেন হঠাৎ রাতের স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল স্বপ্নোত্থিতের চোখ থেকে। সবাই বিমূঢ়। ভাষাহীন তারা অযাচিতভাবে শেখ মুজিব আর বাকশালকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। যারা সঠিক মনে করে আন্তরিকতার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তারা হঠাৎ উপলব্ধি করলেন পদক্ষেপটা সঠিক হয়নি। বাকশাল-এর কেন্দ্রীয় কমিটি দল নয়, গভর্নর বা প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত। আর নিজেদের আনুগত্য প্রমাণের জন্য জঙ্গি সংগঠনের নেতারা তোরণ তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় জয়ের ফিকিরে ছিলেন। একে কী বলা উচিত, রাজনৈতিক দলের নেতরা (বঙ্গবন্ধুর অনুসারী অবশ্য) স্থির করুন। এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রঘাত, সত্যিই কি তাই?

১৯৭৩ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দের পরিণতি থেকে কেউ শিক্ষা নিলেন না কেন! তার মন্ত্রিসভার দেশরক্ষামন্ত্রী (সামরিক জেনারেল একজন) অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। চিলির সেনাবাহিনী ৩২ বছর সরকার গঠন ও নির্বাচনে নিরপেক্ষ ছিল। আলেন্দের সময় সেই নিরপেক্ষতা ভেঙে পড়ে কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ধারা নিরপেক্ষ নয়। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা সে কথাটা সেদিন ভেবে দেখেননি। একজন নেতার মৃত্যু অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডই কি সব ভুল ধরিয়ে ছিল? তারা কেন সাম্প্রতিক চিলির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হলেন?

প্রতিবাদের জন্য চাই সংগঠিত শক্তি! সেদিন বাংলাদেশে চক্রান্তকারীরা সংগঠিত ছিল। বাকশালের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো বিতাড়িত দলের ভেতর কালনেমির লঙ্কাভাগের স্বপ্নে মশগুল ছিলেন এ কথা বলা হয়তো কঠোর মন্তব্য মনে হতে পারে। কিন্তু কোনো সংগঠিত শক্তি ছিল না, কোথাও কোনো উপলব্ধি ছিল না, কেউ ঘুণাক্ষরে জানলেন না কী করছে কিংবা চিন্তা করতেও চাননি কিছু ঘটতে পারে কি? সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা চলে প্রতিদিনই হুঁশিয়ারি দেয়া হচ্ছিল মন্ত্রোচ্চারণের মতো আনুষ্ঠানিক এবং অভ্যাসগত। আঘাত এলে বাধা দিয়ে সফল হওয়া যাবে এমন কথা বলছিনে। তবে আঘাত হানার, প্রতিরোধের কোনো লক্ষণও কার্যত চোখে পড়েনি সেদিন। সর্বত্রই বিস্ময়ভাব। কয়েকদিন পর তারা উপলব্ধি করলেন, বাকশাল গঠন ভুল হয়েছিল। কিংবা এ ধরনের পদক্ষেপ ১৯৭২ সালে নেয়া উচিত

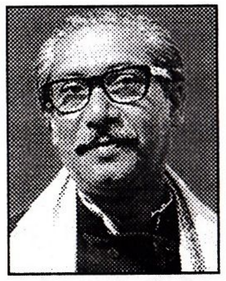
ছিল। তবে ১৯৭৫ সালে কোন পদক্ষেপ উচিত ছিল? আজও কিন্তু সে কথাটা কেউ বলছেন না। অবশ্য বাকশাল দল না ফ্রন্ট তা নিয়েও মিছে তর্ক হয়। আর ব্যাখ্যা দল নিজেদের মতো করে। আজও সেদিনের বুদ্ধিভ্রংশতা অবশ্য যদি হয়ে থাকে, তার আবেগহীন কোনো বিশেষণ হচ্ছে না। শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তার প্রতি প্রযুক্ত সবগুলো বিশেষণ এক নিশ্বাসে বলা ব্যতীত রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা খুব কম ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। কোনো কোনো লেখায় ভক্তির আতিশয্যে কবিতায় ব্যবহৃত কিছু নির্বাচিত শব্দমালা দিয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চোখে পড়ে, যা কখনই বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু আপন প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য।

সবাই জানেন, বঙ্গবন্ধু শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমতাশীল ছিলেন, শুধু তাই নয় তাদের পরামর্শ নিতেন, দায়িত্ব দিতেন। মহীশূরের টিপু সুলতানের সাথে এখানে তাঁর মিল। মৃত্যুতে আছে সাদৃশ্য। শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ ইংরেজদের দখলে। এখনও একজন আহত সেনানী লড়াই করছেন। তার দেহে তিন স্থানে আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে। একাই দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহীশূরবাসী, তিনি টিপু সুলতান। এগিয়ে এলো একদল সৈনিক। দেখল রক্তখোচিত তরবারি। মূর্ছিত প্রায় টিপু সুলতান হেসে উঠলেন। ঝলসে উঠল তার তরবারি। পিছুহটে ইংরেজ সৈনিকেরা গুলি করল তাকে। মহীশূরের শেষ রক্ষক ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

খবর গেল ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির নিকট। ডিনার টেবিলে মদ্যপানরত, পা টলছে তার। কোনোমতে গ্লাস উঠিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, ভারতের লাশের নামে পান করছি।

১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর বাংলাদেশের লাশের নামে স্বাস্থ্য পানের ধূম পড়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদ হওয়ার কথা নয়। ভক্তি অনুকূল মুহূর্তে মত্ততা আনে, প্রতিকূল মুহূর্তে বিমূঢ় করে দেয়। সেখানে প্রতিবাদ উঠতে পারে না। অতীত নিয়ে লজ্জিত হতে বলি না। অতীত থেকে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে আমাদের সকলের এখনো বাকি আছে। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। চক্রান্তের রাজনীতি তিনি কোনোদিন করেননি। ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে কেউ কেউ নির্ভীকতার পরিচয় দেয়। অর্থাৎ ঝুঁকি নেয়। আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকায় থেকে কেউ কেউ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইতিহাসে শেষোক্ত ব্যক্তিদেরই বীর বলা হয় এ যুগে। যারা সমাজতন্ত্র আনার আগ্রাতিশয্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ও রণক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন ইতিহাসের তথ্য হিসেবে—আজকে পুঁজি প্রত্যাহার নীতির সমর্থক

সরকারে মন্ত্রিত্বে গিয়ে এবং ধনসম্পদে স্ফীত হয়েছেন তাদের বিপরীতে শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে একটি কথাই মনে রাখা উচিত যে, শেখ মুজিবের পথ (বাকশাল করার) ঠিক ছিল কি ভুল ছিল সে বিতর্কের ঊর্ধ্বে এই সত্য চিরভাস্বর থাকবে—তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি থেকে একমুহূর্ত ভ্রষ্ট হননি। শান্তি বা যুদ্ধ কোনো সময়ে সেনানীদের সাথে রাজনৈতিক দহরম-মহরম করেননি। তাই নির্দেশ দিয়েছেন। একজন সৎ রাজনীতিকের ভূমিকা তাই হওয়া উচিত। আমরা সেদিন এই সত্য অনুধাবন করতে পারিনি। তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে প্রতিবাদের স্থানে দীর্ঘশ্বাস সম্বল করতে হয়েছে—তাও সঙ্গোপনে।



সরদার ফজলুল করিম

মার্চ মাসের নাম—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জনকণ্ঠের সাহিত্য সম্পাদক আজ তাঁর সাত তলায় হাতের কাছে পেয়ে আর খোঁচা দিতে ছাড়লেন না।

: সরদার ভাই, সবখানে লিখছেন, আমরা কি ফেলনা হলাম?

আমার মুখে জবাব আটকায় না।

: জবররদস্তি না করলে, আমি লেখা কেন দেব? আমি কি লেখক?

: ওসব রসিকতা রাখেন। আজকের সন্ধ্যার মধ্যে লেখা চাই।

: কিন্তু সে তো, 'যে লেখা, লেখা নয়!'

: তাতেই চলবে। আমরা শিরোনাম দেব : 'যে লেখা, লেখা।'

ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক। জীবনকে নিয়ে একটু রসিকতা করতে পারলে ছাড়ি কেন?

না ছাড়লাম না। আমি নিজেই নাম পালটে দিলাম। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের নাম মার্চ বা ব্রুটাস নয় (শুনেছি, বুধ, বৃহস্পতি বলে নাকি আরো নায়ক, অধিনায়কের নাম আছে)। আমাদের বাংলাদেশের অধিনায়কের নাম হচ্ছে : শেখ মুজিবুর রহমান।

: অন্য মাসের নাম কী হবে?

: তা পরে দেখা যাবে। এখন তো এটা হোক। মার্চের নাম : শেখ মুজিবুর রহমান; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

'তোমাদের নেতা, আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'... কোনোদিন এ আওয়াজ যদি কয়েকটি যুবকের বা একটিমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে থাকে, তবে আর একবার আওয়াজই ফ্যাসিস্ট বর্বর

পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামী বাংলাদেশের একমাত্র সর্বজনীন আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে মহান নায়কদের নাম আছে সানইয়াত সেন, লেনিন, স্টালিন, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ নেতার কথা আমরা পড়েছি। কিন্তু ইতিহাস মানেই অতীত। তা আমার কাছে দূর আর অপ্রত্যক্ষ। আর তাই ইতিহাসের একালের মহান নায়কদের জীবনের সাথে অন্যকালের পাঠক আবেগময় যোগ উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি দিয়েই ইতিহাসের মহান নেতাদের জীবনের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সাথে ১৯৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের যে আবেগময় সম্পর্ক রয়েছে একদিন হয়ত তার ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হবে; কিন্তু আজ তা আমাদের প্রতিটি জীবনের গর্বের, গৌরবের আর আনন্দের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আর ইতিহাসের এ এক অপার বিস্ময়।

গল্প শুনেছি, শেখ সাহেব গেছেন অপর এক সহকর্মীর বাড়িতে বেড়াতে কিংবা কাজের কথা বলতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশু মোর্চার সাথে। তারা কাঠির মাথায় কাগজ বেঁধেছে, নিশান লাগিয়েছে। সারিবদ্ধ হয়েছে আর ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে– 'তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব; ভুট্টোর মুখে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; ইয়াহিয়া খানের মুসলমানি—একপোয়া দুধ তিন পোয়া পানি।' ঘুরে ফিরে আবার—'তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' স্বাধীন বাংলার মুক্ত আকাশের নিচে নিঃশঙ্কচিত্তের ধ্বনি নয়। বিশাল ঝড়ের পূর্বক্ষণে আকাশে ধূসর কালো মেঘগুলো যখন ঈশান কোণে কেবল পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, সেই মহালগ্নের আওয়াজ কচি কচি কণ্ঠে। জানিনে কর্মব্যস্ত উদ্বেগভরা প্রতিদিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের এই মোর্চার সামনে পড়ে তাঁর মনে কী আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে মানুষ দোজখের আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবনের হাসি হাসতে পারেন, তিনি শিশু মোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন, 'আরে বাবা, তোদের নেতা শেখ মুজিব!! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার আমার সাহস নাই।'

কিন্তু বাংলাদেশ জানে, শেখ মুজিব এই বিচ্ছুদেরই নেতা হয়েছিলেন, যে কিশোর-তরুণ বিচ্ছুরা জল্লাদ বাহিনীর হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হাজারে হাজারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওদের সেই সংগ্রামী চোখের সামনে আশা আর সাহসের

দেদীপ্য শিখা হয়ে জ্বলছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বাঙ্কারে, অন্ধকার গোপন আড্ডায়, বন্দিদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, জ্বলছিল একটি নাম, একটি প্রতীক—শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব একজন মানুষ। তা আমরা জানি। তাঁর দেহ আছে। তাঁর সুস্থতা-অসুস্থতা আছে। আমাদের মতো তাঁরও আত্মজন আছে। বৃদ্ধ পিতা আছেন। মা আছেন। তাঁর অবোধ সন্তান আছে। তবু বাংলাদেশের দুর্জয় সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক শেখ মুজিব যেন ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে গেছে। এই প্রতীক শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বন্দি-মুক্তি সব মানুষের কাছে '৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রি থেকে একটি পবিত্র আশা আর স্বপ্নের রূপ ধরে ভাসছিল। ২৭ মার্চ। পাক জল্লাদ সামরিক বাহিনী কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্য হ্রাস করেছে। বাসা থেকে দুরু দুরু বুকে রাস্তায় বেরিয়েছি। মেশিনগান রেডি পজিশনে সৈন্যবাহিনী গাড়িগুলো টহল দিচ্ছে দেখতেই বুক কেঁপে উঠেছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ফকিরাপুল বাজারের দিকে এগুচ্ছি। বাজারের মুখ ইটের ব্যারিকেড তখনও বন্ধ। ভয়ার্ত মানুষ কিছু জড়ো হয়েছে। একটা মিলিটারি ট্রাক দেখে ভয়ে আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। আমিও ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েছি টিএন্ডটি কলোনির দেয়ালের মধ্যে। মনে হলো, একজন বাঙালি পুলিশকে ঘিরে বেশকিছু লোক কি যেন বলছে। কাছে গেলাম শত মুখে কোটি কোটি প্রাণের একমাত্র প্রশ্ন সেই বাঙালি পুলিশটির ওপর বর্ষিত হচ্ছে : আপনি ছিলেন শেখ সাহেবের বাসায় ২৫ তারিখ রাতে? আপনি গার্ড ছিলেন? বলুন, বলুন শেখ সাহেব কেমন আছেন? কোথায় আছেন? কী বললেন? ওরা গ্রেপ্তার করেছে? হায় আল্লাহ! বেঁচে আছেন তো? বেঁচে আছেন তো শেখ সাহেব? বেঁচে আছেন তো? এই এক প্রশ্ন, এই প্রশ্ন শুধু সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনেরই দিনরাত্রির প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন ছিল বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে সহানুভূতিশীল বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের।

দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দি ঢাকার মানুষ আমি। পাখির মতো ছোট্ট বাসাটির চারপাশে কেবল ঘুরি! ডানে-বাঁয়ে সশঙ্কিত চোখে পথ চলি। ফ্যাসিস্ট হায়েনার সাথে দেশী কুকুরও নাকি পথে নেমেছে। যখন-তখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পথ থেকে, হাট থেকে, বাসা থেকে। রাত দুপুরে, ভরসন্ধ্যায়, শেষরাতের নিস্তব্ধতায়। তবু এর মধ্যে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। কানের কাছে নিয়ে ট্রানজিস্টার সেটে স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ আর চরমপত্র শুনতে চায়। একদিন যদি সে আওয়াজ খুঁজে না পায় তো হতাশায় মনটা ভরে ওঠে। 'শুনেছ, যাত্রাবাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেছে আকাশবাণী

শোনার অজুহাতে। শুনেছ, পুরান শহরে আওয়াজ দিয়েছে জল্লাদের দল, আকাশবাণী আর স্বাধীন বাংলা শুনলে গুলি করা হবে। তবু কানের কাছে মানুষ তুলে নেয় দেবদুলাল বাবুর দরদভরা সহানুভূতির আওয়াজকে 'ভয় নেই বন্ধু। এ মৃত্যুর শেষে জীবনের সূর্য উঠবেই, ওই শোন মুক্তিবাহিনীর বিষাণ বাজছে।'

হাঁটছিলাম পথ দিয়ে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে এক বৃদ্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। জীবনের আর ভয় কি! এই মৃত্যুর মাঝে। তাই যেন অসম সাহসে কথা বলে চলেছে সঙ্গের মানুষটিকে ডেকে ডেকে : 'হুনছ! ফাঁসি দিবে বলে হারামজাদারা শেখ মুজিবেরে। দেশময় ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মারছে। আবার ফাঁসি দিবে শেখ মুজিবকে। আল্লাহ কি নাই? সইবে না এ পাপ। ওরা মরবে। এই হারামজাদারা মরবে...।' বৃদ্ধ বলেই চলেছে সেদিনের নিষিদ্ধপুরীতে সবচেয়ে নিষিদ্ধ কথা।

বর্বরের হাস্যকর সাহস দেখাতে কোনো চিন্তা হয় না। তাই সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেছিল—শেখ সাহেব কি জীবিত আছেন? তখন জল্লাদ ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিল : হ্যাঁ, আজ জীবিত আছে; কিন্তু কাল থাকবে এমন কথা কে বলতে পারে? সেদিন সেই পাপিষ্ঠের এই ব্যঙ্গোক্তিতেও আমরা শিউরে উঠেছিলাম। ঘরে ঘরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একে অন্যকে প্রশ্ন করেছিলাম, শয়তানদের এ কথার অর্থ কি? তবে কি ওরা শেখ সাহেবকে মেরে ফেলেছে?

কিন্তু আশার পতাকাকে কি কেউ শেষ করতে পারে? তুমি তাকে যতোই ছিন্ন করতে চাও সে ছিন্ন হতে হতে শত থেকে সহস্রে, সহস্রে থেকে অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটিতে পরিণত হয়।

৭ সেপ্টেম্বর জল্লাদের অনুচররা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। জীবননাশের আতঙ্কে কে না আতঙ্কিত হয়। প্রিয়জনের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকতে প্রথম রাতেই প্রহরারত বাঙালি সিপাহীর মুখে শুনলাম শেখ সাহেবের কথা।

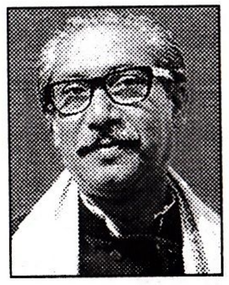
: 'আপনি তো পুরনো মানুষ। আপনি এই যে বিশ ডিগ্রিতে আছেন এর পাশেই দেওয়ানি। সেই ফটকে ছিলেন শেখ মুজিব। সেই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁকে জড়িয়ে দিল, তখন এখান থেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এসে রাতের অন্ধকারে জেলের সব বন্দি যখন তালাবদ্ধ, তখন তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে, সেই '৬৮ সালে। যে সিপাহীদের পাহারায় রেখেছিল জেল কর্তৃপক্ষ আমিও ছিলাম তার মধ্যে। ক্যান্টনমেন্ট যেতেই যখন হবে, তখন আর বাধা না দিয়ে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন

দেওয়ানি ফটকের বারান্দা থেকে। সামনের মাটি থেকে এক মুঠো মাটি তিনি হাতে তুলে নিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে বাংলার ক্ষুদিরাম আবার হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছে। এক মুঠো মাটি তুলে কপালের কাছে নিয়ে যেন বললেন : বাংলা মা আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি। তারপর আমাদের জড়িয়ে ধরে এ কাহিনী শুনতে শুনতে নিজের মনের বিষাদ যে কখন কেটে গেল তা জানতেও পেলাম না। শেখ সাহেব নিজে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গেছেন। পরবর্তীকালের ভয়ার্ত বন্দি মানুষের জন্য আশার টুকরো, সাহসের মণি আর দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র।

আশার পতাকাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আর তাই অযুত জনতা '৬৯ সালের কথা—যখন শুনেছিলাম শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন বুদ্ধি আর বয়সের সব বাধা অতিক্রম করে চোখে আবেগের অশ্রু নেমেছিল। জানি, লক্ষ মানুষের বাধা অতিক্রম করে তাঁকে দেখতে পাবো না। তবু যেন কিসের আকর্ষণে সেদিনও ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। নিজের মনকে বলেছিলাম : না দেখলাম শেখ সাহেবকে। জনতাকে দেখাই তো শেখ সাহেবকে দেখা। জন দিয়েই জনতা। আমি সেদিন জনতারই একজন হবো, আর সেই জনতাকে দেখেই নিজেকে গর্বিত মনে করবো। আমেরিকান সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা পাকিস্তানে কোনোদিন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, কল্পনায় আর যা কিছুই চিন্তা করে থাকি না কেন, এমন কথা কল্পনা করিনি। দখলদার পাকবাহিনীর হাতে বন্দি বাংলাদেশ আর ঢাকায় সেই 'টাইম' পত্রিকাও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। তাদের সাধারণ সংখ্যায় বাংলাদেশের একটি কথাও থাকতো না। কিন্তু গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যায় নাকি বাংলাদেশের সংগ্রামের কথা কিছু কিছু থাকছে। গোপনে গোপনে সেসব সংখ্যা সংগৃহীত হচ্ছে। হাতে কপি করে তা কেউ কেউ বিলি করেছে। দুরু দুরু বক্ষে 'টাইম' পত্রিকার সেই কপি আমরা পড়েছি। এরই এক সংখ্যা দেখলাম, রেসকোর্স ময়দানের ৭ মার্চের লাখ লাখ মানুষের জমায়েতের একটি ছবি তুলে পাশে শেখ সাহেবের একটি জীবনালেখ্য দিয়েছে। শেখ সাহেবের একখানি ছবি দিয়েছে। আর তার নিচে লিখে দিয়েছে : ফ্রম হিরো টু মারটায়ার, বীর থেকে শহীদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঠিকই চেয়েছিল আমাদের আশার এই প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করতে। আমেরিকান বিবেকবান মানুষ তাদের সরকারের সে ষড়যন্ত্রে শামিল হননি। ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহায্যের সাথে পৃথিবীময় বিবেকবান মানুষ সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে বন্দি সংগ্রামী বাংলার দিকে।

সহস্র আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আশার মূর্তপ্রতীক শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রেসকোর্স ময়দানে, যেখানে তিনি শেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

দূর মধ্যপ্রাচ্যের ইয়াহিয়ার বন্দিশালার দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতা আর চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া দীর্ঘদেহী মানুষটি লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে যখন বললেন: 'আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লাখ লাখ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালোবাসার কোনো পরিমাপ নেই। এর কোনো প্রতিদান আমি দিতে পারিনে।' তখন এমন কোনো বাঙালি ছিল না যার নিজের চোখেও পানি জমেনি এবং আবেগে গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসেনি।



সরদার সিরাজুল ইসলাম

বাঙালির মহাকাব্য : কেউ আমাদের দাবায়ে রাখবার পারবা না

বাঙালি জাতির কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পথে-প্রান্তরে, গভীর রাতে, পালা-পার্বণে, সুখে-দুঃখে যে সুর বাজছে তা আর কিছু নয় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ভাষণ নয় যেন মহাকাব্য। কি ছিল সে ভাষণে। বলিষ্ঠ বজ্রকণ্ঠের প্রেরণার উৎস ছিল কি? কেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ গোগ্রাসে গিলেছে সে বাণী। সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু ১৮ মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের মহাসমাবেশ জনমসুদ্রে। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের জন্য জীবনপণ করেছিলেন। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সামান্য রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে জীবন শুরু করে মাত্র দুই যুগের মধ্যে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ঊনসত্তরে হলেন বঙ্গবন্ধু আর একাত্তরের জাতির জনক। তা তো আর এমনি এমনি কেউ করেনি। কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে এসে বলতে পারেন না আমি তোমাদের নেতা এবং তার বলা মাত্র অন্য সবাই তা গ্রহণ করবে না। এজন্য চাই সাহসী, তেজী পুরুষ যে তার জনগণের সুখ-দুঃখ বোঝে। এছাড়া জবর-দখল, নেতৃত্ব দখল কেবল অস্ত্রধারীর পক্ষেই সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বাংলার মানুষকে বোধ হয় এতো বেশি আর কেউ চিনতো না, ভালোবাসতো না। জনগণও তাঁর প্রতি দিয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন। এই দেয়া-নেয়ার সেতুবন্ধনে তাকে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ২৪ বছরের ১৪ বছর কেটেছে জেলে. এর মধ্যে একাধিকবার হতে হয়েছে ফাঁসির মুখোমুখি।

অপরাধ বাঙালির জন্য প্রাণভরা ভালোবাসা। বিদেশী এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন 'আপনার যোগ্যতা কি?' জবাবে তিনি বলেছিলেন আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি। 'আর অযোগ্যতা কি?' প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, জনগণকে বেশি ভালোবাসি, সেটাই আমার অযোগ্যতা। ভালোবাসার দাবিকে প্রতিদান দিয়ে পূর্ণতা আনতে চেয়েছিলেন মুজিব। বাঙালির দাবির প্রশ্নে তাই কোনো আপোষ করেননি। কি ভাষায়, কি স্বায়ত্তশাসন, কি গণতন্ত্রের আন্দোলন সবকিছুতেই মুজিবের—

"অসত্যের কাছে নত নাহি-হবে শির
ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।"

তাই 'উন্নত মম শির' মুজিব কাউকে ভয় করতেন না। কেননা তার শক্তির উৎস ছিল জনগণ। মুজিব জানতেন ঊনসত্তরে তাঁকে আইয়ুব খানের ফাঁসি দেয়া ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে, জেলের তালা ভেঙে, মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল ক্যান্টমেন্ট থেকে।

সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠের সাহস যুগিয়েছে জনগণ যাদের কাছে ভোট চেয়েছিলেন যে কোনো কিছুর বিনিময়ে ছ'দফা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির ওয়াদায়। জনগণ ভোট দিয়েছিল কারণ মুজিব তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাই সেদিন হয়ে ওঠেন বেপরোয়া। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাই আত্মপ্রত্যয় অনুভব করেছিলেন, 'আমরা যখন রক্ত দিতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।' সকল প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই সেনাপতি কেবল শত্রুকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে নিজের বাহিনীকে বলতে পারেন, 'আর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।' শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে সরাসরি বিকল করে দিয়ে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা সেদিন নিজের হাতে নিলেন, যা অর্জনের ক্ষমতা তাকে জনগণ দিয়েছিল। তাই সাতই মার্চ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটলো এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলো। রেসকোর্স ময়দানে সেদিন সরকারি কর্মকর্তা, রেডিও, টেলিভিশন পুলিশ বাহিনীকে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো (পাকিস্তান সরকারের) নির্দেশ পালন করতে নিষেধ করেন। পাকিস্তান সরকারকে ট্যাক্স দেয়া বন্ধ। বাংলাদেশ থেকে

সম্পদ পাচার বন্ধ। ট্যাক্স জমা হবে বাঙালি মালিকাধীন ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে। এসব দুঃসাহসী ঘোষণা দিয়েছিলেন যখন, সে মুহূর্তে মাথার উপরে উড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বোমারু বিমান আর অদূরে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ বলে সুপরিচিত সামরিক বাহিনীর ক্যান্টমেন্ট। জনগণ বঙ্গবন্ধুর সে নির্দেশ পালন করেছিল অক্ষরে অক্ষরে। রেডিও-টেলিভিশন প্রচার করতো বাংলার অবিসংবাদিত বজ্রকণ্ঠের প্রতিটি নির্দেশ। জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুললো। বঙ্গবন্ধু যেন জানতেন তাকে হয় হত্যা করা হবে নয়তো বন্দি করা হবে। তাই সাতই মার্চ চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং সম্ভাব্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে চলবে তার সুনির্দিষ্ট খুঁটিনাটি রূপরেখাও ছিল সেদিনের সংক্ষিপ্ততম ১৮ মিনিটের ভাষণে। তাই তো গোটা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস। মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলার সাথে অবশ্যই জয় বঙ্গবন্ধু বলে ঝাঁপিয়ে পড়তো শত্রুর উপরে। শত্রুর গুলি খেয়ে রক্ত ঝরছে মুক্তিযোদ্ধার, জীবন প্রদীপ নিভতো জয় বঙ্গবন্ধু বলে। শত্রুর শত নির্যাতন এমনকি বুলেট তাক করা মুহূর্তেও জয় বঙ্গবন্ধু বলে আত্মহুতি দিতেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি, দিয়েছিলেন বাঙালি জাতিসত্তার সার্বিক 'মুক্তির আভাস'। এর অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় বরং বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য খাওয়া, থাকা পরা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দেয় এমন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম 'আমি তোমাদেরই লোক' সংকলনে মূল্যায়ন করেছেন, 'শেখ মুজিব কতোখানি ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, তা আমি জানি না। কিন্তু সংগ্রামী মুজিব অবচেতনভাবে হলেও অনুভব করেছিলেন স্বাধীনতার চাইতে ব্যাপকতর তাৎপর্যের শব্দ হচ্ছে মুক্তি।'

স্বাধীনতায় যদি ভৌগোলিক সীমাচৌহদ্দী থাকে, 'মুক্তি' অতিক্রম করে যায় সকল সীমাকে। মুক্তি বঞ্চনা থেকে, মুক্তি বৈষম্য থেকে, মুক্তি সংকীর্ণতা থেকে, কুপমণ্ডুকতা থেকে, মুক্তি সকল দীনতা থেকে। মানুষের জীবনে এর চেয়ে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে। এই মহৎ স্বপ্ন উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সংগ্রামী মানুষের নিশান বরদার শেখ মুজিবের কণ্ঠে।

পরবর্তীতে একটি মুখচোরা মহল সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন, যে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তা হলে ঐ দিনই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত, পাকিস্তানি বাহিনী প্রস্তুতি নিতে সময় পেত না। স্বাধীনতা যেন এমনি এসেছে। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে বিতর্কে

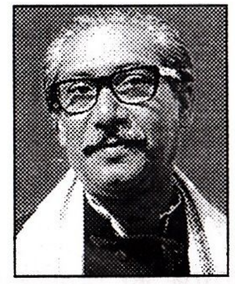
যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই—যা খোদ জিয়াউর রহমান নিজের লেখা প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ আমাদের কাছে গ্রিন সিগন্যাল মনে হয়েছে।'

মওলানা ভাসানী ৯ মার্চ '৭১ পল্টনে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবকে আমি ভালোভাবে চিনি। সে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চাইতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক হওয়াই শ্রেয় মনে করে।' সদ্য প্রকাশিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ডে (পৃঃ ৭৫৬) দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা আছে—'চট্টগ্রাম ১৭ মার্চ—ন্যাপ প্রধান মওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানী এখানে বলেন যে, 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য থাকতে পারে না। ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে আপোষের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।' শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে স্বাধীনতা প্রশ্নে পরিষ্কার কোনো বোঝাপড়া হয়েছে কিনা প্রশ্নের জবাবে মওলানা সাহেব বলেছিলেন, 'সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে বলা যায় না, অনেক কিছুই রাজনীতিকদের কাছে গোপান থাকে।' বলা বাহুল্য এ যুক্তির পটভূমি ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একটি বলিষ্ঠ দিক। শত্রুতো প্রস্তুত, কিন্তু, বাঙালিরা? এবার তো সভা হরতালে কাজ হবে না। বুলেটের জবাব এবার দিতে হবে বুলেটে। তাই অস্ত্র চাই, চাই অস্ত্র চালনার শিক্ষা, সাহায্যকারী বন্ধু চাই, চাই বিশ্ব জনমত। পৃথিবী জানুক নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা না দেয়ার পরিণতি। অর্থাৎ বাঙালি যেন হানাদার বাহিনী না হয়। মুজিবকে যেন দেশের জনগণ বলতে না পারে যে, স্বাধীনতা তো বিনা রক্তপাতে পাকিস্তানিরা দিয়ে দিতো। তাই বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সঠিক। তিনি চৈত্র মাসের ওয়াজ মাঘ মাসে করেননি। তাই বাস্তবতার আলোকে আলোচনায় না বসলে বিশ্বজনমত যেমনি পাওয়া যেত না, তেমনি হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলায় জাতিকে প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাই সময় নিয়ে জাতিকে শুধু মানসিকভাবে প্রস্তুত করেননি বরং অস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করতে তৈরি করেন। যার ফলে অল্প সময়ে খোদ পঁচিশে মার্চ রাতে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যে কোনো হঠকারিতা স্বাধীনতার বিপক্ষে যেতো। এ প্রসঙ্গে ২৬ মার্চ ৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণে বলেন, 'It became quite evident that intention of Sheikh Mujib and his advisors waw not to come to an undersanding on the basis of one Pakistan, but was somehow to extract from me a proclamation which

would in effect divide the notional assembly in to seperate constituents assembly, gives birth to a confedaration rather than a federation and by the remoble of the martial law, create complete chaos in the county. Througout this law they expected to establish a seperate state of Bangladesh. That eedless to say, would have been and of Pakistan as created by the other of nation.' এতে আপোষের গন্ধ কোথায়? যারা মনে করেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার এলএফও মেনে নিয়ে নির্বাচন করছেন তাই তার হাত-পা বাঁধা ছিল। আপোষ করা ছাড়া কোনো পথ ছিল না। তাদের পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা সিদ্দিক সালেকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থখানা পড়তে অনুরোধ রইলো। উক্ত গ্রন্থে সিদ্দিক সালেক লিখেছেন, (পৃ. ১৭) 'শেখ মুজিব পরম আস্থার সাথে তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের সাথে এলএফও সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করতেন।' অথচ তিনি জানতেন যে তাঁর কথাগুলো ইয়াহিয়া খানের জন্য টেপ হয়ে যাচ্ছে। সেই রেকর্ডকৃত টেপে মুজিব বলেন, 'আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি ঐ এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। নির্বাচনের পরে কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।' ২৫ মার্চ ৭১ সন্ধ্যায় পাকিস্তান টাইমস-এর বিখ্যাত সাংবাদিক প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাথে। বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন, 'ইয়াহিয়া ভেবেছে আমাকে হত্যা করে আন্দোলন দমিয়ে দেবে। কিন্তু সে ভুল করছে। আমার কবরের উপর স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।' বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তথাকথিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঊষালগ্নে *(ভাসানীর ভারত প্রবাসে নয় মাস : সাইফুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ছুটি, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫)* তা ছিল অন্তরে। প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ভাষা ২১ দফা আন্দোলনের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের, ছ'দফা আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলনের ধাপে ধাপে। এভাবে জনগণকে উপলব্ধি করালেন যে, পাকিস্তানিরা বাংলাকে উপনিবেশবাদে পরিণত করে গোলাম বানিয়েছে। জনগণ যখন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জবাবে পেল বুলেট তখন তাদের নেতাকে বললো, 'মুজিব তুমি এগিয়ে চলো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' ঠিক তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা। স্বাধীনতার পরে যখন দেখলেন জনগণ তাঁর প্রতি যে আশায় স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেছে সে জনগণ প্রত্যাশিত খাওয়া-

পরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তখন বঙ্গবন্ধু তাদের পক্ষে এসে দাঁড়ালেন, সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিলেন। সীমাহীন লুটপাটের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসীরা তা মানবে কেন? একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে? না, মোটেই না। তাঁর আত্মা বাংলাদেশের সত্তার সাথে মিশে গেছে। কেননা মৃত্যুকালে জনগণের জন্য রেখে গেছেন তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি ভূখণ্ড।

জনগণ কি মুজিবকে বেশি দিয়েছে না মুজিব জনগণকে বেশি দিয়েছেন? জনগণ চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন, মুজিব দিয়েছে স্বাধীনতা। জনগণ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক বানিয়েছে আর মুজিব শুধু স্বাধীনতাই দেননি, জীবন দিয়েছেন। জনগণের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম দিয়েছেন, দিয়ে গেছেন আগামী দিনের পথের সন্ধান। এবারে জনগণের রক্তের ঋণ শোধ দেয়ার পালা। মুজিবের রক্ত আজ কথা বলছে। জনগণ বুঝতে পারছে সমাজতন্ত্র উত্তরণ ছাড়া শোষিতের বিপ্লব ত্বরান্বিত হোক আর সেভাবেই রক্তের ঋণ শোধের জন্য প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে। সে গতিধারাকে প্রতিহত করার শক্তি জনপদে আজ আর কারো নেই।



সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু : একটি নাম, একটি জাতির ইতিহাস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চিরবিদ্রোহী—বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। অতীতে দেখা যায়, বাংলার ভূখণ্ড ছিল, জনগণ ছিল। কিন্তু জাতির গঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বীরপুরুষ ছিল না। প্রাচীনকালে আমরা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বীর চরিত্রের পরিচয় পাই। চাঁদ সওদাগর ছিলেন বিদ্রোহী। তিনি কোনোক্রমে দেবী পদ্মার পূজা দেবেন না। অথচ দেবীর পূজা চাই। তাই আক্রোশে পদ্মা দেবী চাঁদ সওদাগরের পুত্রদের দংশন করে হত্যা করে। তার ব্যবসা নষ্ট করে। তবু চাঁদ সওদাগর দেবীর মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেননি। তেমনিভাবে শেখ মুজিব কোনো শক্তির নিকট মাথা নত করেননি। তিনি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের উদ্ধত সঙ্গীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি বাঙালি স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে নিজের ভাগ্যের উন্নতি করেননি। তিনি ছিলেন বাংলার মহাশক্তি—সে মহাশক্তির নিকট আইয়ুব, মোনায়েম, ইয়াহিয়ার সিংহাসন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হাজার হাজার ঘাতক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়। তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান। তিনিই বাঙালি জাতির জনক এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু বাংলার লেনিন, মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, চার্চিল। তিনি বাংলার দ্য গল, ক্যাস্ট্র, লুমুম্বা, চেগুয়েভারা, হো চি মিন। তিনি বাংলার সুকর্ন জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, জন কেনেডি। বিশ্বের যে কয়জন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক আছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে তুলনা করা যায় সুকর্ন ও জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে। লেনিন, হো চি মিন, ক্যাস্ট্র, দ্য গল প্রমুখ যে বিশেষ

নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজ শাসকরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কেউ রোধ করতে পারেনি। সিরাজউদ্দৌলার নাম আবার উচ্চারিত হয়েছে এবং উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। তেমনিভাবে শেখ মুজিবের নাম আমাদের পূর্বসূরিরা স্মরণ করবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আর ঘৃণাভরে তাকাবে বিশ্বাসঘাতক কর্নেল ফারুক, রশিদ, কর্নেল ডালিম, কর্নেল শাহরিয়ার, নূর, মেজর হুদা, মোসলেম, মোশতাক প্রমুখের প্রতি।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর স্থান ছিল কোটি কোটি মানুষের অন্তরে। তখন বাংলাদেশে একটি নামই উচ্চারিত হতো—শেখ মুজিব, যার বজ্রকণ্ঠে সাড়া দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করেছে। তাঁর নাম সগর্বে উচ্চারিত হবে ততদিন, যতদিন মেঘনা, পদ্মা, যমুনা প্রবাহিত হবে, যতদিন বাংলার মাটি আর মানুষ থাকবে। ৫০ হাজার বছর পরেও যদি এ শতকের একটি নাম উচ্চারিত হয় সে নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

'যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্ত গঙ্গা বহমান,
নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।'

বঙ্গবন্ধু যে কত বড় ছিলেন, কত মহৎ ছিলেন, কত বড় গণতন্ত্রী ছিলেন, কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, কত বড় জনদরদী, কত বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তা বাংলাদেশের একটি বিশেষ শ্রেণী বুঝতে পারেননি। তাদের হয়তো খুব দোষ দেয়া যায় না। কারণ বঙ্গবন্ধু এত বড়, এত মহৎ এবং তারা এত ক্ষুদ্র যে তাদের সংকীর্ণতার মাপে বঙ্গবন্ধুর বিশালতার পরিমাপ করা এক অসাধ্য কাজ। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে এত অপপ্রচার চালানো হয়েছে যে, তাতে দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ও ছাত্র-যুবকদের বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন—১৫ আগস্টের পর একটি বিশেষ মহল মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রচার করছে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন ২৬ মার্চ এবং বাংলার মানুষ যুদ্ধ শুরু করে

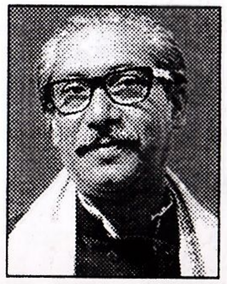
অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন, সেদিক দিয়ে মুজিব এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইতিহাস স্রষ্টা। তিনি তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের বিপ্লবী নেতা। তাই তাঁকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ জুলিও কুরি পদক দিয়েছে এবং লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা তাকে বাংলাদেশের 'মুকুটহীন সম্রাট' বলে আখ্যায়িত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাসন দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। এ ধারা বেশি দিন চলতে থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে যে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ঘটেছে তা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভুলে যাবে এবং স্বাধীনতার যৌক্তিকতার প্রতি তারা আস্থা হারাবে। ১৫ আগস্টের পরে যারা ক্ষমতায় আসে তারা ইচ্ছাপূর্বক তাকে নির্বাসন দেয়ার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলার স্থপতি। তিনি জাতির জনক। শেখ মুজিবকে অস্বীকার করার অর্থ স্বাধীনতার ইতিহাসকে অস্বীকার করা। এক জনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদানকে বিচার করতে হলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনীতিতে ১২ বছর জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁকে ১৮টি ফৌজদারি মামলায় জড়ানো হয়েছে, দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। শতকরা ৯৯ জন মানুষ মুজিব বলতে অন্ধ ছিল। তার আহ্বানে বাংলার ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে। তার প্রশাসনের সাড়ে তিন বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষপটে তাঁকে নির্বাসন দেয়ার অর্থ বাঙালি জাতিকে এবং তাদের মহান নেতাকে অপমানিত করা। এতে লাভবান হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও ক্ষমতালোভী বিশেষ দল। বামপন্থী দলগুলো আপাত সুবিধার জন্য তাকে অবমূল্যায়ন করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কি সর্বহারার সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পেরেছে? অধিকন্তু ১৯৪৭ সালের দ্বি-জাতিতত্ত্ব আবার দেখা দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানি ভাবধারা পুনর্বাসিত করার চেষ্টা চলছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে বঙ্গবন্ধুর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দলীয় ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি জাতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন। তিনি জাতির পিতা। এ আসন থেকে যতদিন তাঁকে দূরে রাখবো ততদিন জাতিকে আমরা বঞ্চিত করবো। আমাদের উত্তরসূরিরা একদিন আমাদের এজন্য অভিযুক্ত করবে।

ঐ একই দিন থেকে। ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা মুক্তি সংগ্রামের একটি অখণ্ড ঘটনা। যুদ্ধক্ষেত্রের একটি ঘটনা দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের মূল্যায়ন করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ২৪ বছরের ইতিহাস এবং সে ইতিহাসের মহানায়ক শেখ মুজিবুর। জিয়াউর রহমান এই ইতিহাসের একজন বীর সিপাহী মাত্র।

সভ্যতার ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস সামনের দিকে চলে। পশ্চাতে ফেলে আসে মিথ্যার ইতিহাস। ইতিহাসের অগ্রযাত্রাকে পাকিস্তানি শাসনচক্র ও তাদের বাংলাদেশের উত্তরসূরিরা ভিন্নপথে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে এবং করছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেমন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক, স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমানকে যারা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে তাদের নিয়তি আইয়ুব, ইয়াহিয়া খানের মতোই হবে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির প্রতীক। বাঙালি জাতির ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস আর বাংলাদেশের ইতিহাস এক ও অভিন্ন ।



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শেখ মুজিবের গোপন শত্রু

শেখ মুজিব সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে করেছেন, পরেও করেছেন, মাঝখানে, ঐ যুদ্ধের সময়টাতেই বরং, মরণপণ লড়াই চলছিল,সব ফ্রন্টে তখনই কেবল নীরব ছিলেন, নইলে তাঁর জীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইতিহাস।

পাকিস্তানের সারা সময় তাঁকে লড়তে হয়েছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। তাদেরকে তিনি চিনতেন। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষকামিতা দেখিনি। সুযোগ ও প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও অনেক বুনিয়াদি নেতা যেখানে ব্যর্থ হয়ে গেলেন সেখানে শেখ মুজিবের সাফল্যের কারণ কি?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে তাঁর আপোষবিমুখিতার উল্লেখ না করে উপায় থাকে না। আপোষের চোরাবালিতে অন্যরা পা দিয়েছেন, তিনি দেননি। অন্যরা হারিয়ে গেছেন, তিনি যাননি; অসমতল ভূমিতে সরলরেখায় প্রসারিত পথ ধরে তিনি এগিয়ে গেছেন। পাকিস্তানি শত্রুদের তিনি জানতেন। কিন্তু বোধ হয় সবটা জানতেন না, জানলে ধরা দিতেন না একাত্তরে, কিংবা পাকিস্তানি আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তাজউদ্দিন আহমদকে পরামর্শ দিতেন না পুরাতন ঢাকায় গিয়ে আত্মগোপন করতে। বর্বরেরা কত বর্বর হতে পারে সে তাঁর অভিজ্ঞতার ভেতর ছিল না, যদিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি ছিলেন তিনি, এক নম্বর আসামি, আশঙ্কা ছিল ফাঁসির।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও দেখছি সমানে তিনি লড়েছেন। সমান তেজস্বিতায়। আগের মতোই বলিষ্ঠ তিনি, আগের মতোই তেজস্বী। কিন্তু কার বিরুদ্ধে লড়াই এবার? শত্রু কে?

না, পাকিস্তানিরা তখন আর প্রধান ছিল না। যুদ্ধবন্দিদের বিচার হবে বাংলাদেশের মাটিতেই—তার এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা উদ্দীপ্ত করেছে মানুষকে। কিন্তু সে বিচার হয়নি। আল-বদর, রাজাকারদেরও তিনি মাফ করে দিয়েছেন, সাধারণ ক্ষমার ভেতর দিয়ে। এরা নয়, এদের জায়গায় তখন এসেছে চোরাচালানী, মজুতদার, মুনাফাখোর। তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন। তার সেই বলিষ্ঠ তর্জনী বারবার উদ্যত হচ্ছে তাদেরকে লক্ষ্য করে। আরো ছিল বামপন্থীরা, যাদেরকে তিনি দুষ্কৃতকারী বলেছেন সব সময়ে, কখনো কখনো বলেছেন নকশাল এবং নির্দেশ দিচ্ছেন দেখামাত্র গুলি করার। সন্দেহ ছিল না কোনো যে, তাঁর দৃষ্টিতে এরাই তখন প্রধান শত্রু, তাঁর এবং বাংলাদেশের। বামের এই কর্মীরা যে আন্তরিক, তারাও যে দেশপ্রেমিক—সেই সত্য অন্যে মানলেও মানতে পারতো, শেখ মুজিব মানতেন না। তাঁর পথটা সোজা এবং সেই পথের যে পথিক নয় সেই দুষ্কৃতকারী। অবশ্য তিনি দলীয় ঐক্যজোট ও পরে বাকশাল গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা নমনীয় বামকে নিয়ে, দুরন্ত বামের সাথে তাঁর আপোষের প্রশ্নই ওঠেনি। পাকিস্তানিদের সাথে যেমন, এদের সাথে তেমনি, তিনি ছিলেন আপোষহীন। তখনকার ন্যাপের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী একবার সুন্দর করে বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব এক হাত তোলায় সন্তুষ্ট নন, তিনি দু'হাত তুলতে বলেন, তিনি চান সবাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করুন। কথাটা সত্য। তিনি আত্মসমর্পণই চাইতেন এবং ন্যাপ-সিপিবি আত্মসমর্পণই করেছিল তাঁর কাছে।

বাম তাঁর শত্রু, যেমন বামের শত্রু তিনি, এটা সহজ হিসাব। কিন্তু বাম তাঁকে তেমনভাবে আক্রমণ করেননি, বামকে যেমনভাবে তিনি আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি যে নিহত হলেন তা বামপন্থীদের হাতে নয়, ডানপন্থীদের হাতেই। বিদেশীরা মন্তব্য করেছে, শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন তাঁর নিজের লোকদের হাতেই। কথাটা মিথ্যা নয়। বাঙালিই তো, বাঙালির হাতই তো রঞ্জিত হয়েছে বাঙালিদের নেতার রক্তে।

বাঙালির ইতিহাসে শেখ মুজিবের স্থান অনন্য। কোনো বাঙালি যা পারেনি, তিনি তা করে গেছেন, একটি বাংলা ভাষী স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। এ স্থান থেকে তাঁকে চ্যুত করবে কি? কিন্তু সেই নেতাকে কেবল বাঙালি নয়, তাঁর কাছের লোকেরাই হত্যা করলো। ঘাতকদের মধ্যে এমন লোকেরা ছিল যারা অংশ নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। অন্তত একজন তো মনে হয় খুন করতে গেছে অভিমান বশে, সুবিচার পায়নি বলে তপ্ত হয়ে। সবচেয়ে

বড় কথা, এই ঘাতকদের ওপর রাজনৈতিক ছাতা যাঁরা খুলে ধরেছিল তাঁরা কারা? কারা দিলেন আশ্রয়? খন্দকার মোশতাক কে? তিনি শেখ সাহেবের নিকটতম সহযোগী, গালে চুমো দিতেন প্রকাশ্যে, হেলিকপ্টারে ওঠার জন্য পাখা ধরে ঝুলে পড়তে চাইতেন আগ্রহাতিশয্যে। তাহের উদ্দিন ঠাকুর বা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের তুলনায় মুজিববাদের পক্ষে বড় গলা কারছিল সেকালে? শেখ সাহেবের আপন লোকের মধ্যেই তাঁর আসল শত্রু ছিল, তিনি জানতে না, চিনতেন না, শত্রু খুঁজছিলেন তিনি অন্যত্র। দূরে দূরে।

আর যারা আরো বেশি আপন তাঁর, অত্যন্ত নিকটের, যাঁদের পক্ষে প্রশ্নই ওঠে না তাঁর বুকের ওপর অস্ত্র তুলে ধরার, যাঁদের কেউ কেউ তাঁর সাথেই নিহত হয়েছেন ১৫ আগস্টের সেই ভয়ঙ্কর রাতে, তাঁরা কি মিত্র ছিলেন শেখ মুজিবের? না, ছিলেন না। তাঁরাও তাঁর শত্রু ছিলেন, মিত্রের ছদ্মবেশে। ইচ্ছা করে নয়, শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের অজান্তে, মিত্রের কাজ করতে গিয়ে। তাঁর আত্মীয়দের দৌরাত্ম্যের কথা দেশবাসী শুনেছে, টেলিভিশন থাকায় দেখতেও পেয়েছে। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ তখন এদের কারো কারো মধ্যে উৎসব শুরু হয়েছে সোনার মুকুট মাথায় পরার। যৌবনে শেখ মুজিব যখন মন্ত্রী হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের, তখন গোপালগঞ্জের লোকেরা ঘিরে রাখতে চেয়েছিল তাঁকে। পারেনি, তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে সংগঠনে ফেরত চলে গিয়েছিলেন। এবারও যখন তিনি অনেক বড়, গোপালগঞ্জের নন, আওয়ামী লীগের নন, এমনকি হওয়ার কথা নয় কেবল তাঁর শ্রেণীরও, তখনও তাঁর আপনজনেরা—পরিবারের, অঞ্চলের, দলেও শ্রেণীর মানুষেরা তাঁকে আঁকড়ে ধরে রইল। উড়ার কথা যাঁর আকাশে, তাঁর ডানা দুটো আটকা পড়ে গেল কাদায়। ফলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তিনি, আর সেই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিল ঘাতকেরা। নইলে তাদের সাধ্য কি তাঁর গায়ে হাত তোলে। পাকিস্তানিরা পারেনি, কেননা তারা জানতো তাঁর সাথে জনগণ আছে, জনগণের তিনি অবিসংবাদিত নেতা। সেই আসন থেকে টলে পড়েই তিনি নিহত হলেন, নইলে হতেন না। নৈতিক পতনই তার দৈহিক পতন ডেকে আনলো।

যারা তাঁকে বাকশাল গঠন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজনৈতিকভাবে তারাও তাঁর আপন লোকই। সেই পরামর্শ মিত্র হিসেবে দেয়া হলেও মিত্রসুলভ ছিল না। কেননা বাকশাল তাঁকে আরো দূরে সরিয়ে দিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, সন্দেহ করার কারণ ঘটল যে, তিনি স্বৈরাচারের পথ ধরে এগুচ্ছেন, আর পিছুবেন না।

বলা হয়ে থাকে যে, একাত্তরের আগের শেখ আর পরের শেখ এক নন। বড় সত্য সে-কথা। কি ঘটেছে ইতোমধ্যে? না, শত্রু বদলে গেছে। পাকিস্তানিরা নেই, সেই জায়গায় আপনজনেরা এসে গেছে। আপনজন যাঁর শত্রু তাঁকে বাঁচায় কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছিল, অবশ্যই ছিল ওঁৎ পেতে, অপেক্ষা করে; কিন্তু ঐ সাম্রাজ্যবাদকে প্রবেশের পথ করে দিল কে? কে দিল দরজা খুলে ভেতর থেকে? কে পারে, ভেতরের লোক ছাড়া?

তিনি ইতিহাসে চলে গেলেন ঠিকই, কিন্তু ইহজগতে থাকতে পারলেন না দীর্ঘদিন। আপনজনের কারণে। এঁরাই তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল—বামের চেয়ে তো বটেই, ইয়াহিয়া খানের চেয়েও বড় শত্রু; তা এখন তাঁরা যতই বিলাপ করুন না কেন—বিভিন্ন সুরে ও স্বরে।



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি দু'বার মাত্র

আমি 'পূর্ব পশ্চিম' নামে উপন্যাসটি রচনা করার সময় স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অনেক বই সংগ্রহ করেছিলাম, প্রচুর পুরনো পত্রপত্রিকাও ঘাটাঘাটি করতে হয়েছিল। সেই সব তথ্য থেকে গড়ে ওঠে আস্তে আস্তে এক ছাত্রনেতা থেকে গণনেতা, তারপর সব বাঙালির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উজ্জ্বল চরিত্র। ঐ উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কথা আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এবং লেখার আগেই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ি। সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন নেতা আর তখন দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে মাত্র দু'বার।

ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর স্থান নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে এবং আরো লেখা হবে। আমি আর নতুন কী বলবো? ব্যক্তিগত কিছু কথাই মনে পড়ে।

উনিশ শো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের পর কী ঘটেছিল, তা আমরা এখন জানি, কিন্তু সেই সময় ছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠা। তিনি বেঁচে আছেন কি না, তাও বোঝা যাচ্ছিল না। শেখ মুজিব 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বলে ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হলো, তখন তিনি অদৃশ্য। কিন্তু তাঁর প্রেরণাতেই মুক্তিযোদ্ধারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। সেই একাত্তর সালের একেবারে শেষের দিকে শোনা গিয়েছিল তিনি আবদ্ধ আছেন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। তখন এদিকে স্লোগান উঠেছিল, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।'

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী শেখ

মুজিবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ মুজিব এসেছিলেন কোলকাতায়, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এক সাথে ভাষণ দিয়েছিলেন ময়দানের বিশাল জনসভায়। সেই সভায় আমিও গিয়েছিলাম শ্রোতা হিসেবে, তাঁকে প্রথম দেখি দূর থেকে, আলাপ করার প্রশ্নই ছিল না। মনে আছে, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক সব প্রটোকল ভেঙে মঞ্চে উঠে পড়েছিলেন নাটকীয়ভাবে।

কিছুদিন পরেই কোলকাতা থেকে একটি লেখকের দল আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল ঢাকায়, আমি সেই দলের কনিষ্ঠ সদস্য। আমার পূর্ববঙ্গে জন্ম হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কখনো ঢাকায় যাওয়া হয়নি। ফরিদপুর থেকে চলে আসতাম কোলকাতায়। ঢাকায় যাওয়া শুরু করার পর টের পেলাম, সেখানে এক বিষম বিপদে পড়তেই হয়। তার নাম দাওয়াত। প্রতিদিনই দু'বেলা অতরকম পদ ভোজন করলে প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর। কিন্তু আমন্ত্রণ এমনই আন্তরিক যে, প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। ঢাকায় গিয়েই আমি প্রথম শুঁটকি মাছ আস্বাদন এবং উপভোগ করি, ফরিদপুরে ওসবের চল ছিল না।

যাই হোক, সেবারে ঢাকায় পৌঁছে আমার প্রধান বাসনা ছিল শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার। সে সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, তখন একটার পর একটা দেশ সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দূতাবাস, প্রচুর দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎকার দিতে হচ্ছে শেখ সাহেবকে। তিনি অতি ব্যস্ত। তবু তাঁর কাছের লোকদের ধরাধরি করে এক সকালে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য সময় নির্ধারিত হলো।

আমরা সাত-আটজনের একটি দল গেলাম, বঙ্গভবনে নয়, তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে। সেখানে বাড়ির মধ্যে ও বাইরে অজস্র ভিড়। কোনোক্রমে পৌঁছলাম শেখ সাহেবের সান্নিধ্যে, বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, কেউ একজন পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো আমাদের।

শেখ সাহেব আমাকে ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বেছে নিয়ে ডেকে নিলেন। আমাদের দুজনের অতিরিক্ত যোগ্যতা এই যে আমাদের এই দুজনেরই দেশের বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। গোটা বাংলাদেশটাই তো শেখ মুজিবের বাড়ি, তবু নিজের জেলার প্রতি বোধ হয় তাঁর কিছুটা বেশি টান ছিল।

'আপনারা তো আমার দেশের লোক' বলে তিনি দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন আমাদের। সেই উষ্ণ আলিঙ্গনে আমরা অভিভূত। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কোন গ্রামে আমাদের বাড়ি, এখনো কেউ আছে কিনা ইত্যাদি।

আমার এক দাদামশাই অঙ্কের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর নাম শুনে তিনি চিনতে পারলেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমি অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলাম তো। তাই সুরেন গাঙ্গুলি মশাইকে দেখলেই আমার ভয় লাগতো।

তিনি আমাদের সাথে এমন সহজ-সরল ব্যবহার করলেন, যেন কত দিনের চেনা। কোথায় গেল সে পনেরো মিনিটের গণ্ডি, ছাড়িয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বললেন, আমার খুব সাধ নিজের জন্মস্থানটা একবার দেখার। সুনীল যদি আমার সাথে যায়।

শেখ সাহেব সাথে সাথে বললেন, যান না, যান না, আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সাথে আর্মড গার্ড থাকবে।

সেবারে অবশ্য আমাদের যাওয়া হয়নি। তখনো আইন-শৃঙ্খলার অবস্থান তেমন ভালোছিল না। বন্ধুরা নিষেধ করেছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্র'র অবশ্য কোনোদিনই আর জন্মস্থানটা দেখা হয়নি।

শেখ সাহেবকে আমি আর দেখার সুযোগ পাইনি, পরের বছরই কাপুরুষেরা তাঁকে এবং তাঁর প্রায় পুরো পরিবারটিই নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আট-ন' বছরের শিশু রাসেলকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি।

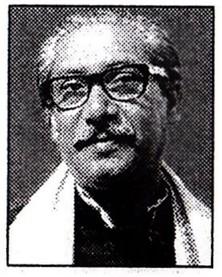
ঘটনাটি ঘটে শেষ রাতে, আমরা কোলকাতায় খবর পেয়ে যাই দুপুরের আগেই। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি, মনে হয়েছিল বাজে গুজব। বাংলাদেশের কোনো মানুষ কি জাতির মুক্তিদাতাকে খুন করতে পারে? অবশ্য ভারতের মানুষই তো খুন করেছিল মহাত্মা গান্ধীকে। পরবর্তীকালে আর একবার গিয়েছিলাম ধানমণ্ডির সেই বাড়িতে, শেখ হাসিনা দেখিয়েছিলেন সিঁড়ির কাছে কোথায় পড়েছিলেন শেখ সাহেব। তখনো আমার বুকের মধ্যে হাহাকার টের পেয়েছিলাম।

রাসেলকে নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম সেই সময়ে :

রাসেল, অবোধ শিশু, তোর জন্য
আমিও কেঁদেছি
খোকা, তোর মরহুম পিতার নামে যারা
একদিন তুলেছিল আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি
তারাই দু'দিন বাদে থুতু দেয়, আগুন ছড়ায়
বয়স্করা এমনই উন্মাদ!
তুই তো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়েসেতে ছিলি

তবুও পৃথিবী আজ এমনই পিশাচী হলো
শিশু রক্ত পানে গ্লানি নেই?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে!
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই!

কলকাতা, ২০০৫ সাল



সুব্রত বড়ুয়া

বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

বাঙালি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে গবেষক পণ্ডিতরা হাজার বছরেরও অতীতে তার মূলসূত্র আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত পলি মাটির দেশ এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের অস্তিত্ব সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই। নদীর প্রবাহের সাথে এই বাংলাদেশের প্রাণের একটি সম্পর্ক রয়েছে। নদীবাহিত পলিমাটিতে গড়া এ দেশের নিম্নাঞ্চল; নদীর পানিতে বাহিত পলিসিঞ্চনে এ দেশের মাটির উর্বরতা সৃষ্টি হয়েছে। নদীমাতৃক কৃষিভিত্তিক এই বাংলাদেশের মানুষের কথা বলতে গেলে তাই নদীর কথাই প্রথমে বলতে হয়। সেজন্যই বঙ্গবন্ধুর কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন—'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান/ ততদিনে রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিব রহমান।' বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবন যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত সে কথাটি এখানে বলা হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের পেছনে বঙ্গবন্ধুর অবদান যে অবিস্মরণীয় সে কথা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির অন্তরে যে স্বাধীন জাতিসত্তার স্বপ্ন বহুকাল ধরে ক্রমে একটি অবয়বের রূপ ধারণ করতে শুরু করেছিল তারই বাস্তব রূপায়ণ আজকের বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু যে রূপাবয়ব আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ এক সময়ের আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং লক্ষ্যমুখী অবিচলিত নেতৃত্বের নির্দেশনা। ব্যক্তিমানুষের চিন্তা-ভাবনা-স্বপ্ন নির্দিষ্ট দিকাভিমুখী হওয়ার জন্য যেমন সুদীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন তেমনি একটি ভূখণ্ডের মানুষের মনোবাসনা ও বাস্তব জীবনধারার মধ্যে

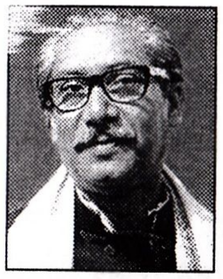
সার্বিক সমন্বয় ও নির্দিষ্টতার জন্যও প্রয়োজন সযত্ন প্রয়াস ও সচেতন নেতৃত্ব। আজকের বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান এ প্রসঙ্গেই স্মরণযোগ্য। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক বিবেচনাসমূহ এবং জাতিসত্তার ধারণাবলী ক্রমশ এ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে থাকে। এ চেতনাবোধ থেকেই পরবর্তীকালে সূচিত হয় স্বাধীনতার আন্দোলন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম। এ আন্দোলন ও সংগ্রাম নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ, দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজাত শ্রেণী ও সামন্ত-আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা, একেবারে প্রথম থেকেই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বই যে কেবল ব্যবধানের প্রধান বিষয় ছিল—তা নয়, বরং শাসনক্ষমতায় পূর্বাঞ্চলের বাঙালির প্রবেশাধিকার ছিল একেবারেই সীমিত। স্বাভাবিভাবেই বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল তারা। সে কারণেই যে বাঙালি তরুণ ও যুবকরা ভারত বিভাগের মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্জনের লক্ষ্যে মাত্র কিছুকাল আগেও অদম্য শক্তিতে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাদের অনেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের এক বছরের মধ্যেই ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অযৌক্তিক আচরণ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই তরুণ যুবকদেরই একজন। সেদিন ইচ্ছা করলেই তিনি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সামিল হয়ে পার্থিব সম্পদ-বৈভবের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তা করেননি। তিনি যে তা করেননি তা কোনো আপতিক ঘটনা ছিল না। বস্তুত কৈশোরকাল থেকেই এ দেশের জনমানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছিলেন তিনি; সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন তাদের একজন হিসেবে। মানুষের প্রতি ভালোবাসার অঙ্গীকার ছিল তাঁর জীবন ও কর্মসাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ভালোবাসাই আমৃত্যু তিনি বহন করে চলেছিলেন তাঁর হৃদয়ে। আর সে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে।

কিন্তু শুধু দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা কোনো মানুষকে মহৎ অর্জনের লক্ষ্যে সফল করে তুলতে পারে না। রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণ করতে গিয়ে তিনি খুবই সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে,

বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজন তা হালো বাংলার স্বাধীনতা, বাঙালির স্বাধীনতা। বস্তুত পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে প্রায় পঁচিশ বছরকাল অতিবাহিত করার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিনিয়তই অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন নিজেকে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কখনোই জনসম্পর্কহীন তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে অর্জিত হয়নি। তিনি জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন একান্ত নিবিড়ভাবে। একই সাথে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। যখনই সঙ্কট ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তখনই সীমাহীন সাহস নিয়ে তার মোকাবিলা করেছেন এবং সে মোকাবিলার জন্য যে জনসমর্থনের প্রয়োজন ছিল তা সংগঠিত করেছেন। এ ভূমিকায় তিনি এজন্যই অনন্য যে, কপটাচারের আশ্রয় তিনি কখনো গ্রহণ করেননি, জনমানুষের কাতার থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি নিজেকে, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নিজের সাহসী দৃঢ় অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াননি একবারও। অন্যদিকে, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে এ দেশের মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি করা, সে চেতনাকে উজ্জীবিত করা এবং তার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সংগঠিত করা যে কত সুকঠিন ছিল সে কথা আজকের দিনে আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এ চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা যে অনন্য ও অবিসংবাদিত, তারই প্রতিধ্বনি ঘটেছে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্যে : However, this emerging sense of distinctiveness between the people fo East and West Pakistan did not automatically evolve into a sense of national identity because the Bangalis of Pakistan still thought of themselvers as Pakistanis. It needed a major political effect to weave together these various nations of separateness within the consciousness of the Bangalis into a shared nationhood. Whilst a number of historic political figures such as H.S. Suhrawardy, Sher-e-Bangla Fazlul Haq and Moulana Bhashani played a vanguard role in the political struggles of people of Bangladesh, the catalytic act of political enterpreneurshop needed to forge a sense of nationhood for the Bangalis was provided by Bangabandhu Sheikh Mujibur.

From the period in 1966 when Bangabandhu launched the 6-point Progammed down to the defining two-year period from March 1969 to 1971 in the course of an election campaign of unique historical significance, Bangabandhu played a dominant role inthe struggle of self-slue for the Bangalis. In this task he was reinforced by the dedication of his senior colleagues as well as younger activists, in the Awami League as well as other secular political forces, not to mention individuals within and outside politics. But all these forces were brought and had to be kept together by Bangabandhu during the two-year period for the political campaign from 1969 to 1971 to ensure that any division amongst the Bangalis could not be used by the Pakistani elite to deflect the demand for self-rule for Bangladesh.

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে দৃঢ়মূল করার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু তার দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তার মাধ্যমে সে চেতনাকে রাষ্ট্রগত বাস্তব রূপদানের প্রক্রিয়ায়ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গবন্ধু বাঙালির এই অবিনাশী আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে-আন্দোলনে যে একত্ম ছিলেন সে কেবল রাজনৈতিক অভিলাষ বা উচ্চাভিলাষের কারণে নয়; তিনি নিজেও ছিলেন মনেপ্রাণে এই বিকাশধারার একটি অংশ, একটি বিকিরণশীল প্রত্যয়।



সুফিয়া কামাল

আমার দেখা মুজিব

শেখ মুজিবর রহমান যখন 'বঙ্গবন্ধু' হয়নি, বলা যেতে পারে তার কিশোর বয়স থেকেই আমি তাঁকে জানি। সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁকে প্রথম দেখি কোলকাতায়। তখন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সে। রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর খ্যাতি তখন তুঙ্গে, সেই সময় থেকে ছাত্রকর্মী-ছাত্রনেতা হিসেবে মুজিবুর রহমানকে আমি চিনি আজীবন। নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন মুজিবুর রহমান। কিন্তু আমার কাছে আমার ছোট ভাইয়ের মতনই ছিল সে। বরাবার আমাকে 'আপা' বলে সম্বোধন করেছে। কাছে গেছি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি, তারপর একই পাড়ায় থাকার কারণে মুজিবের সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতন গড়ে উঠেছিল।

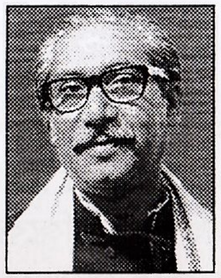
মুজিবের কথা বলতে গেলে মুজিবের স্ত্রীর কথাও বলতে হয়। এত ধৈর্যশীল, এত শান্ত, এত নিষ্ঠাবতী মহিলা খুব কমই দেখা যায়। বছরের বারো মাসের মধ্যে বেশিরভাগ সময় মুজিবের কেটেছে জেলে। যখনই শুনেছি মুজিবকে ধরে নিয়ে গেছে—ছুটে গিয়েছি। দেখেছি মুজিবের স্ত্রী অবিচল মুখে কাপড়-বিছানা-বালিশ গুছিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। বলেছে আপনার ভাইতো জেলে গেছে। বেচারি ধৈর্যের সাথে সংসারটাকে টেনেছে। বাবাকে জেলে নিয়ে গেছে বলে কোনো স্কুলে হাসিনাকে ভর্তি করবে না—এমনও দিন গেছে। নারী শিক্ষামন্দিরে আমরা তাকে ভর্তি করিয়ে নিলাম। তখন নারী শিক্ষামন্দিরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম আমি। একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে পায়ে হেঁটে হেঁটে মুজিবের সাথে গিয়েছি শহীদ মিনারে ফুল দিতে। মুজিব বলেছে আহ্ আমার বোনটা, আমার আপাটা এরকম করে হেঁটে যাবে? আপা আপনি

হেঁটে যাবেন না। আপনি রিকশায় যান। আমরা হেঁটে যাই। আমি বলেছি, না ভাই। আমি হেঁটে গিয়ে মিটিং-এ যোগ দিয়েছি। আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মুজিব সব সময় আমাকে বড় বোনের মতন আগে আগে সাথে রেখেছে। রাস্তায় দেখা হলে গাড়ি থামিয়ে বলেছে, আপা শিগগির আসেন—গাড়িতে আসেন। আমি বলেছি, না ভাই এইটুকুন পথ তো—এইখান থেকে এইখানে হেঁটে যেতে পারব। কিন্তু মুজিব বলেছে, না আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। ড্রাইভারকে বলেছে, আমার বোনকে আমার বোনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আস। মুজিবের বাড়িতে গিয়েছি। শত মিটিং হলেও মুজিব এসে বলেছে, আপনি এসে আমাকে খবর দেন কেন? আপনি সরাসারি আমার কাছে চলে আসবেন। আপনি এসে কেন নিচে বসে থাকেন। আমার বাড়ি আপনার বাড়ি। আমি আপনাকে বড় বোন বলে মনে করি।

মুজিব প্রতিদিন ভোরবেলা তাঁর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে এক চক্কর দিত। একদিন আমাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে বলল, গতকাল মনে হলো আমার বাড়িতে তো পিঠা হচ্ছে। আপাকে একটা ডাক দেব নাকি? কিন্তু অত ভোরে আপাকে আর ডাক দিলাম না। এই পর্যন্ত তার একটা আন্তরিকতা ছিল আমাকে নিয়ে পিঠা খাওয়াবে।

আমার মেয়ের স্বামী আবদুল কাহহার চৌধুরী চাটগাঁ রেডিওর অফিসার ছিল। একাত্তর সালে পাকবাহিনীর হাতে মারা যায়। দেশে ফেরার পর মুজিব এ ঘটনা শুনল। বলল, কই দুলু কোথায়? আমার মেয়ে বিধবা হলে যে রকম কষ্ট পেতাম সে রকম কষ্ট বোধ করছি। দুলু যা চায় আমি ওকে সব দেব। আমি বললাম, হাজারো মানুষ এরকম গেছে। আমার জামাই গেছে। তার জন্য শুধু দোয়া করো। মুজিব আবার বলল, আপা আমি আপনার কাছে হাত জোর করে বলছি, আপনি বলেন দুলুকে আমি কি সাহায্য করতে পারি। আমি বললাম, ভাই রক্তের বিনিময়ে আমার মেয়েকে কিছু দিতে হবে না। দেশের হাজারো মেয়ের মতো আমার দুলুও বিধবা হয়েছে। অনেক বিধবা তো আমার আশ্রয়েই রয়েছে। ওদের জন্য শুধু দোয়া করো। তারপর সে যখন রাষ্ট্রপতি হলো, আমাকে বলেছে, এবার এসে আমাকে দোয়া করে যান। গাড়ি পাঠালাম। আমি গেলাম। ঐ প্রথম যাওয়া। ঐ শেষ যাওয়া আমার প্রেসিডেন্ট হাউসে। তখন বাকশাল গঠিত হয়েছে। মুজিব বলল, একটা লোক পাচ্ছি না—যাকে বাকশালের ভার দেব। আপা, আপনি যদি রাজি হন তবে বাকশালের সভানেত্রী হয়ে থাকেন। আপনি যে রকম বলবেন, সে রকমই হবে। আমি বললাম, ভাই রাজনীতি না। আমাকে মাফ করো। এই

আমি বাকশালে গেলাম না। কিন্তু যখনই কোনো মিটিং হয়েছে, আমি মুজিবের সাথে গিয়েছি। তারপরে বলেছে আওয়ামী লীগের মহিলা কমিটি করে সেখানে আপনি সভানেত্রী থাকুন। সবসময় আমাকে সে সম্মানের পদ দিতে চেয়েছে। আমি বলেছি, ভাই রাজনীতির মধ্যে আমি পারব না। রাস্তায় নামতে পারি কিন্তু রাজনীতির কোনো সংশ্রবে আমি থাকব না। তখন মুজিব বলেছে আপা আপনাকে আমি মাথায় করে রাখব না আপনাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করবো? আমি আপনার কাছে মিনতি করছি। আমি বলছি, ভাই আমিও মিনতি করছি। ধানমণ্ডিপাড়ায় মুজিবের আগে আসি আমি। তাকে গ্রেপ্তারের সময়গুলোতে তার ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার বউ একটা বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এই দুর্দশার ভেতর দিয়ে মুজিবুর রহমান নেতা হয়েছে। মুজিবের ত্যাগের কোনো সীমা নেই। তার নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে কতখানি ভালোবাসত তার পরিমাপ কোথাও নেই। মানুষের জন্য মমত্ববোধ আত্মার একটা টান তার ছিল। আজকের দিনে তার মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার পলায়নি মনোবৃত্তি ছিল না। যেখানে সংকট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত 'মুজিব' ভাই লাফিয়ে পড়ে একাই দেশকে স্বাধীন করেছে। বাঙালির হাতে মুজিব হত্যা হয়েছে। এই বাঙালি জাতির সেই পাপের, সেই গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে, আমি জানি না। মুজিবকে আমি সারা অন্তর দিয়ে এখনো উপলব্ধি করি। সে যা দিয়ে গেছে—সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলায় এখন যারা আগুন জ্বালাচ্ছে, তাদের ধিক্কার দেয়ার মতো ভাষা আমার নেই। মুজিবের দেশপ্রেমের আর্দশ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপ্ত হোক—এই প্রার্থনা করি আমি আল্লাহর কাছে।



সেলিনা হোসেন

মৃত্যুঞ্জয় মুজিব

উপরের শিরোনামটি আমার শ্রদ্ধার মানুষ আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কাছ থেকে নেয়া। শুরুতেই তার কাছে আমার ঋণ স্বীকার করি। আমার মনে হয়েছে মুজিবের নামের আগে 'মৃত্যুঞ্জয়' শব্দটির মতো আর কোনো শব্দ গভীর অর্থ নিয়ে প্রযোজ্য নয়।

আগস্ট তার মহাপ্রয়াণের মাস। এ মাস তিনি বুকে গুলি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। পেছন ফিরে তাকাননি—গুলির জন্য পিঠ পেতে দেননি। ভয় পাননি। মৃত্যু ছিল তার কাছে এমনই অনায়াস, এমনই তুচ্ছ। যারা তাকে হত্যা করেছিল তারা বুঝতে পারেননি যে মুজিবের শরীরকে পৃথিবী থেকে সরানো যায়, কিন্তু ইতিহাস থেকে যায় না।

আগস্ট মাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি আশি বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন। তারপরও কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই দুই মৃত্যুর কারণে বাঙালির কাছে এ মাস এক বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত। এ দুজনের একজন বাংলা ভাষার অমর কবি। অন্যজন বাংলা ভাষার একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। দুজনকেই আমাদের আগামী দিনগুলোতে স্মরণ করতে হবে, আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে।

মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি অবধারিত সত্য। প্রশ্ন হলো কে কিভাবে নিজের কর্মফলকে পুণ্যের ঘরে উঠিয়ে দিয়ে মৃত্যু জয় করেন। যার যার কর্মফলই তাকে নিয়ে যায় নির্ধারিত গন্তব্যে। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্নের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির গৌরবে

পৌঁছে দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় এবং মহৎ কর্মফল একজন মানুষ তার এক জীবনে অর্জন করতে পারে না। সে কারণেই তিনি আমাদের জীবনে মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমরা কি তাঁকে যথাযথ সম্মান দিতে পেরেছি?

তাঁর মৃত্যুর একুশ বছর ধরে তিনি এ দেশের জাতীয় গণমাধ্যমে নিষিদ্ধ ছিলেন কেন? কি তাঁর অপরাধ? দোষে-গুণে, ভালো-মন্দে মিলিয়ে তিনি তো একজন মানুষ। তার কিছু ভুল হতেই পারে। কিন্তু সে ভুলের তুলনায় তার পুণ্যকর্ম হাজার গুণ বেশি। এ জাতির জন্য তিনি যা করেছেন হাতেগোনা কয়েকজন মানুষই তা করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিবিপ্লবী শক্তি, সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নৃশংস খুন হয়েছিলেন বলেই কি তাঁর প্রতি আমাদের এই আচরণ? ভারতে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীও দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে শাসকগোষ্ঠী তাকে জাতির পিতা থেকে খারিজ করে দেয়নি। তাকে তার অবস্থানে রেখে যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রেখেছেন। কি শাসকগোষ্ঠী, কি জনগণ কেউ তার অবমাননা করেনি। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাতচল্লিশের দেশভাগের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, এখন থেকে আমরা সবাই পাকিস্তানি। বাঙালিরা সেটা মানতে পারেনি। কিন্তু অন্যরা মেনেছে এবং পাকিস্তানিদের কাছে তিনি এখন পর্যন্ত কায়েদে আযম এবং জাতির পিতা। তাহলে আমরা এমন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলাম কেন? আমরা তো জারজ সন্তান নই। আমাদের প্রত্যেকেরই পিতার পরিচয় আছে।

আমরাতো সবাই জানি দেশটা স্বাধীন হয়েছিল বলেই আমাদের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই আমরা সুবিধাভোগীর কাতারে উঠেছি। প্রত্যেককে হিসাব করে দেখতে বলি, এখন পর্যন্ত আমরা যদি পাকিস্তানের পদানত থাকতাম তাহলে প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থান কোথায় থাকতো? এমনওতো হয়েছে যার কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না সে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। আমার ছোট ভাই যে ফার্মে কাজ করতো তার পাঞ্জাবি বস তাকে সামনের চেয়ারে বসতে দিতো না। আমরা কেন এত দ্রুত ভুলে যাচ্ছি আমাদের নিকট অতীতকে?

'বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ বছরের দৈনন্দিন কর্মতালিকা দলিল' নামে একটি বই সম্পাদনা করেছেন প্রাবন্ধিক, গবেষক শাহরিয়ার ইকবাল। তিনি তার 'সম্পাদকের বক্তব্য' অংশের দ্বিতীয় প্যারায় লিখেছেন, "কখনো আবার বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন নিজ নিজ দেশের

সরকারপ্রধানের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে। কখনো বিদেশী মন্ত্রীরা আসতেন আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নিজ দেশের সরকারপ্রধানের কোনো প্রস্তাব বা পরামর্শ নিয়ে। একবার রাষ্ট্রাচারের (প্রটোকলের) সকল নিয়ম ভঙ্গ করে মধ্য রাতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মিশর ও আলজেরিয়ার দুই রাষ্ট্রপ্রধান আনওয়ার উস্ সাদাত ও হুয়ারি বুমেদিন। উদ্দেশ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের সাথে কয়েক ঘণ্টার জন্য পরামর্শ করা। আরও এসেছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার মহানয়াক যোসেফ ব্রোজ টিটো। উল্লেখ্য, এই নতুন দেশটির নেতা শেখ মুজিবকে একবার নিজ চোখে দেখা ও পরিশেষে সকল প্রকার সহায়তার আশ্বাস দান। আরও অনেক নেতা এসেছিলেন সে সময়ের বাংলাদেশে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গাট হুইটলাম, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ দাউদ। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোও লোভ সামলাতে না পেরে একদিন সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তার স্বপ্নের মুসলিম বেঙ্গল-এর মাটিতে। উল্কার বেগে এসে ভুট্টো সাহেব দেখলেন তার কল্পনার মুসলিম বেঙ্গল সত্যি সত্যিই 'বাংলাদেশে' পরিণত হয়েছে। যার অবিসংবাদিত নেতা তার সেই চেনা মুখ-শেখ মুজিব।" গবেষক শাহরিয়ার ইকবাল তার বইয়ে যে সময়ের কথা বলেছেন সে সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর সহকারী একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাগুলো বলা। তিনি আরো বলেছেন, 'বাঙালি জনজীবনের তিনি ছিলেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সরকারি অবস্থান কেন্দ্র গণভবনে প্রতিদিন ভিড় জমাতেন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত অগণিত মানুষ। বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রয়োজনে যেতেন। সাধারণ নাগরিক যেতেন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের আশায়। মন্ত্রীরা যেতেন পরামর্শের জন্য। আমলারা নির্দেশ গ্রহণের জন্য।' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ নিয়ে এই দেশটির অন্তহীন সমস্যার সমাধান ছিল দুরূহ এবং কঠিন। তারপরও বহির্বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর এমন একটি ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতার এত অল্প সময়ে সেটা ভাবাই কঠিন। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের প্রশ্ন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেশটির প্রতিষ্ঠা—এই দ্বিমুখী দায়িত্ব পালনে বঙ্গবন্ধু কতটা সফল হয়েছিলেন ইতিহাসই সে প্রশ্নের উত্তর দেয়। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের ক্ষমতা পালন শেষে যারা বঙ্গবন্ধুর ছবি ভেঙে ফেলার মহোৎসবে মেতে ওঠে তাদেরকে নিজের ইতিহাসের দিকে ফিরে

তাকাতে বলি। কেন আমরা তাঁকে দলীয় নেতার ঊর্ধ্বে শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে স্থাপন করে স্বাধীনতার প্রতীকে রূপান্তরিত করতে পারবো না? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, ছবি ভাঙার ব্যাপারে তারা একটি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পত্রিকার খবর ছিল এমন : 'আইন-শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কাউন্সিল কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিটি এ ধরনের বে-আইনি কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছে।' *(প্রথম আলো : ২০.৭.০১)*।

আজ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। পিছুহটার সুযোগ নেই। দৃঢ়চিত্তেই পরিস্থিতি শান্ত করতে হবে এবং বলতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে আমাদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ আমার দায়িত্ব। তোমার দায়িত্ব। যারা বিভ্রান্ত করে, বোঝাতে কত সময় লাগবে জানি না। কিন্তু সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকা যাবে না। আমরা তো একটু একটু করে এগোচ্ছি। আইন করে যে হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করা হয়েছিল, তার বিচার হয়েছে। রায় হয়েছে। সময়ই এগিয়ে আনে সময়। গভীর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করলে এ সময়ও আসবে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হবে। এই বিচারকাজ সম্পন্ন হলে সমাজ থেকে একটি অন্যায় দূরীভূত হবে এবং এমন প্রত্যাশা করা যায়, যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে বিচার প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষ ন্যায়বিচার পাবে। এই ন্যায়বিচারের প্রার্থনা হোক আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য।

বঙ্গবন্ধুর কাছে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের আসার কথা শাহরিয়ার ইকবালের লেখা থেকে জানা যায়। ঘটনাগুলো জানা তাঁকে মূল্যায়নের একটি উৎস। সে সময়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন এবং বাস্তবায়নের কার্যক্রম জানার কৌতূহল ছিল তাদের ভেতরে, এটুকু বললে কম বলা হবে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব এবং একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতাই তাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরও তাঁর নাম উচ্চারিত হয় দৃষ্টান্ত হিসেবে এবং উচ্চারিত হয় পৃথিবীর আরও অন্যান্য বড় বড় মনীষীদের সাথে। এভাবেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় দেশের ইতিহাসে এবং বাইরের জগতেও। ২০০১ সালের ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শান্তির পক্ষে সম্মেলন।

এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল এসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস। এশিয়ার ঊনত্রিশটি দেশের সংসদ সদস্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একই সাথে এই সম্মেলনে সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুশীলসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমিও একটি আমন্ত্রণ পাই এবং সম্মেলনে যোগদান করি। উজবেকিস্তানের প্রতিনিধি তার বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তিনি ছিলেন শান্তির পক্ষে সোচ্চার একজন ব্যক্তিত্ব। আজকের এই সম্মেলনে আমি তাঁকে স্মরণ করছি।

পরদিন কিংডম অব টোঙ্গা থেকে আগত প্রতিনিধি একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়েন । এখানে তিনি বলেন, I have dream of the Pacific Island and its peolple as the people of peace, as a rejections fo peace and the Pacific as our ocean of peace if the Exclusive Economic Zone (EEC) is acceptable globally, why out an Exclusive Zone for Peace (EZP), why not, if we agreed, to start peace within ourself and between yourself, and let our fellow human being not only feel, but experience the wave of peace through the new currents of the Pacific, the current of peace, why not give solidarity to the Pacific way-a concept based on tolerance, and understanding, unity in diversity and respect for one and all.

পরে তিনি বলেছেন, এটা অনেকের কাছে স্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু এখন শুধুই স্বপ্ন নয়। পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক এ স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন—"Jefferson, Adam, Madison, Benjamin Franklin, and many others this dream and look at the United States of America—Martin Luther King, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman of Bangladesh had this dream, and though it cost their life, we live in a world of more freedom and greater peace because of their supreme sacrifice."

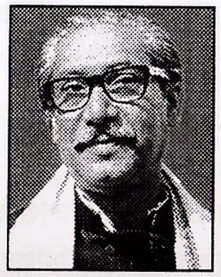
প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ কিংডম অব টোঙ্গা'র একজন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য যে সর্বোচ্চ ত্যাগের কথার উল্লেখ করেন, তখন বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মফল নিয়ে এমন ছোট ছোট দেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। নিজের জীবনকে অন্যের কাছে উদাহরণ হিসেবে তৈরি করা

সহজ কথা নয়। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই তিনি জাতির কাছে মৃত্যুঞ্জয়।

আসুন, আমরা তাঁকে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখি। আমরা তাঁর অবমাননা করবো না। তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, সাহস এবং শৌর্যের প্রতীক। যে জাতির জাতীয় বীর নেই সে জাতির আত্মার শূন্যতা থাকে। আমরা তেমন জাতি হতে চাই না। আমরা শূন্যতার ঊর্ধ্বে উঠতে চাই।

আসুন আমরা সবাই প্রয়াত রমেশ দাশগুপ্তের ভাষায় বলি :

যেমন জাগরুক সালভাদর আলেন্দে চিলিতে
ওরাফ পালমে সুইডেনে
সামোয়া মাচেল মোজাম্বিকে
বাংলাদেশে শেখ মুজিব।



সৈয়দ শামসুল হক

আজ এক কণ্ঠে 'জয় বাংলা' বলবার দিন

আঙিনায় বটবৃক্ষ হয় না। বটবৃক্ষের জন্য চাই তার পায়ের নিচে বিশাল প্রান্তর, মাথার উপরে অসীম আকাশ, আর চাই সূর্যের উদার আলোকসম্পাত। বাংলার শ্যামল প্রান্তর বড় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিল এক মহামুনি বটবৃক্ষের জন্য। বাংলার ইতিহাস হাজার বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল এক মহানায়কের জন্য। শৃঙ্খলিত বঙ্গজননী শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করেছিলেন তার সেই সন্তানের জন্য যিনি দুঃখের সমস্ত তিমির বিদীর্ণ করে সূর্যের মতো উদিত হবেন।

আমাদের এই বিশাল শ্যামভূমির সেই মহামুনি বটবৃক্ষ, আমাদের ইতিহাসের সেই মহানায়ক, আমাদের দীর্ঘ অমবস্যা শেষে উদিত সেই সূর্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলীসহ তেরোশত নদী থেকে জাগরিত পলল মৃত্তিকার এই বাংলাদেশ, প্রায় সাতান্ন হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত বিশাল এই বাংলাদেশ, কোটি কোটি অগণন মানুষের নাড়ি পোঁতা এই বাংলাদেশ।

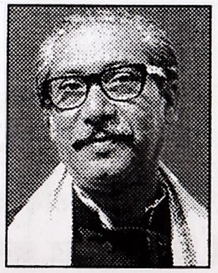
এত বিশাল একটি ভূমি জুড়ে, এত কোটি কোটি মানুষকে, এক সূত্রে, এক মন্ত্রে, এক সংকল্পে যিনি হাজার বছরের ভেতরে প্রথম গ্রোথিত করতে পেরেছিলেন, শৃঙ্খল মুক্তির যুদ্ধে প্রাণিত করেছিলেন এবং বিজয় এনে দিয়েছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই রাষ্ট্রের স্থপতি তিনি। এই জাতির জনক তিনি, বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। 'জয় বাংলা' রণমন্ত্রে যুদ্ধের সে সূচনা, যে রণহুঙ্কার যুদ্ধের বিজয়কে করে নিস্পিত; যে জয়ধ্বনি রাষ্ট্রকে গণমানুষের প্রকৃত একটা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতীক হয়ে আছে

ও থাকবে, সেই 'জয় বাংলা'র উদ্গাতা পুরুষকে অভিবাদন।

পাল যুগ পূর্বে থেকে ব্রিটিশবিরোধী শত-সহস্র বিপ্লব, বিদ্রোহ, যুদ্ধ হয়েছে আমাদের ভূখণ্ডে—স্বাধীনতার জন্য, জননীর শৃঙ্খলমোচনের জন্য; কিন্তু এ সবই ছিল খণ্ডিত; ক্ষুদ্র; ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে ব্যর্থ পরাজয়ে খিন্ন। কত বীর, কত যোদ্ধা, কত সন্তান প্রাণ দিয়েছে—তাদের রক্তে আজও ভিজে আছে বাংলার মাটি। সেসব বিপ্লব-বিদ্রোহ-যুদ্ধের রক্ত ভেজা খণ্ড খণ্ড অঞ্চলকে বিশাল ভূমিতে পরিণত করে, বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি মানুষকে একটি মানুষে পরিণত করে, একাত্তরের যুদ্ধে পাঠিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধু এ জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করেন, তাই তিনি জাতির জনক। এবং নিজের বুকের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেন তিনি বঙ্গজননীর শ্যামল আঁচলে, বাংলার মাটিতে। বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তার শেষ আঘাত হানে বাংলারই শ্রেষ্ঠ সন্তানের বুকে; কারণ তারা জানে, বাঙালির এ বিজয় আর কখনোই পরাজিত হওয়ার নয়। মানুষের মৃত্যু হয়, স্বপ্নের মৃত্যু হয় না। নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে যায় আদর্শ অবিনশ্বর হয়ে থাকে। বাংলার মাটিতে এরই প্রমাণ আমরা দেখেছি ১৯৯৬ সালে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী সংগ্রামী চেতনায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক প্রত্যাবর্তনে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, জাতির জনকের রাষ্ট্রস্বপ্ন বাস্তবায়নে, মানুষের কর্মিষ্ঠ বাহুতে শক্তি ও সংকল্পের পুনরুত্থানে।

এ জাগরণকে ধরে রাখতে হবে। এ বাহুকে কর্মে নিযুক্ত রাখতে হবে। লাখ লাখ মানুষের রক্তের সাথে মিশে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর রক্ত ভেজা এ মাটিকে মানুষের জন্য প্রকৃত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আজ এ শপথ নেয়ার দিন। শোক থেকে আজ এ সংকল্প নেয়ার দিন। 'জয় বাংলা'কে প্রান্তরে প্রান্তরে জনপদে জনপদে আজ ধ্বনিত করার দিন।

তেরো কোটি কণ্ঠ আজ এক কণ্ঠে 'জয়বাংলা' বলার দিন।



হারুন হাবীব

শেখ মুজিব : বাঙালির অস্তিত্বের আশ্রয়

কিছু মানুষের নাম থাকে, যা অবিনশ্বর হয়ে টিকে থাকে। হয়তো কবর উপেক্ষিত হয়। এসব নামকে হৃদয়ের মমতা থেকে উপেক্ষা করার শক্তি কারও হয় না—যদিও সমসাময়িক ব্যক্তি বা রাজনীতির স্বার্থে অনেকেই তা করার মূর্খতা দেখান। এ নামগুলো কবরের সীমানা পেরিয়ে, কালের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে, সোচ্চার এবং শক্তিধর হয়ে ঘরবাড়ি, মাঠঘাট, কল-কারখানা, বিদ্যালয়, ব্যবসাকেন্দ্র, সড়ক, মহাসড়ক এবং মহাকালের অস্তিত্বে টিকে থাকে। এ নামগুলো মহাপুরুষের। এ মহাপুরুষরা যে কীর্তি রেখে যান—সেই কীর্তিকে অস্বীকার করার জো থাকে না আমাদের। যদিও কখনো কখনো চলতি রাজনীতি স্বার্থে আমরা আত্মপ্রবঞ্চক বা আত্মঘাতী পর্যন্ত হই সেই শাশ্বত কীর্তিকে উপেক্ষা করতে।

শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' নামে উচ্চারিত না হলে যে নামের উচ্চারণ প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বাঙালির জন্য তেমনি এক নাম। এ নামকে যেমন জোর করে প্রতিষ্ঠা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না, তেমন জোর করে মুছে দেয়াও সম্ভব নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন যেমন, চীনের মাও সেতুং যেমন, ভিয়েতনামের হো চি মিন যেমন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী যেমন, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন যেমন, আফ্রিকার প্রথম মুক্ত উপনিবেশ ঘানার মিট্রিস লুমাম্বা আর কওমি নক্রমা যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা যেমন, নামিবিয়ার ম্যাম নওমা যেমন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন যেমন, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো যেমন—বাংলাদেশের তেমন শেখ মুজিব। নামে এঁরা এক না হলেও কীর্তিতে এঁরা এক, গৌরবে এঁরা ভাস্বর। যে নাম শেখ

মুজিব—সে নামের সাথে মিশে আছে বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশ। জাতি হিসেবে বাঙালিদের জন্য ইতিহাসের প্রথম দেশ বাংলাদেশ, যার স্থপতি টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের যে বাঙালি জাতি, কখনো বিচ্ছিন্ন পরাজিত, কখনো জাতিসত্তা অন্বেষণে বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত, সেই বাঙালির জন্য প্রথম স্বাধীন-সার্বভৌম আবাসভূমির স্থপতির নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এ নাম শত্রুর কাছে যেমন সত্য, তেমনি সত্য মিত্রের কাছে; না হয় কখনো আমরা তা বলার সৎসাহস দেখাই—কখনো দেখাই না।

অনেক সীমাবদ্ধতা আর ব্যর্থতা নিয়েও শেখ মুজিব মহান এবং শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের একজন, যিনি তাঁর শ্রম, মেধা আর ত্যাগে পাকিস্তানের কঠোর সামরিক স্বৈরাচার, ধর্মীয় মিথ্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীকে দুর্বার অধিকার সচেতন করেছিলেন। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনি শুধু শুরু করেননি, সেই আন্দোলনকে তিনি বেগবান করেছিলেন, অপ্রতিরোধ্য করেছিলেন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাঝে শেষ করেছিলেন অভাবিত সাফল্য। ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত শেখ মুজিব এক হয়ে গিয়েছিলেন বাঙালির মানস আর বাংলার মাটিতে। শেখ মুজিব হয়েছিলেন বাংলা ও বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার নাম, না হয় আজ সে ইতিহাস কেউ জানতে চাই—কেউ চাই না।

সাহিত্য, শিল্প আর দর্শনে বাঙালিকে প্রথম বিশ্বনন্দিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তীতে হয়েছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী বাঙালি অগ্নিপুরুষ। এরপর একমাত্র এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালিদের জন্য যিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামো বিনির্মাণের মূল কারিগর হওয়ার গর্ব ধারণ করে যাবেন অনন্তকাল। সবশেষে সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন, আরেক ক্ষণজন্মা বাঙালি, যিনি প্রায়-সমসাময়িক ছিলেন নেতা শেখ মুজিবুরের।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এক জাতি হয়েও বাঙালি কখনো এক হয়নি, হতে পারেনি। সুদীর্ঘ ইতিহাসে স্ব-শাসিত হওয়ার বড় বেশি সুযোগও ঘটেনি বাঙালির। ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সামাজিক কুসংস্কার, সঙ্কট, লোভ-দাসত্ব ইত্যাদি বার বার আঘাত করেছে বাঙালিকে। এক হয়ে মাথা তুলে তাই দাঁড়াতে পারেনি বাঙালি, স্ব-শাসিত স্বাধীন হওয়ার আশা তাই ম্লান হয়েছে দুর্ভাগ্যে। শেখ মুজিবই প্রথম সবল-সফল রাজনৈতিক পুরুষ, তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাধর নেতৃত্বে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বিকশিত করতে পেরেছিলেন আপাদমস্তক। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে তুলতে

পেরেছিলেন বলেই তাঁর নেতৃত্ব-শিল্পকলা বাঙালিকে এক আত্মা হয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে নামিয়েছিল গোটা জাতিকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সাথে রক্তাক্ত শেষ নিশ্বাসে প্লাবিত করেছে তাঁর পরিবারের প্রায় সকলকে। শিশুকে, বয়োবৃদ্ধকে, নববধূকে। এ হত্যাকাণ্ড যে বাঙালির ইতিহাসের বর্বরতম-নিষ্ঠুরতম এক হত্যাকাণ্ড এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বলার বিষয় তা নয়। মানুষ যখন জন্মায় তখন মৃত্যু তার অবধারিত। শেখ মুজিব যখন বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তখনও তিনি পাকিস্তানিদের হাতে প্রাণ দিতে পারতেন। মুক্তিযুদ্ধকালে যখন তাঁকে পাকিস্তানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল—তখনও তিনি প্রাণ হারাতে পারতেন অনায়াসে। এমনকি, ১৫ আগস্ট যখন ঘাতকরা তাঁর প্রাণসংহার করতে ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার আগেও তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে পারতেন। অতএব মৃত্যুটাই বড় নয়, বড় শেখ মুজিবকে হত্যার পেছনের কারণ, তার ফলাফল এবং পরবর্তীতে বেরিয়ে আসা থলের বিড়াল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের, এযাবৎ কালের শ্রেষ্ঠতম সফল পুরুষ, সন্দেহ নেই কোনো এ উচ্চারণে। কিন্তু স্বাধীনতার পর, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হিসেবে শেখ মুজিবের প্রশাসন, এও সত্য, বিতর্ক বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সুদীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের দিন পর্যন্ত রবীন্দ্র ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা শেখ মুজিবের সে আত্মা, যে আত্মা তাঁর অটুট থাকলেও সরকারপ্রধান শেখ মুজিবের কিছু অসফলতা বা অসম্পূর্ণতা ছিল এবং সেই ব্যর্থতাকে যে কেউ তুলে ধরার বা প্রতিবাদের অধিকার রাখেন বৈকি। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যার কারণ যে কোনো বিবেকবান বাঙালি মাত্রেই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশের প্রথম সরকারের ব্যর্থতা বা অসম্পূর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কৃতিশীলতাই নষ্ট করতে চায়নি, সেই সাথে ফুরিয়ে দিতে চেয়েছে রক্তার্জিত মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, বিজয় আর আদর্শ এবং আমি বলতে বাধ্য, তাদের সেই সুচারু-দক্ষ পরিকল্পনায় তারা সফলতা লাভ করেছিল, যতটুকু তারা ভেবেছিল হয়তো তার চেয়েও বেশি।

কোনো হত্যাই অভিনন্দনযোগ্য নয়, হওয়া উচিতও নয়। কোনো সংকট বা সমস্যারই হত্যার মাধ্যমে সমাধান খোঁজা উচিত নয় এবং তা সম্ভবও নয়।

অথচ মানুষ প্রায় বন্যপ্রাণীর মতোই এ সমাজ-সংসারে রক্তপাতের মাধ্যমে, হত্যার মাধ্যমে সমাধান খোঁজে। এ মূর্খতা থেকে মানুষ কবে মুক্ত হবে আমি জানি না, আদৌ হবে কিনা তাও জানি না, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো মানুষকে হত্যা এবং যে হত্যাকে নীরবে সমর্থন করে জাতি হিসেবে আমরা যে পাপ করেছি—তার বোধকরি শত প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ। ঐ মানুষটার মৃত্যু নয়, ঐ মানুষটির হত্যা বাঙালিকে প্রথমবারের মতো ঘাতক জাতিতে পরিণত করলো, ঐ হত্যা মুক্তিযুদ্ধের সাড়ে তিন বছরের মাথায় অগণিত মৃত্যু দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার অর্জনকে ভূলুণ্ঠিত করলো, ঐ হত্যা স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মাথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলো সেই উপেক্ষিত পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি, সেই সমাজনীতি, সংস্কৃতি চর্চা, আবার সেই ধর্ম দিয়ে, ধর্মের চাতুরি দিয়ে মানুষকে, মানুষের প্রগতিকে, বিনাশ করার সর্বনাশা সেই ঝড়, যাকে কবর দিয়েছিল একাত্তরে রক্তস্নাত বাঙালি প্রতিরোধ।

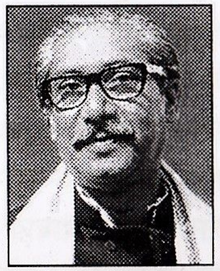
কেন তাহলে হত্যা করা হলো ঐ মানুষটিকে? যারা ঐ হত্যায় নিমরাজি ছিলেন, প্রগতিশীল মুক্তিযোদ্ধা হয়েও নীরবে খুশি হয়েছিলেন, প্রতিবাদ করতে মন চাইলেও সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেননি, আমার বিশ্বাস, সেই মানুষেরাও আজ অন্তত বুঝতে পারছেন—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড তাদের প্রিয় মুক্তিযুদ্ধকে, তাঁদের অর্জিত অসাম্প্রদায়িক জাত-চেতনাকে, তাদের লাখো ভালোবাসার শহীদের রক্তকে, সর্বোপরি বাংলা এবং বাঙালিত্বকে কোথায় নিয়ে আজ দাঁড় করিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ড করে বাংলাদেশ তৈরিরই প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ। জাতিগতভাবে এই আমরা, এই বাঙালিরা, এতোটাই অযোগ্য যে, আমরা না পেরেছি সেই হত্যাকাণ্ডকে বা পরবর্তীর আরও অগণিত হত্যাকাণ্ডকে প্রতিরোধ করতে, না পেরেছি হাজার বছরের বাঙালি-সাধনার ফসল মহান মুক্তিযুদ্ধকে, তার সম্মানকে, তার শহীদের রক্তকে, আশাকে, আদর্শ-বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করতে। আমাদের অযোগ্যতার সীমানা যখন পাহাড় সমান, জাতি হিসেবে আমরা যখন আত্মঘাতী বা লাঞ্ছিত হতেও লজ্জাবোধ করি না, তখন স্বাধীনতার মাত্র বিশ-একুশ বছরের মাথায় একাত্তরের ঘাতক দালালদের আবার আমরা মুখোমুখি দেখবো—এই তো স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু এতো হতাশার পরেও এতো ব্যর্থতার পরেও, আমি বিশ্বাস করি, নিঃশেষ হয়ে যাবেন না শেখ মুজিব আর সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালির বিকাশ অথবা এ জাতির আত্মরক্ষার তাগিদেই মুক্তিযুদ্ধকে যেমন আঁকড়ে ধরতে হবে, একাত্তরের ঘাতক দালাল আর নব্য স্বাধীনতাবিরোধী

মৌলবাদীদের হাত থেকে নিজেদের যেমন রক্ষা করতে হবে এবং আজ হোক কাল হোক স্ব-সম্মানে সেই আসনেই বসাতে হবে শেখ মুজিবকে, যে আসন গৌরবের এবং যে আসন তাঁরই প্রাপ্য। মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থীদের তৎপরতা বড় বাড়বে—যত তাদের শক্তি সঞ্চারিত হবে—তত দ্রুত আশ্রয় খুঁজতে হবে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তিকে মুক্তিযুদ্ধের কাছে এবং সেই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। আমি বিশ্বাসে দৃঢ় যে, অগণিত দলমতে বিশ্বাসী হয়েও, রাজনৈতিক দর্শনে নানামুখী ধারা বহন করেও সম্মান আর আত্মরক্ষার তাগিদেই বাঙালির বিভাজিত অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে আবার ফিরে যেতে হবে স্বাধীনতা-পূর্ব গণআন্দোলনে এবং আবার সেই একাত্তরে—যে একাত্তরের স্থপতি শেখ মুজিব এবং যে একাত্তর স্নাত লক্ষ বাঙালির রক্তে। বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বিভাজন উপেক্ষা করতে হবে এবং মৃত শেখ মুজিবকে হয়তো আবার ডেকে আনতে হবে পরিস্থিতির হাল ধরতে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর দলের নেই, তিনি জাতির এবং আমি এ কথাও আজ বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, ঐ মহাপ্রাণ ব্যক্তিটিকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে কোনো দলভুক্ত হওয়ারও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ নামে যার আস্থা, বাংলাদেশের হৃদয়ে যার বিশ্বাস, বাঙালির শাশ্বত জাত্যাভিমান পোষণ করে যে মানুষের হৃদয়—তার কাছেই শেখ মুজিব শ্রদ্ধার, ভালোবাসার, অহংকারের। যে বাঙালির হৃদয়ে দাসত্ব নেই, পরাধীনতা আর উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনায় লোভ নেই, সেই বাঙালিকেই আজ গ্রহণ করে নিতে হবে শেখ মুজিবকে। এই লোকটিকে শ্রদ্ধা জানাতে একজন বাঙালি হলেই যথেষ্ট—আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

এবং আমি দিব্য চোখে দেখছি, শেখ মুজিব আবার উঠে আসছেন টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে ১৭ বছরের বন্দি শয়ন থেকে। কেউ আমরা চাই বা না চাই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই কুর্ণিশ করতে হবে তাঁকে, না হয় বড্ড দেরিই হয়ে গেছে!



হাশেম খান

বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম। খুব কাছে থেকে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আর যে লোকটির কারণে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে পেরেছিলাম তাঁর নাম নূরুল ইসলাম। নূরুল ইসলাম তার কিশোর বয়স থেকে, সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, আওয়ামী লীগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন, অত্যন্ত কাছের লোক। আওয়ামী লীগের প্রচার কাজের সাথে দীর্ঘদিন তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোস্টার তৈরি করা, লিফলেট, পুস্তিকা ও বিভিন্ন রকম প্রচারকাজ মুদ্রণ, বিলি ও সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য একজন পারদর্শী ও সাহসী ব্যক্তিত্ব এই নূরুল ইসলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে যে সাড়া জাগানো পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল—তার রূপকার ছিলেন এই নূরুল ইসলাম।

প্রচার কাজে তার নিষ্ঠা ও কর্মোদ্দীপনার কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অনেকেই তাকে সম্বোধন করতেন 'পোস্টার নূরুল ইসলাম' নামে।

১৯৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি আমার ঠিকানায়—২৫ গোপীবাগ ৩য় গলির বাড়িতে। বললেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফার লোগো, পতাকা, প্রচারপুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার ইত্যাদি করতে হবে।

নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার তখন কোনো পরিচয় ছিল না। তবে ছাত্রলীগের অনেকের সাথেই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের কারণে—বিশেষ করে পোস্টার, ফেস্টুন ডিজাইন করা, ছবি আঁকা ইত্যাদির কারণে পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন—শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রব, আবদুর রাজ্জাক, শামসুজ্জামান খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, আবদুল আজিজ বাগমার, মাযহারুল ইসলাম বাকী প্রমুখ। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অসংখ্য পোস্টার এঁকেছি, তৈরি করেছি। পোস্টার আঁকা, পুস্তিকার প্রচ্ছদ কিংবা কোনো সভা বা অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি কারণে নূরুল ইসলাম যখন-তখন আমাকে কাজে লাগাতেন। হয়তো আন্দোলনের কাজে আমার আগ্রহ দেখে প্রচার কাজের বিভিন্ন শিল্পকর্মে তিনি আমাকে আস্থাভাজন মনে করতেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগের ফরমায়েশ অনুযায়ী নূরুল ইসলামসহ তার সাথে মিলেমিশে সেই ষাটের দশকে কত পোস্টার, ফেস্টুন যে এঁকেছি, ছবি এঁকেছি, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছি আজ তার হিসাব মেলানো কঠিন কাজ।

যা হোক, তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার সনদ আওয়ামী লীগের ছয়-দফা যা শিগগিরই ঘোষণা করতে যাচ্ছেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফা'র লোগো, পতাকার নকশা ইত্যাদি কাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমার মতো এক তরুণ শিল্পকর্মীকে এতবড় দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, আমি খুবই ভাবনায় পড়ি। নূরুল ইসলামকে বলেই ফেলি অনেক বড় বড় ও অভিজ্ঞ শিল্পী আছেন তাদের কাউকে দিয়ে কাজটা করালে ভালো হত না?

মুজিব ভাইয়ের সাথে সব কিছু আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছয় দফার এসব কাজ আপনিই করবেন। নূরুল ইসলামের পরিষ্কার জবাব।

প্রায় সাত-আটদিন অনেক নকশা এঁকে, জল্পনা-কল্পনা করে ছয় দফার লোগো, পতাকার নকশা, পোস্টার ও অন্যান্য শিল্পকর্ম দাঁড় করলাম। শেখ ফজলুল হক মনি ও নূরুল ইসলাম কাজগুলোসহ আমাকে নিয়ে একেবারে নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুখোমুখি। তৎকালীন হোটেল ইডেনের সামনের মাঠে সভার ব্যবস্থা করে ছয় দফা জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা দেয়া হবে। তার প্রস্তুতিপর্বের কাজের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন হোটেল ইডেনের বারান্দায় আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার সাথে বসে আলাপ করছেন। শেখ মনি ও নূরুল ইসলাম আমার আঁকা নকশা ও অন্যান্য শিল্পকর্ম তাঁর সামনে তুলে ধরল। এই প্রথম আমি বঙ্গবন্ধুর সামনে (তখন অবশ্য 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি), তাই খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার আঁকা

নকশা, পোস্টার ইত্যাদি তাঁর পছন্দ হবে তো? এরপর এখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য নেতা। তারা সবাই কী বলেন কে জানে!

বঙ্গবন্ধু পাইপ টানছেন আর নিবিষ্ট মনে একটি একটি করে নকশা দেখছেন। অন্যান্য নেতার সামনে নকশাগুলো ঠেলে দিচ্ছেন আর মৃদু ও গম্ভীর স্বরে বলছেন, হ্যাঁ, দেখেন।

আমার বুকে তখন দপদপ আওয়াজ। ঘাবড়ে যেয়ে রীতিমতো ঘেমে উঠেছি। কী বলেন কে জানে। নকশা ও ছবি যদি পছন্দ না হয়। শেখ মনি বলে উঠলেন, মামা, হাশেম ভাই নকশাগুলোর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। হাশেম ভাই, আপনি ব্যাখ্যাগুলো বলুন।

আমি আরো ঘাবড়ে যাই। বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় মৃদু হাসি দেখে এবার খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। তিনি খুশি হয়েছেন। বলেছেন, বেশ তো ব্যাখ্যাগুলো কী একটু শুনি।

সাহস পেয়ে আমি প্রতিটি নকশার অর্থ ও ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে বললাম। বঙ্গবন্ধু অন্যান্য নেতার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা কী বলেন, মনোগ্রাম আর ডিজাইনগুলো ভালো হয়েছে না? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব ভালো হয়েছে। নূরুল ইসলাম, এবার যত তাড়াতাড়ি পারো এগুলো ছেপে বের কর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে মঞ্চ থেকে ছয় দফা ঘোষণা হবে তার 'ব্যাকসিনে' এই 'সিমবলিক' নকশা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। আর এ 'মনোগ্রাম' ও নকশা ছয় দফার সবরকম প্রচারে ব্যবহার করতে হবে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর সারল। সমস্ত ভয় কেটে গেল আমার। ছয় দফা'র লোগো পুস্তিকা ও পোস্টারের ডিজাইন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পছন্দ হয়েছে। আমি সেদিন হালকা মেঘের সাথে আকাশে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ অনুভব করলাম।

শেখ মুজিবের ইচ্ছে অনুযায়ী ছয় দফা ঘোষণা মঞ্চে পোস্টারের নকশা ব্যবহার করা হলো। ছয় দফা উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো এবং ইত্তেফাকের পূর্ণ পৃষ্ঠার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হলো ঘোষণা মঞ্চের অঙ্গসজ্জা।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আরো ছয় বছর পর ১৯৭৩ সালের মে মাসে। আমার শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থটি ছেপে বের হচ্ছে। কীভাবে ছাপা হবে, ছবি নকশা কিছু হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা

হবে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আগামীকাল সকাল ১১টায় গণভবনে দেখা করতে হচ্ছে। তুমিও আমার সাথে যাবে।

পরদিন যথারীতি শিল্পাচার্যের সাথে গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে হাজির। সেখানে আগেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। তিনিই সংবিধান গ্রন্থটির শিল্পমান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য শিল্পাচার্য ও বঙ্গবন্ধুর সেই সভার আয়োজন করেছিলেন। ঘরে ঢুকতেই সফেদ পাঞ্জাবি, পাজামা ও মুজিব কোট পরিহিত শেখ মুজিব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আসুন।

বাংলাদেশের 'সংবিধান গ্রন্থের' প্রথম পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ। বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় চারদিক জুড়ে রয়েছে নকশা এবং ভেতরে লেখা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের তত্ত্বাবধানে প্রধান শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন এ গ্রন্থের লেখক হাশেম খান। নকশা তৈরি করেছেন জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও আবুল বারক আলভী। পুরো গ্রন্থের লিপিকার ছিলেন আব্দুর রউফ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী ঐতিহাসিক পোস্টার।

তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান।

তারপর করমর্দনের জন্য দুজনকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবেদিন স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। বঙ্গবন্ধু মাঝখানে শিল্পাচার্যকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি বসুন, আমিই ওর পরিচয় দিচ্ছি। ও আমার ছয় দফার মনোগ্রাম, নকশা, পোস্টার করেছিল। ছয় দফা ঘোষণার জন্য যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল তার ব্যাকসিনটা ও এত সুন্দরভাবে করেছিল আমার এখনো সব মনে আছে। ছয় রং, ছয়টি গঠন ও আকৃতি ইত্যাদি দিয়ে সেদিন ছয় দফার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল আমি আগে ভাবতেই পারিনি আমার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও বাঙালিদের ন্যায্য অধিকারসহ নকশা, ছবি দিয়ে ছয়-দফার এত চমৎকার ব্যাখ্যা হয়। আবেদিন ভাই, সংবিধান গ্রন্থে ছবি আঁকার জন্য আপনি ঠিক লোককেই পছন্দ করেছেন।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত। সেই কবে ১৯৬৬ সালের এক বিকেলে বিশ মিনিটের এক সাক্ষাৎ। আমার মতো এক সাধারণ তরুণের কথা 'ছয় দফা'র মনোগ্রাম ও পোস্টারের নকশা, তার ব্যাখ্যা সব কিছু এতদিন পর তাঁর মনে আছে। গত ছয় বছরে তাঁর ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। ঊনসত্তরের আন্দোলন, আগরতলা মামলা, স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানের জেলে দুর্বিষহ জীবন, ৩০ লক্ষ প্রাণের

বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, দেশকে গড়ে তোলার এক দুর্জয় স্বপ্ন নিয়ে এগুচ্ছেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিও তাঁর কাছে ম্লান নয়।

সেদিন অনেক কথাই আলোচনা হলো। তবে মূল আলোচনা ছিল সংবিধান গ্রন্থটির ছবি-নকশা ইত্যাদি সমন্বয়ে একটি সুদৃশ্য গ্রন্থ তৈরি করা। বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্যকে বললেন, আবেদিন ভাই, পাকিস্তানিরা সবই তো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। সব সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে জাতির অনেক চাওয়া এবং পাওয়া, আমি যে কী দিতে পারবো জানি না। অনেক পরিশ্রম করে আমরা একটা সংবিধান তৈরি করেছি—আট কোটি বাঙালির মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সরকারের কিছু নিয়ম, আইন ও দলিল। আমি কিছু দিবার না পারলেও আমার পরে যারা আসবে অন্তত এই সংবিধান সামনে রেখে তারা জাতিকে নিশ্চয় কিছু দিবার পারবে। আবেদিন ভাই, সংবিধানের মতো রস-কষহীন একটা বিষয় কতটুকু শৈল্পিকভাবে ও সুন্দরভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরবো সেই পরামর্শ আপনি ছাড়া আর কে দেবার পারবে। আমি কাজ করবার পারি, খাটবার পারি কিন্তু তা সুন্দরভাবে করা, কাজকে শৈল্পিক রূপ দেয়া আপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এ সংবিধান গ্রন্থের রূপ কেমন হবে, ছবি, নকশা এসবের প্রয়োজন আছে কী নেই—সুন্দর প্রকাশনার দায়িত্বটুকু আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

শিল্পাচার্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখছিলাম, তাঁর কথা শুনলেন এবং বললেন, আপনি যা চাইছেন, তা আমরা শিল্পীরা কতখানি পারবো জানি না, তবে আমরা আপনার সাথে আছি। যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন আপনি দেখছেন—আজন্ম এই ইচ্ছাকেই তো আমি লালন করে চলেছি। আজ আপনার উৎসাহ ও স্বপ্ন আমাকে এবং শিল্পী সমাজকে অনুপ্রাণিত করছে।

এরপর প্রায় চার মাসের অনলস কর্মের ফলে শিল্পাচার্যের নেতৃত্বে ড. কামাল হোসেন ও আমরা পাঁচজন শিল্পীর একটি দল দিনরাত পরিকল্পনা, চিন্তা এবং তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধানের প্রতিটি পাতার জন্য নকশা তৈরি করি। যার মধ্যে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকাচারের রং রেখার ব্যবহার করে, বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের এক আবহ সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে।

সংবিধান গ্রন্থের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, আবুল বারক আলভী ও ক্যালিওগ্রাফির জন্য আব্দুর রউফ।

সংবিধান গ্রন্থটি যেটি বাংলা ভাষায়, সেটিকে মুদ্রণ যন্ত্রের টাইপ ব্যবহার না করে প্রতিটি পৃষ্ঠা হাতে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা হাতের লেখা ব্যবহার করে পুরো গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার গ্রন্থটিতে টাইপ ব্যবহার করা

হয়েছিল। এমন একটি মূল্যবান দলিল-গ্রন্থ ইচ্ছে করলে দেশের বাইরে যে কোনো উন্নত দেশ থেকে সুন্দর পরিপাটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা যেত। অনেকেই সেই পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পাচার্য, বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন একটি বিষয়ে একমত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তা হলো—আমাদের যা সম্পদ আছে, যে প্রযুক্তি আছে, যে কর্মী আছে, শিল্পী আছে তা দিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। যে নিষ্ঠা ও চেতনা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি—দেশ গড়ার কাজেও মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে। নিতান্তই প্রয়োজন না হলে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই সংবিধান গ্রন্থের জন্য শুধু কিছু উন্নতমানের কাগজ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সরকারি মুদ্রণালয়ের অতি পুরনো একটি মুদ্রণ যন্ত্রকে সামান্য মেরামত করে গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশ তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি উন্নত মানের মুদ্রণালয় থাকা সত্ত্বেও একটি আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে ও সরকারি মুদ্রণালয় এবং সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ববোধকে সচেতন করার প্রয়োজনে এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সত্যি সত্যি সরকারি মুদ্রণালয়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজটি সমাধা করেছিলেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করায় সরকারের প্রতি তাদের সন্তোষ প্রকাশ পায়। সংবিধান গ্রন্থটির মুদ্রণ শেষ হলে সরকারি মুদ্রণালয়ে এক সমাবেশে কর্মচারী ও কর্মকর্তারা—তাদের প্রতি সরকারের আস্থা ও দায়িত্ব অর্পণের কারণে বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে তাদের আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সোনার বাংলা গড়ার কাজে বঙ্গবন্ধুর হাতকে বলিষ্ঠ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ইচ্ছাকেও প্রকাশ করে।

শিল্পাচার্য ও ড. কামাল হোসেন শিল্পকর্মে শোভিত ও পরিপাটিভাবে মুদ্রিত সংবিধান গ্রন্থটি নিয়ে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। সাথে আমরা পাঁচজন শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু একটি একটি পাতা তুলে সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলো অবাক হয়ে দেখছেন। কিছুক্ষণ দেখার পর মুগ্ধ ও অভিভূত দৃষ্টিতে আমাদের সবার দিকে তাকালেন। বললেন, আবেদিন ভাই, এত সুন্দর কী করে করলেন! আমি যে ভাবতেই পারছি না! কিছুই তো ছিল না, ভাঙা প্রেস, ভালো কালি নেই—তারপরও আপনি কি অসাধ্য সাধন করলেন। আপনারা শিল্পীরা কত সুন্দর ও পরিপাটি করে বাংলার মানুষের জন্য সংবিধান গ্রন্থ তৈরি করলেন। কিন্তু আমি কি করি?

আমি কি পারব আমার বাংলাকে এত সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে? এই যেমন আপনারা পারলেন এই সংবিধান!

—বঙ্গবন্ধু, এই কাজটা তো আপনিই করলেন। আপনার পরিকল্পনা ও চিন্তাকে আমরা একটা রূপ দিলাম। আমরা আপনার হাতিয়ার, আপনার কর্মী। বাংলার মানুষের দেশ গড়ার সংবিধান শৈল্পিক রূপ লাভ করুক, সুন্দর একটি চেহারা অর্জন করুক—আপনার স্বপ্ন ও অভিলাসকেই আমরা শিল্পীরা রূপ দিয়েছি। আমাদের শিল্পীদের মতো বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ও কর্মী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। যাকে যে কাজে প্রয়োজন আপনি আহ্বান জানালেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনার আহ্বানেই যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাকসেনাদের মতো অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা বাংলার মানুষের ছিল না। তবুও তারা যুদ্ধ করেছে। ৩০ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে। তেইশ বছর সংগ্রাম ও নয় মাস হাতিয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে বলিষ্ঠ ও দক্ষ পাকবাহিনীকে হটিয়ে নিজের দেশকে মুক্ত করেছে। আজ আপনার স্বপ্ন—এ বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলবেন। বাংলার মানুষ আপনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তৈরি, আপনি ডাকুন।

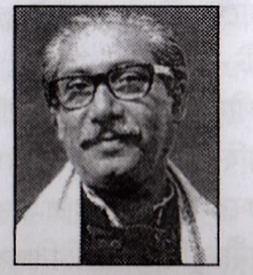
বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন সংবিধান গ্রন্থটি। তারপর বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি তো আমার কাজটা করে দিলেন। এখন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন।

—আমি এবার একটা কাজে হাত দিতে চাই। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পাচার্য বঙ্গবন্ধুকে বলতে লাগলেন—ঢাকার পাশে যে ঐতিহাসিক সোনারগাঁও, সেই সোনারগাঁওকে আমি নতুনরূপে গড়ে তুলতে চাই। এ অঞ্চলেই তৈরি হতো বিশ্বখ্যাত শিল্পকর্ম 'মসলিন' যা আজ হারিয়ে গেছে। এমনিভাবে বাংলার অনেক ঐতিহ্য ও লোকশিল্প আজ লুপ্ত প্রায় এবং যে কটি বেঁচে আছে তা কোনো কদর পাচ্ছে না। বাংলার লোক-ঐতিহ্য ও শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এখনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সোনারগাঁওয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের লোকশিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আমি একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছি। আর তা বাস্তবায়নে আপনার সাহায্য ও উৎসাহ প্রয়োজন। সোনারগাঁওকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে আপনার সোনার বাংলা গড়ার কাজ অনেকখানি এগুবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু একটু অবাক হয়ে শিল্পাচার্যের দিকে তাকালেন। একটু সময় নিলেন। সংবিধানের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আনন্দ ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখুনি কাজে নেমে যান। আমি এবং বাংলাদেশ সরকার আপনাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ, সোনারগাঁওয়ে মাঝে মাঝে আমি আপনার কাছে গিয়ে থাকবো। আমার জন্য আপনার পাশে একটু জায়গা রাখবেন। সুন্দর কিছু সৃষ্টি করার শক্তি ও প্রেরণা আপনার কাছ থেকে যাতে পেরে পারি ও শিখতে পারি সেই ব্যবস্থা আমাকে করে দেবেন।

সংবিধান এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন—দুটি মানুষের কথোপকথন। আমি সেদিন বিমোহিত। মহামানব দেখতে কেমন হয়, এমন কোনো ধারণা আমার নেই। কিন্তু সেদিন এ দু'জনকে আমার মনে হয়েছে, দুই মহামানবের সম্মুখে আমরা। বিশাল বক্ষ দু'জনের। যে বক্ষ ধারণ করে আছে বাংলার আপামর মানুষকে। সোনাগাঁও ও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে। দুজনের মধ্যেই এক অদ্ভুত মিল। এ দুই মহামানব হারিয়েও গেছেন আমাদের মাঝে থেকে প্রায় একইভাবে। দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মানবজাতির শত্রুরা—দুর্বৃত্তরা ও দুর্জনরা। শিল্পাচার্যকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ আর বঙ্গবন্ধুকেও অকস্মাৎ হত্যা করল কিছু দুর্বৃত্ত—সৈন্য—বাংলার শত্রু!

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। শিল্পাচার্যের সোনারগাঁও গড়ার স্বপ্ন সফল হলো না। কী কাকতালীয় মিল। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নও সফলতার মুখ দেখল না।



হাসানুল হক ইনু

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতি ও এ ভূখণ্ডের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের সবচেয়ে মহত্তম কর্মযজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠতম অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সুনির্দিষ্ট অতীত ও ইতিহাস, রাজনৈতিক আদর্শ-দর্শন-লক্ষ্য, নেতৃত্ব, শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ ছিল।

এ ভূখণ্ডের জনগণের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার হাজার বছরের আকুতি-স্বপ্ন ও সংগ্রাম ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। ১৯৫২ সালে মহান বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক উন্মেষ, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান, ১৯৬২ সালের সামরিক শাসনবিরোধী শিক্ষা ও গণতন্ত্রের আন্দোলন, ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজের আন্দোলন, ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি ও উত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে গণরায় প্রদানের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের জন্য পরিপক্ক হয়েছে। তিলতিল করে গড়ে ওঠা এ দীর্ঘ সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ ও নির্দেশে ঐতিহাসিক নজিরবিহীন অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও মহানায়কে

পরিণত হননি, সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রস্তুত করেন। এ দীর্ঘ সংগ্রামে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ন্যাপের উভয় গ্রুপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

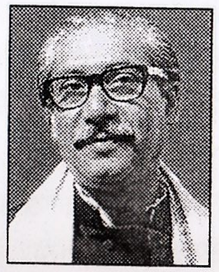
মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সমগ্র জনগণের যুদ্ধ। স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি জনগণই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সদস্য থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী-চিকিৎসক-নার্স-প্রকৌশলী-সরকারি চাকরিজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর-পেশার নাম জানা না জানা লক্ষ লক্ষ মানুষ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ৩০ লক্ষ মানুষের জীবন, কয়েক লক্ষ নারীর সম্ভ্রম, এক সাগর রক্ত সমগ্র জাতির সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু, কারিগর মুক্তিযোদ্ধারা আর মালিক জনগণ।

একটি স্বাধীন এবং শোষণহীন, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। জাতিগত নিপীড়নকারী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে যে অন্যায্যতা ছিল, তার মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা তৈরি হয়েছিল। ইতিহাসের ন্যায্যতাকে অস্বীকার করে জামায়াতে ইসলামসহ যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তারা ইতিহাসের বিপক্ষে অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী সমগ্র জাতির ওপর ইতিহাসের বর্বরতম গণগত্যা, গণধর্ষণ, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত করেছে। তাদের এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মুক্তিযুদ্ধের সুস্পষ্ট শত্রু-মিত্র ছিল। সমগ্র বিশ্বে মানবতাবাদী শান্তিকামী গণতান্ত্রিক জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন যুগিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভারত, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট দেশসমূহ নেপাল, ইরাক সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকার তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষপটে বিশাল রাজনৈতিক কূটনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিঃশর্ত রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থিক, মানবিক, বিশাল সমর্থন প্রদান

করেছিল। ভারত দেড় কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের পশ্চাদভূমি হিসেবে ভারতের মাটি ব্যবহার করাসহ নানাভাবে সামরিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। ভারতের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল-মহল-ব্যক্তি, সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষ করে পশ্চিবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়ের সর্বস্তরের জনগণের মানবিক সাহায্য ও অপরিসীম ত্যাগ-কষ্ট স্বীকারের ঘটনা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ-ভারতের যৌথবাহিনীর অংশ হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রায় চার হাজার জওয়ান শহীদ এবং দশ হাজার জওয়ান আহত হন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান ও পাকিস্তানের পক্ষে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রয়োগের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরাই একমাত্র সৌভাগ্যবান জাতি, যে জাতি ভাষাভিত্তিক আধুনিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা পৃথিবীর দুটি সৌভাগ্যবান জাতির একটি, যাদের লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণা আছে। যে ঘোষণার বলে আমরা স্বাধীনতার জন্য সরকার গঠন করেছি এবং যে ঘোষণার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে সংবিধান রচনা করেছি। যে ঘোষণার ভিত্তিতে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। এরপরও স্বাধীনতার ঘোষণাসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক শুধু দুঃখজনকই নয়, আত্মঘাতী। এ বিতর্ক কেবল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদেরই শক্তি যোগায়।



হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

শেখ হাসিনা যেভাবে জানতে পেরেছিলেন

পনের আগস্ট ভোরবেলা টেলিফোন বেজে উঠল। ঘুমিয়েছিলাম। টেলিফোন ধরলাম। অপর কণ্ঠ থেকে—স্যার আমি ফারুক বলছি, লন্ডন থেকে। খবর শুনেছেন স্যার?

কী খবর?

ঢাকার খবর।

কী হয়েছে ঢাকায় আবার?

স্যার, ঢাকায় অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। শেখ সাহেবের ভাগ্যে কী ঘটেছে, এখনো অনিশ্চিত স্যার।

বলো কী?

সম্ভবত স্যার শেখ সাহেব মারা গেছেন। ফারুক আহমেদ চৌধুরী তখন লন্ডনে ডেপুটি হাইকমিশনার। ফোন রেখে স্ত্রী মাহজাবিনকে বললাম, মাহজাবিন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমিও না। তবুও ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। ব্রাসেলসে ফোন করলাম সানাউল হক সাহেবকে। জানতে চাইলাম, ঢাকার খবর কী? রাষ্ট্রদূত নীরব। কথা বলছেন না। এক পর্যায়ে টেলিফোন রেখে দিলেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে খবর দিতে চান না বলে মনে হলো। ভাবনায় পড়ে গেলাম, কী করি। আবার ফোন করলাম। রাষ্ট্রদূত ধরতেই বললাম, পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত হাসিনা-রেহানাদের যেন না জানায়। তাকে আরও বললাম, যে কোনো সাহয্যের জন্য আমাকে জানাতে যেন ভুল না হয়। আমি যে কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত এ কথাও বললাম। টেলিফোন রেখে বিবিসি শুনতে গেলাম।

রেডিও অন করতেই শোনা গেল বাংলাদেশে অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য বিবিসি এ কথাও বলল, খবরটি এখনো অসমর্থিত। রেডিও বন্ধ করে ভাবছিলাম কী করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভেসে উঠল বারবার। মনে পড়ে শেখ সাহেবের কথা। এক পর্যায়ে বলেছিলেন, ঘটনাবলী ভালো যাচ্ছে না। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, শেখ সাহেব তার মৃত্যুর আগাম বার্তা পেয়ে গেছেন। কয়েক ঘণ্টা পর ব্রাসেলস থেকে সানাউল হকের টেলিফোন। খুব অস্থির, হাসিনা-রেহানাকে নিয়ে যেন ঝামেলায় আছেন। ওদের তাড়িয়ে দিলেই বাঁচেন মনে হলো। বললেন, জানো হুমায়ূন, প্যারিস থেকে আবুল ফতেহ গাড়ি পাঠায়নি। কথা ছিল গাড়ি পাঠাবে, ওদের নিয়ে যাবে। এখনো গাড়ি আসেনি। ফতেহকে পাওয়া যায়নি। ওর বাসায় টেলিফোন ধরছে না। প্যারিসে শফি সামিকে টেলিফোন করলাম। শফি তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। শফিকে বললাম, রাষ্ট্রদূত ফতেহকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেখ সাহেবের মেয়ের আসার কথা প্যারিসে। ওরা যদি আসে, ওদেরকে আদর-যত্ন করো। ও বলল, ঠিক আছে, আমার বাড়িতে রাখব। শফির স্ত্রী আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আবার ফোন করলাম ব্রাসেলসে। সানাউল হককে বললাম, ওদের গাড়ি দিয়ে জার্মান সীমান্ত অন্তত পৌঁছে দেন।

সানাউল হক রাজি হলেন না। বিস্মিত হলাম, কী বলছেন আপনি। এইটুকু মমতাবোধ নেই? অথচ শেখ সাহেব তাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেকের অমতে তাকে রাষ্ট্রদূত বানিয়েছিলেন। সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও তার নেই। আমি ক্ষুব্ধ হলাম। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই ভদ্রলোক কি এমন আচরণ করতে পারতেন? বঙ্গবন্ধুর মেয়েদের গাড়ি দিতে রাজি নন, বাড়িতে ঠাঁই দূরের কথা। কী বলব, এই ভদ্রলোকই পরবর্তী সময়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদে সদস্য হয়েছিলেন। যাকগে ওসব কথা। সানাউল হককে বললাম, আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। ওরা আমার জার্মানির বাড়িতে আসবে। আমি তাদের আশ্রয় দেব। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমার চাকরির কোনো মায়া নেই। মানবতা আমার কাছে মুখ্য। আমার বাবা-মা মানুষের সেবা করতে শিখিয়েছেন। বলেছেন, মানুষের বিপদে-আপদে যেন ছুটে যাই। ফলাফল কী হবে জেনেও আমি ওদের জার্মানি আনার ব্যবস্থা করলাম। পনেরো আগস্ট সন্ধ্যায় ওরা জার্মানি পৌঁছাল। ঐদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের জার্মানি পৌঁছার কথা। সাথে থাকবেন পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালক রেজাউল করিম। বেলগ্রড থেকে কামাল তখনও ঢাকার খবর জানেন না, আমি তাদের

বাসায় নিয়ে গেলাম। কামাল হোসেন খুবই অস্থির, কথা বলতে পারছেন না। হাসিনা-রেহানাদের আগেই ড. কামাল জার্মানি পৌঁছেছেন। সারাদিনই কাটালাম রেডিও শুনে। যখন জানতে পারলাম খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তখন আবারো মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। তখন থেকেই তিনি নানা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। মোশতাক চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন।

শেখ সাহেবের মেয়েরা যখন আমার বাসায় পৌঁছল তখন কী দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়।

জীবনে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এমন হইনি কখনো। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হিমশীতল পরিবেশ। এক পর্যায়ে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নায় বাড়ির নিস্তব্ধতা কেটে গেল। ঢাকায় ফোন করলাম, কোনো টেলিফোনই কাজ করছে না। ঢাকার সাথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টেলিফোন পাঠালাম বিস্তারিত জানার জন্য। কোনো উত্তর এল না। লন্ডনে ফোন করলাম। তারা বলল, রেডিও রিপোর্ট ছাড়া কিছু জানে না। হাসিনা-রেহানা জানত না, ঢাকায় শেখ পরিবারের সবাই মারা গেছেন। তাদের সবকিছু জানানো হয়নি। আমার বাসায় তিনটি রেডিও ছিল। একটি রেডিও ছাড়া বাকি দুটি আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রেখে দিলাম। কীভাবে যেন হাসিনা-রেহানা জেনে গেল, শেখ সাহেব মারা গেছেন। এই খবর শোনামাত্র ড. ওয়াজেদ বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার মনে আছে, শেখ হাসিনা আমাকে বলেছিল, জানি জানি, কামাল-জামালও চলে গেছে। হাসিনা কান্নাজনিত কণ্ঠে বলছিল, চাচা, আমার মা ও রাসেলকে আমাদের কাছে আনার ব্যবস্থা করুন।

রাত তখন দশটা। আমি জানতাম, বেগম মুজিব মারা গেছেন।

তবু আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কী করা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা কীভাবে যেন নিশ্চিত হয়ে গেল, বেগম মুজিবও নেই। কী বলব ওদের অবস্থার কথা। হাসিনার অনুরোধেই আমি টেলিগ্রাম পাঠালাম ঢাকায়, শেখ রাসেলকে যেন জার্মানিতে পাঠানো হয়। আমার ধারণার বাইরে ছিল, এ অল্প বয়সের শিশুটিকেও হত্যা করা হয়েছে। কোনো জবাব এল না ঢাকা থেকে। জার্মানি সরকারকে জানালাম, আমার বাসায় শেখ সাহেবের দুই মেয়ে, মেয়ের জামাই ও দুই নাতি-নাতনী রয়েছে। জার্মান সরকার সাথে সাথে আমার বাসার সামনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিস্তারিত জানতে চাইল। তারা বলল, এক্সিলেন্সি, আমরা আপনার

সাহসী ভূমিকাকে উৎসাহিত করছি। তবু আপনি নিজে কোনো ঝামেলায় পড়েন কি-না খেয়াল রাখবেন। বললাম, কোনো অসুবিধা হবে না। মানবিক দায়িত্ব পালন করছি। মনে আছে, ডেস্ক অফিসার আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন নিশ্চিত না হই, অসুবিধা হবে না, এ কথা ভেবে। তার ভাষায় সুবিধা হতে পারে। সতর্ক থাকবেন। আমাদের জানাবেন সবকিছু।

এক পর্যায়ে হাসিনা জানতে চাইল কে এই ঘটনার নায়ক। আমি বললাম, রেডিও রিপোর্ট থেকে শুনেছি খন্দকার মোশতাকের কথা। হাসিনা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। আব্বার সাথে মোশতাক চাচার কত ঘনিষ্ঠ। পরিবারের একজন সদস্যের মতো। তিনি এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারেন না। হাসিনা অবিশ্বাস করলে কী হবে, মোশতাকই এ ঘটনার নায়ক। অভ্যুত্থানের সুবাদে প্রেসিডেন্ট।

সারা দুনিয়া থেকে টেলিফোন আসা শুরু করল আমার কাছে। তারা জানতে চাইল শেখ পরিবারের দু'সদস্যের কথা। সংবাদপত্র থেকেও ফোনের পর ফোন। এক জার্মান মহিলা মিশনে ঢুকে বললেন, তোমরা কেমন জাতি, তোমাদের নেতাকে হত্যা করতে পারো, তোমরা এক অসভ্য জাতি। ভদ্রমহিলা কোনো অবস্থাতেই থামতে রাজি নন। ১২ বছরের বালককে নিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কীভাবে এ বয়সের বালককে হত্যা করতে পারো। রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয় দিতে তখন লজ্জা লাগছিল। এই যখন অবস্থা, তখন জার্মান প্রবাসী কিছু যুবক এসে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। তারা বলল, আমি কেন শেখ সাহেবের মেয়েদের ঠাঁই দিয়েছি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন তাদের বাসা থেকে বের করে দেই। তা না হলে আমাকে তারা দেখে নেবে। তারা কয়েকটি পাসপোর্ট বের করে বলল, তাতে যেন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সিল মেরে দেই। তাদের ধারণা, বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়ে গেছে। ষোল আগস্ট ড. কামাল লন্ডনের পথে পাড়ি দিলেন। আমার বাসায় যে কক্ষে ড. কামাল উঠেছিলেন সেটি খালি করা হলো। আমার ভাগিনা এসে হাজির। সুঠাম দেহের অধিকারী ভাগিনা যখন তার কক্ষে যাচ্ছিল তখন শেখ সাহেবের এক মেয়ে তাকে দেখে ফেলে। তারা ভাবে অন্য কেউ হয়তো এসেছে তাদের হত্যা করতে। সারারাত তারা ঘুমাইনি। ড. ওয়াজেদ আমাকে জার্মানির সোভিয়েত দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখার অনুরোধ জানালেন। তার ধারণা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের আশ্রয় দেবে। আমি জানালাম, আশ্রয় নিতে চাইলে সোভিয়েত কেন জার্মানিতেই হবে। এটা কোনো সমস্যা নয়। ইচ্ছা করলে লন্ডনেও যাওয়া যেতে পারে। এক সময় ভারতীয়

হাইকমিশনার মি. রহমান টেলিফোন করে শেখ পরিবারের সদস্যদের কুশলাদি জানতে চাইলেন। বললাম, তারা ভালো আছে, আমি দেখাশোনা করছি। তিনি বললেন, ভারতীয় হাইকমিশনার মি. রহমান দেখা করতে চান তার সাথে। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। আমি গরহাজির থাকলাম। ড. ওয়াজেদ সবাইকে নিয়ে গেলেন কালশোতে। সেখানে শিক্ষা সফরে এসেছিলেন তিনি। কিছুদিন পর ভারতীয় হাইকমিশনার জানালেন, শেখ পরিবারের সদস্যরা নিরাপদে, সুস্থভাবে বসবাস করছেন দিল্লিতে। ২৫ আগস্ট জেনেভা থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী টেলিফোনে জানালেন, মোশতাক সাহেব খুবই ক্ষিপ্ত—কেন আমি হাসিনা-রেহানাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আবু সাঈদ বললেন, প্লিজ, আপনি ঢাকা যাবেন না, গেলে বিপদ হবে। দু'দিন পর ঢাকা থেকে বার্তা, আমাকে ওএসডি করা হয়েছে। জার্মান বন্ধুরা বলল, ঢাকায় যাবার দরকার নেই। জার্মানিতে সেক্রেটারি মি. এইচ. আর ডিঙ্গেলস বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আমরা আছি।